আলেক্স হেলি

শিকড়ের সন্ধানে

অনুবাদ

গীতি সেন

প রি বে শ ক

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

আমার সকল শুভপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা ও পথপ্রদর্শক

আমার জীবনের আলো

অমিয়কুমার সেনকে

১৭৫০ সালের বসন্তকাল। জুফরে গ্রাম পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়া উপকূলে উজান বেয়ে চারদিনের পথ। সেখানে অমোরো ও বিণ্টা কিণ্টের একটি পুত্রসন্তান সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে। সে তার মায়ের মতোই কৃষ্ণবর্ণ এবং সবল। সারা দেহ ক্লেদ ও রক্তে পিচ্ছিল। ভূমিষ্ঠ হয়েই আপ্রাণ চিৎকার করছিলো। ইয়াইসা এবং নিও বটো নামে শিশুর দুই বৃদ্ধা ধাত্রী পুত্রসন্তান দেখে আনন্দধ্বনি করে উঠলো। পরিবারের প্রথম সন্তানটি পুত্র হওয়া আল্লাহের বিশেষ করুণার চিহ্ন বলে মনে করা হয়। কিণ্টে পরিবার সেই করুণার স্পর্শে ধন্য হলো।

তখন উষাকাল। পিতামহীদের অনর্গল বাক্যালাপ ছাড়াও উদুখলের ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি ভেসে আসছিলো। প্রাতঃরাশের জন্য প্রতিদিন টাটকা শস্য কুটে মাটির পাত্রে ফুটিয়ে নেওয়া সে দেশের প্রথা।

ধুলিধূসর ছোট্ট গ্রামটির গোলাকৃতি মাটির কুটিরগুলোর মাথার ওপর দিয়ে নীল ধোঁওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে যাচ্ছে। গ্রামের ইমাম কাজালি ডেম্বার করুণ অনুনাসিক আজান ধ্বনি সকলকে প্রার্থনা সভায় আহ্বান করছিলো। আল্লাহের উদ্দেশ্যে দৈনিক পাঁচদফা নামাজের শুরুতে সর্বপ্রথম এই ফজরের আজান সকলকে জাগ্রত হ'বার আহ্বান। সৃষ্টির কোন আদিম যুগ থেকে এর সূত্রপাত—কে জানে!

বাঁশ ও পশুচর্মের তৈরী শয্যা ছেড়ে এবার সকলে উঠে পড়লো। মোটা কাপড়ের পোশাক পরে নিয়ে পুরুষেরা দ্রুতপদে সভার দিকে অগ্রসর হলো। ইমামের নেতৃত্বে প্রার্থনা শুরু হয়—'আল্লাহু আকবর। আশাদু আন লা ইলাহা ইলালা!'—ঈশ্বর এক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ঈশ্বর কেবলমাত্র এক!—

প্রার্থনার শেষে বাড়ী ফিরবার পথে সুখী ও উত্তেজিত অমোরো তার প্রতিবেশীদের সুসংবাদটি দিলো। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে সকলে নবজাতকের উদ্দেশে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলো।

বাড়ী ফিরে এলে স্ত্রীরা স্বামীদের লাউয়ের খোলার পাত্রে চূর্ণ শস্যের পরিজ খেতে দেয়। পেছনের উঠোনের এক প্রান্তে রান্নাঘর। শিশুদের খাইয়ে সর্বশেষে গৃহকর্ত্রীদের খাবার পালা। প্রাতঃরাশের পর পুরুষেরা কৃষিকর্মের যন্ত্রপাতি নিয়ে

কাজে বেরিয়ে পড়ে। গাম্বিয়া উপকূলের এই উষ্ণ, উর্বর, বৃক্ষহীন তৃণভূমি বা সাভানা অঞ্চলে বাদাম, তুলো এবং ধানই প্রধান ফসল। ধান চাষের কাজটি একান্তই মেয়েদের।

বংশরীতি অনুযায়ী পরবর্তী সাতদিনে অমোরোর প্রধান কাজ হবে তার পুত্রের একটি উপযুক্ত নাম নির্বাচন। অতীত ইতিহাস ও শিশুর ভবিষ্যত জীবন উভয় দিক থেকে নামটি উপযুক্ত এবং প্রতিশ্রুতিময় হওয়া দরকার।

মানডিনকা উপজাতির বিশ্বাস—যে ব্যক্তি বা বস্তুর নামে নামকরণ হবে, নবজাতকের চরিত্রে তার অন্ততঃ সাতটি গুণ বর্তাবে।

সাতদিনের মধ্যে অমোরো জুফরে গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেককে জন্মের অষ্টমদিনের নামকরণ উৎসবে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। নবজাতকটি সেদিন তাদের উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

অষ্টমদিন প্রত্যূষে গ্রামবাসীরা অমোরো ও বিণ্টার কুটিরের সামনে সমবেত হলো। পিতৃ পরিবার ও মাতুল পরিবারের মেয়েদের মাথায় লাউয়ের খোলায় দই, চাল ও মধুমিশ্রিত মিষ্টান্ন। গ্রামের জালিবা বা ঘোষক কারামো সিলা তার ঢাক নিয়ে এসেছে। আরাফাঙ বা গ্রামের বৃদ্ধ শিক্ষক ব্রিমা সিসেও উপস্থিত। ইমাম এসেছেন। অমোরোর দুই ভাই জানে ও সালুম অন্য গ্রামে বাস করে। ঢাকের আওয়াজের মাধ্যমে ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্মসংবাদ পেয়ে তারাও বহুদূর থেকে এ উৎসবে যোগ দিতে এসেছে।

বিণ্টা তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে গর্বভরে এগিয়ে এলো। শিশুর মাথার সামান্য অংশ প্রথা অনুযায়ী মুণ্ডন করে দেবার পর সমবেত মহিলারা সমস্বরে তার দেহশ্রীর প্রশংসা করতে লাগলো। গ্রামের ঘোষকের ট্যাং ট্যাং ঢাক বেজে উঠলো। এবার ইমাম দই ও মিষ্টান্ন সামনে রেখে প্রার্থনা শুরু করলেন। খাদ্যের প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ সকলেই ডান হাতে পাত্রটি স্পর্শ করে নিলে ইমাম শিশুটির উপর তাঁর আশীর্বাণী বর্ষণ করলেন। আল্লাহ্ তাকে দীর্ঘ আয়ু ও সার্থক জীবন দিন! সে পরিবারের তথা গ্রামের ও জাতির সম্মান বৃদ্ধি করুক এবং বহু সন্তানের জনক হোক্! পরিশেষে আজ যে নামে তাকে ভূষিত করা হবে, তার উদ্দেশ্য সফল হোক্।

অমোরো এগিয়ে এসে স্ত্রীর কোল থেকে শিশুটিকে তুলে নিলো। তারপর সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে তার কানে নির্বাচিত নামটি মৃদুস্বরে তিনবার উচ্চারণ করলো। তাদের জাতির বিশ্বাস প্রত্যেকেরই নিজের নাম সর্বপ্রথম শুনবার জন্মগত

অধিকার আছে। ট্যাং ট্যাং ঢাক আবার বেজে উঠলো। এবার অমোরো বিণ্টার কানে নামটি বলতেই আনন্দ ও গৌরবে নতুন মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এরপরে আরাফাঙের কানে নামটি উচ্চারিত হলো। এবার ব্রিমা সিসে ঘোষণা করলেন—'অমোরো ও বিণ্টা কিণ্টের প্রথম সন্তানের নাম—কুণ্টা !'

নামটি শিশুর পিতামহ কায়রাবা কুণ্টা কিণ্টের মধ্যম নাম। তিনি মরেটানিয়া থেকে গাম্বিয়া এসে জুফরের লোকেদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। পিতামহী ইয়াইসাকে বিবাহ করে তিনি গ্রামপ্রধান হিসাবে জুফরেতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সসম্মানে কাটিয়েছেন।

আরাফাঙ মরেটানিয়ার পূর্বপুরুষদের নাম বলে গেলেন। প্রাচীন বংশ-তালিকা। দু'শো বর্ষা থেকেও প্রাচীন ও মহান। জালিবা আবার তার ট্যাং ট্যাঙে আওয়াজ তুললো। উপস্থিত সকলেই সেই সম্ভ্রান্ত বংশের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় মুখরিত হলো। সে রাত্রে চন্দ্র ও নক্ষত্র খচিত আকাশের নীচে অমোরো এই নামকরণ অনুষ্ঠানের শেষ লৌকিকতা সমাপ্ত করলো। ছোট্ট কুণ্টাকে তার সবল বাহুতে তুলে গ্রামের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেলো। তাকে আকাশের মুখোমুখি উঁচু করে ধরে কোমলকণ্ঠে বললো—'তাকিয়ে দেখ, তোমার থেকেও মহত্তর যদি কিছু থাকে—তবে সে এই আকাশ !'

দুই

চাষের মরসুম। প্রথম বর্ষণ আসন্ন। জুফরেবাসীরা তাদের ক্ষেতে শুকনো আগাছা একসাথে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই ভস্ম বায়ু সঞ্চালনে সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে উর্বরতা বৃদ্ধি করবে। মেয়েদের ধানের ক্ষেতে চারা রোপণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

পিতামহী ইয়াইসা এতদিন বিণ্টার ক্ষেত দেখাশুনা করছিলেন। এখন বিণ্টা আবার তার কাজ শুরু করবে। কুণ্টাকে পিঠে বেঁধে তার মা অন্যান্য মেয়েদের সাথে রওয়ানা দিলো। সকলেরই মাথায় বোঁচকা। অনেকেরই পিঠে বাঁধা ছোট শিশু। গাম্বিয়া নদীর বহু শাখা উপশাখা দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত। তাদের গ্রামের ধারের নদীটির নাম কাম্বি। মেয়েরা পাঁচ ছ'জন করে এক একটা ক্যানু বা নৌকোতে চড়ে বসলো। এর দাঁড়গুলো বেঁটে ও চওড়া। বিণ্টা চলতে ফিরতে

পিঠে শিশুর উষ্ণ কোমলতা অনুভব করছিলো। গরান গাছের তীব্র মদির সুগন্ধ, নদীর দু'পাশে ঘনবদ্ধ অন্যান্য উদ্ভিদ এবং তরুরাজির সৌরভে বাতাস ভারী। ধাবমান ক্যানুগুলোর গতিবেগে ভীত বেবুনের দল অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে উঠে চিৎকার, লাফালাফি, গাছের ডাল ধরে ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করে দেয়। বন্য শুয়োরেরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ভোঁস ভোঁস শব্দে ঝোপের ফাঁকে-ফোকরে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। নদীর কর্দমাক্ত তীরে অসংখ্য পেলিকান, এগ্রেট, হেরণ, গাল, টার্ণ, স্পুনবিল ও সারস পাখী প্রাতঃরাশ বন্ধ করে ভীত নয়নে এদের দিকে লক্ষ্য রাখে। ছোট ছোট পাখীগুলো আকাশে উড়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করতে থাকে।

ঊর্মিমুখর জলস্রোত কাটাতে গিয়ে কখনো বা এক ঝাঁক রুপোলী মাছ লাফিয়ে ওঠে। তারা এক ঝলক নৃত্যকলা দেখিয়ে তেমনি অকস্মাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কখনো বা হিংস্র, ক্ষুধার্ত বড়ো বড়ো মাছ মিনো মাছকে তাড়া করতে গিয়ে নিজেরাই দ্রুতগতি ক্যানুর ভিতর পড়ে যায়। মেয়েরা সেগুলোকে দাঁড় দিয়ে মেরে ফেলে রাতের ভোজ্য তালিকার একটি পদ বাড়িয়ে নেয়।

একটা বাঁক ঘুরে ক্যানুগুলো আর একটু চওড়া নদীতে এসে পড়তেই সামুদ্রিক পাখীর একটা বিরাট ঝাঁক দেখা যায়। আকাশে যেন একটি বিরাট চলমান সজীব কার্পেট। পাখা ঝাপটানোর শব্দে চারিদিক পূর্ণ। উড়ন্ত পাখীর গতি আর স্খলিত পালকে নদীর জল নিবিড় ঘন, কুঞ্চিত হয়ে আসে। জুফরের মেয়েরা বংশানুক্রমে যে বিল অঞ্চলে ধানের চাষ করে তার কাছাকাছি পৌঁছাতেই মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মশার দল তাদের ঘিরে ধরে। ক্রমে একটা একটা করে ক্যানু ক্ষেতের ধারে জমাট বাঁধা আগাছার আলে আটকে গেলো। এই আল দিয়েই প্রত্যেকের জমি চিহ্নিত। সেখানে তখন পান্না রঙের কচি ধানের চারা জলের উপর বিঘৎ পরিমাণ উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রতি বৎসর জুফরের গ্রামপ্রধানেরা কোন পরিবারে খাবার মুখ ক'টি—সে হিসাবে মেয়েদের জমি বণ্টন করে দেন। বিণ্টার জমি এখনো ছোট। পিঠে শিশু নিয়ে বিণ্টা সাবধানে ক্যানু থেকে নেমে এলো। এগোতে গিয়ে সামনে তাকিয়ে বিস্ময়ে আনন্দে থেমে গেলো। খুঁটির ওপর তৈরী একটি ছোট্ট পাতায় ছাওয়া বাঁশের ঘর। বিণ্টার অনুপস্থিতিতে অমোরো তার শিশুর আশ্রয়ের জন্য এইটি তৈরী করে রেখেছে।

বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে ঘরটির ভেতরে রেখে, বিণ্টা তার বোঁচকার ভেতর

থেকে কাজের পোশাক বার করে পরে নিলো। তারপর জলের ভেতর দিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ করে চলে এসে নীচু হয়ে ঝুঁকে ধান গাছের গোড়ার আগাছা বাছতে লাগলো। বাচ্চা কেঁদে উঠলেই একবার করে তার কাছে গিয়ে খাইয়ে আসছিলো। ছোট্ট কুণ্টা এমনি করে বাবার তৈরী ছত্রছায়ায়, মায়ের উষ্ণ স্নেহ-ধারায় বড়ো হতে লাগলো। কাজ থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলায় রান্না করে স্বামীকে খাইয়ে বিণ্টা ছেলের সারা গায়ে শিয়া গাছের তেল মালিশ করে দিতো। কখনো বা গ্রামের অপর প্রান্তে পিতামহী ইয়াইসার কুটিরে তার শিশুকে দেখাতে নিয়ে যেতো। সেখানে তো কুণ্টার আরো আদর। অতিরিক্ত আদরের জ্বালায় সে কাঁদতে শুরু করতো। মা ও ঠাকুরমা তার ছোট্ট মাথা, নাক, কান, ঠোঁট সব কিছু সুগঠিত করবার জন্য টিপে টিপে দিতেন।

সে দেশে স্বামীদের কুটির আলাদা। অমোরো কখনো বা ছেলেকে তার নিজের ঘরে নিয়ে যেতো। চৌকির মাথার দিক থেকে নানারকম তাবিজ আর মাদুলি ধরনের জিনিস ঝুলতো। কুণ্টার চোখ ও আঙুলের পক্ষে সে মস্ত বড়ো আকর্ষণ। যে কোন রঙীন জিনিসেই তার কৌতূহল, বিশেষ করে তার বাবার চামড়ার শিকারের থলিটি সম্পর্কে। অমোরো যতগুলো শিকার করেছে—প্রতিটি পশুর জন্য একটি করে ঝিনুক বা কড়ি সে থলিতে লাগানো। এখন সেটি প্রায় ভরে এসেছে। পাশেই লম্বা বাঁকানো ধনুক এবং তীর ভর্তি তূণ। সেটি দেখে শিশুর মুখে নানারকম কলধ্বনি ফুটতো। সরু, লম্বা, বহুব্যবহারে মসৃণ বর্শাটিও উৎসুক ছোট্ট হাতে স্পর্শ করা চাই। শুধু তার প্রার্থনার আসনটি অমোরো শিশুকে স্পর্শ করতে দিতো না—কারণ সেটি বড়োই পবিত্র।

খাবার সময় হলে অমোরো তাকে মায়ের ঘরে ফিরিয়ে আনতো। কুণ্টা বড়োই হাসিখুশী ছেলে। মা তাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতেন—

আমার ছোট্ট মিষ্টি হাসিভরা খোকা,
বিরাট লোকের নামে তোমার নাম।
একদিন তুমি তাঁরই মতো মস্ত হবে.
বিরাট বড়ো শিকারী বা যোদ্ধা।
গর্বে তোমার বাবার বক ভরবে।
কিন্তু আমার বুকে আঁকা চিরদিনের
সেই ছোট্ট মিষ্টি হাসিভরা খোকা।

যে ক'মাস স্ত্রীরা নবজাত শিশুদের স্তন্য দেয়, তার মাঝে মুসলমান স্বামীরা

অনেকেই দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। বিণ্টার মনের গহনে সে আশঙ্কা লেগেই ছিলো। কুণ্টা কতদিনে মাতৃদুগ্ধ ছাড়বে—এই ছিলো তার ভাবনা। তেরোটি পূর্ণ চন্দ্রের পর টলমলে ছোট্ট পায়ে কুণ্টার প্রথম পদক্ষেপে তার মা সাগ্রহে সাহায্য করলেন। শীঘ্রই অমোরোর গর্ব এবং বিণ্টার স্বস্তি ঘটিয়ে সে একাই অনিশ্চিত পায়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো। তারপর থেকে মায়ের কাছে দুধ খাবার বায়না ধরলেই বিণ্টা তাকে এক চাপড় লাগিয়ে এক পাত্র গরুর দুধ ধরিয়ে দিতো।

তিন

তিনটি বর্ষা কেটে গিয়েছে। সাধারণতঃ চতুর্থ বৎসরটি নিষ্ফলা হয়। গ্রামে গত ফসলের শস্য এবং শুকনো খাদ্যের ভাণ্ডারটি প্রায় শূন্য। পুরুষেরা শিকারে বেরোচ্ছে। কিন্তু শিকারও দুর্লভ। প্রচণ্ড তাপে সাভানা অঞ্চলের জলস্থানগুলো শুকিয়ে কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী ফসল ফলাবার প্রস্তুতিতে জুফরের পুরুষদের তখন প্রচুর শক্তি দরকার। অথচ বড়ো বড়ো পশু, লোভনীয় শিকার সবই গভীর অরণ্যের অন্তরালে। গৃহিণীরা ভাতের সাথে বাঁশের বীজ, বিস্বাদ বাওবাব গাছের শুকনো পাতা ইত্যাদি মিশাতে শুরু করেছে। অনাহারের দিনগুলো বড়ো শীঘ্র এসে গেলো। পাঁচটি ছাগল, দুটি ষাঁড় আল্লাহের নামে কুরবানী দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের আকুল প্রার্থনা—দুর্ভিক্ষ ও অনাহার থেকে তিনি এ গ্রামকে রক্ষা করুন।

অবশেষে তপ্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মৃদু বায়ু প্রবলতর হলো। একদিন বিনা ভূমিকায় সামান্য বর্ষণও হলো। তৃষিত ভূমি মুহূর্তে তা শুষে নিলো। কৃষকেরা মাটি চষে বীজ বোনার জন্য সারিবদ্ধ নরম মাটির লাইন প্রস্তুত করে রাখলো। বড়ো বর্ষা আসার আগে রোপণের কাজ শেষ করতে হবে।

এখন কিছুদিন মেয়েরা তাদের ধানের ক্ষেতে যাবে না। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক বধূরা বড়ো বড়ো টাটকা সবুজ পাতার পোশাক পরে গান গাইতে গাইতে পুরুষদের চষা ক্ষেতে উপস্থিত হবে। তাদের মাথায় থাকবে মাটির পাত্রে তুলো, বাদাম ও অন্যান্য ফসলের বীজ। কণ্ঠে থাকবে সুরেলা ছন্দে পৌরাণিক গান, যা প্রার্থনারই নামান্তর। নগ্নপদে, ছন্দোময় চলনে সারিবদ্ধ মেয়েরা, প্রতিটি কৃষকের ভূমির চারিপাশে তিনবার ঘুরে ঘুরে গান করবে। বীজগুলো যেন দৃঢ়মূল হয়ে

সতেজ স্বাস্থ্যে বৃদ্ধি পায়। তারপর আলাদা হয়ে প্রতি ভূমিস্বামীর পেছনে একজন নারী থাকবে। পুরুষটি তার জমির প্রতিটি লাইনে নির্দিষ্ট দূরত্বে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে গর্ত করে এগিয়ে যাবে। নারীটি তাতে একটি করে বীজ ফেলে দিয়ে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলে গর্ত বুজিয়ে দেবে। মেয়েদের পরিশ্রম ছেলেদের থেকে বেশী। স্বামীদের কাজে সাহায্য, নিজেদের ধানের ক্ষেতের দেখাশোনা এবং রান্নাঘর সংলগ্ন সবজি বাগানের দেখাশোনার ভার সবই তাদের ওপর।

বিণ্টা যখন পেঁয়াজ, লাউ, কুমড়ো, টম্যাটো ইত্যাদির পরিচর্যায় ব্যস্ত, ছোট্ট কুণ্টা তার একাধিক বৃদ্ধা পিতামহীর তত্ত্বাবধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম কাফো অর্থাৎ পাঁচটি বর্ষার নীচে যাদের বয়স—জুফরের এমন সকল শিশুর ভারই এদের ওপর। পশু ও মানব শিশু একই সাথে—নগ্ন দেহে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিশুদের কারো বা মুখে প্রথম কথা ফুটেছে। কুণ্টার মতো সকলেই স্বাস্থ্যবান, সবল। গ্রামের বৃদ্ধ বাওবাব গাছটির সুবৃহৎ কাণ্ডের চারিপাশে এরা হেসে খেলে কুকুর ও মুরগীগুলোকে তাড়া করে ছুটে বেড়ায়।

কিন্তু পিতামহীদের মাঝে কেউ যদি গল্প বলার আশ্বাস দেন, এরা মুহূর্তে শান্ত হয়ে নিঃশব্দে বসে যাবে। গল্পের অনেক কথাই কুণ্টা বুঝতে পারে না। কিন্তু যাঁরা বলেন, তাঁদের দেহের অঙ্গভঙ্গী, নানারকম আওয়াজ যেন গল্পের ঘটনাটি চোখের সামনে এনে দেয়। সে বড়ো বড়ো চোখ করে তাই উপভোগ করে।

এসব গল্পের অনেকগুলোই ছোট্ট কুণ্টা তার নিজের ঠাকুরমা ইয়াইসার কাছে শুনেছে। কিন্তু খেলার সাথীদের সাথে বসে অতি প্রিয় নিয়ো বটোর মজার ধরনে বলা গল্প শোনার আনন্দই আলাদা। নিয়ো বটোর মাথায় একটিও চুল নেই। গভীর রেখাঙ্কিত দেহ মিশমিশে কালো। কোলা বাদাম খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো হলদে। আবার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে ঘাসে পাকানো চুরুটের মতো একখানা কাঠি সর্বদাই গোঁজা। গলা দিয়ে নানারকম আওয়াজ করতে করতে নীচু টুলে এসে বসবে। বাইরে রূঢ় ব্যবহার করলেও শিশুরা জানে সে তাদের নিজের সন্তানতুল্য ভালোবাসে।

গল্প শোনার শেষে ঠাকুরমারা কেউ বাচ্চাদের জন্য গুবরে পোকা আর গঙ্গা ফড়িং ভাজা নিয়ে আসতেন। বৎসরের অন্যান্য সময় এতে কারো পেট ভরতো না। কিন্তু আসন্ন দুর্ভিক্ষের মুখে এ দিয়েই খাওয়া সারতে হবে। চালের বড়োই টানাটানি।

চার

আজকাল রোজ সকালে সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশে রামধনু দেখা গেলেই কুণ্টা আর তার সাথীদের উত্তেজনার সীমা থাকতো না। তারা ছুটে সেটা ধরতে যেতো। কিন্তু বর্ষার সাথে সাথে এসেছিলো উড়ন্ত পোকার ঝাঁক। তাদের কামড়ের জ্বালায় শিশুরা ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হতো।

অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে বর্ষণ অতি প্রবল হলো। বড়ো বর্ষা এসেছে। ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে সকলে চালের ওপর প্রচণ্ড বারিপাতের শব্দ শুনছিলো। তীব্র বিদ্যুৎ চমকে ও মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষে শিশুরা ভীত, সন্ত্রস্ত। বড়োরা তাদের সাহস যোগাচ্ছিলো। এ ঘোর দুর্যোগে প্রবল বর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে কেবল শৃগালের চিৎকার, হায়নার গর্জন ও ভেকের আর্তনাদ শোনা যায়।

রাতের পর রাত একই পরিস্থিতি। এ দেশে কেবল রাতেই বর্ষণ প্রবল হয়। নদীতীরের নীচু জমি সব জলমগ্ন হয়ে গেলো। কৃষিক্ষেত্রগুলি যেন জলাভূমি। তাদের গ্রাম এক বিরাট কর্দমাক্ত প্রান্তর। তা সত্ত্বেও প্রাতঃরাশের আগে জুফরের মসজিদে সকালের প্রার্থনায় একত্র হয়ে কৃষকেরা এই প্রার্থনাই জানাতো—আল্লাহ, আরো বৃষ্টি দিন। কারণ তাদের জীবন মরণ এই বৃষ্টির ওপরেই নির্ভর করে। মাটির গভীর অন্তর্দেশ পর্যন্ত জলসিক্ত হওয়া চাই। গাছের মূলদেশ পর্যন্ত জল না পৌঁছলে আগামী দিনের প্রচণ্ড দাবদাহে এক দানা ফসলও রক্ষা করা যাবে না।

বাচ্চাদের কুটিরে আলোর ব্যবস্থা অতি সামান্য। কিছু শুকনো কাঠি আর ঘুঁটে জ্বালিয়ে ঘর সামান্যই গরম হয়। বৃদ্ধা নিয়ো বটো কুণ্টা ও অন্যান্য শিশুদের গল্প বলছিলো। যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি না হলে কী ভয়ঙ্কর দুর্দশা হয় সে কথাই হচ্ছিলো। একবার বড়ো বর্ষার সময় দুদিন বৃষ্টির পরেই প্রখর রোদ উঠেছিলো। আল্লাহের কাছে কাতর প্রার্থনা, বৃষ্টি ভিক্ষার প্রাচীন নৃত্য সবই হচ্ছিলো। প্রতিদিন দুটি ছাগল ও একটি ষাঁড় উৎসর্গ করা হয়েছে। তবুও মাটির বুকে যা কিছু উদ্ভিদ, শুকিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে গেলো। বনের ভেতরের জলাশয়গুলি পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিলো। বন্য পশুপাখী তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের সন্ধানে গ্রামের ভেতরে চলে আসছিলো। প্রতি রাত্রে নির্মেঘ স্বচ্ছ আকাশে হাজার হাজার উজ্জ্বল নক্ষত্র নিষ্ঠুর দ্যুতিতে ঝকঝক করতে লাগলো। শীতল হাওয়া বইতে শুরু করলো। জুফরে গ্রামে যেন অশুভ প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। ক্রমশঃ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলো।

যারা সুস্থ ছিলো—প্রার্থনা, নৃত্য, বলি চালিয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে গ্রামের শেষ ছাগল, শেষ ষাঁড়টি পর্যন্ত উৎসর্গ করা হয়ে গেলো। কিন্তু আল্লাহ জুফরে-বাসীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই রাখলেন। বৃদ্ধ, দুর্বল ও রুগ্নরা মরতে শুরু করলো। সমর্থ ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলো—দাসত্বের বিনিময়ে ক্ষুধা মেটাবার আশায়। সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে আল্লাহ কায়রাবা কুণ্টা কিণ্টেকে পথ দেখিয়ে জুফরে নিয়ে এলেন। সেখানকার অধিবাসীদের দুর্দশা দেখে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নতজানু হয়ে আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সামান্য জল ছাড়া কিছুই তিনি গ্রহণ করেননি। একাদিক্রমে পাঁচদিন প্রার্থনা করবার পর পঞ্চম দিন সন্ধ্যাবেলা প্রচণ্ড বর্ষণ হলো। বন্যার মতো প্রবল জলধারা নেমে তাপ-ক্লিষ্ট জুফরে গ্রামকে রক্ষা করলো। গল্প শেষ হবার পর অন্যান্য শিশুরা যেন কুণ্টাকে নতুন করে চিনলো। সে তাদের মনে একটি বিশিষ্ট শ্রদ্ধাব আসন পেলো।

পাঁচ

প্রতি রাত্রে প্রবল বৃষ্টিপাত চলতে লাগলো। বয়স্করা প্রথমে জলের ভেতর গোড়ালী ডুবিয়ে, পরে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে চলাফেরা করতে লাগলো। অবশেষে তাদের স্থানান্তরে যেতে নৌকো ব্যবহার করতে হলো।

গ্রামের জীর্ণ কুটিরগুলির চালা অতি কষ্টে সারিয়ে নিতে হচ্ছিলো। পতনোন্মুখ ঘরগুলোকে কোনক্রমে ঠ্যাকা দিয়ে খাড়া রাখছিলো। শিশুদের কিন্তু এই নিয়ে ভাবনার বালাইমাত্র ছিলো না। ক্ষিধের জ্বালাকে তাবা ভ্রুক্ষেপ করতো না। কাদার ভেতর খেলা করতে, পরস্পরের সাথে ঠেলাঠেলি মারামারি করে উলঙ্গ দেহে গড়াগড়ি যেতেই তাদের আনন্দ। তবে একাদিক্রমে বহুদিন রোদের মুখ না দেখে কখনো বা বিরক্ত হয়ে ছাইরঙের আকাশের দিকে তাকিয়ে বড়োদের মতো বলতো—'ওঠ, সূর্য ওঠ। তোমাকে ছাগল কেটে দেবো।'

প্রাণস্বরূপা বর্ষার আগমনে প্রকৃতি নবীন শ্যামলিমায় ভরে উঠেছিলো। চারিদিকে পাখীর কূজন, ফুলের সুগন্ধ' গৈরিক মাটির পথ রাতের বর্ষণচ্যুত বিচিত্রবর্ণ উজ্জ্বল পাঁপড়ি ও পাতার আস্তরণে নিত্য নূতন সাজ ধরতো।

কিন্তু প্রকৃতির এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও জুফরে গ্রামবাসীদের মাঝে রোগ ও মৃত্যু বাড়ছিলো। এই নতুন ফসলের সমৃদ্ধির মাঝেও খাবার উপযুক্ত সুপক্ক খাদ্যের

অভাব ছিলো। গাছভর্তি আম ও আপেলের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাই সার। সবুজ ফলগুলো পাথরের মতো শক্ত। খাবার চেষ্টা করলেই অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়।

পিতামহী ইয়াইসা কুণ্টাকে দেখলেই আক্ষেপ করেন—'ঈস্, কেবল হাড় আর চামড়া!' নিজেরও কিন্তু সেই অবস্থা। কারণ জুফরের শস্যভাণ্ডার শূন্য। গ্রামে অতি অল্পসংখ্যক গরু, ছাগল, মুরগী বেঁচে ছিলো। ভবিষ্যত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনেই তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। অগত্যা মেঠো ইঁদুর, নানারকমের মূল ও পাতাই ভরসা। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তারই তন্ন তন্ন অন্বেষণ!

বৎসরের অন্যান্য সময়ে পুরুষেরা কখনো কখনো বন্য পশু শিকার করেছে। এখন বনের ভেতর গিয়ে শিকার করলেও মৃত পশু গ্রাম অবধি টেনে আনবার শক্তি তাদের নেই। প্রচুর বাঁদর বা বেবুন দেখা যায়। কিন্তু মানডিনকা উপজাতির সংস্কার অনুযায়ী ওসব খাওয়া বারণ। চারিদিকে অজস্র মুরগীর ডিম বা সোনা ব্যাঙ। তাও খাওয়া বারণ। বন্য শূকর অনেক সময় খাদ্যের সন্ধানে গ্রামের ভেতর চলে আসে। কিন্তু মুসলমান ধর্মীয় অনুশাসনে শূকর নিষিদ্ধ খাদ্য। পুষ্টির অভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছিলো।

আজকাল প্রায়ই জুফরে গ্রামের বুক চিরে শোকের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। কুণ্টার মতো ছোট ছেলেও তা শুনে বুঝতে পারে কারোর হৃদয়ের পরম ধন চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলো। অধিকাংশ সময় ক্ষেতে আগাছা সাফ করতে গিয়ে অসুস্থ চাষী সন্ধ্যাবেলা আর ফিরতে পারে না। তার নিশ্চল, স্থির দেহ একটা ষাঁড়ের চামড়া করে বয়ে আনা হয়।

অনেকের পা ফুলে যায় বা কাঁপিয়ে জ্বর আসে আর ভয়ানক ঘাম হতে থাকে। বাচ্চাদের হাত বা পায়ের খানিকটা অংশ অনেক সময় ফুলে ওঠে, ফেটে গিয়ে পূঁজ গড়াতে থাকে। কুণ্টারও তাই হয়েছিলো। পায়ের ঘায়ের যন্ত্রণায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। কপাল ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছিলো। তার মা বাবা দুজনেই তখন ক্ষেতে। বন্ধুরা তাকে পিতামহী ইয়াইসার কুঁড়েঘরে নিয়ে গেলো। ইয়াইসাকেও অবশ্য খুবই দুর্বল ও রুগ্ন দেখাচ্ছিলো। বাঁশের খাটিয়াতে ষাঁড়ের চামড়ায় গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘামছিলেন। কিন্তু কুণ্টাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন। বাচ্চাদের আদেশ দিলেন কিছু কেলেলানু পিঁপড়ে ধরে আনতে। দু'ধারের চামড়া চেপে ধরে মিলিয়ে রেখে একটা করে পিঁপড়ে তার ওপর ছেড়ে দিলেন। পিঁপড়েগুলো এক এক করে ক্ষতের দু'পাশের চামড়ায়

হুল ফুটিয়ে সাঁড়াশীর মতো কামড়ে ধরতেই নিপুণ হাতে তাদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ফলে ছেঁড়া চামড়া সেলাই করে জুড়ে দেওয়ার মতো হলো।

তারপর অন্য বাচ্চাদের ছুটি দিয়ে তিনি কুণ্টাকে পাশে নিয়ে শুলেন। বিছানার পাশে তাকের ওপর বোঝাই করা বইগুলো কুণ্টার পিতামহের। কুণ্টার ঠাকুরমা তাঁর কথা বলতে শুরু করলেন।

তাঁর আদি দেশ মরেটানিয়া। তাঁর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বর্ষা, তখন তাঁর গুরুর কৃপায় তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। পুরোনো মালি অঞ্চলে তাঁদের বহুশত বর্ষা প্রাচীন বংশে সন্ন্যাসীর সংখ্যা প্রচুর। তাঁর গুরু গোষ্ঠিপ্রধান ছিলেন। তাঁকে গুরু রূপে পাবার জন্য কুণ্টার পিতামহ আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি যখন চতুর্থ কাফোতে তখন তার প্রার্থনা পূরণ হয়। গোষ্ঠিপ্রধান তাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। পরবর্তী পনেরো বর্ষা তিনি গুরুর স্ত্রী, ক্রীতদাস, শিষ্য ও গরু-ছাগল সমেত বিরাট দলটির সাথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘোরেন ও কায়মনোবাক্যে আল্লাহ এবং তাঁর প্রজাদের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ধূলিধূসর পায়ে চলা পথ, বা নদীতীরের কর্দমাক্ত খাঁড়ি ধরে প্রখর রৌদ্রতাপ ও বর্ষণসিক্ত হিমেল হাওয়া তুচ্ছ করে কত শ্যামল উপত্যকা, তীক্ষ্ণ বায়ু জর্জরিত ঊষর মরুদেশ পরিভ্রমণ করেছেন। পরেও কায়রাবা কুণ্টা কিণ্টে বহু চন্দ্রকাল একা ঘুরে বেরিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ এই নবীন সাধুকে দক্ষিণ মুখে প্রেরণ করেন। প্রথমে গাম্বিয়ার পাকালি এনডিঙে আসেন। এঁর প্রার্থনায় সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায় দেখে স্থানীয় লোকেদের ধারণা হলো ইনি আল্লাহের বিশেষ অনুগ্রহ-প্রাপ্ত। ঢাকের বাজনার মাধ্যমে এ খবর দ্রুত চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন অন্য গ্রামের লোকেরাও তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলো। দূতের মুখে সুন্দরী, গুণবতী কন্যা, ক্রীতদাস, গরু-ছাগল নানাবিধ উপহারের প্রস্তাব আসতে থাকলো। সেখান থেকে তিনি জিফারঙ গ্রামে যান। সেখানেই জুফরে গ্রামের দুর্দশার কথা শোনেন। অবিলম্বে জুফরেতে উপস্থিত হয়ে তিনি পাঁচদিন অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করেন এবং বড়ো বৃষ্টি এনে জুফরেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

গাম্বিয়ার এই অংশ বারার রাজার অধীন। তিনি স্বয়ং এই নবীন সাধকের বিবাহের জন্য একটি উৎকৃষ্ট কন্যা পাঠিয়েছিলেন। তিনিই সিরেঙ, কায়রাবা কুণ্টা কিণ্টের প্রথমা স্ত্রী, জানে এবং সালুম নামে দুই পুত্রের জননী। পিতামহী ইয়াইসা এতক্ষণে খাটিয়ার উপর উঠে বসেছেন। তাঁর দুই চক্ষু পরম উৎসাহে উজ্জ্বল!

'এরপর নাচের আসরে তাঁর এই ইয়াইসার সাথে সাক্ষাৎ। আমার বয়স তখন পনেরো বর্ষা।'

ফোকলা মাড়ি উদ্ভাসিত করে তিনি বললেন—'এবার পত্নী নির্বাচনের জন্য কোনও রাজার মধ্যস্থতা প্রয়োজন হয়নি। তোমার বাবা অমোরো আমারই গর্ভের সন্তান।'

বাড়ী ফিরে এসে সে রাত্রে কুণ্টা বহুক্ষণ ঘুমোতে পারেনি। তার ঠাকুরমার কাছে শোনা কথাগুলোই ভাবছিলো। পিতামহ সাধক মানুষ। তাঁর প্রার্থনার জোরেই জুফরে গ্রাম বেঁচেছে। আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে নিয়েছেন—এসব কথা সে আগেও অনেক শুনেছে। কিন্তু তিনি তার বাবার বাবা ছিলেন। কুণ্টা যেমন করে অমোরোকে জানে, অমোরো তেমনি করে তাঁকে জানতেন। বিণ্টা যেমন কুণ্টার মা, পিতামহী ইয়াইসা তেমনি অমোরোর মা। এভাবে কথাগুলো সে আগে কখনো ভেবে দেখেনি। হয়ত তারও একদিন কোন মেয়ের সাথে দেখা হবে—যে তার সন্তানের মা হবে। আবার সেই ছেলেও একদিন—

কুণ্টা ক্রমশঃ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো।

ছয়

কিছুদিন যাবৎ বিণ্টা সূর্যাস্তের আগে ধানক্ষেত থেকে ফিরেই কুণ্টাকে গ্রামের কুয়ো থেকে পরিষ্কার জল আনতে পাঠাতো। সারাদিনে যা কিছু আহার্য জোটে ফুটিয়ে একটা স্যুপ তৈরী হতো। তারই খানিকটা নিয়ে বিণ্টা তার ছেলের সাথে পিতামহী ইয়াইসাকে খাওয়াতে চলে যেতো। বিণ্টার চলন অনেক মন্থর হয়ে গিয়েছে। কুণ্টা লক্ষ্য করেছিলো তার মার উদরদেশ বেশ স্ফীত ও ভারী।

পিতামহীর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে খাইয়ে তাঁর ঘর গুছিয়ে দিয়ে আসা হতো।

একদিন রাতে কুণ্টাকে তার বাবা ঝাঁকুনী লাগিয়ে জাগিয়ে দিলো। বিণ্টার কণ্ঠে মৃদু মৃদু কাতর ধ্বনি। নিয়ো বটো এবং বিণ্টার এক বান্ধবী ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছে। অমোরো কুণ্টাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিলো। ব্যাপারটা কী—ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে অমোরো কুণ্টাকে জাগিয়ে বললো—তোমার একটি নতুন ভাই হয়েছে! কুণ্টা চোখ কচলাতে কচলাতে কোনক্রমে উঠে বসে ভাবলো—এ নিশ্চয়ই

একটা অসাধারণ ঘটনা। নইলে তার বাবার মতো কঠোর স্বভাবের লোককে এত খুশী দেখাচ্ছে কেন! বিকালে কুণ্টা তার কাফোর সাথীদের সাথে খাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় নিয়ো বটো তাকে ডেকে বিণ্টার কাছে নিয়ে গেলো। মাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিলো। বিছানার ধারে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসেছিলেন। ছোট্ট কুঁকড়ে থাকা কালো বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করতে করতে সে সহসা লক্ষ্য করলো মায়ের দেহের স্ফীত অংশটি মিলিয়ে গিয়েছে। মা ও নিয়ো বটো দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে হাসছিলো। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো। বন্ধুদের কাছে ফিরে না গিয়ে সে বাবার ঘরের পেছনে বসে রইলো।

পরের সাতদিন সে বাবার ঘরে ঘুমিয়েছে। সবাই বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত। কুণ্টার কথা যেন কারো খেয়ালই নেই। তার মা বাবা কি তাকে আর ভালোবাসেন না? কিন্তু অষ্টম দিনে সন্ধ্যাবেলা আবার ডাক পড়লো। গ্রামের যারা সুস্থ সমর্থ, সকলেই সেদিন বিণ্টার ঘরের সামনে জড়ো হয়েছে। তাদের সাথে কুণ্টাকেও নবজাতকের নাম শুনতে আসতে হলো। শিশুটির নাম রাখা হলো—ল্যামিন।

সেদিন রাত্রে কুণ্টা আবার তার পুরোনো বিছানায় মা ও ভাইয়ের সাথে শুতে পেয়ে মহা খুশী। এতদিনে সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পেলো। দেহে একটু বল ফিরে পেতেই বিণ্টা রোজ সকালে অমোরো ও কুণ্টাকে খাইয়ে বাচ্চা নিয়ে ইয়াইসার কুটিরে চলে যেতো। অমোরো ও বিণ্টার উদ্বিগ্ন ভাব দেখে কুণ্টার মনে হচ্ছিলো পিতামহী অত্যন্ত অসুস্থ।

এর কিছুদিন পর সন্ধ্যাবেলা কুণ্টা তার সাথীদের সাথে আম কুড়োচ্ছিলো। আমগুলো এত দিনে পেকে গিয়েছে। ছেলেরা পাথরে ঠুকে আমের খোসার একটা দিক নরম করে দাঁত দিয়ে ফুটো করে তার মিষ্টি নরম শাঁস চুষে খায়। অকস্মাৎ কুণ্টার ঠাকুরমার ঘরের দিক থেকে পরিচিত কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এলো। কুণ্টার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেলো। গত কিছুকাল মাঝে মাঝে এমন আর্তনাদ সে বহুবার শুনেছে। তার মায়ের কণ্ঠের সাথে অন্যান্য নারীকণ্ঠ যুক্ত হয়ে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছিলো। কুণ্টা অন্ধ আবেগে তার ঠাকুরমার ঘরের দিকে ছুটে গেলো।

সেখানে শোকার্ত অমোরোও উপস্থিত ছিলো। বৃদ্ধা নিয়ো বটো করুণ স্বরে বিলাপ করছিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামের প্রচারক ঢাকের মাধ্যমে পিতামহী ইয়াইসার দীর্ঘ জীবনের সুকৃতিগুলো প্রচার করতে লাগলো। প্রথা অনুযায়ী অবিবাহিতা কিশোরী কন্যারা ঘাসে বোনা চওড়া পাখা মাটিতে পিটিয়ে

ধুলো উড়াচ্ছিলো। কুণ্টা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো—কিন্তু তার প্রতি কারো দৃষ্টি ছিলো না।

বিণ্টা, নিয়ো বটো এবং আরো দুটি ক্রন্দনাকুল মহিলা কুঁড়েঘরে ঢুকলে দু'পাশের লোকেরা নতজানু হয়ে মাথা নীচু করে থাকলো। ভয়ে ও দুঃখে কুণ্টার চোখ ফেটে জল পড়ছিলো। পুরুষেরা নতুন চেরা একটি প্রশস্ত কাঠ এনে ঘরের সামনে রাখলো। মহিলারা মৃতদেহ বয়ে এনে তার ওপর নামালো। তার গলা থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে মোড়া। মৃতের প্রতি যারা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলো তারা প্রার্থনা করতে করতে ইয়াইসার দেহ সাতবার প্রদক্ষিণ করলো। ইমাম রীতি অনুযায়ী তারস্বরে শোকপ্রকাশ করছিলেন এবং প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। —ইয়াইসা এবার আল্লাহের কাছে তাঁর পূর্বপুরুষদের সাথে চিরকাল শান্তিতে কাটাবেন। তাঁর যাত্রা সহজ হোক। অবিবাহিত যুবকেরা গরুর শিং ভর্তি সদ্য নতুন ভস্ম দেহের ধারে ধীরে সাজিয়ে রাখছিলো। এতে তাঁর আত্মা সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রমের শক্তি পাবে। সকলে চলে যাবার পর নিয়ো বটো এবং অন্যান্য বৃদ্ধা মহিলারা পাশে বসে পড়ে দু'হাতে মাথা চাপড়ে তীব্র আর্তনাদ করতে লাগলেন। সারা রাত তাঁরা এভাবে কাটাবেন। এটাই প্রথা। অল্পবয়স্কা মেয়েরা বড়ো বড়ো সিওবা গাছের পাতা এনে বৃদ্ধাদের মাথা ঢেকে দিলো, যাতে তাঁরা বৃষ্টিতে ভিজে না যান। গ্রামের ঢাকগুলো সারারাত ধরে পিতামহী ইয়াইসার মৃত্যুবার্তা গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে গ্রামের পুরুষেরা শোকযাত্রা করে মৃতদেহ সমাধিভূমিতে নিয়ে গেলো। যাদের চলবার ক্ষমতা নেই, তারাই শুধু পড়ে থাকলো। শববহন-কারীদের পেছনে অমোরো। তার কোলে শিশু ল্যামিন। অপর হাতে সে কুণ্টার হাত ধরে আছে। আতঙ্কে কুণ্টার কান্না শুকিয়ে গিয়েছিলো। এদের পেছনে গ্রামের অন্যান্য লোকেরা। সাদা কাপড়ে শক্ত করে জড়ানো দেহটি নতুন খোঁড়া গর্তে নামিয়ে দেওয়া হলো। তার ওপর প্রথমে চাপানো হলো মোটা করে বোনা বেতের পাটি। এর পর হায়নাদের আক্রমণ থেকে মৃতদেহ রক্ষা করবার জন্য কাঁটাঝোপ বিছানো হলো। সবচেয়ে ওপরে পাথর ও মাটি শক্ত করে ঠেসে দেওয়া হলো।

অনেকদিন পর্যন্ত কুণ্টার আহার-নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিলো। খেলার সাথীদের কাছে পর্যন্ত যেতো না। তার আশ্রয়চ্যুত, শোকার্ত মনটি কোথায়ও শান্তি পাচ্ছিলো না। অমোরো অবস্থা বুঝে একদিন তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিলো।

স্বভাবগত কঠোরতা ত্যাগ করে স্নেহসিক্ত কোমল কণ্ঠে নানা কথা বলে সে পুত্রের মনের প্রশান্তি অনেকটাই ফিরিয়ে আনলো।

সাত

বর্ষা শেষ। উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ। নীচে সিক্ত ধরণী। অপর্যাপ্ত বন্য ফুল ও ফলের সুগন্ধে বাতাস ভারী। প্রত্যূষে উদুখলে জোয়ার, বাদাম ইত্যাদি চূর্ণ করবার শব্দ। এটাই প্রধান ফসল নয়। আগের বৎসরের কিছু বীজ ক্ষেতে থেকে যায়। এ হলো সেই প্রাথমিক ফসল। পুরুষেরা চমৎকার সুপুষ্ট হরিণ শিকার করে আনে। মাংস বার করে নিয়ে চামড়াটি সংরক্ষণ করা হয়। মেয়েরা ঝোপ ঝেড়ে লালচে ম্যাঙকানো বেরি সংগ্রহ করে। তার কিছুই ফেলা যায় না। চূর্ণ শাঁস থেকে রুটি তৈরী হয়। বীজগুলো জোয়ারের সাথে সিদ্ধ করে নিলে প্রাতঃরাশের পরিজ একটু ভিন্ন স্বাদের হয়। স্বচ্ছলতার দিনগুলো আর বেশী দূরে নয়।

দিনে দিনে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে। জুফরেতে প্রাণের জোয়ার আসে। পুরুষদের চলাফেরা অনেক সাবলীল হয়েছে। অপরিমিত ফসলের রাশির দিকে তাকিয়ে গর্বে তাদের মন ভরে ওঠে। সুপক্ক হয়ে উঠতে আর কত দেরী আছে— তারই হিসাব কষে। অতি প্লাবিত নদীর জল কমে আসতে মেয়েরা রোজই তাদের ক্ষেতে যেতে পারছিলো। সবুজ রঙের দীর্ঘ ধান গাছের গোড়া থেকে সামান্যতম আগাছাও তারা পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো।

দীর্ঘ বুভুক্ষার কাল পার হয়ে শিশুদের অপরিমিত হাসি ও কলধ্বনিতে আবার চারিদিক পূর্ণ হয়েছে। পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে দেহের অভাব মিটে যেতে ক্ষতগুলোও শীঘ্র নিরাময় হয়েছে। দ্রুতগামী কাঠবিড়ালী তাড়া করে, দলবদ্ধ বাঁদরের পালের দিকে ঢিল ছুঁড়ে নতুন উদ্যমে তারা হাজারো রকম খেলায় মেতে উঠেছে।

কুণ্টার বিশেষ বন্ধু তার প্রতিবেশী সিটাফা সিলা। এরা এবং কাফোর অন্যান্য ছেলেরা কুস্তি লড়বার সময় সিংহের গর্জন, হাতির বৃংহণ, বন্য শূকরের ঘোঁত ঘোঁত শব্দের অনুকরণ করতো। মেয়েরা বড়োদের অনুকরণে কেউ মা সেজে, কেউ বৌ সেজে রান্না করে, পুতুল সাজিয়ে ঘরকন্না করতো। কিন্তু বড়োরা পাশ দিয়ে গেলে এরা সম্মান দেখাতে ভুলতো না। বিনীতভাবে তাকিয়ে বলতো— 'কেরাবে?' অর্থাৎ 'শান্তিতে আছেন?' তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে এরা দু'হাতে

সে হাত চেপে ধরতো। তারপর যতক্ষণ না শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিটি চলে যান, এরা দু'হাতের তালু বুকে চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

কুণ্টার বাড়ীর শিক্ষা অত্যন্ত কড়া। তার মনে হতো—তার প্রতিটি চালচলনই মায়ের অপছন্দ। খেলার পর ভালোভাবে হাত-পা না ধুলে মা গা পরিষ্কার করবার ছোবড়া আর ঘরে তৈরী সাবান দিয়ে তার চামড়া ঘষে প্রায় তুলে ফেলেন। খাবার সময় নিজের খাদ্য ছাড়া অন্য কোনদিকে তাকানো বারণ। বড়োদের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা বারণ। তাঁদের কথার মাঝখানে কথা বলাও বারণ। এসব বিষয়ে অন্যথা হলেই মার। মিথ্যাকথা বলার চিন্তাও করা যায় না। কুণ্টার অবশ্য অসত্য বলার কারণ কখনোই ঘটেনি।

বিণ্টা স্বীকার না করলেও কুণ্টা সর্বদা ভালো ছেলে হয়ে থাকতেই চেষ্টা করতো। অন্যান্য ছেলেদের সাথে তারও লেখাপড়া সুরু হয়েছিলো। তাদের মাঝে মতভেদ প্রায়ই হতো। অন্যেরা হয়তো সে অবস্থায় দু'চারটে কঠিন কথা শুনিয়ে দিতো। কুণ্টা তখন বিনা বাক্যব্যয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতো। তার মা বলতেন—মানডিনকা জাতির বৈশিষ্ট্য—প্রবল মর্যাদাবোধ এবং আত্মসংযম তাতেই সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পায়!

এত চেষ্টা সত্ত্বেও কুণ্টা তার শিশু ভাইয়ের সাথে দুষ্টুমী করবার জন্য প্রতি-রাত্রে মার খেতো। দুষ্টুমী করে কখনো সে রাগী কুকুরের মতো শব্দ করতো। কখনো বা বেবুনের মতো চার পায়ে হেঁটে বা চোখ উল্টে দিয়ে ভাইকে ভয় দেখাতো। বিণ্টার অসহ্য বোধ হলে সে রাগ করে চেঁচিয়ে উঠতো—

'এবার সাদামানুষ ডেকে আনবো!' তাতেই কুণ্টার সবচেয়ে ভয়। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরমাদের কাছে সেই লালমুখো, প্রচুর লোমওয়ালা, অদ্ভুত দেখতে সাদা মানুষের গল্প শুনেছে। এরা বড়ো বড়ো নৌকো করে মানুষ চুরি করে নিয়ে যায়।

আট

বারো পূর্ণচন্দ্র অতিবাহিত হয়েছে। আরো একবার বড়ো বর্ষা শেষ হয়েছে। গাম্বিয়াতে তখন পরিভ্রমণের ঋতু। কুণ্টা এবং তার সাথীদেরকে বিদেশী পরিব্রাজকের ওপর নজর রাখবার ভার দেওয়া হয়েছে। তাদের কারো বা গন্তব্যস্থল জুফরে গ্রাম। কেউ বা অন্য কোথায়ও যাবার পথে এ গ্রামে থেমে যায়। এ সব

আগন্তুকের জন্য একটা গাছতলা এবং একটি কুটির নির্দিষ্ট ছিলো। অচেনা কোন পথিক দেখতে পেলে ছেলেরা প্রথমেই তীরবেগে ছুটে বড়োদের খবরটা দিয়ে আসতো। ফিরে এসে আগন্তুকের পাশে চলতে চলতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার সবকিছু লক্ষ্য করতে থাকতো। তার কী পেশা বুঝতে পারলেই আর এক ছুটে সে খবরটাও জানিয়ে আসতো। প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের উপর অতিথি সৎকারের ভার। অতিথি যতদিন খুশী থেকে যেতে পারে। বিনামূল্যে তাকে খাদ্য ও আশ্রয় দিতে হবে।

কুণ্টা, সিটাফা এবং তাদের সাথীদের ওপর এ কাজের ভার দেবার পর থেকে যেন তাদের বয়স বেড়ে গিয়েছিলো। প্রাতঃরাশের পর তারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আরাফাঙ বা শিক্ষকের কাছে চলে যেতো। বড়ো ছেলেদের যা শেখানো হতো এরা নিঃশব্দে নতজানু হয়ে বসে মন দিয়ে তাই শুনতো। বড়ো ছেলেরা দ্বিতীয় কাফোর। তাদের বয়স কুণ্টার বয়স ছাড়িয়ে—পাঁচ থেকে নয় বর্ষা। এরা কোরানের আয়াৎ পড়তে শিখতো। রান্নার হাঁড়ির নীচের কালি, তেতো লেবুর রসের সাথে মিলিয়ে কালি তৈরী হতো। ঘাসের শিষের কলম তারা সে কালিতে ডুবিয়ে লিখতো।

পড়া শেষ হলে দ্বিতীয় কাফোর ছেলেরা ছুটে পালাতো। কাপড়ে তৈরী পোশাক বা ডুনডিকো পেছনে উড়তে থাকতো। এরপর তারা গ্রামের ছাগলের পাল চরাতে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় কাফোর ছেলেদের লম্বা জামার জন্য, আর তাদের ওপর দেওয়া ওসব গুরু দায়িত্বের জন্য কুণ্টা ও তার সাথীরা হিংসা করতো। বাইরে অবশ্য দেখাতো যেন তারা সেসব বিষয়ে নির্বিকার। কুণ্টারা যথেষ্ট বড়ো হয়েছে। নগ্ন হয়ে থাকা আর তাদের পছন্দ নয়। ল্যামিনের মতো স্তন্যপায়ী শিশুদের তাদের ছুঁতেও ঘেন্না হতো। যে সব শিশুরা সদ্য হাঁটতে শিখেছে, তাদের তাকিয়ে দেখবার যোগ্য মনে করতো না। বড়োরা কাছাকাছি না থাকলে সুযোগ পেলেই তাদের দুটো চড়চাপড় লাগাতো। বৃদ্ধা পিতামহীদের সঙ্গও আর তাদের পছন্দ নয়। মা বাবার বয়সী বড়োদের কাছাকাছি ঘুরতে থাকতো, ভুলেও যদি দু'চারটে কাজের ফরমাইশ জোটে—সেই আশায়।

ফসল তুলবার কাল এলে এক রাতে অমোরো খাবার সময় কুণ্টাকে জানালো —পরদিন সে যেন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে। ফসল পাহারা দেবার কাজে তাকে দরকার হবে। উত্তেজনায় সারারাত কুণ্টার ঘুমই হলো না। সকালে কোনক্রমে খাবার গলাধঃকরণ করলো। মাঠে যাবার আগে অমোরো তার হাতে নিড়ানিটি ধরিয়ে দিতেই সে আনন্দে ফেটে পড়লো। কুণ্টার সাথীরাও তাদের বাবার সাথে

মাঠে এসেছিলো। তারা সবাই মিলে দৌড়াদৌড়ি করে বীরবিক্রমে বন্য শূয়োর আর বেবুনদের তাড়া করছিলো। উৎসাহের সীমা পরিসীমা ছিলো না। পাখীদেরও সমান উৎসাহে তাড়াচ্ছিলো। কারণ ঠাকুরমাদের কাছে শুনেছে—পশু থেকে পাখীরা ফসল কম নষ্ট করে না। ক্ষেতে পড়ে থাকা বাদাম ও অন্যান্য ফসল কুড়িয়ে, লাউয়ের খোলার পাত্রে ঠাণ্ডা পানীয় জলের যোগান দিয়ে সারাদিন তারা অপরিসীম ব্যস্ততায় কাটালো। আত্মগরিমা আর কাজ ভালোভাবে করবার ক্ষমতা, পরস্পরকে বাড়িয়েই তোলে।

আল্লাহ বিধান দিলেন—ছ'দিন পর ফসল তোলা শুরু হবে। সেদিন ভোরের প্রার্থনার পর কৃষকেরা তাদের পুত্রদের নিয়ে মাঠে উপস্থিত হলো। সবাই কান পেতে অপেক্ষা করে ছিলো। অবশেষে গ্রামের সুবৃহৎ ঢাকটি বেজে উঠতেই চাষীরা কাজে লাফিয়ে পড়লো। ছোট ছোট ঢাক নিয়েও কিছু ঢাকী মাঠে এসেছিলো। এবার তারাও বাজাতে লাগলো। সবাই সমস্বরে তালে তালে গান শুরু করলো। কোন কোন চাষী মনের আনন্দে হাতের নিড়ানি বা চাষের অন্য কোন যন্ত্র তাল মিলিয়ে ওপরে ছুঁড়ে লুফে নিচ্ছিলো।

কুণ্টার কাফোর সাথীরা প্রত্যেকে নিজের বাবার সাথে পরিশ্রম করছিলো। সকালের মাঝামাঝি সময় একবার ছুটি। মধ্যাহ্নে মেয়েরা যখন খাবার নিয়ে আসে তখন কৃষকদের মাঝে আর একবার হর্ষধ্বনি ওঠে। মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে ফসল তুলবার গান করতে করতে উপস্থিত হয়। মাথা থেকে আহার্যের পাত্র নামিয়ে লাউয়ের খোলায় ঢেলে কৃষক, বাদক প্রত্যেককে পরিবেশন করে। এর পরে সামান্য বিশ্রাম। আবার বড়ো ঢাক বেজে উঠলে কাজ শুরু।

কাজের শেষে মাঠে ফসলের স্তূপ জড়ো হয়ে থাকতো। পরিশ্রান্ত, ঘর্মাক্ত কৃষকেরা কাদামাখা গায়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তো। হাসতে হাসতে তারা পর-স্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতো। অবশেষে স্নানের শেষে শীতল দেহে বাড়ী ফিরে আসা। রান্নাঘরে তখন ধোঁওয়া উঠছে। রান্না মাংসের সুগন্ধে তাদের ক্ষুধা দ্বিগুণ জ্বলে উঠতো। যতদিন ফসল কাটা চলবে, তিনবেলা মাংস এদের খাদ্য।

কুণ্টা কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলো—মা যেন কী সেলাই করছেন। কিন্তু তা নিয়ে অতটা মাথা ঘামায়নি। দ্বিতীয়দিন সকালে চাষের যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরোবার সময় বিণ্টা সহসা ভৎর্সনার ভঙ্গীতে বলে উঠলো—

'কাপড় পরে বেরোচ্ছো না কেন?'

কুণ্টা চমকে ফিরে তাকালো। দেওয়ালে কাঠের গোঁজ থেকে একটা নতুন

ডুনডিকো বা পোশাক ঝুলছিলো। মনের উত্তেজনা বহু কষ্টে সংযত রেখে স্বাভাবিক ভাবে সেটি পরে নিলো। বাইরে বেরিয়েই এক দৌড়। তার সঙ্গীরা সবাই তার মতো নতুন পোশাক পরে আছে। জীবনের প্রথম পোশাক! সবাই লাফাচ্ছে, চ্যাঁচাচ্ছে, হাসছে। আর তাদের নগ্ন থাকতে হবে না। সবাই দ্বিতীয় কাফোতে উত্তীর্ণ। এবার তারা সত্যি বড়ো হয়ে গিয়েছে।

নয়

সে রাত্রে কুটিরে ফিরবার আগে জুফরের সকলকেই কুণ্টার পোশাক দেখানো হয়ে গিয়েছে। এবার তার ভাবনা—মা তাকে বড়োদের মতো রাতে একটু বেশী সময় জেগে থাকতে দেবেন কিনা। সারাদিন কাজ করেও তার মোটেই ক্লান্ত লাগছিলো না। এখন তো সে বড়ো হয়েছে। তার শুতে যাবার সময় বড়োদের মতো পিছিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু ল্যামিন ঘুমোবার একটু পরেই মা তাকে শুতে বললেন। বলে দিলেন—পোশাকটা যেন ঠিকমত কাঠের গোঁজে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

কুণ্টা গোমড়া মুখে চলে যাচ্ছিলো—মা ফিরে ডাকলেন। মুখ গোমড়া করবার জন্য বকবেন, না, সদয় হয়ে আর একটু জাগতে দেবেন, বোঝা যাচ্ছিলো না। মা খুব নির্বিকার মুখে বললেন—'তোমার বাবা সকালে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছেন।' কুণ্টা জানতো এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাবে না। সে-ও সমান আগ্রহহীন কণ্ঠে উত্তর দিলো—'হ্যাঁ, মা।'

গো-চর্মের ঢাকনার নীচে শুয়ে কুণ্টা আকাশ পাতাল ভাবছিলো—হঠাৎ এই ডাক কেন। সে এমন কি অপরাধ করেছে, যার জন্য মায়ের শাসনও যথেষ্ট নয়। বাবার হাতে মার খাওয়া মানেই সাংঘাতিক কোন অপরাধ।

পরদিন সকালে কুণ্টার মন এতই উদভ্রান্ত—তার নতুন সম্পত্তি ডুনডিকোর কথা পর্যন্ত মনে পড়লো না। ছোট্ট শিশু উলঙ্গ ল্যামিনের গা তার গায়ে ঠেকে যেতেই খেয়াল হলো। রাগ করে এক ধাক্কা মারতে গিয়ে বিণ্টার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখে নিরস্ত হলো। খাওয়ার শেষে একটু এদিক ওদিক ঘুরছিলো—মা যদি ডেকে আরো কিছু বলেন সেই আশায়। কিন্তু বিণ্টার যেন ভ্রুক্ষেপই নেই। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্থর গতিতে অমোরোর কুটিরে উপস্থিত হলো। বাইরে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অমোরো বেরিয়ে এসে নীরবে ছেলের হাতে একটি গুলতি দিলো। বিস্ময়ে আনন্দে কুণ্টার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। হতবাক হয়ে একবার নিজের হাতের দিকে, একবার বাবার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলো।

'তুমি দ্বিতীয় কাফোতে উত্তীর্ণ হলে। ওটা তোমারই। দেখো ভুল জিনিষে মেরো না। আর লক্ষ্যচ্যুতও হয়ো না।'

'হ্যাঁ, বাবা।' এর বেশী কুণ্টার মুখে যোগালো না।

'দ্বিতীয় কাফোর ছেলে হিসাবে এবার থেকে তোমাকে ছাগলের দেখাশোনা করতে হবে এবং স্কুলে যেতে হবে। আজ টুমানি টোরের সাথে ছাগল চরাতে যাও। সে এবং অন্যান্য বড়ো ছেলেরা কাজ শিখিয়ে দেবে। তাদের কথা শুনো। কাল থেকে স্কুলে যাবে।'

অমোরো ঘরে ঢুকে গেলো। কুণ্টা একছুটে ছাগলের খোঁয়াড়ে উপস্থিত হলো। সেখানে তার বন্ধু সিটাফা এবং বাকী সঙ্গীরা উপস্থিত। সকলের পরণে নতুন ডুনডিকো, হাতে নতুন গুলতি। বড়ো ছেলেরা তখন ছাগলগুলোর খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দিচ্ছিলো। ক্ষুধার্ত পশুগুলো মাঠে যাবার জন্য অস্থির। অমোরো এবং বিণ্টার নিকটতম বন্ধুর বড়ো ছেলে টুমানি। তার এবং অন্যান্য বড়ো ছেলেদের চেষ্টা ছিলো ছোটদের গায়ের ওপর দিয়ে ছাগল চালিয়ে দেওয়া। ছোটরা ভয়ে পালাচ্ছিলো—বড়োদের তাতে খুব ফুর্তি। অবশেষে বড়োরা হাসতে হাসতে ছাগলগুলোকে ঠিক পথে নিয়ে চললো। ধুলিধুসর পথ। সঙ্গে পাহারাদার কুকুর। ছোট ছেলেরা অনিশ্চিতভাবে পেছনে চলতে লাগলো।

ছাগল যে এত দ্রুত দৌড়তে পারে, এদের ধারণাই ছিলো না। গ্রাম ছেড়ে এত দূরের পথে কুণ্টা কখনো আসেনি। বিরাট চারণ ক্ষেত্র। একদিকে ঘন অরণ্য, অন্যদিকে গ্রামের কৃষকদের চাষের জমি।

অবশেষে টুমানি কুণ্টার দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু ভাব দেখে মনে হলো সে কোন তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ দেখছে।

'একটা ছাগলের দাম কত জান?' কুণ্টা উত্তর দেবার আগেই—

'একটা যদি হারায়, তখন তোমার বাবা দাম ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।'

এবার টুমানি এক দীর্ঘ উপদেশবাণীর অবতারণা করলো। ছেলেদের অমনোযোগ বা আলস্যের সুযোগে কোন ছাগল দলচ্যুত হলে খুবই বিপদ। পাশের জঙ্গলে সিংহ, চিতাবাঘ ওত পেতে থাকে। ওদের এক থাবায় একটা ছাগল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ছোট ছেলে পেলে তো কথাই নেই। ছাগল থেকে ছোট ছেলের

মাংস ওদের অনেক বেশী পছন্দ। কুণ্টার ভয়ে বিস্ফারিত নয়ন দেখে পরম হৃষ্টচিত্তে সে বলে চললো—

কিন্তু সিংহ আর চিতাবাঘ থেকেও বড়ো বিপদ হলো সাদা মানুষ আর তাদের কালো সহকারীরা। মানুষ ধরবার আশায় তারা লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকে। এই তো তার দ্বিতীয় কাফো জীবনের পাঁচ বর্ষার মাঝে জুফরে গ্রামের ন'টি ছেলে চুরি গিয়েছে। প্রতিবেশী গ্রামগুলোর আরো বহু।

কুণ্টার মনের কথা আন্দাজ করেই যেন সে আরো জানালো—গ্রামের ভেতর থাকাও নিরাপদ নয়। একবার এ গ্রামেরই একজন কেউ সাদা মানুষের টাকা খেয়ে ছেলে চুরি করেছিলো। অচেনা লোককে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। তাছাড়া, চরাতে গিয়ে কোন ছাগল যেন দলচ্যুত হয়ে জঙ্গলে ঢুকে না যায়। তাহলে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই মহাবিপদে পড়বে। আবার, একটা ছাগলের পেছনে যেতে গিয়ে যদি অপর ছাগলগুলো কারো ক্ষেতে ঢুকে পড়ে তাহলেও অনেক ক্ষতি। ক্ষুধার্ত ছাগল ক্ষেতের আর কিছুই বাকী রাখবে না।

দুপুরের মধ্যে সদ্য নতুন দ্বিতীয় কাফোর ছেলেদের ছাগল সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রদ্ধার পরিসীমা থাকলো না। টুমানির বয়সী ছেলেরা কেউ বা গাছের নীচে বিশ্রামে ব্যস্ত, কেউ বা নতুন পাওয়া শিষ্যদের গুলতিগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষায় ব্যস্ত। ছোটদের সামান্যতম ত্রুটিতে এরা অপমানজনক মন্তব্য করছিলো বা নিজেদের মধ্যে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলো। ফলে কুণ্টাদের অতি সতর্কতার জ্বালায় ছাগলগুলো ঘাস থেকে মাথা তুলবার অবকাশ পাচ্ছিলো না। কুণ্টা সভয় দৃষ্টিতে বারেবারেই বনের দিকে তাকাচ্ছিলো।

বেলা গড়িয়ে এলে টুমানি রূঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলো—

'তোমার ভাগের কাঠ কে কুড়োবে ?'

কুণ্টার মনে পড়লো—ছাগল চরিয়ে ফিরবার সময় প্রত্যেকের মাথায় কাঠের আঁটি থাকতে সে দেখেছে বটে। তাই দিয়ে রাত্রে আগুন জ্বালানো হয়। বড়োদের অবিশ্রান্ত বিদ্রূপের মাঝে ছোটরা যতটা সম্ভব কাঠ জড়ো করে অতি কষ্টে মাথায় তুললো। এবার বাড়ী ফেরার পালা। সে পথ এদের চেয়ে বেশী আর কে চেনে ? এত একাগ্র প্রতীক্ষায় গ্রামের দর্শন মেলে তা .ক এরা আগে কখনো জানতো ? পরের দিন প্রাতঃরাশ সেরে নতুন দ্বিতীয় কাফোর ছেলেরা কাঠের শ্লেট আর দোয়াত-কলম নিয়ে ঈষৎ উদ্বিগ্ন চিত্তে স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলো। মনে তাদের সগর্ব পুলক।

আরাফাঙের ব্যবহারে কিন্তু মনে হচ্ছিলো—সেই নবীন ছাত্ররা ছাগলের থেকেও নিকৃষ্ট কোন জীব।

কথা বলার আগেই বেত। দারুণ ভ্রূকুটি করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—তাঁর ক্লাশে টুঁ শব্দটি হলে বেত খেতে হবে আর অপরাধীকে তখনই বাড়ীতে ফেরৎ পাঠানো হবে। দেরী করে এলেও একই শাস্তি। দিনে দু'বার ক্লাশ—সকালে খাবার পরে এবং ছাগল চরিয়ে ফিরে এসে।

'তোমরা আর শিশু নও। দায়িত্ব নেবার বয়স তোমাদের হয়েছে।' নবীন ছাত্রদের জানিয়ে দেওয়া হলো—সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোরাণের কিছু অংশ তাদের পড়ানো হবে। সেগুলো মুখস্ত করাই সর্বপ্রথম কাজ। তখনকার মতো এদের ছুটি হয়ে গেলো। পুরোনো ছাত্ররা আসতে শুরু করেছে। নতুন ছাত্রদের থেকে কিন্তু তাদেরই বেশী ভীত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো। তার কারণ সেদিন তাদের স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষা। সে পরীক্ষার ফলাফলের ওপর তৃতীয় কাফোতে উত্তরণ অনেকাংশেই নির্ভর করছিলো।

জীবনে সেদিন প্রথম কুণ্টাদের কাফোর ছেলেরা কারো সাহায্য ছাড়াই খোঁয়াড়ের দরজা খুলে ছাগল চরাতে নিয়ে গেলো। সামান্য একটু দূরের ঘাসের গোছার দিকে এগোলেই সেই নবীন রাখালেরা প্রবল আপত্তি জানাচ্ছিলো। বেচারা ছাগলদের সেদিন আধপেটাই থাকতে হলো। দলের ছেলেদের মাঝে কুণ্টার ভয়টাই যেন সবচেয়ে বেশী। তার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতার কথা একান্তে ভাবতে বসলেই একটা অজানা আশঙ্কা, একটা দুর্বোধ্য অশান্তি তাকে ঘিরে ধরে। তার যেন কী অসমাপ্ত কাজ পড়ে আছে, কোন অনির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়া যেন তখনো বাকী। গভীর চিন্তার অবকাশ অবশ্য মেলে না। সারাদিন কাজের অন্ত নেই।

ছাগল চরানো, দু'বেলা আরাফাঙের কাছে পড়া, দিনের আলো থাকতে থাকতে যতটুকু সম্ভব গুলতিতে লক্ষ্যভেদ।

বাদামের ফসল উঠে গিয়েছে। এবার ধান উঠবে। এ কাজে পুরুষদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। ছেলেরাও মায়েদের সাহায্য করবে না। ধান তোলার কাজ সম্পূর্ণ মেয়েদের। অতি প্রত্যূষে ক্ষেতে গিয়ে মেয়েরা সোনা রঙের ধানের রাশি কাটে। শুকোবার জন্য কয়েকদিন সেগুলো ক্ষেতেই ফেলে রাখা হয়। পরে নৌকো ভর্তি করে তা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। বাড়ীতে গৃহিণী এবং তার মেয়েরা মিলে পরিচ্ছন্ন আঁটি বেঁধে ধান গোলায় তুলে রাখে। কিন্তু ধান তোলার কাজ চলছে বলে মেয়েদের অন্য কাজের বিরাম নেই। তুলো ওঠাবার কাজেও পুরুষদের

সাহায্য করতে হবে। তুলো যত বেশী শুকোয় ততই ভালো সুতো হয়। তাই তুলো ওঠানো হয় সব ফসলের শেষে।

জুফরের আসন্ন সপ্তাহব্যাপী নবান্ন উৎসবের আগে সকলের নতুন পোশাক চাই। মায়েরা সেই কাজে ব্যস্ত। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুণ্টাকে কয়েকদিন তার হাড়জ্বালানো বকবক্কা ছোট ভাইকে সামলাতে হয়েছে। তবে মা যেদিন তাকে গ্রামের তাঁতিনী ডেম্বো ডিবার কাছে নিয়ে গেলেন সেদিন কুণ্টা খুব খুশী। তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সুতোর গোছা সুবিন্যস্ত হয়ে পরিচিত বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হচ্ছিলো। বাড়ীতে রঙ করার কাজেও কুণ্টা তার মাকে সাহায্য করেছে। সব বাড়ীতেই এক কাজ। যেন বিচিত্র বর্ণসম্ভারের প্রদর্শনী চলছিলো। ঝোপের মাথায় মাথায় লাল, নীল, হলুদ, সবুজ—নানা উজ্জ্বল বস্ত্রের পসরা শুকোতে দেওয়া হয়েছে।

মেয়েরা বোনার কাজে, সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত। পুরুষদেরও উৎসবের আগে কতকগুলো বিশেষ কাজ শেষ করতে হবে। পরে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কঠিন পরিশ্রম অসম্ভব। গ্রামের চারিপাশের উঁচু বাঁশের বেড়া কোথাও বা ঝুলে পড়েছিলো। মাটির ঘরগুলো প্রবল বৃষ্টিতে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। পুরোনো চালা নতুন করে ছাওয়া দরকার। সম্ভাব্য নতুন দম্পতিদের জন্য নতুন কুটির প্রয়োজন। বড়োদের সাথে কুণ্টারাও মহা উৎসাহে কাদা ঘাঁটার কাজে নেমে পড়েছিলো।

ল্যামিনের বয়সী ছোট ছেলেরাও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো—কারণ বৃদ্ধা পিতামহীদের কাজের অন্ত ছিলো না। উৎসবের আগে কুমারী মেয়েদের কেশ-সজ্জার সরঞ্জামের প্রচুর চাহিদা। সিসল বা বাওবার গাছের বল্কল থেকে কবরী, বিনুনী, পরচুলা ইত্যাদি তৈরী হয়। বাওবাব গাছের তন্তু রেশমের মতো উজ্জ্বল ও মসৃণ। কিন্তু তার থেকে কিছু তৈরী করা বেশ শ্রমসাধ্য। একটা পরচুলার দাম পড়ে যায়—তিনটে ছাগল। অবশ্য ক্রেতাদের সাথে অনেক সময় ধরে দাম-দর, হৈ-হল্লা, হাঁকাহাঁকি বৃদ্ধাদের কাছে বড়োই সুখের। সে আনন্দটুকু পাবার জন্য খানিকটা দাম কমাতেও তারা রাজী।

দ্বিতীয় কাফোর কিশোরী কন্যারা তাদের মায়ের সাহায্য করছিলো অন্যভাবে। তারা নানা রকমের রান্নার মসলা বা ওষুধের মূল সংরক্ষণ করে রাখছিলো। মায়েরা ঝেড়ে পিষে শস্য বার করে নিলে মেয়েরা তুষ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো। ঘরে তৈরী সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করছিলো।

উৎসবের দিন এগিয়ে আসতে জুফরের আবহাওয়া বদলে যাচ্ছিলো। গ্রামের

নানা দিক থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসে। তারের যন্ত্রের মাঝে ছিলো কোরা, বালাফোন। ঢাক তো ছিলোই। তাছাড়া বাঁশী, ঘণ্টা, ঝুনঝুনি—আরো কত।

উৎসবে নর্তকদের ব্যবহারের জন্য তৈরী হচ্ছিলো মুখোস। গুটিকয়েক শিল্পী ধৈর্য সহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ কাজ করছিলো। বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন আকারের। কাঠের ওপর কারুকার্য করা বিচিত্র সব জিনিষ। মানুষের মুখ, নানা পশুর মুখ ও অবয়ব তাতে খোদাই করা। কোনটা ভয়ঙ্কর, কোনটা রহস্যময়।

বিণ্টার বয়সী মেয়েদের কাজের পরিসীমা নেই। জামা-কাপড় সেলাই, ঘরদোর পরিষ্কার, শুকনো খাবার ভেজানো, ছাগল মেরে ঝলসানো—এ সব কাজের ফাঁকেও গ্রামের নতুন কুয়োর ধারে বসবার খানিকটা সময় বার করতেই হবে। সেখানে খানিকটা গল্প আর খানিকটা রূপচর্চা। উৎসবের আগে নিজেকে যথাসাধ্য সাজিয়ে নিতে হবে।

যেসব মেয়েরা এতদিন গেছোমী করে বেড়িয়েছে তারাই এখন লজ্জা ও সঙ্কোচে নুয়ে পড়ছে—কুণ্টা তাদের আমূল পরিবর্তন দেখে হতবাক। ভালো করে যেন চলতেই পারে না—এমনি সব ভাব। আর পুরুষদেরও বলিহারি—যে সব অপদার্থ মানুষ ধনুক দিয়ে একটা তীর পর্যন্ত ঠিকমতো ছুঁড়তে পারে না, তাদের দিকেই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে! কুণ্টা লক্ষ্য করছিলো—কোন কোন মেয়ের ঠোঁট ফুলে ঢোল হয়েছে। নাকি তারা ঠোঁটের নীচে ইচ্ছে করে কাঁটা ফুটিয়েছে। আবার কালিঝুলি মেখে কালোও করেছে। বারো বৎসর বয়স থেকে শুরু করে বিণ্টার বয়সী মেয়েরা প্রতিদিন ফুদানো গাছের পাতা জলে ফুটিয়ে তাই দিয়ে পা এবং হাতের পাতা কালির মতো কালো করছিলো। মাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে তাড়া খেয়েছে। বাধ্য হয়ে বাবাকেই জিজ্ঞেস করতে হয়েছে।

'যত বেশী কালো হবে, মেয়েদের সৌন্দর্য ততই খুলবে।'

'কিন্তু কেন?'

'বড়ো হলে বুঝতে পারবে।'

দশ

ভোর বেলা বাজনার শব্দে কুণ্টার ঘুম ভেঙে গেলো। সিটাফা ও অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে সে এক ছুটে শিমুল গাছের নীচে উপস্থিত হয়। বয়স্করাও সেখানে জড়ো

হয়েছে। গ্রামের ঢাকীরা প্রাণপণে ঢাক পিটাচ্ছে। আবার ঢাকের সাথে চেঁচিয়ে কথা বলছে যেন সেগুলো প্রাণবন্ত বস্তু। হাত এত দ্রুত চলছে যে স্পষ্ট দেখাই যায় না। চারপাশে যারা জড়ো হয়েছিলো সকলেরই পরণে উৎসবের নতুন পোশাক। ক্রমেই তাদের হাত পা দেহ সুরের দোলায় দুলতে লাগলো। প্রথমে ধীরে। ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর। একে একে সকলেরই।

কুণ্টা নাচের আসর অনেক দেখেছে—বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু—নানা উপলক্ষে। কিন্তু নাচ আগে কখনো এমন করে তার মর্ম স্পর্শ করেনি। গ্রামের প্রতিটি বয়স্ক লোক যেন দেহের গতিতে কিছু একটা ভাব প্রকাশ করতে চাইছিলো। তার একান্ত নিভৃত কোন মনের বাসনা। কেউ বা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছিলো, কেউ লাফাচ্ছিলো, কেউ ঘুরছিলো। অনেকে মুখোস পরে ছিলো। নিয়ো বটোকে এদের মাঝে দেখে কুণ্টা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রচণ্ড চিৎকার করে বৃদ্ধা দু'হাতে কোন অদৃশ্য শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলো। কী যেন কল্পিত বস্তু কারো হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নাচতে নাচতে অবসন্ন হয়ে সে ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো। নিজের বাবার কাণ্ড দেখেও কুণ্টার চোখ বিস্ফারিত। খুব উঁচুতে লাফিয়ে উঠে ধপাস করে ধুলোয় পড়ছিলো। পেশী নাচাতে নাচাতে পিছিয়ে গিয়ে বুকে করাঘাত করতে করতে এগিয়ে আসছিলো। মুখে বিকট চিৎকার। আকাশে পাক খেয়ে লাফিয়ে উঠে হুহুঙ্কার শব্দে নেমে আসছিলো।

ঢাকের নিনাদ কুণ্টার কানে নয়, যেন প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিলো। অবশেষে যেন তার অজ্ঞাতে, যেন স্বপ্নের ঘোরে তার দেহ চঞ্চল হয়ে উঠলো, বাহু দুলে উঠলো। সেও অন্যদের সাথে চিৎকার করে লাফাতে শুরু করলো। গভীর ক্লান্তিতে পরে কখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে কেউ খেয়ালও করেনি। এক সময় নিজেকে জোর করে তুলে দুর্বল পায়ে সে নাচের আসরের পাশে সরে গিয়েছে। সেখান থেকে ভীত, উত্তেজিত কুণ্টা হতবুদ্ধি হয়ে দেখেছে সিটাফা ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা সবাই বড়োদের সাথে নাচছে। সাহস পেয়ে কুণ্টা আবার নাচতে শুরু করেছে। বালক থেকে বৃদ্ধ—প্রতিটি গ্রামবাসী সারাদিন নেচেই চলেছে। আহার নিদ্রার কথা—না তাদের, না ঢাকীদের—কারোরই মনে পড়েনি। শুধু মাঝে মাঝে দম নেবার জন্য ক্ষণেক মুহূর্ত থামা। রাত্রে কুণ্টা যখন ঘুমিয়ে পড়ে—ঢাক তখনও বাজছিলো।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিদের শোভাযাত্রা। দ্বিপ্রহরের পরে শিক্ষক, ইমাম, সারা বৎসরে স্মরণীয় কাজের জন্য সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা,

বয়োজ্যেষ্ঠ সংসদের সভ্যরা, শিকারী, মল্লবীর—এদের সামনে নিয়ে এক শোভাযাত্রা বার হলো। সম্মানিত ব্যক্তিদের পেছনে গ্রামের অন্য সকলেই ছিলো। সবাই গান করছিলো, করতালি দিচ্ছিলো। বাজনাদারেরা বাজাচ্ছিলো। শোভাযাত্রা গ্রাম ঘুরে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট গাছের কাছে আসতেই কুণ্টাদের কাফো শোভাযাত্রায় যোগ দিলো। বাজনার সাথে সাথে নানা অঙ্গভঙ্গী করে তারা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো। পুত্রের কাণ্ড-কারখানা দেখে অমোরো ও বিণ্টার চোখে নীরব প্রশংসাই ফুটে উঠেছিলো।

প্রতি গৃহের রন্ধনশালা সেদিন সকলের জন্য উন্মুক্ত। যারা শোভাযাত্রার অন্তর্ভুক্ত, তারা যে কোন গৃহকোণে দু'লহমা দাঁড়িয়ে নিজেদের পছন্দমতো সুখাদ্য একপাত্র খেয়ে নিতে পারে। সুপক্ক সুস্বাদু ভাত, মাছ, সবজি, ভাজা মাংসের প্রচুর আয়োজন। আর ছিলো বাঁশের ঝাঁপি ভর্তি নানারকম ফল। কিশোরী মেয়েদের ওপর ফল সরবরাহের ভার।

এই সময় বিদেশী অতিথির আনাগোনা বেড়ে যায়। নানা বেসাতি নিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেও অনেকে আসে। কাজ করা রঙীন কাপড়, নাইজেরিয়ার উৎকৃষ্ট কোলা বাদাম, নৌকো করে নুনের খণ্ড নিয়ে আসতো। তার পরিবর্তে ব্যবসায়ীরা চাইতো নীল, পশুচর্ম, মোম, মধু ইত্যাদি।

বিধর্মী বণিকেরা তামাক ও মদের পণ্য নিয়ে জুফরে গ্রামে থামতো না। তাদের গন্তব্যস্থল অন্যত্র। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানডিনকা উপজাতির লোকেদের মদ বা তামাক স্পর্শ করা নিষেধ। আবার বহু যুবক কেবলমাত্র বেড়াবার উদ্দেশ্যেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতো।

প্রত্যহ গ্রামবাসীরা ঢাকের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমোতো, ঢাকের শব্দে জেগে উঠতো। কত ভ্রাম্যমাণ বাদক তারের যন্ত্র, ঢাক, বাঁশী ইত্যাদি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো। বাজনা শুনে খুশী হয়ে লোকে তাদের উপহার দিতো। তাদের বাজনার সাথে নাচতো, গান গাইতো।

কথকের দল আসতো। কেউ বা পৌরাণিক কাহিনী শোনাতো, কেউ ধর্মীয় অনুশাসন। বাওবাব গাছের চারিপাশে লোকেরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে শুনতো।

ষষ্ঠদিন অপরাহ্ণে পার্শ্ববর্তী কোন গ্রাম থেকে অকস্মাৎ অচেনা ঢাকের আওয়াজ ভেসে এলো। অত্যন্ত অপমানজনক বার্তা। মহবলশালী মল্লবীরেরা শীঘ্রই জুফরে গ্রামে পোঁছচ্ছে। জুফরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ক্রুদ্ধ জুফরেবাসীগণ

ঢাকের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ উত্তর জানালো—মুর্খ বিদেশীদের যদি প্রাণভয় অথবা অঙ্গহানির ভয় না থাকে, তবে অবশ্যই আসতে পারে।

সকলেই দ্রুত মল্লযুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো। স্থানীয় মল্লবীরেরা বাওবাব পাতার গুঁড়ো আর ছাই মেখে গা পিচ্ছিল করে নিলো। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীরাও অবিলম্বে এসে গেলো। সামনে এলো ঢাক বাজাতে বাজাতে তাদের ঢাকীর দল। জুফরের বীরেরা যখন নিজেদের ঢাকীর পেছনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো, চারিদিকে তখন তুমুল কোলাহল, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গিয়েছে।

দু'পক্ষের ঢাক সজোরে বললো—প্রস্তুত! জোড়ায় জোড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি দাঁড়ালো। প্রথমে ঢাকের মাধ্যমে দু'পক্ষের প্রাচীন মল্লবিদ্‌দের গুণ-কীর্তন করা হলো। তারপর বিদ্যুৎগতিতে দু'পক্ষ পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধুলোর ঝড়ে চারিদিক আচ্ছন্ন, কোন পক্ষ অকস্মাৎ ভূমিশায়ী হলেই পরাজিত বলে ধরা হবে না। অপর পক্ষ তাকে শূন্যে তুলে আছাড় মারতে পারলে তবেই তার পরাজয়। কখনো জুফরের কখনো বিপক্ষের জয় হচ্ছিলো। তৎক্ষণাৎ ঢাকে বিজয়ীর নাম বেজে উঠছিলো। চারিদিকে অপরিসীম উত্তেজনা। কুণ্টা আর তার সাথীরা দর্শকদের পেছনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মাঝে কুস্তি লড়ছিলো।

অবশেষে জুফরের দল সংখ্যায় একবার বেশী আছাড় মেরে জয়ী হলো। বিজয়ীরা প্রত্যেকে সদ্য বধ-করা ষাঁড়ের শিং ও খুর উপহার পেলো। পরাজিত বীর প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও মহাসমাদরে ভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বড়ো বড়ো মাংস-খণ্ড আগুনে ঝলসানো হতে থাকে। তাদের শক্তি ও বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসায় চারিদিক মুখরিত। কুমারী কন্যারা উভয়পক্ষের মল্লবীরদের হাতে ও পায়ে ছোট ছোট ঘণ্টার মালা বেঁধে দেয়।

সূর্যাস্তের পর আবার সকলে মল্লভূমিতে সমবেত হয়েছে। উৎসবের উৎকৃষ্ট পোশাক তাদের পরণে। ঢাকীরা নীচু হয়ে সামনে বসে। উভয় দলের বীরেরা সেই চক্রাকার প্রাঙ্গণে এবার নানা বিচিত্র খেলা দেখাতে লাগলো। ঢাকের নিনাদ ক্রমে তীব্র ও দ্রুত হয়ে উঠছিলো। এরপর কুমারী কন্যারা প্রবেশ করে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করলো। নাচের পর ঘর্মাক্ত, পরিশ্রান্ত দেহে প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় কুমারীরা একে একে মাথার রঙীন ওড়না ফেলে যাচ্ছিলো। সেটাই ইঙ্গিত। সকলে অসীম আগ্রহে ওড়নাগুলোর পরিণাম লক্ষ্য করতে থাকে। কোন বিবাহেচ্ছু যুবক বিশেষ একটি ওড়না তুলে নিলে তার মনোবাসনা প্রকাশ পায়। তারপর শুধু কন্যার পিতার সাথে ছাগল ও গরুর

বিনিময়ে কন্যার মূল্য নির্ণয়। একজন বিদেশী মল্লবীর একটি ওড়না কুড়িয়ে নিতে সমবেত দর্শকের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। গ্রামের একটি কন্যাকে এই বিবাহের ফলে চিরদিনের মতো হারাতে হবে।

এগারো

উৎসবের শেষের দিন প্রভাতে বালকদের ভয়ার্ত চিৎকারে কুণ্টার ঘুম ভেঙে গেলো। ডুনডিকো পরে ছুটে গিয়ে যা দেখলো, তাতে রক্ত শুকিয়ে যায়। বীভৎস মুখোস পরে বর্শা হাতে কিছু ভয়ঙ্কর দর্শন লোক লম্বা টুপী আর গাছের বাকল ও পাতার পোশাক পরে চিৎকার করে লাফাচ্ছিলো। প্রতিটি কুটিরে ঢুকে তারা তৃতীয় কাফোর একটি একটি করে ছেলেকে টেনে বার করে আনছিলো।

কুণ্টার সমবয়সী ছেলেরা একটি ঘরের পেছন থেকে ভীত বিস্ফারিত নয়নে এ দৃশ্য দেখছিলো। তৃতীয় কাফোর ছেলেদের মাথার ওপর একটি করে সাদা মোটা কাপড়ের ঢাকনা পরানো। তাদের জোর করে টেনে আনা হচ্ছিলো, ক্ষেত্র বিশেষে লাথি মেরে পর্যন্ত। ওদের সবাইকে গ্রামের বাইরে পুরুষত্বের শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। সে যে এমন ভয়াবহ ব্যাপার—কুণ্টার ধারণাই ছিলো না।

এ ঘটনার পর সারা গ্রাম কিছুদিন যেন বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। কুণ্টারা কোন বিষয়েই মন বসাতে পারছিলো না। কোরানের আয়াৎ ঠিকমতো মুখস্থ বলতে না পারায় আরাফাঙের কাছে শাস্তি স্বরূপ মাথায় গাট্টা খেতে হচ্ছিলো। কিন্তু কুণ্টারা কী করে ভুলবে—পরের বারে মাথায় সাদা টুপী চড়িয়ে লাথি মেরে গ্রাম থেকে বার করে নিয়ে যাবে তাদের দলকেই।

এরা শুনেছিলো তৃতীয় কাফোর ছেলেরা বারো চন্দ্রকাল পরে যখন এই শিক্ষা সমাপ্ত করবে, তখন তারা পূর্ণ যুবক। তার আগে সেই নতুন শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিদিন তাদের প্রহার সহ্য করতে হবে। বন্য জন্তু শিকার করতে পারলে তবেই খাদ্য জুটবে। রাত্রে তাদের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে পথ চেনা শেখবার জন্য। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হলো—এদের পুরুষাঙ্গের খানিকটা নাকি কেটে ফেলা হবে। ভাবলে ভয়ে এদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়।

এতদিনে এরা ছাগল চরাতে বেশ দক্ষ হয়েছে। লক্ষ্য করেছে—সকাল বেলায়

মাছির কামড়ে জানোয়ারগুলো ছটফট করে কেবলই এদিক সেদিক পালাতে চায়। কিন্তু দুপুরের প্রখর রৌদ্রে মাছিগুলো শীতল ছায়াঢাকা জায়গা খোঁজে, ছাগলগুলো ক্ষুধার জ্বালায় অধীর আগ্রহে ঘাস খেতে থাকে। তখন ছেলেরা একটু নিজস্ব স্ফূর্তির সময় পায়।

এরই মাঝে এরা দিব্যি গুলতি ছুঁড়তে শিখেছে। নতুন তীর ধনুকে ছোট ছোট জানোয়ার মারতে পারে। একদিন একটা বনমুরগী জুটেছিলো। আগুন জ্বালিয়ে ঝল্‌সে নিয়ে দিব্যি ভোজ হয়েছে।

ক্রমশঃই গরম বাড়ছিলো। লম্বা ঘাসগুলো পুড়ে যাওয়াতে ছাগলগুলো হাঁটু গেড়ে নীচের সবুজ ঘাসের সন্ধান করতো। কুণ্টারা অবশ্য গরমের পরোয়া না করে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে উঠতো। কিন্তু খেলার মাঝেও সকল দিকেই লক্ষ্য রাখতে হতো। ঘাসের সন্ধানে কোন ছাগল দলচ্যুত হয়ে গেলে যত শীঘ্র সম্ভব সেটাকে ফিরিয়ে আনা দরকার। কুণ্টা বনের ভেতর ছাগলের খোঁজে যে কয়েক মুহূর্ত কাটাতো—কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতো। সিংহ বা মত্ত মহিষের মতো ভয়ঙ্কর জীব শিকারের দিবাস্বপ্ন দেখতো। যেন সে মস্ত বড়ো বীর। শিকার করে ফিরেছে। চারিদিকে মুগ্ধ গ্রামবাসী। তার মা তাকে জড়িয়ে ধরেছেন। পিতা নীরবে প্রশংসাদীপ্ত নয়নে তাকিয়ে আছেন।

বারো

নিদারুণ গ্রীষ্মের দীর্ঘ পাঁচ চন্দ্রকাল কেবল শুরু হয়েছে। যেমন গরম বাইরে, তেমনি ঘরে। ছাগল চরাতে যাবার সময় বিণ্টা রোজ ছেলের পায়ে খেঁজুরের তেল লাগিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও বাইরে থেকে সে রক্তাক্ত ফাটা পা আর ঠোঁট নিয়ে ফেরে। বাইরের শুকনো চারণক্ষেত্র গ্রামের ভেতর থেকেও গরম।

ছেলেরা তাদের কুকুর ও ছাগলের দল নিয়ে মধ্যাহ্নে গাছের নীচে বিশ্রাম করতো। প্রখর রৌদ্রে জানোয়ারগুলোরও চরে বেড়াবার সাধ্য হতো না। ছেলেদের শিকার করবার উৎসাহ লুপ্ত হয়েছিলো। ছাগল চরাবার কাজের আনন্দ আর লেশমাত্র ছিলো না। দিনে মনে হতো কাঠ কুড়োবার প্রয়োজন হবে না—রাতে আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করবার দরকারই হয়তো হবে না। কিন্তু সূর্যাস্তের পরেই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে। রাত্রে খাবার পর আগুনের পাশে বসতেই

হয়। আগুনের কুণ্ড চারটে। অমোরোর বয়সীদের জন্য একটি, বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য একটি। বিণ্টার বয়সী মেয়েদের জন্য তৃতীয়টি। পিতামহী এবং তাদের গল্পশোনা বাচ্চাদের জন্য চতুর্থটি। কুণ্টার মতো দ্বিতীয় কাফোর ছেলেরা প্রথম কাফোর বাচ্চাদের সাথে একটু দূরত্ব রেখে বসতো, যদিও তারা ঠাকুরমাদের গল্পের দিকে কান পেতে থাকতো। মাঝে মাঝে অবশ্য বৃদ্ধদের কথাবার্তাও শুনতো। বৃদ্ধদের গল্পে কোন বৈচিত্র্য থাকতো না। আগে কবে এর চেয়েও দুর্দিন হয়েছিলো—কেবল তারই গল্প।

তেরো

অকস্মাৎ কোনদিন হাওয়া আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মানুষের মেজাজও যেন পাল্লা দিয়ে গরম হয়ে যায়। কেউই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। বাড়ীতে দিবারাত্রি তুমুল কলহ। স্ত্রীরা রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যায়। দু'মাস পরে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি একটু শান্ত হলে তারা স্বামীর ঘরে ফিরে আসে।

দীর্ঘ নিদাঘের মাত্র অর্ধেক পার হয়েছে। গোলাঘরে খাদ্যের অভাব নেই। তবু রান্নার পরিমাণ কমে গিয়েছিলো। গরমে কারো খেতে ইচ্ছা করতো না। যে মুরগীগুলো সর্বদা দৌড়াদৌড়ি চ্যাঁচামেচি করে উঠোনময় ঘুরে বেড়াতো, তারাও নির্জীবের মতো মাটিতে শুয়ে থাকতো। গোরুর গায়ের বিভিন্ন জায়গায় চামড়া ফেটে ঘা হয়ে গিয়েছে। গাছে বাঁদরের দেখা নেই। তারা গভীর বনে চলে গিয়েছে। ছাগলগুলোর পর্যন্ত খাওয়া কমে যায়। কেবলই ছটফট করে বেড়ায়।

কুণ্টা ভাবছিলো—তাদের দেশে দুঃখ-কষ্ট চিরদিন লেগেই আছে। নিরলস, নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের কথা সে কখনো শোনেনি। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড উত্তাপ, আয়েশহীন হিমশীতল রাত্রি, আর বৎসরের অর্ধেক কাল ঘোর বর্ষা। কোন কিছুই যেন পরিমিত পরিমাণে হয় না। বৃষ্টির জন্য আকুল প্রার্থনার পর যে বর্ষা আসবে তা প্রাণান্তকর। পুরো গ্রাম, পথঘাট সবই জলে তলিয়ে যাবে। কষ্টের সীমা থাকবে না। সুদিনে যখন পশুরা পর্যাপ্ত খাবারে সুপুষ্ট, বৃক্ষগুলি ফুলে ফলে পরিপূর্ণ, তখনও ভবিষ্যৎ দুর্দিনের আশঙ্কায় কণ্টকিত থাকতে হবে। আকালের সময় অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য। তার প্রাণাপেক্ষা পিতামহী ইয়াইসার মতো কত প্রিয়জন দুর্ভিক্ষের বলি হবে!

ফসল তোলার উৎসব শেষ না হতেই দীর্ঘ যন্ত্রণাময় নিদাঘের দাবদাহ। তারই মাঝে যখন বাতাসে আগুন ধরে যায় তখন দুর্দশার সীমা থাকে না। কুণ্টা ও ল্যামিনের কপালে দিবারাত্র মায়ের প্রহার ও তিরস্কার।

ছোট ভাইয়ের জন্য কুণ্টার দুঃখ হতো। বেচারা! তার তো একা একা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবারও সাধ্য ছিলো না। একদিন ভাইয়ের কান্না দেখে কুণ্টা বাইরে যাবার সময় মায়ের অনুমতি নিয়ে ল্যামিনকেও সাথে নিলো। বাইরে গিয়েই অবশ্য তাকে এক লাথি কষিয়ে দিলো। কিন্তু ল্যামিন কাঁদতে কাঁদতে কুকুর-ছানার মতো দাদার পেছনেই দৌড়োয়। দাদার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিলো না। কুণ্টার অবশ্য খুবই বিরক্ত লাগতো। কিন্তু তার ওপর ল্যামিনের শ্রদ্ধা-ভক্তি কুণ্টাকে গোপনে খুশীও করতো। ছোট ভাইয়ের হাজার রকম প্রশ্নের সে উত্তর দিতো। ছোট একটা বীজ থেকে কী করে বিশাল শিমূল গাছ হয়, মৌমাছির হুল কোথায় থাকে, মধু কী করে সংগ্রহ করতে হয় ইত্যাদি। কী করে গাছে চড়তে হয়, কুস্তি করতে হয়, শিষ দিতে হয়—সব বিষয়ে কুণ্টাই ভাইয়ের শিক্ষাগুরু। ল্যামিন দুষ্টুমী করলে বিণ্টা 'দাদার সাথে যেতে দেবো না' বলে ভয় দেখালেই কাজ হতো। ল্যামিন তাতেই সারাদিন ভালো ছেলে হয়ে থাকতো।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সূর্যের অবস্থান দেখে সঠিক সময় বলাটা ল্যামিনকে শেখানো গেলো না।

'ঠিক আছে। এখনো বেশী ছোট আছো। আর একটু বড়ো হলে পারবে।'

মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাইকে দু'চারটে চড়চাপড় মারতো। আবার পরে অনুতপ্ত হয়ে নগ্ন ল্যামিনকে তার ডুনডিকোটা একটু পরতেও দিতো।

আট বছরের কুণ্টা বড়ো ছেলেদের সাথে যে মানসিক দূরত্ব অনুভব করতো, ভাইকে ভালোবাসার ফলে সেটা কমে এলো। সে মাত্র দ্বিতীয় কাফোর ছেলে, মায়ের ঘরে ঘুমোয়—বড়োদের ব্যবহারে এ তাচ্ছিল্য সবসময়ই প্রকাশ পেতো। তারই প্রতিক্রিয়ায় ল্যামিন সম্পর্কে তার একটা প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ এসে গিয়েছিলো। বড়োরা ছোটছেলে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বার হলে যেমন হয়—এও যেন তেমনি। তার রক্ষণাবেক্ষণের, তার অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর যোগানোর ভার তারই ওপর।

'পৃথিবীটা দেখতে কেমন?'

'আরাফাঙ তোমাকে কী শেখায়?'

'প্যাঁচা মারতে নেই কেন?'

আবার অনেক সময় এমন প্রশ্নও করতো যার উত্তর কুণ্টার জানা ছিলো না।

'সূর্যে আগুন লেগেছে নাকি ?'

'বাবা আমাদের সাথে ঘুমোয় না কেন ?'

কুণ্টা তখন তার বাবার মতো গম্ভীর হয়ে গলা খাঁকারি দিতো বা চুপ করে থাকতো। ল্যামিনকেও চুপ করে যেতে হতো। কারণ মানডিনকা জাতির অনুশাসনে অপরপক্ষ কথা বলতে না চাইলে প্রশ্ন করা বারণ।

ল্যামিনের অনুপস্থিতিতে কুণ্টা চট করে মা বা বাবার কাছ থেকে তার না জানা প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতো। তারাও ততদিনে কুণ্টার সাথে সমকক্ষের মতো ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

বাবা, ক্রীতদাস কী করে হয় ? অমোরো খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো—নানা ভাবেই হতে পারে। ক্রীতদাসের সন্তানেরা ক্রীতদাস হয়। দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যের বিনিময়ে নিজের স্বাধীনতা বিক্রয় করে কেউ দাসত্ব বরণ করে। যুদ্ধবন্দীরাও ক্রীতদাসে পরিণত হয়। হত্যা, চুরি বা অন্য অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরাও ক্রীতদাস। শুধু অপরাধী ক্রীতদাসেরাই ঘৃণার পাত্র—সকলে নয়। এমন বহু ক্রীতদাস আছে, যাদের নাম সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়। পিতামহী নিয়ো বটোও একজন ক্রীতদাসী।

কুণ্টা বিস্ময়ে চমকে উঠলো। নিয়ো বটোর কথাবার্তা চালচলন তো মহারানীর মতো। সে কি করে ক্রীতদাসী হবে ?

পরদিন বিকালে তার ভাগের ছাগলগুলোকে খোঁয়াড়ে বন্ধ করে সে নিয়ো বটোর কুটিরে উপস্থিত হলো। কুণ্টা নিয়ো বটোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। কুণ্টার মুখের দিকে তাকিয়েই নিয়ো বটো বুঝতে পারলো—তার মনে বিশেষ কোন জিজ্ঞাসা আছে। সাধারণ সৌজন্যসূচক কথাবার্তার পর কুণ্টা বলে উঠলো—'তুমি ক্রীতদাসী কেন ?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে নিয়ো বটো স্থির হয়ে থাকলো। তারপর প্রশ্নের উত্তর দিলো—

'এখান থেকে বহুদূরে, বহু বৎসর আগের কথা। আমি তখন কিশোরী, দুই সন্তানের মা। আমার স্বামী কিছুদিন আগে যুদ্ধে মারা গিয়েছেন। এক রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা। ঘরের চালা ভেঙে পড়েছে। শিশু কন্যা ও পুত্রের হাত ধরে বাইরে এসে সশস্ত্র সাদা মানুষের সম্মুখীন হলাম। চারি-পাশে প্রতিবেশীদের ঘরও জলছিলো। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর স্থানীয় গ্রামবাসীরা পরাজিত হয়। তাদের অতি নিষ্ঠুরভাবে বন্দী করা হয়েছিলো। আহত বৃদ্ধ ও

শিশুদের সাদা মানুষেরা নির্মম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিলো। আমার মা, আমার দু'টি সন্তান—নিয়ো বটো কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বিপর্যস্ত, আতঙ্কিত বন্দীদের গলায় গলায় চামড়ার ফিতে দিয়ে লম্বা লাইনে বেঁধে দিনের পর দিন সাদা মানুষেরা মারতে মারতে টেনে নিয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ, উত্তপ্ত, কঠিন, বন্ধুর পথ হতভাগ্যের দল পায়ে হেঁটে পার হয়েছে। দ্রুত চলবার তাড়া দিয়ে তাদের অবিরাম বেত মারা হয়েছে। তাতেই কত লোক প্রাণ হারিয়েছে। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে বন্দীরা ক্রমেই অশক্ত হয়ে পড়ছিলো। বন্য জন্তুরা সেই অর্ধমৃতদের কামড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ। স্নেহনিবদ্ধ কত পরিবারের একমাত্র চিহ্ন মাটি ও খড়ের কুটিরের দগ্ধাবশেষ। পশু ও মানুষের মাথার খুলি ও অস্থিখণ্ড চারিদিকে ছড়ানো। তারই ভিতর দিয়ে বন্দীর দল কত নিস্তব্ধ গ্রাম,—কত জনহীন পথ অতিক্রম করেছে। ক্যাম্বি নদীর যে কূলে ক্রীতদাস-দের কেনাবেচা হয়, সেখান থেকে জুফরে গ্রাম চারদিনের পথ। অর্ধেকেরও কম বন্দী অবশেষে জুফরেতে পৌঁছেছিল। নিয়ো বটোকে সেখানে এক বস্তা শস্যের বিনিময়ে বিক্রী করা হয়। নিয়ো বটো কথার অর্থ—এক বস্তা শস্য। নিয়ো বটোর প্রভু মারা যাবার পর থেকে সে জুফরেতেই বাস করছে।

এরপর কিছুদিন কুণ্টার দিবারাত্রির ভাবনা ছিলো সাদা মানুষেরা। অসীম কৌতূহলে সাহস করে একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি সাদামানুষ দেখেছো?'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে অমোরো মুখ খুললো।

—হ্যাঁ। সে এবং তার দুই ভাই একবার পায়ে হেঁটে ক্যাম্বি নদীর ধারে গিয়েছিলো। তিনদিন লেগেছিলো। সাবধানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে চলতে চলতে তারা চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলো। সে সময় কুড়িখানা বিরাট ক্যানু নদীতীরে অপেক্ষা করছিলো। যা আয়তন, এক একখানাতে জুফরের সমস্ত লোক এঁটে যায়। বহু সাদা মানুষ চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ছোট ছোট ক্যানু করে নীল, তুলো, মোম, শুকনো চামড়া ইত্যাদি এনে বড় ক্যানুতে তোলা হচ্ছিলো। বন্দীদের ওপর যে অত্যাচার চলছিলো—না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

বারার রাজা গ্রামে আগুন ধরানো, হত্যা বা বন্দী করা—নিষেধ করে দিয়ে-ছিলেন। সাদা মানুষ ভর্তি কয়েকটা ক্যানু জ্বালিয়ে দেবার পর সত্যি সেটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়েছিলো! কিন্তু রাজা মানুষচুরি বন্ধ করতে পারেননি।

কঠোর দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে অমোরো বললো—

'এবার তোমাদের যা বলছি, সমগ্র চেতনা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা কর। পারত-পক্ষে একা বেরোবে না। পারতপক্ষে রাত্রে বেরোবে না। রাত্রে বা দিনে, লম্বা লম্বা আগাছা বা ঝোপ সর্বসময় পরিহার করে চলবে। বড় হবার পরেও, সারা জীবনই—সাদামানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। আমাদের নিজেদের লোকেরাও অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে, টাকা নিয়ে চরের কাজ করে। কাজেই অচেনা কাউকেই বিশ্বাস করবে না।

'এ সব বিষয়ে সতর্কতা কখনো অতিরিক্ত হয় না। মনে রেখো—আমাদের নিজেদের মাঝে ক্রীতদাস আর ওদের অধীনস্থ ক্রীতদাস এ দুয়ের অবস্থার মাঝে অনেক পার্থক্য। চুরি করে ধরে আনা মানুষদের ওরা শিকল দিয়ে বেঁধে বাঁশের খাঁচায় ভরে রাখে। চারিদিকে কঠিন পাহারা। সাদা মানুষদের কর্তাব্যক্তি এলে বন্দীদের টেনে খাঁচার বাইরে বালির ওপর বার করে। তখন তাদের মাথা কামানো, সারা গায়ে তেল মাখানো। আদেশ মাফিক তাদের লাফাতে হয়, উঁচু হয়ে বসতে হয়। মুখ হাঁ করিয়ে দেহের গোপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টেনে, তন্ন তন্ন করে তারা পরীক্ষা করে। অবশেষে গরম লোহা দিয়ে পিঠে ও কাঁধে চিহ্ন দিয়ে হতভাগ্যদের টানতে টানতে নৌকোয় তোলা হয়। অভাগারা চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে মাটি আঁকড়ে জন্মভূমিকে ধরে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। চাবুক আর লাঠির সাথে লড়তে লড়তে অনেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধূসর পিঠ, সাদা বুক, সারি সারি দাঁতে ভরা বাঁকানো মুখ হাঙ্গরগুলো মুহূর্তে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। নদীর জল রক্তে লাল হয়ে ওঠে।'

চোদ্দ

এ সব কাহিনী শুনবার পর সে রাত্রে বারবার ঘুম ভেঙে ল্যামিন কুণ্টাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরছিলো। কুণ্টা ঠিক করলো—পরের দিন ছাগল চরিয়ে ফিরে এসে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গল্প বলে ভাইয়ের মনের আতঙ্ক ভুলিয়ে দেবে।

সে কাকাদের গল্প শুরু করলো—কাকারা ঘুরে বেড়াতে এত ভালোবাসে যে বিয়েই করেনি। চন্দ্রকালের পর চন্দ্রকাল দিনে তাদের মাথার ওপর কোন আচ্ছাদন থাকে নি। রাতেও নক্ষত্র খচিত আকাশের নীচে ঘুমিয়েছে। এমন দেশে গিয়েছে—যেখানে অন্তহীন বালির রাশি অবিরত রোদে পুড়ছে। স্মরণকালে

কখনো বৃষ্টি হয়নি। আবার এমনও দেশ আছে—যেখানে অরণ্য এমন নিবিড় ঘন যে দিনেও রাতের মতো গহন অন্ধকার। সে দেশের মানুষেরা উচ্চতায় ল্যামিনের মতো। বড় হয়েও তারা ল্যামিনের মতো নগ্ন থাকে। ছোট ছোট বিষাক্ত তীরে কিন্তু তারা হাতীর মতো বিশাল জীবকে মেরে ফেলতে পারে। আবার কাকারা বিরাট দৈত্যদের দেশেও গিয়েছে। সেখানকার লোকেরা জুফরের সবচেয়ে লম্বা লোকের চেয়েও দু'হাত উঁচু।

ল্যামিনের বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের সামনে কুণ্টা তার প্রিয় আখ্যানগুলো অভিনয় করতে লাগলো। যেন সে কাকাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে খোলা তলোয়ার। সামনে দস্যু। কুণ্টার সাথে হাতির দাঁত, দাসী, রত্ন, সোনা। এ দিবাস্বপ্ন তো সে সর্বদাই দেখে!

কিছুদিন পর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটলো। শান্ত, তাপদগ্ধ অপরাহ্ণ। প্রায় সকলেই কুটিরের দরজার সামনে বা বাওবাব গাছের ছায়ায়। অকস্মাৎ পাশের গ্রাম থেকে ঢাকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এলো। কুণ্টা ও ল্যামিন উৎকর্ণ হলো। ল্যামিন তার বাবার নাম শুনে উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলো। সূর্যোদয়ের দিকে পাঁচদিনের পথে জানে ও সালুম কিণ্টে একটি নতুন গ্রামের পত্তন করছে। এর পরের দ্বিতীয় অমাবস্যার দিন তার প্রতিষ্ঠা উৎসব। তাদের ভাই অমোরো যেন সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকে।

ল্যামিনের প্রশ্নের শেষ নেই। ওরাই আমাদের কাকা? জায়গাটা কোথায়? বাবা কি যাবে? কুণ্টা দৌড়ে জালিবার কুটিরে উপস্থিত হলো। ক্রমশঃই লোক জমছিলো। একটু পরে অমোরো এসে জালিবার সাথে সংক্ষেপে কথা সারলো। তাকে কিছু পারিশ্রমিকও ধরে দিলো। অমোরোর উত্তর ঢাকে বেজে উঠলো। ইনসাল্লা, অমোরো পরের দ্বিতীয় অমাবস্যার আগে ভাইদের প্রতিষ্ঠিত গ্রামে উপস্থিত হবে।

অমোরোর যাত্রার বিলম্ব নেই। এদিকে কুণ্টার মাথায় একটা চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে।—বাবা কি তাকে সঙ্গে নিতে পারেন না?—সে আর কোন বিষয়েই মন লাগাতে পারছিলো না। মেজাজও বড় রুক্ষ। বেচারা ল্যামিন দাদার ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত ও বিস্মিত।

কুণ্টা কাউকেই তার মনের বাসনা জানাতে পারছিলো না—মাকেও না। সে জানতো—মাকে বললে উল্টো ফল হবে। নাঃ বাবাকেই একা পেতে হবে।

যাবার আর তিন দিন বাকী। সকালবেলা ছাগল বার করতে গিয়ে দেখে—

বাবা বিণ্টার কুটির থেকে বেরোচ্ছেন। ছাগলগুলোকে সে এমনভাবে তাড়ালো যে অমোরোকে একটু বিপথে সরে দাঁড়াতেই হলো। কুণ্টা ছাগলের কথা ভুলে শশকের মতো এক লাফে অমোরোর সামনে উপস্থিত। এক নিঃশ্বাসে তার আর্জি জানাতে অমোরো বললো—

'সে কথা বলতেই তো তোমার মায়ের কাছে গিয়েছিলাম।'

কুণ্টার কথাটা বুঝে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। তারপরই ডিগবাজী খেয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠলো। 'আয়ী—য়ী!' বলে চীৎকার করে আর এক-লাফে ছাগলগুলোর মাঝে গিয়ে পড়লো। বন্ধুদের তার সৌভাগ্যের কথা জানাতে হিংসায় সবার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলো!

সন্ধ্যাবেলা খুশীতে ভরপুর হয়ে বাড়ী ফিরতেই মা বিনাবাক্যে তাকে দুই চড় কষিয়ে দিলেন। কুণ্টা তার অপরাধের কথা জানতে চাইলো না। নীরবে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলো। অমোরোর প্রতি বিণ্টার ব্যবহারও অকস্মাৎ বদলে গেলো। ল্যামিন পর্যন্ত জানে—পুরুষদের প্রতি কোনও অসম্মান দেখানো মেয়েদের পক্ষে নিষেধ। কিন্তু বিণ্টা আজকাল অমোরোকে শুনিয়ে শুনিয়েই তার ও কুণ্টার অত দূরের পথে যাবার বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করে। বিভিন্ন গ্রামের ঢাকের মাধ্যমে প্রায় রোজই মানুষ চুরির খবর আসে—তাতেও কি লোকের শিক্ষা হয় না! প্রাতরাশের শস্য চূর্ণ করবার সময় এত জোরে উদূখল পেটায়—যেন ঢাকের মতো আওয়াজ হতে থাকে। ইতিমধ্যে বিণ্টা আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।

পরদিন পথে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে দেখা হলে তারা সবাই কুণ্টাকে এত অল্প বয়সে দীর্ঘ ভ্রমণের সুযোগ পাবার জন্য অভিনন্দন জানায়। কুণ্টাও সুশিক্ষার নিদর্শন স্বরূপ বিনীতভাবে তাঁদের ধন্যবাদ জানালো। বড়রা কাছাকাছি না থাকলে কুণ্টা মাথায় একটা বিরাট বোঁচকা নিয়ে হাঁটার অভ্যাস করছিলো আর বন্ধুদের দেখাচ্ছিলো। তিন পা এগোবার আগেই তিনবার সেটা মাটিতে পড়ছিলো।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরার পথে কুণ্টা প্রবল ইচ্ছার টানে নিয়ো বটোর কুটিরে উপস্থিত হলো।

'আমি জানতাম—তুমি আসবে।'

দু'জনে খানিকক্ষণ নীরব। বয়সের বৈষম্য সত্ত্বেও মনের দিক থেকে তারা চিরদিন পরস্পরের অতি নিকটে। অবশেষে নিয়ো বটো উঠে গিয়ে কুণ্টার বাহুতে ধারণ করবার একটি তাবিজ এনে দিলো। 'এটি তোমার পিতামহের জিনিস। ইয়াইসা তোমার জন্যই এটি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলো।'

যাত্রার দিন প্রভাতে প্রার্থনার পর মসজিদ থেকে ফিরে অমোরো অপেক্ষা করে করে অধীর হয়ে উঠছিলো। কুণ্টার মাথার বোঁচকা গুছিয়ে দেওয়া বিণ্টার আর শেষ হয় না। কুণ্টা সারারাত উত্তেজনায় ঘুমোতে পারেনি। ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে মায়ের কান্না শুনছিলো। সহসা বিণ্টা তাকে সজোরে বুকে চেপে ধরেছে— মায়ের দেহের কম্পন তাকেও কাঁপিয়ে তুলছিলো। মায়ের হৃদয়ের গভীর ভালো-বাসা এমন করে সে আগে কখনো উপলব্ধি করেনি।

প্রথমে অমোরো, পরে কুণ্টা কুটিরের দরজার বাইরে দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এলো। প্রথম পদক্ষেপের ধূলো তুলে নিয়ে নিজেদের শিকারের থলিতে পুরলো। এর ফলে তাদের পদচিহ্ন আবার সেখানে ফিরে আসবে।

বিণ্টা ল্যামিনকে তার স্ফীত উদরে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে অমোরো ও কুণ্টার যাত্রাপথে তাকিয়ে রইলো। একান্ত আগ্রহ সত্বেও কুণ্টা আর ফিরে তাকালো না। তার বাবার মতো মাথা উঁচু করে চলতে থাকলো। সে জানতো— পুরুষ মানুষের কখনো মনের চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে নেই।

কুণ্টার সাথীরা যাবার সময় তাকে দেখবে বলে দেরী করে ছাগল চরাতে যাচ্ছিলো। কথা বলা বারণ। কুণ্টা তাদের দিকে তাকিয়ে শুধু নীরবে হাত নাড়লো। পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট গাছের নীচে অমোরো প্রার্থনার প্রতীক হিসাবে দু'টি কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে দিলো।

সত্যি তাহলে সে যাচ্ছে। কুণ্টার যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিলো না। সহসা চটকা ভেঙে দেখে —অমোরো অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। কুণ্টাকে বহু কষ্টে মাথার বোঝা সামলে দৌড়োতে হলো।

পনেরো

নিয়ম হলো কুণ্টাকে অমোরোর দু'পা পেছনে চলতে হবে। কিন্তু তার বাবার লম্বা পায়ের এক পা পথ কুণ্টার ছোট দু'পা পথের সমান। ঘণ্টা খানেক বাদে, তার মনের উত্তেজনা, চলার গতি দুই-ই কমে এলো। মাথার বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হচ্ছিলো।

পথে কোথায়ও বুনো শুয়োর দৌড়ে পালাচ্ছিলো, কোথায়ও উড়ন্ত তিতির, কোথায়ও ছুটন্ত খরগোশ। কিন্তু কুণ্টার কোন দিকে তাকাবার অবসর নেই। তাকে

অমোরোর সাথে চলার গতি ঠিক রাখতে হবে। তার হাঁটুর নীচে পেশীতে ব্যথা করছিলো। মুখ ও মাথা অবিরল ঘামছিলো। মাথার বোঁচকা স্বস্থানে রাখা ক্রমেই কঠিন হচ্ছিলো। অদূরে পথের ধারে অচেনা গ্রামের যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট গাছ-তলাটি দেখা গেলো। সর্বত্রই এই বিশেষ গাছতলায় পথ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। একদিক গ্রামের অভ্যন্তরে চলে যায়। অপর দিক বাহিরে।

গ্রামটির নাম জানতে কুণ্টার খুবই কৌতূহল হচ্ছিলো। কিন্তু অমোরো এ পর্যন্ত একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি বা কথা বলেনি। প্রথম কাফোর উলঙ্গ শিশুর দল কুণ্টাকে দেখে দৌড়ে এলো। এমন অল্পবয়স্ক পথিক তারা দেখেনি।

'কোথায় যাচ্ছো?'

'কোথায় থাক?'

'উনি কি তোমার বাবা?'

কুণ্টার নিজেকে বিশেষ সম্মানিত ও পরিণত বয়স্ক মনে হচ্ছিলো। উত্তরে সে শুধু তার বাবার মতো নীরবে মাথা নাড়ে।

বাওবাব গাছটির নীচে এক চারণ সমবেত গ্রামবাসীর কাছে মানডিনকা জাতির গৌরব গাথা গাইছিলো। তার গন্তব্যস্থানও সেই নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠার উৎসব স্থল।

সে গ্রামে কিন্তু কুণ্টারা থামলো না। কুণ্টার দেহ আর বইছিলো না। পা ভয়ানক ব্যথা করছিলো। মাথার বোঝা অতি গুরুভার হয়ে উঠেছিলো। ঘামে দৃষ্টি আচ্ছন্ন। সূর্য তখন মাত্র মধ্য আকাশে। নিজের অক্ষমতার আশঙ্কায় কুণ্টা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এমন সময় অমোরো পথের বাঁকে একটি পরিচ্ছন্ন জলকুণ্ডের সামনে তার মাথার বোঝা নামালো। কুণ্টা বহু কষ্টে অবাধ্য পা দু'টি বশে এনে মাথায় বোঝায় হাত দিতেই সেটি অবশ বাহু ছাড়িয়ে ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেলো। ভয়ে ভয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলো অমোরো নতজানু হয়ে জল পান করছে। ছেলের কথা যেন মনেই নেই।

কুণ্টা কতটা তৃষ্ণার্ত হয়েছিলো—এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। নীচু হয়ে জল খেতে গিয়ে পা দু'টি আয়ত্তে আনতে পারলো না। অবশেষে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জলে মুখ লাগালো।

জুফরে ছাড়ার পর এই প্রথম অমোরো মুখ খুললো।

'খুব অল্প। সামান্য একটু খাও। খানিকটা বিশ্রাম করে আবার খেয়ো।'

কুণ্টার ভারী রাগ হয়ে গেলো। ঠাণ্ডা জল আকণ্ঠ পান করতে না পেরে অসহ্য লাগছিলো। পুরুষত্ব শিক্ষা কেন্দ্রে নিশ্চয়ই এমনই সব যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা। এর

চেয়ে বেশী কষ্টকর আর কী হতে পারে? আর একটু জল খেয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না।

চমকে জেগে ওঠে অমোরোকে ধারে কাছে না দেখতে পেয়ে কুণ্টা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু না, অমোরোর বিরাট বোঁচকা পাশেই পড়ে আছে। সারা গায়ে ব্যথা। তবুও অনেকটা সুস্থ লাগছিলো। আরো একটু জল পান করবার জন্য মাথা নীচু করতেই স্থির জলে তার মুখের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠলো। কালো, সরু একটি মুখ। বড় বড় চোখ। চওড়া মুখের হাঁ। দেখে দেখে তার হাসি পাচ্ছিলো। দন্ত-পাটি বিকশিত করে প্রতিচ্ছবির দিকে মুখ ভেঙচালো। তারপর হেসে মুখ তুলতেই বাবাকে দেখে অপ্রস্তুত।

গাছের ছায়ায় তারা খাওয়া সেরে নিলো। মাথার ওপর বাঁদরের কিচিমিচি, টিয়াপাখীর ডাকাডাকি। কুণ্টা যখন ঘুমোচ্ছিলো, তার বাবা তীর ধনুকে চারটি সুপুষ্ট বন্য পায়রা মেরে আগুনে ঝলসে নিয়েছে। তারি সাথে তাদের বোঁচকা থেকে নেওয়া রুটি। ততক্ষণে দিনের তাপ কমে এসেছে। সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটাই ঢলে পড়েছে। চলতে চলতে অমোরো বললো—

'এখান থেকে একদিনের পথ দূরে নদীর ধারে সাদা মানুষদের ক্যানো বাঁধা থাকে। দিনের বেলা অবশ্য অনেকটা পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। তবু আমরা লম্বা ঘাস ও ঝোপের ধারে যাবো না। আজ রাত্রে কোন গ্রামের ভেতরে ঘুমোতে হবে।'

কুণ্টার দেহে ভয়ের শিহরন খেলে গেলো। আরো খানিক দূরে হাতীর দেখা মিললো। থ্যাতলানো, মাড়ানো ঝোপ, ছালতোলা গাছের চারা, উপড়ানো গাছ—সবই তাদের কীর্তি। সাধারণতঃ বন্য হাতী জনবসতির কাছাকাছি আসে না। এত নিকট থেকে হাতী দেখবার সুযোগ কুণ্টার আগে কখনো হয়নি। ভাইকে বলবার মতো অনেক নূতন অভিজ্ঞতা তার হচ্ছিলো।

কুণ্টা ও অমোরো যে অঞ্চলে পৌঁচেছে, তা তাদের পরিচিত গ্রাম থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের। ঘাসগুলো ঘন ও মোটা। পরিচিত গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ক্যাকটাস ও তাল জাতীয় গাছ। তাদের গ্রামের টিয়া এবং অন্যান্য সুন্দর পাখীর পরিবর্তে শিকারের সন্ধানে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিল, মৃত প্রাণীর অন্বেষণে তীক্ষ্ণ চঞ্চু ভয়াল দর্শন শকুনি।

সূর্য নামে মস্ত বড় গোলাকার কমলাবর্ণ বস্তুটি পৃথিবীর কাছাকাছি চলে এসেছে। এমন সময় অদূরে একটি গ্রামের মাথার ওপর ধোঁওয়ার কুণ্ডলী দেখা গেলো। পথিকদের জন্য চিহ্নিত গাছটির নিকটে এসে কুণ্টার মতো কিশোর বালকও

একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আভাস পেলো। গাছ থেকে অতি সামান্য ক'টি কাপড়ের ফালি ঝুলছিলো। অর্থাৎ এ গ্রামের সাথে বাহির বিশ্বের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। তাদের দেখা পেয়ে কোন শিশুই ছুটে বেরিয়ে এলো না। বাওবাব গাছটি অংশত দগ্ধ। মাটির কুটিরগুলো শূন্য। উঠোনময় জঞ্জাল। পাখী-গুলো ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। খরগোশগুলো নির্ভয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজ নিজ কুটিরের দরজার গোড়ায় মুষ্টিমেয় যে ক'জন শুয়ে বসে আছে—সকলেই রুগ্ন বা বৃদ্ধ। অল্প কয়েকটি একান্ত শিশু কাঁদছে। অমোরো বা কুণ্টার বয়সী একটি মানুষও চোখে পড়লো না।

কয়েকজন লোলচর্ম বৃদ্ধ অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালো। তাদের মুখেই শোনা গেলো—দাস ব্যবসায়ী দস্যুরা একরাত্রে অল্পবয়স্ক সব গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে বা হত্যা করেছে। নিতান্ত বৃদ্ধরাই পড়ে রয়েছে। গ্রামে খাদ্য নেই, শস্য নেই। পরিশ্রম করবার লোকের অভাবে অনাহারে এদেরও মৃত্যু হবে। অমোরো গভীর মনোযোগে তাদের কথা শুনে ধীর স্বরে বললো—

'আমার ভাইদের গ্রাম এখান থেকে চারদিনের পথ। পিতামহগণ আপনারা সেখানে চলুন।' বৃদ্ধেরা কিন্তু গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজী হলো না।

'এ আমাদের নিজেদের গ্রাম। এমন মিষ্টি পানীয় জল আর কোথায় পাবো? কোথায় এমন সুস্নিগ্ধ নিবিড় ছায়াঘন বৃক্ষ? আমাদের নিজেদের ঘরে রান্না অন্নের স্বাদ আর কোথাও পাবো না।'

তাদের প্রতি কোন আতিথেয়তা করা গেলো না বলে বৃদ্ধরা দুঃখ প্রকাশ করলো। অমোরো জানালো—নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশের নীচে শুয়েই তাদের বেশী ভালো লাগছে। সে রাত্রে অমোরো ও কুণ্টা তাদের বোঁচকার রুটি বৃদ্ধদের সাথে ভাগ করে খেলো।

রাত্রে শুয়ে কুণ্টা ভাবছিলো—এ সর্বনাশ যদি জুফরে গ্রামে হতো তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াতো? তার পরিচিত সবাই—এমন কি অমোরো, বিণ্টা, ল্যামিন, সে নিজে—সবাইকে যদি ধরে নিয়ে যেতো বা মেরে ফেলতো! যদি বাওবাব গাছটি দগ্ধ, তার চারপাশের প্রাঙ্গণটি অমার্জিত, আবর্জনাপূর্ণ থাকতো!

অন্ধকারে বন্য পশুর তীক্ষ্ণ চীৎকার তাকে সেই মনুষ্য অপহরণকারী শয়তানদের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। কিন্তু দূরে অতি পরিচিত হায়নার গর্জন তাকে আশ্বস্তও করে। জীবনের প্রতিটি রাত্রে সে হায়নার গর্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়েছে।

তার আপন গৃহের নিরাপত্তা বোধের সাথে জড়িত এই আওয়াজে সে নিশ্চিন্ত বোধ করে। ক্রমে সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলো।

ঊষার প্রথম আলোকপাতে কুণ্টার ঘুম ভেঙে গেলো। প্রাতরাশের পর আবার পথ চলা শুরু। পথে এক সিংহ পরিবারের সাথে দেখা। বিরাট পুরুষ সিংহ, চমৎকার দেখতে একটি সিংহী এবং দু'টি শাবক। কুণ্টা ইতিপূর্বে সিংহ দেখেনি! শুধু সিংহের গল্প শুনেছে, ছাগল চরাতে গিয়ে বড় ছেলেদের কাছ থেকে সিংহের এক থাবায় একটি ছাগল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার রোমাঞ্চকর কাহিনী। ত্রাসে তার বুক কেঁপে ওঠে। অমোরো যেন ছেলের মনের কথা বুঝেই পেছন না ফিরে শান্ত স্বরে বললো—'কোনও ভয় নেই। ক্ষুধার্ত না হলে সিংহ কখনো আক্রমণ করে না।'

অবশ্য যতক্ষণ সিংহদের দেখা যাচ্ছিলো অমোরো তীর ধনুকে হাত রেখে সতর্ক ছিলো। রুদ্ধনিঃশ্বাস কুণ্টাও তাদের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলো না। চলতে চলতে সে ওদের কথাই ভাবছিলো। কিন্তু ক্রমেই এত পা ব্যথা করতে লাগলো যে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেলো। রাতে বিশ্রাম করবার জন্য যে জায়গাটি নির্বাচন করা হলো, বিশটা সিংহ তেড়ে এলেও কুণ্টার সেখান থেকে এক পা এগোবার সাধ্য ছিলো না। নরম ডালপালায় তৈরী শয্যায় মুহূর্তে সে গাঢ় নিদ্রায় তলিয়ে গেলো। চোখের পলকে যেন রাত্রি প্রভাত হলো। অমোরো অতি দ্রুত হাতে দু'টি খরগোশের ছাল ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ঝলসিয়ে নিচ্ছিলো। কুণ্টার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। বড়রা এত কাজ শেখে কখন? সংসারে কোন সমস্যার সমাধানই যেন তাদের কাছে কঠিন নয়!

ভ্রমণের তৃতীয় দিনে কুণ্টার দুর্দশার অন্ত ছিলো না। ফোসকা পড়া পা, পিঠ, ঘাড়—সারা দেহ এক সাথে ব্যথা করছিলো। সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগলো—তার পুরুষত্বের শিক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যথার কথা সে প্রাণান্তে প্রকাশ করবে না। মধ্যাহ্নে যখন একটা ধারালো কাঁটায় খচ করে পা কেটে গেলো, সে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কান্না দমন করলো। কিন্তু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছিলো। দুপুরে খাবার পর অমোরো তাকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে দিলো। ফলে সে খানিকটা সুস্থ বোধ করলো। এর পরে হাঁটবার সময় অমোরোর হাঁটার গতিবেগ সামান্য শ্লথ হয়েছিলো। রাত্রে মলম লাগিয়ে দিতে পরদিন কুণ্টার যন্ত্রণা অনেকটাই কমে গেলো।

কুণ্টা লক্ষ্য করলো কাঁটা ঝোপ ও ক্যাকটাসের রাজ্য শেষ হয়েছে। যে অঞ্চলে তারা প্রবেশ করেছে—তার বনজ সম্পদ অনেকটা জুফরে গ্রামের মতো। বড় বড়

গাছ, কুসুমিত তরু, যূথবদ্ধ বাঁদরের কিচিমিচি, লাফালাফি আর বিচিত্র বর্ণ পাখীর ঝাঁক। এতক্ষণে তার ত্রস্ত, বিভ্রান্ত হৃদয় অনেকটা ভরসা পেলো। সুরভিত হাওয়া তাকে গ্রামের নদীতটে ছোট ভাইয়ের সাথে বেড়াবার কথা মনে করিয়ে দিলো।

অমোরো প্রতি গ্রামে পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট, বৃক্ষতলটি পরিহার করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তা সত্ত্বেও প্রথম কাফোর শিশুরা সর্বত্রই দৌড়ে এসে গ্রামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তাদের বলে যেতো।

একটি গ্রামে কাউকে দেখা গেলো না। চারিদিক নিস্তব্ধ। পরবর্তী গ্রামের শিশুদের কাছে তার কারণ শোনা গেলো। সেখানকার হতভাগ্য গ্রামপ্রধান সকলের অপ্রিয়। তার প্রতিটি কাজ গ্রামবাসীদের অপছন্দ। অবশেষে একদিন রাতের গভীরে সকলেই তাদের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছে। এখন পরিত্যক্ত গ্রামপ্রধান গ্রামবাসীদের ফিরে আসবার জন্য সাধ্য সাধনা করছে।

রাত্রি আসন্ন। অমোরো সে গ্রামেই রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কুণ্টা গরম ভাত ও বাদামের ঝোল দিয়ে দিব্যি এক পেট খেয়ে নিলো। অমোরো গ্রামের ভেতরে গিয়ে জালিবার ঢাকের মাধ্যমে ভাইদের কাছে একটি বার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। পরদিন সূর্যাস্তের আগে সে পৌঁছে যাবে, সাথে থাকবে তার প্রথম পুত্র।

ঢাকের আওয়াজে নিজের নাম শুনবার দিবাস্বপ্ন কুণ্টার কত কালের। আজ সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হলো। কল্পনায় শব্দটি তার কানে কেবলই ধ্বনিত হতে থাকলো। জানে ও সালুমের প্রতিষ্ঠিত গ্রামে যাবার পথে আরো অনেক জালিবার ঢাকেই নিশ্চয় সেই নামটি বেজে উঠেছে। অতিথিশালার বাঁশের খাটিয়ায় শুয়ে পরিশ্রান্ত কুণ্টা সে কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো।

এ বার্তা প্রচারিত হবার পর থেকে প্রতিটি গ্রামেই যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বৃক্ষ-তলে শিশুদের সাথে বড়রাও তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে অমোরো প্রতি অতিথিশালায় কিছুক্ষণ বসে গ্রামবাসীদের সাথে পানাহার করেছে। অমোরোর চারিপাশে বড়রা, কুণ্টার চারিপাশে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাফোর ছেলেরা জড়ো হয়েছে। বাবার মতো কুণ্টাও পরম গাম্ভীর্যে ছেলেদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। তার মনে আশা—সে সারা-জীবন গাম্বিয়া উপকূলে পরিভ্রমণ করে কাটিয়েছে, এমন ধারণা নিশ্চয়ই তার বালক শ্রোতাদের মনে জন্মাবে।

ষোলো

শেষ গ্রামটিতে বড় বিলম্ব হয়ে গেলো। সূর্যাস্তের আগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে হলে আরো দ্রুত চলতে হবে। কুণ্টার ক্লিষ্ট, ঘর্মাক্ত দেহে নূতন শক্তির জোয়ার আসে। ঢাকের শব্দ ক্রমেই জোরদার হচ্ছিলো। কারানটাবা, কুটাকুণ্ডা, পিসানিয়া, জনকাকুণ্ডা কত অপরিচিত গ্রামের নামে বাতাস মুখরিত। ঐ সব গ্রামের প্রতিনিধি স্বরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে পৌঁছোনো মাত্র তাঁদের নাম ঢাকে বেজে উঠছিলো। উলি রাজ্যের একজন চারণ এসেছে। বারা রাজ্যের রাজা তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন। কাকাদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় কুণ্টা বিস্মিত হলো। ধূলিধূসরিত পথের এই শেষভাগটুকু বাবার সঙ্গ ধরতে কুণ্টাকে প্রাও দৌড়োতে হ্‌চ্ছিলো।

অবশেষে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য যখন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে, দূরে একটি গ্রামের মাথায় ধোঁওয়া দেখা গেলো। ধোঁওয়ার কুণ্ডলীর বিশেষ ধরনের আকৃতি দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মানার্থে মশা তাড়াবার উদ্দেশ্যে বাওবাব গাছের ছাল জ্বালানো হয়েছে। আরো কিছুদূর যেতে গ্রামের বৃহৎ আনুষ্ঠানিক ঢাকের শব্দ ভেসে এলো। কোন নূতন অতিথি গ্রামে প্রবেশ করলেই একবার করে সেটা বেজে উঠছিলো। সঙ্গে ছোট ছোট ট্যাং ট্যাং ঢাকের শব্দ, নর্তকদের তীক্ষ্ণ উল্লাস ধ্বনি। পথটি আর একবার বাঁক ঘুরতেই গ্রাম দেখা গেলো। সামনে কেউ একজন একটি বালককে সাথে নিয়ে যেন কারো প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিলো। তাদের দেখেই সে হাত নাড়লো। প্রত্যুত্তরে অমোরো হাত নাড়তেই সে বসে পড়ে তার ঢাকে আওয়াজ তুলে বার্তা ঘোষণা করলো—'অমোরো কিণ্টে এবং তার প্রথম পুত্র !'

কুণ্টার পা যেন আর মাটিতে স্পর্শ করছিলো না। প্রায় উড়ে চলছিলো। শীঘ্রই পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট বৃক্ষটি দেখা গেলো। অজস্র কাপড়ের ফালি ঝুলছে। গ্রামের প্রবেশ পথটি পায়ে পায়ে অতি বিস্তৃত। ট্যাং ট্যাঙের আওয়াজ ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছিলো। বল্কল ও পত্রপরিহিত নর্তকের দল বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য চীৎকার করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো। গ্রামের সুবৃহৎ ঢাকটি অতি গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। দু'টি মানুষ ভীড় ঠেলে ছুটছিলো। অমোরোর মাথার বোঝা খসে পড়ে। সেও ছুটতে শুরু করলো। অজানতে কখন কুণ্টাও মাথার বোঝা ফেলে দৌড়োতে শুরু করে।

লোক দুটি ও অমোরো গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হলো। সহসা তারা কুণ্টাকে শূন্যে তুলে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো—

'এই আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ?'

চারিদিকে জনারণ্য। আনন্দ কোলাহল। কুণ্টা সাগ্রহে তার কাকাদের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়েছিলো। হ্যাঁ, অমোরোর মতোই দেখতে বটে। তবে তার থেকে আর একটু বেঁটে আর মজবুত গড়নের। জানের চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। মনে হয় বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। দুজনেরই চলাফেরা ক্ষিপ্র ও সতর্ক। কথা বলার ধরনও অতি দ্রুত। জুফরে এবং বিণ্টা সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসার অন্ত ছিলো না।

গ্রামের চারিপাশে বাঁশের উঁচু বেড়া। পাশে পাশে শুকনো কাঁটা ঝোপ স্তূপীকৃত করা। অবাঞ্ছিত মানুষ বা পশুকে প্রতিহত করবার জন্য তার ভেতরে তীক্ষ্ণ শলাকা লুকানো আছে। প্রতিটি কুটিরের নিজস্ব প্রাঙ্গণে শুকনো খাদ্য বা শস্য সংরক্ষণের ভাণ্ডারটি উনুনের সোজা উপরে। ফলে তাতে কখনো পোকার উপদ্রব হবে না। মাথার উপর টিয়া পাখী ও বাঁদরের কিচিমিচি লেগেই আছে। পায়ে পায়ে পাহারাদার কুকুর। ভারী সুন্দর, সুসজ্জিত, সুপরিকল্পিত গ্রাম। চারিদিকে এতরকম উত্তেজনার বস্তু, এত রঙ, এত শব্দ, এত গন্ধ—কুণ্টার মাথা ঘুরছিলো। সে কোনদিকে তাকাবে ? মানডিনকা জাতির স্থানীয় উপভাষা যে কতরকম তার ঠিক নেই। আরাফাঙের মতো বিদ্বান ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে বিভিন্ন উপজাতির হরেক রকমের ভাষা বুঝবার উপায় নেই। অথচ কুণ্টা নিজেদের গ্রামে পথিকদের বৃক্ষতলে নানা অঞ্চলের লোকের সাথেই অনেকটা সময় কাটিয়েছে। বিভিন্ন উপজাতির দৈহিক গঠনেও পার্থক্য আছে। ফুলাদের ডিম্বাকৃতি মুখ, পাতলা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ গড়ন, লম্বা চুল। ওলফরা অতিশয় কালো, অত্যন্ত স্বল্পভাষী। সেরাহুলি উপজাতির গাত্রবর্ণ আর একটু হালকা। ছোটখাটো চেহারা। জোলাদের চেনা সহজ। সারা গা চিত্রবিচিত্র করা। মুখের ভাব অতি ভয়ঙ্কর।

আরো বহু উপজাতির লোক সেখানে উপস্থিত ছিলো। কুণ্টা সকলের নামও জানে না। শুকনো পশুচর্ম, মেয়েদের কেশসজ্জা, কোলা বাদাম ইত্যাদি নানা পণ্য-দ্রব্যের বেচাকেনা চলছিলো। সেই অবিরাম জনস্রোতের মাঝে যারা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তি, কেবল তাদের সাথেই অমোরোর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো। কুণ্টার কাকারা কত ভাষাই যে জানে !

এতক্ষণে কুণ্টা একটু খাবার মুখে দিতে পারলো। বাওবাব গাছের নীচে

টেবিলে অজস্র খাদ্যসম্ভার। হরিণ বা গরুর মাংসের রোষ্ট, বাদামের ঝোল ইত্যাদি। খেতে ভালোই। কিন্তু জুফরে গ্রামের গৃহিণীদের হাতের রান্নার মতো সুস্বাদু নয়।

অবশেষে কুণ্টা তার সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপস্থিত হলো। নতুন গ্রামটি কী করে গড়ে উঠলো—তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। জানে ও সালুম যত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, সর্বত্রই কিছু কিছু লোক তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। কোন পরিবারে সকলের পক্ষে যথেষ্ট জায়গা নেই। কারো গ্রামের ভূমি তেমন উর্বর নয়। কুণ্টার কাকারা সে সব দেখে শুনে একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়েছিলো। যারা ইচ্ছুক তারা সকলেই তাদের ছাগল, মুরগী, অন্যান্য পোষা জানোয়ার, উপাসনার আসন, অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে সপরিবারে নূতন বাসস্থানের সন্ধানে চলে এসেছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে আগুন জ্বালানো হলো। আজ পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা অগ্নিকুণ্ড নয়! কয়েকটি কুণ্ড ঘিরে সকলেই জড়ো হয়েছে। ইমাম প্রথমে সকলকে আশীর্বাদ জানাবেন। জানে ও সালুম ঘুরে ঘুরে তাদের ভ্রমণ কাহিনী বলবে। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সকলকে শোনাবেন। তাঁর বয়স নাকি একশো বর্ষা পার হয়ে গিয়েছে।

'সোনার লোভে সাদা মানুষেরা সর্বপ্রথম আফ্রিকাতে আসে। উত্তর গিনিতে ও ঘানাতে সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো।' লবণও সোনার মতোই দামী। জানে ও সালুম সোনা ও লবণ সমমূল্যে বিনিময় হতে দেখেছে। তাঘাজা শহরে লবণখণ্ডের তৈরী বাড়ী এবং মসজিদও তারা দেখেছে।

এক বৃদ্ধা বলে উঠলো—

'সেই অদ্ভুত কুঁজওয়ালা জানোয়ারের কথা বল।'

'সে সব জানোয়ারকে উট বলে। অনন্ত মরুসমুদ্রে এরাই একমাত্র বাহন। সূর্য, তারা এবং হাওয়ার গতি থেকে এরা দিক নির্ণয় করে। মাসের পর মাস বিনা জলে চলতে পারে।

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে সাদা মানুষেরা জাহাজে করে চীনামাটি, কাপড়, ঘোড়া আরো কত জিনিস নিয়ে আসে। উট ও গাধার পিঠে করে সেগুলো দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছে। তার বদলে, আফ্রিকায় উৎপন্ন খেজুর, জলপাই, কোলা বাদাম, তুলো, তামা, মূল্যবান পাথর, পশুচর্ম, হাতীর দাত ইত্যাদি সাদা মানুষের জাহাজে চলে যায়।'

এমন সময় ঢাকের মাধ্যমে খবর ভেসে এলো—'এক ফকিরের দল আসছে।'

সকলে সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে গেলো। গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সবার সামনে জানে ও সালুম। তারপর গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠর দল, ইমাম, আরাফাঙ। পরে গ্রামের অন্যান্য মাননীয় প্রতিনিধিগণ। তাদের মাঝে অমোরোও। কুণ্টার বয়সী ছেলেদের দলে কুণ্টা। বাদক দলকে সামনে নিয়ে তারা এমনি সময় বাওবাব গাছের তলায় উপস্থিত হলো যখন অতিথিরা সদ্য এসে পৌঁছেছে। শ্বেত শ্মশ্রু, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ এক বৃদ্ধ সর্বসম্মুখে। পেছনে অগণিত পুরুষ, নারী ও শিশুর দল। প্রত্যেকের মাথায় বড় বড় বোঁচকা। অন্ততঃ একশটি ছাগলের একটি পাল তারা তাড়িয়ে এনেছে।

ফকির দ্রুত ভঙ্গীতে সমবেত জনতাকে আশীর্বাদ জানালেন। কুণ্টার কাকারা নিজেদের পরিচয় দিতে, ফকির তাদের উদ্দেশে আরবী ভাষায় কিছু উচ্চারণ করলেন। তার মাঝে শুধু ঠাকুরদার নামটিই কুণ্টা বুঝতে পারলো। মাথায় পবিত্র হস্তের লঘু স্পর্শ অনুভব করতে কুণ্টার তৎক্ষণাৎ মনে হলো—তার ঠাকুরদাও তো এমনই একজন ফকির ছিলেন। জুফরে গ্রামকে অনশনের হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো। একথা সে পিতামহী ইয়াইসা ও নিয়ো বটোর কাছে শুনেছে। কিন্তু ফকিরের মাহাত্ম্য অথবা ইসলামের মহিমা সে আগে কখনো এমন ভাবে উপলব্ধি করেনি। দু'কড়ি খরচ করে সে ফকিরের স্বহস্ত চিহ্নিত একটি ছোট্ট স্মারক খণ্ড সংগ্রহ করলো। এই পবিত্র বস্তুটি সে বাড়ী নিয়ে যাবে। কেবলমাত্র নিয়ো বটো এর কথা জানবে। নিজের প্রথম পুত্রকে তাবিজ করে দেবার জন্য কুণ্টা তার কাছে এ জিনিস রেখে দেবে।

সতেরো

কুণ্টার প্রতি ঈর্ষায় তার সাথীরা জ্বলছিলো। স্থির করেছিলো সে ফিরে এলে তার সাথে কথাই বলবে না। আশৈশব বন্ধুদের বিরূপ ব্যবহারে কুণ্টা অত্যন্ত দুঃখ পেলো। অমোরো ও তার অনুপস্থিতিকালে কুণ্টার একটি ছোট্ট ভাই হয়েছে। তার নাম সুওয়াডু। মনের দুঃখে কুণ্টা তার নবজাত ভাইয়ের কথাও ভাবতে পারছিলো না।

নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে একদিন মাঠে ছাগল চড়াতে গিয়ে সে আপন মনেই কথা বলতে শুরু করলো। যেন সে তার সাথীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে। প্রথম দিকে তার হাঁটতে কত কষ্ট হচ্ছিলো সে কথা, পায়ের ব্যথা,

সিংহ দেখার কাহিনী, বিভিন্ন গ্রামের বর্ণনা ইত্যাদি বলে চললো। কখন তার চারি পাশে বন্ধুরা নিঃশব্দে জড়ো হয়েছে কেউই জানে না। অকস্মাৎ কুকুরের হিংস্র চিৎকার ও ভয়ার্ত ছাগলের ব্যাকুল ক্রন্দনে চারণভূমির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো। ছেলেরা তাকিয়ে দেখে লম্বা ঘাসের ওপর একটা বিরাট চিতা বাঘের মাথা। তার মুখের ভয়ঙ্কর হাঁ থেকে একটা ছাগল ঝুলছে। বাঘটা সে অবস্থাতেই দুটো পাহারাদার কুকুরের ওপর ঝাঁপ দিতে উদ্যত। ছেলেরা ভয়ে উত্তেজনায় রুদ্ধবাক। থাবার এক আঘাতে একটা কুকুরকে ছুঁড়ে ফেলে বাঘটা গর্জন করে উঠতেই অন্য কুকুরগুলো প্রচণ্ড চীৎকার শুরু করলো। ছাগলগুলো দিশাহারা হয়ে দিকবিদিকে ছুটতে লাগলো।

নিহত ছাগলটা অমোরোর। বাঘের মুখ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। কুণ্টা অন্ধ আবেগে সেটার দিকে ছুটলো। সিটাফা 'কুণ্টা, না, না। যেয়ো না!' বলে চেঁচিয়ে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। দু'টি ছেলের চ্যাচামেচিতে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বাঘটা পেছন ফিরে পালালো। ছাগলটা মাদী। তার ঘাড় মটকানো। গাঢ় ধারায় রক্ত ঝরছিলো। জিভ বেরিয়ে পড়েছে। চোখ উল্টানো। সবচেয়ে বীভৎস ব্যাপার হলো—পেট চিরে বেরিয়ে পড়া গর্ভস্থ শিশুটি তখনো প্রাণবন্ত।

আহত কুকুরটা যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কুণ্টার দিকে এগোবার চেষ্টা করছিলো। বাঘের গায়ের দুর্গন্ধ, রক্তের গন্ধ ও সামনের দৃশ্য কুণ্টা আর সহ্য করতে পারছিলো না। সেখানেই বমি করে ফেলে বিবর্ণ মুখে সিটাফার দিকে তাকালো। তার দু চোখ জলে ভরা।

চোখের জলের ভেতর দিয়েই কুণ্টা বুঝতে পারছিলো—চারিপাশে জড়ো হয়ে থাকা ছেলেরা ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে। শুধু সিটাফা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। একটা অনুচ্চারিত প্রশ্ন বাতাসে ভাসছিলো—কুণ্টা তার বাবাকে কী জবাব দেবে?

কুণ্টা রুদ্ধকণ্ঠে বললো—

'আমার ছাগলগুলো খোঁয়াড়ে তুলে দাও। আমি চামড়াটা বাবার কাছে নিয়ে যাবো।'

দলের দুটি ছেলে আহত কুকুরটিকে কোলে তুলে নিলো। কুণ্টা নতজানু হয়ে মৃত ছাগলটির চামড়া ছাড়িয়ে নিতে লাগলো। তার বাবাকে যেমন করতে দেখেছে, তেমনি করে খানিকটা করে কেটে ছাড়িয়ে নিচ্ছিলো। অবশেষে রক্তে ভেজা চামড়াটি তুলে নিয়ে মৃতদেহটি ঘাসে চাপা দিয়ে দিলো।

আগে একবার ছাগল চড়াতে গিয়ে সে অসাবধান হয়েছিলো। প্রতিজ্ঞা করে-

ছিলো—আর ভুল হবে না। কিন্তু আবারও ভুল হলো। এবার তার মাশুল একটি বাচ্চাসুদ্ধ ছাগল। না, না। নিশ্চয়ই এ একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু না! এই তো তার হাতে ভেজা চামড়া। সে নিজের মৃত্যু কামনা করছিলো। কিন্তু আত্মহত্যাও তো পাপ। আল্লাহ নিশ্চয়ই তার অহঙ্কারের শাস্তি দিয়েছেন। নতজানু হয়ে সে আল্লাহের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলো।

বাড়ীর দিকে এগোতে এগোতে কুণ্টার সকল শক্তি অন্তর্হিত হচ্ছিল। অপরাধ-বোধ ও আতঙ্ক তাকে অবশ করে ফেলছিলো। এই তাহলে সমাপ্তি। এবার তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। বিণ্টা, ল্যামিন, নিয়ো বটো কাউকে সে আর দেখতে পাবে না। সহসা সামনের দিকে তাকিয়ে তার চলৎশক্তি রহিত হলো। অমোরো তার দিকেই ছুটে আসছে। কে তাকে খবরটা দিয়েছে?

'তোমার কিছু হয়নি তো?'

কুণ্টার কথা বলার ক্ষমতা ছিলো না। বহু কষ্টে উচ্চারণ করলো—'না বাবা!'

ততক্ষণে অধীর উৎকণ্ঠায় অমোরো কুণ্টার সারা দেহে হাত বুলোচ্ছে। রক্তে ভেজা ডুনডিকো তুলে পরীক্ষা করছে, সে রক্ত কুণ্টার দেহনিঃসৃত কিনা। অবশেষে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চামড়াটি ঘাসের ওপর ফেলে কুণ্টাকে বসতে আদেশ দিলো।

'একটা জিনিস তোমার জানা দরকার। ভুল সকলেরই হতে পারে। তোমার বয়সে আমারও একটা ছাগল সিংহের কবলে পড়েছিলো। কিন্তু কখনো হিংস্র জানোয়ারের দিকে দৌড়োবে না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুণ্টার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললো—

'বুঝতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'মনে থাকবে তো?'

অমোরো চামড়াটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো—

'কখনো ভুলে যেয়ো না।'

কুণ্টার মাথা ঘুরছিলো। বাবার প্রতি ভালোবাসায় তার হৃদয় টলমল করছিলো।

আঠারো

কুণ্টার দশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে প্রতিদিন সে আরা-

ফাঙের কাছে দু'বেলা যে পাঠ নিচ্ছিলো তা শেষ হয়ে এসেছে। শেষ দিনে ছাত্রদের অভিভাবকেরা সবাই এসেছেন। সকলেই উৎফুল্ল ও গর্বিত। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদও উপস্থিত। ইমাম প্রথমে তাঁর প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করবার পর আরাফাঙ একে একে ছাত্রদের নানা প্রশ্ন করতে থাকলেন।

'তোমার পূর্বপুরুষদের জীবিকা কী ছিলো?' 'একটা বেবুনের সাতটি স্ত্রী। প্রতিটি স্ত্রীর সাতটি সন্তান। প্রত্যেকটি শিশু সাতদিন ধরে রোজ সাতটি বাদাম খেলে বেবুনটি কটি বাদাম চুরি করেছিলো?'

মৌখিক প্রশ্নোত্তরের পর প্রত্যেককে আরবীতে নিজের নাম লিখতে হলো এবং উঠে দাঁড়িয়ে কোরাণের একটি আয়াৎ পড়তে হলো। এর পরে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের করমর্দন করে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন—এদের শিক্ষা সমাপ্ত। এখন থেকে এরা তৃতীয় কাফোর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সমবেত অভিভাবকগণ ও গ্রাম-পরিষদ হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। মায়েরা নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন। এবার তার সদ্ব্যবহার করে অনুষ্ঠান শেষ হলো।

পরদিন ছাগল চরাতে যাবার সময় অমোরো একজোড়া সুস্থ সবল ছাগল দেখিয়ে কুণ্টাকে বললো—'শিক্ষা সমাপ্তি উপলক্ষ্যে এ দুটো তোমাকে উপহার দিলাম।'

এমন নির্বিকার কণ্ঠস্বরে, যেন কুণ্টাকে দু'খানা ছাগল উপহার দেওয়া তার বাবার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ। কুণ্টা বহুকষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো। কিন্তু বাবা দৃষ্টির বাইরে যাওয়া মাত্র এমন তারস্বরে উল্লাসধ্বনি করে উঠলো যে ছাগল দুটো উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালালো। চারণভূমিতে পৌঁছে কুণ্টা দেখলো তার সব সাথীরাই তার মতো একজোড়া করে ছাগল উপহার পেয়েছে। প্রত্যেকেই বহুমূল্য সম্পত্তির মতো নিজ নিজ ছাগলের যত্ন নিচ্ছিলো। এ দুটোর বাচ্চা হবে। এমনি করে বাড়তে বাড়তে প্রত্যেক ছেলেরই তার বাবার মতো বৃহৎ ছাগলের পাল হবে।

আর এক পূর্ণ চন্দ্রের আগে আরাফাঙকেও অভিভাবকেরা একটি করে ছাগল উপহার দেবে। এটি হলো তাদের ছেলেদের পড়াবার পারিশ্রমিক। যারা অনেক বেশী সম্পন্ন, তারা গরুও উপহার দিয়ে থাকে। কিন্তু জুফরে স্বল্পবিত্তদের গ্রাম। ক্রীতদাসদের এক মাস বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করার চেয়ে অধিক কিছু দেবার সাধ্য থাকে না।

ক্রমে আর এক বর্ষা কেটে যায়। কুণ্টাদের কাফো এতদিনে ল্যামিনদের

কাফোর ছেলেদের ছাগল চরানো শিখিয়ে নূতন রাখাল দল তৈরী করেছে। নবান্ন উৎসবের পরেই তৃতীয় কাফোর ছেলেদের জুফরের বাইরে পুরুষত্ব শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। দশ থেকে পনেরোর মাঝে এদের বয়স। চার চন্দ্রকাল পরে এরা যুবক হয়ে ফিরবে।

ছেলেরা সর্বক্ষণই গভীর উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছিলো। আর বড়দের কাজে কর্মে কথাবার্তায় তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখছিলো।

গ্রীষ্মের প্রথমে বড়দের দু'চারজন জুফরে ছেড়ে কোথায় চলে গিয়ে কয়েকদিন পরে ফিরলো। পুরুষত্ব শিক্ষাকেন্দ্র জুজুয়ো নামে একটি জায়গায়। কুণ্টার সাথী কালিলু কণ্টে জানালো—সে তার কাকাকে বলতে শুনেছে - জুজুয়োতে ঘর মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রের ভার যার ওপর থাকে তাকে বলে কিণ্টাঙো। বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদের একজন এ উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হয়। কুণ্টার বাবা কাকা দাদারা নিজেদের কিণ্টাঙোর নাম সর্বদাই শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করে।

নবান্ন উৎসবের ঠিক আগে তৃতীয় কাফোর ছেলেরা উত্তেজিত কণ্ঠে নিজেদের মাঝে আলোচনা করছিলো। তাদের মায়েরা নাকি ফিতে দিয়ে ছেলেদের মাথা ও কাঁধের মাপ নিয়েছেন। পাঁচ বছর আগে তখনকার তৃতীয় কাফোর ভীতসন্ত্রস্ত বালকদের কতকগুলো দুর্ধর্ষ লোক জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। কুণ্টারা তখন দ্বিতীয় কাফোতে সদ্য উত্তীর্ণ—নূতন রাখালের দল। তারা আতঙ্কে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো। সে দৃশ্য তারা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি।

বড় ঢাকের গম্ভীর ধ্বনির সাথে ফসল তোলার কাজ শুরু হলো। কুণ্টা সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করবার সুযোগ পেয়ে বর্তে গিয়েছিলো। তার চিন্তা কববার অবকাশ থাকতো না। কিন্তু ফসল তোলার শেষে উৎসব শুরু হতেই কুণ্টার মনের সুখ অন্তর্হিত হলো। শেষ দু'দিন নদীর ধারে একা বসে সে অশান্ত মনে জলে পাথর ছুড়তে লাগলো।

উৎসবের সমাপ্তি দিবসে কুণ্টা তার মায়ের কাছে বাদামের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছিলো—সহসা অমোরো তার পেছনে উপস্থিত হলো। ভালো করে দেখতে পাবার আগেই একটা সাদা ঢাকনা তার মাথার ওপর দিয়ে নেমে এলো। ভয়ে কুণ্টার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলো। তার বাবা তাকে বাহু ধরে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং একটু পেছনে একটা নীচু টুলের ওপর বসালেন। কুণ্টা স্থির হয়ে বসে সেই ঘনিয়ে আসা ঈষৎ অন্ধকার সয়ে নেবার চেষ্টা করছিলো। একদিন এই ঢাকনা তার বাবার মাথার ওপরেও নেমে এসেছিলো। সেদিন কি অমোরো এমনি ভয়

পেয়েছিলো ? নিশ্চয়ই নয়। কুণ্টাও ভয় পেয়ে কিণ্টে পরিবারে অসম্মান ডেকে আনবে না।

কয়েক চন্দ্রকালের মাঝেই এই বালকেরা দক্ষ শিকারী, কুশলী যোদ্ধা, যোগ্য মানুষে পরিণত হবে। যে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, সে চিরকালের মতো সমাজে হেয় পরিগণিত হয়। তাদের বিবাহ করতে দেওয়া হয় না। মা, বাবা, ভাই বোনেরাও তাকে আপন বলে স্বীকার করে না। না, না। তেমন পরিণতি কুণ্টা কল্পনা করতেও ভয় পায়।

সারারাত সে ভাবেই কাটলো। কখন সে ঘুমে ঢুলে পড়েছিলো। আবার চমকে জেগে উঠেছে। সকালবেলায় মোরগের ডাক, পাহারাদার কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ইমামের আজান ধ্বনি, উদূখলের শব্দ সবই তার কানে আসছিলো। চোখে না দেখতে পেলেও তার মায়ের উপস্থিতি, পায়ের শব্দ সবই সে বুঝতে পারছিলো।

কুটিরের বাইরে কোরা, বালাফোন বাজতে শুরু করলো। বহু লোকের পদধ্বনি, কথাবার্তা ভেসে এলো। জোরে জোরে ঢাকের বাজনাও শুরু হলো। এর পরেই কুটিরের ভেতর দ্রুত পদধ্বনি শুনে কুণ্টার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে হাত ধরে টেনে জোর করে কুটির থেকে বার করে আনা হলো। চড় চাপড় আর লাথি চললো। অসহ্য বোধ হওয়ায় কুণ্টার মন বিদ্রোহ করে উঠছিলো, এমন সময় একটি মৃদু করস্পর্শ তাকে আশ্বস্ত করলো। পুত্রদের জুজুয়োতে পৌঁছে দেবার জন্য পিতারা ক্রীতদাস নিযুক্ত করেছেন। এ তারই হাত। ক্যান কুরাঙ নর্তক দল নামে সেই ভয়ঙ্কর লোকগুলো ততক্ষণে অপর কোন ছেলেকে ধরে আনতে অন্য কুটিরে গিয়েছে। প্রতিবার একটি করে ছেলেকে আনবার সময় সেই ক্যানকুরাঙ নর্তকেরা আকাশে বর্শা ছুঁড়ে রক্ত হিম করা চীৎকার করছিলো। গ্রামবাসীরাও সাথে সাথে যথাশক্তি উল্লাসধ্বনি করে উঠেছে। এতক্ষণে গ্রামের বড় ছোট সব ঢাকগুলোই বাজতে শুরু করেছে। সারিবদ্ধ জনতার মাঝখান দিয়ে ক্রীতদাসটি যখন কুণ্টাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো, সকলেই চীৎকার করে বলছিলো —'চার চন্দ্রকাল! তারপরই এরা মানুষ হয়ে ফিরবে।' কুণ্টা বহুকষ্টে কান্না সামলাচ্ছিলো। অমোরো, বিণ্টা, ল্যামিন এমন কি ছিচকাঁদুনে সুওয়াডুকে একটু স্পর্শ করবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি ।। দ্রুত ছন্দে ঢাক বাজছিলো। কুণ্টা অনুভবে বুঝতে পারছিলো—সে একটা লম্বা সারির অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাজনার সাথে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ জনতার শব্দ মিলিয়ে গেলো। গ্রাম পেছনে পরে থাকলো। কুণ্টার চোখের জল আর বাধা মানলো না।

কুটিরের ভেতর চোখে না দেখেও সে যেমন মায়ের উপস্থিতি অনুভব করছিলো, তেমনি এখন তার সামনে ও পেছনের ছেলেদের মনের শঙ্কা যেন একটা ঘন ধোঁওয়ার মতো তাকে আচ্ছন্ন করলো। তাতে সে খানিকটা আশ্বাসও পাচ্ছিলো। মাথার ওপরের সেই শুভ্র আচ্ছাদনের অন্ধকার যেন তাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলো। কুণ্টা শুধু তার মা বাবা ভাইদের পেছনে ফেলে যাচ্ছে না। তার মধুর শৈশবকে চিরদিনের মতো হারাচ্ছে। বেদনায় তার হৃদয় মথিত হচ্ছিলো। কিন্তু উপায় নেই। তার বাবাকেও একদিন এ কাজ করতে হয়েছে। তার ছেলেকেও করতে হবে। সে যুবক হয়ে তবেই এ পথে ফিরতে পারবে।

উনিশ

মাথার ঢাকনা সত্ত্বেও সদ্য কাঁটা বাঁশের তাজা গন্ধ পাচ্ছিলো। একটু পরে অনুমানে বুঝতে পারলো—তারা একটা বাঁশের বেড়া পার হলো। সঙ্গের ঢাকের শব্দ থেমে যেতে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মাথার ওপর টিয়াপাখীর ডাকাডাকি আর বাঁদরের কিচিমিচি একমাত্র শব্দ।

সহসা কুণ্টার মাথার ঢাকনা সরিয়ে নেওয়া হলো। মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোতে চোখ অভ্যস্ত হওয়ার পরেও কুণ্টা তার সাথীদের দিকে তাকাতে সাহস করছিলো না। সামনেই লোলচর্ম সিলা বা ডিবা দাঁড়িয়ে। ছেলেরা সবাই তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সকলকে ভালো করে চেনে। কিন্তু সিলা বা ডিবার আচরণে মনে হচ্ছিলো তিনি পূর্বে এদের কখনো দেখেনি। শুধু তাই নয়। তাঁর দৃষ্টিতে এদের প্রতি চরম তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাচ্ছিলো। ইনিই তাহলে তাদের কিণ্টাঙো। তাঁর দু'পাশে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক দু'জন—আলি সিসে এবং সোরু তুরা।

কাফোর তেইশটি ছেলেই বুকের ওপর হাতের তালু রেখে উচ্চারণ করলো —'শান্তি!'

বড়রা উত্তর দিলো—

'কেবল শান্তি!'

ঘাড় না ফিরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে কুণ্টা দেখে নিলো মস্তবড় উঠানে ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট কতগুলো খড়ে ছাওয়া মাটির কুটির। চারিপাশে নতুন তৈরী উঁচু বাঁশের বেড়া।

'জুফরে গ্রামের বালকেরা ! যদি মানুষ হয়ে ফিরতে চাও, তবে সবচেয়ে প্রথম ভয় দূর কর। ভয় মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল ব্যক্তি পরিবারের, তথা গ্রামের, তথা সমগ্র জাতির কলঙ্ক।'

কিণ্টাঙো পেছন ফিরলে তার সহকারী দু'জন—ছেলেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিলো।

ছড়ির আঘাতে তাদের পিঠ, কাঁধ সোজা রেখে ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। কুটিরে ঢুকে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর সন্ধ্যাবেলা আবার ছেলেদের সারিবদ্ধ করে গভীর অন্ধকারে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হলো। ঝরণার জল আর একটু শুকনো মাংস গোগ্রাসে গিলে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত পায়ে কোনক্রমে শেষ রাত্রে কুটিরে পৌঁছে হতক্লান্ত ছেলেরা নিমেষে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গিয়েছিলা। ছ রাত্রি এরকমচললো। ততদিনে ছেলেরা জঙ্গলে অন্ধকার পথে চলাফেরা করতে অনেকটা অভ্যস্ত হয়েছে। আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় করতে শিখেছে। এক রাত্রে কুণ্টা দলপতি হয়ে চলবার সময় এক বুনো ইঁদুরের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছিলো। এটা খুবই গর্বের বিষয়। কারণ বোঝা যাচ্ছে ছেলেরা নিঃশব্দে চলাফেরা করতে শিখেছে—বনের পশুরাও তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারছে না।

জঙ্গলে চলাফেরা শেখা হয়ে গেলে এদের শিকারের অন্যান্য কৌশল শেখানো শুরু হলো। কিণ্টাঙো বারবার একটি জিনিসের ওপর জোর দিচ্ছিলেন। 'পশুদের আচরণ লক্ষ্য কর। শিকারীদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা তাদের কাছে।' কিণ্টাঙোর সহকারীরা ছেলেদের একে একে কতকগুলো জায়গা দেখালো—কোথা থেকে সিংহ শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার আগে সে কোথায় ওৎ পেতে ছিলো। হরিণ শিকার করে সে কোথায় আহার সমাপ্ত কবলো—রাতে কোথায় শুলো। আবার অন্যদিকে নিহত হবার আগে হরিণগুলোই বা সারাদিন কোথায় ছিলো, কী করছিলো, সব একে একে ঘুরিয়ে দেখালো ও বোঝালো। ফলে পশুদের গতি-বিধির পরিষ্কার একটা ছবি ছেলেদের মানসপটে ফুটে উঠলো। পাথরের ফাটলে যেখানে নেকড়ে বাঘ আর হায়না থাকে—ছেলেদের দেখানো হলো। শিকারের বহু গূঢ় তত্ত্বও তাদের জানা হলো। শিকারীর চলাফেরা দ্রুত, চকিত ও নিঃশব্দ হতে হবে। ব্যাধের উপস্থিতি অনুমান করতে পারলে শিকার তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ছেড়ে যায়। পশুপাখীর ডাক অনুকরণ করতে গিয়ে সেটা আরো স্পষ্ট হলো। নতুন শিকারীর দল যতই ডাকাডাকি করুক, কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। অথচ কিণ্টাঙো এবং তাঁর সহকারীরা অন্তরাল থেকে অতি সঙ্গোপনে একই

আওয়াজ করলে পশুপাখীরা ধীরে ধীরে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিলো। তারা যেন উৎকর্ণ হয়ে সাথীর সন্ধানে ইতস্ততঃ তাকাচ্ছিলো।

দু' মাসের মাঝে তৃতীয় কাফোর ছেলেরা বনের ভেতর চলাফেরায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গেলো যেন তারা নিজের গ্রামেই আছে। পশুপাখীর উপস্থিতির অতি সূক্ষ্ম চিহ্নও তাদের চোখ এড়াতে পারে না। পূর্বপুরুষদের নির্দিষ্ট আচার আচরণ, প্রার্থনা—যা শিকারীদের অবশ্য জ্ঞাতব্য, সবই তারা শিখে নিয়েছে। এর ফলে তারা আরো নিরাপদ বোধ করছে, নিজেদের আহারের সব মাংসই এখন এদের শিকার করা। মৃত পশুপাখীর চামড়া ছাড়ানো, চকমকি দিয়ে শুকনো কাঠি ও লতাপাতায় আগুন ধরিয়ে দ্রুত হাতে মাংস ঝলসে নেওয়া, এসব এখন এদের কাছে অতি সহজ।

আবার অপরিকল্পিত ঘটনা থেকেও তাদের নূতন অভিজ্ঞতা হয়। একদিন অবসর ক্ষণে খেলাচ্ছলে ছুড়ে দেওয়া একটি তীর গাছের অনেক ওপরে মৌমাছির চাকে গিয়ে লাগে। মুহূর্তে ক্রুদ্ধ মৌমাছির দল ছেলেদের কামড়ে অস্থির করে তুললো।

পরস্পরের ব্যথার জায়গায় শিয়া গাছের তেল মালিশ করতে বলে কিণ্টাঙো তাদের উপদেশ দিলেন—

'কখনো না দেখে তীর ছুড়বে না। আজ রাতে তোমাদের দেখাবো মৌমাছিদের কি করে কাবু করতে হয়।'

রাত্রে মৌমাছিদের চাকের নীচে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। আগুনের লেলিহান শিখা অনেক উঁচু পর্যন্ত লাফিয়ে উঠতে হাজার হাজার মরা মৌমাছি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে লাগলো। পরদিন সকালে শেখানো হলো, কী করে মৌমাছি সরিয়ে চাক থেকে মধু আহরণ করতে হয়। দীর্ঘকাল বনের ভেতর আবদ্ধ শিকারীদের দেহে মধু অতি দ্রুত শক্তি সঞ্চার করে।

বৃদ্ধ কিণ্টাঙো কঠোর স্বভাবের লোক। তাকে সন্তুষ্ট করা মুস্কিল। যে কোন ছেলের ত্রুটির জন্য সারা কাফোর ছেলেকে দণ্ড পেতে হয়। কিন্তু অসহ্য বোধ হলেও অপরাধীকে কেউ নিজের হাতে শাস্তি দেয় না। কারণ জীবনে তাদের প্রধান শিক্ষা হলো—

মানডিনকা জাতি কখনো নিজেদের মাঝে মারামারি করে না। দ্বিতীয়তঃ এরা ক্রমেই উপলব্ধি করছিলো একটা দলের ভালোমন্দ দলগত ভাবে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করছে। নিয়মের ব্যতিক্রম ক্রমশঃই কমে এলো। কিণ্টাঙোর প্রতি ভয়ের পরিবর্তে আন্তরিক শ্রদ্ধা তাদের মনে স্থান পেলো।

শিখবার বিষয়ের শেষ নেই। একটা বস্ত্রখণ্ড কেমন করে ভাঁজ করে কুটিরের বাইরে ঝোলানো আছে দেখে বোঝা যাবে গৃহকর্তা কবে বাড়ী ফিরবে। জুতো জোড়া কেমন করে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে তা দেখে অনেক কিছু বোঝা যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সিরা কাঙো নামে একটা গুপ্ত ভাষা। শুধু মানডিনকা পুরুষেরই সেটা জানবার অধিকার আছে। শিশু, নারী বা অন্য জাতির লোক তা বুঝবে না। কুণ্টার মনে পড়লো তার বাবাকে সে বাইরের লোকের সাথে অনেক সময় একটা অপরিচিত ভাষায় কথা বলতে শুনেছে, যার অর্থ তার বোধগম্য হয়নি।

কুড়ি

কিণ্টাঙো একদিন সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন—

'তোমরা আর শিশু নও। এ তোমাদের দ্বিতীয় জন্ম। এত চন্দ্রকাল ধরে এক সাথে শিক্ষা নিয়ে, কাজ করে, এমন কি একসাথে শাস্তি গ্রহণ করে তোমরা প্রত্যেকেই নিশ্চয় নিজেদের মাঝে দুইটি পৃথক সত্তা আবিষ্কার করেছো। একটি অন্তরে, বৃহত্তর সত্তাটি বাইবে যাদের সাথে জীবন ভাগ করে নিচ্ছো তাদের মাঝে। প্রকৃত যোদ্ধা হতে গেলে এই জীবনদর্শনে বিশ্বাস রাখতে হবে। মানডিনকা জাতি নিজের উদ্যোগে কখনো যুদ্ধ শুরু করে না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মতো বীর দুর্লভ।'

পরের অর্ধচন্দ্রকাল কুণ্টা ও তার সাথীরা যুদ্ধবিদ্যা শিখলো। কিণ্টাঙো এবং তার সহকারীরা ধুলোর ওপর দাগ কেটে নানা ব্যূহ রচনা করে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলো।

'শত্রুপক্ষকে কখনো সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলবে না। পালাবার পথ রাখবে। কারণ লোকে মরিয়া হলে অতি মারাত্মক যুদ্ধ করে।'

'অপরাহ্নকালে যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত, পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলে শত্রুপক্ষ যেন অন্ধকারে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়।'

আরো নানাবিধ উপদেশ। যুদ্ধ চলাকালে ভ্রমণরত ফকির, চারণ বা কর্মকারদের অনিষ্ট করতে নেই। তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। চারণেরা বিরূপ হলে তাদের কথা দিয়ে শত্রুপক্ষকে উৎসাহিত করতে পারে। কর্মকাররা শত্রুপক্ষের

অস্ত্র তৈরীর কাজে সাহায্য করতে পারে। কুণ্টারা নিজের হাতে বর্শা এবং তীর তৈরী করতে শিখলো। কোন লতার রসে নিষিক্ত করলে তীর বিষাক্ত হয়, তাও জেনে নিলো।

নানা বিচিত্র বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার জন্য পরের মাসে বিভিন্ন ধরনের পরিদর্শকদল জুজুয়োতে তাদের শিক্ষা দিতে এলো। প্রথমে এলো মল্লবীরের দল। তারা এসেই ছেলেদের বিনা বাক্যব্যয়ে একে একে তুলে ধরে মাটিতে আছাড় দিতে লাগলো। দেহের নানা জায়গায় আঘাত খেতে খেতে ছেলেরা ক্রমশঃই মল্ল-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলো। তাদের শিক্ষকেরা বার বার একটা কথার ওপর জোর দিচ্ছিলো—জ্ঞান ও কৌশলই প্রকৃত শক্তি। কেবলমাত্র কায়িক শক্তিতে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। কুস্তির সময় পরস্পরকে ধরবার এতরকম কায়দা আছে, তার কার্যকারিতা এমন প্রচণ্ড—কুণ্টারা আগে কল্পনাই করতে পারেনি।

মল্লবিদদের ফিরে যাবার দু'দিন পরে এলো এক সুবিখ্যাত চারণ কবি। সে প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আফ্রিকার বহু কৃষ্ণবর্ণ রাজবংশের গৌরবগাথা সুললিত ভাষায় এদের শোনালো। সেসব বৃত্তান্ত আফ্রিকাতে সাদা মানুষের পদার্পণের বহু আগের। ছেলেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে সেই অমৃতসম কাহিনী শুনছিলো। চারণ কবি চলে যাবার পরও সে সব কথার স্মৃতি তাদের দিবারাত্র আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এ হলো ইতিহাসের শিক্ষা।

এর পরে এলেন এক প্রথিতযশা পণ্ডিত। গাম্বিয়া দেশের শিক্ষকদের মাঝে তার আসন সর্বোচ্চে। সে দেশে এমন ব্যক্তিকে বলে মরো। মরোর পেছনে স্তূপীকৃত পুঁথি মাথায় নিয়ে এলো তাঁর পাঁচজন শিষ্য। এঁর আগমন সম্ভাবনায় কিণ্টাঙো আগেই জুজুয়ো ঝেড়ে মুছে অতি পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। ছেলেরা শুনেছিলো—গ্রামপ্রধানেরা, এমন কি রাজারাও মরোর দর্শন লাভ করলে, তাঁর উপদেশবাণী শুনতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। জুজুয়োর প্রবেশপথের ধারে কিণ্টাঙো, তাঁর দুই সহকারী এবং ছেলেরা নতজানু হয়ে বসেছিলো। বৃদ্ধ মরো তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রবেশ করা মাত্র তারা নীচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালো। মরো সকলকে আশীর্বাদ জানাবার পর তারা গাত্রোত্থান করে তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে নিজেরা চারপাশ ঘিরে বসলো। মরো নানা অশ্রুতপূর্ব কাহিনী তাঁর গ্রন্থ থেকে পড়ে শোনালেন।

খৃষ্টান ধর্মের অনেক উপাখ্যানও এসব দুর্লভ পুস্তকের মধ্যে ছিলো। মুসা ও মোজেস, দাউদি ও ডেভিড, ইসা ও ইসাইয়ার কাহিনী মূলতঃ একই। খৃষ্টানদের

কোরাণকে বলা হয় বাইবেল। সাদা মানুষেরা যাকে 'মহাবীর আলেকজাণ্ডার' বলে, তাকেই এরা 'জোলো কারা নাইনি' নামে জানে। প্রতিটি পুঁথি খোলা ও ও বন্ধ করবার সময় মরো সেটি মাথায় ঠেকিয়ে 'আমেন!' বলছিলেন। পুঁথি থেকে পাঠ হয়ে গেলে তিনি মুখে মুখে অনেক আখ্যান বলে শোনালেন। আদম ও ইভের কাহিনী, মোজেস, ডেভিড ও সলোমনের কাহিনী, অ্যাবেলের মৃত্যু ইত্যাদি। সর্বশেষে পাঁচ ওক্ত নামাজের নিভুর্ল পদ্ধতি, পবিত্র মসজিদের ভেতর পালনীয় শুদ্ধ আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁর নির্দেশে জানালেন। তৃতীয় কাফোর ছেলেরা এবার গ্রামে ফিরে মসজিদে প্রবেশ করবার অধিকার পাবে।

মরো সর্বদাই অতি ব্যস্ত। তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মসূচীর উদ্দেশে শিষ্যদের নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। সে রাত্রে কুন্টার চোখে ঘুম ছিলো না। অল্পদিনের মধ্যে এত বিচিত্র ধরনের শিক্ষা তার মনকে বিহ্বল করে তুলেছিলো। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—একই কাল প্রবাহের অংশ। মৃত জীবিত এবং ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে সকলেই এক সুবৃহৎ গোষ্ঠীর অংশ। সে নিজে, তার পরিবারের অপর সকলে, তার গ্রাম, উপজাতি, আফ্রিকা মহাদেশ, এমন কি সারা পৃথিবীর সকল মানুষ—একই মানব পরিবারভুক্ত; একই বন্ধনে দৃঢ়সংবদ্ধ—সকলেই আল্লাহের অধীন। কুন্টার নিজেকে এই বিরাট পটভূমিকায় অতি সামান্য, আবার একই সাথে অতিপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিলো। হয়তো সেটাই পুরুষত্ব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এর পরে পুরুষত্ব-লাভের, সবচেয়ে ভীতিজনক অধ্যায় সুন্নৎ হয়ে যেতে ছেলেরা অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করলো। চার চন্দ্রকাল পূর্ণপ্রায়। কিন্টাঙোর ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন তিনি তৃতীয় কাফোর ছেলেদের সাথে সমকক্ষের মতো ব্যবহার করেন। তাদের কথার অনেক বেশী মূল্য দেন। প্রতিদিন বহু বিষয়ে আলোচনা হয়। যে কোন গ্রামে নবজাত শিশু থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রত্যেক মানুষের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই নবীন পুরুষেরা যেন প্রতিজনকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়। পুরুষ হিসাবে তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য—গ্রামের প্রতিটি বৃদ্ধ, নারী ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের মঙ্গলসাধন।

'তোমরা ফিরে গিয়ে গ্রামের চক্ষু কর্ণের কাজ করবে। সাদা মানুষ বা বর্বর অসভ্য জাতি সম্পর্কে সদাজাগ্রত, অতি প্রখর দৃষ্টি রাখবে। শস্যক্ষেত্রগুলি পশুপক্ষীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। মেয়েদের রান্নার বাসন পরিচ্ছন্ন, পানীয় জল দোষ-মুক্ত আছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও তোমাদের কর্তব্য।'

কুন্টার স্ফূর্তির সীমা রইলো না। কবে বাড়ী ফিরে মায়েদের ওপর কর্তামি

করতে পারবে সেই আশায় উৎসুক হয়ে রইলো। পনেরো বর্ষা অন্তে চতুর্থ কাফোতে উত্তীর্ণ হলে এরা জুফরে ও নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের মধ্যে সংবাদবাহকের কাজ করতে পারবে। বিশ বর্ষা অতিক্রম করে পঞ্চম কাফোতে উন্নীত হলে তবেই সত্যিকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পাবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্যান্য দূরবর্তী গ্রামের সাথে সংযোগ রক্ষা বা চরের কাজ করবার অধিকার তখনই জন্মায়। অমোরোর মত ত্রিশবর্ষা অতিক্রান্ত হলে ক্রমেই পদমর্যাদা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিশেষে সে ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ সংসদের সম্মান পায়—যতদিন না আল্লাহ তাকে ডেকে নেন।

শেষ ক'টা দিন আর কাটতে চায় না। অবশেষে চতুর্থ পূর্ণচন্দ্র সুগোল, উজ্জ্বল হয়ে মধ্য আকাশে দীপ্যমান হলো। কিণ্টাঙোর সহকারীরা রাত্রে খাবার পর শিক্ষার্থীদের সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলো। জুজুয়োর প্রধান প্রবেশ পথে কিণ্টাঙো দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্বার সম্পূর্ণ খুলে ধরে আদেশ দিলেন—

'জুফরে গ্রামের পুরুষেরা, গ্রামে ফিরে যাও!' চার মাস আগে এই একই প্রাঙ্গণে যখন তাদের মাথা থেকে ঢাকনা খুলে নেওয়া হয়েছিলো, কুণ্টারা কল্পনাও করতে পারেনি—একদিন এ জায়গা বা এ বৃদ্ধটিকে ছেড়ে যেতে এত দুঃখ হবে। বার বার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। দ্বারের বাইরে এসে গৃহমুখী মন প্রথমে উল্লাসে লাফিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু পথ চলতে চলতে ব্যাকুল হৃদয় ক্রমে শান্ত হয়ে এলো। প্রত্যেকে নিজস্ব ভাবনায় মগ্ন হয়ে যায়। পেছনে কী পড়ে থাকলো, সামনে কোন ভবিষ্যত অপেক্ষা করে আছে—তারই হিসাবনিকাশ করে। গৃহের পথ চিনে নিতে তাদের সেদিন কোনও নক্ষত্রের নির্দেশ প্রয়োজন হয়নি।

একুশ

'আয়ী —! আয়ী —!' মেয়েদের উল্লাসধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হলো। পুরুষেরা কুটির থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো।

হাস্যে, করতালিতে, নৃত্যে গ্রামপথ মুখরিত হয়ে উঠলো। চার চন্দ্রকাল শিক্ষা শেষ ক'রে সদ্য নতুন পুরুষেরা অতি প্রত্যূষে আপন গ্রামে প্রবেশ করছিলো। তাদের মাঝে যাদের পনেরো বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা এখন চতুর্থ কাফোর অন্তর্ভুক্ত। সকলেই মনের আকুলতা সংযত রেখে, গম্ভীর মুখে, মর্যাদাপূর্ণ, ধীর

সমতাল পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিলো। মাকে দেখে কুণ্টার ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু তার চলার গতি বা ভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রইলো। শুধু মুখটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে কুণ্টার আর একটি ছোট ভাই হয়েছে। সে বিণ্টার পিঠে কাপড়ের ফালিতে বাঁধা। বিণ্টা ছুটে এসে দরবিগলিত অশ্রুধারায় কপোল ভাসিয়ে কুণ্টাকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু কুণ্টা পুরুষোচিত মর্যাদার সাথে নিজেকে সংযত রাখলো। সে ছোট্ট ভাইকে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়লো। তারপর তাকে উঁচু করে তুলে ধরে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো—

'এই আমার ভাই!'

ভাইটির নাম ম্যাডি। নানা মুখভঙ্গী করে, মজার আওয়াজ করে সে ভাইয়ের গাল টিপে দিতে লাগলো। এক পাল নগ্ন শিশু বিস্ফারিত নয়নে, বিহ্বল মুখে কুণ্টার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। মহিলারা তার পুরুষোচিত দৈহিক সৌষ্ঠবের প্রশংসা করছিলো। কুণ্টা বাইরে উদাসীনতা দেখালেও সে সব কথা, শিশুদের মুগ্ধ মনোযোগ—সবই তার অন্তরে মধু বর্ষণ করছিলো।

অমোরো ও ল্যামিন কোথায়? খেয়াল হলো ল্যামিনের সেটা ছাগল চড়াবার সময়। প্রথম কাফোর একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু বিণ্টার কাপড় ধরে দাঁড়িয়েছিলো। আচ্ছা! এই সুওয়াড়ু! চার চন্দ্রকালের মাঝেই যেন অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে, অনেক কথা বলতে শিখেছে। মানুষ হয়ে গিয়েছে!

আনন্দে ও মাতৃগর্বে উচ্ছ্বসিত বিণ্টার কথা বলার প্রয়োজন ছিলো না। কুণ্টারও নয়। মায়ের অভাবে তার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিলো। আরো কত কথা বলতে ইচ্ছা করছিলো। কিন্তু এখন সে বড় হয়ে গিয়েছে। এ সব ভাবোচ্ছ্বাস মেয়েদের কাছে—নিজের মায়ের কাছে হলেও প্রকাশ করা বড়ই লজ্জার।

'বাবা কোথায়?'

'তোমার ঘর ছাওয়াবার শণ যোগাড় করতে গিয়েছেন।'—কুণ্টা ভুলেই গিয়েছিলো এবার তাকে আলাদা কুটিরে বাস করতে হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার খোঁজে যেতেই অমোরোর সাথে দেখা। কুণ্টার হৃদয় আবেগে দুর্বার হয়ে উঠলো। তবু গভীর দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা বয়স্ক ব্যক্তির মতো অনুচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে করমর্দন করলো। এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে অমোরো নিরুচ্ছ্বাস কণ্ঠে জানালো—কুণ্টার জন্য নূতন ঘর তৈরী হচ্ছে। কুণ্টা কি দেখতে চায়? এক সাথে যেতে যেতে অমোরোই বেশী কথা বলছিলো। কুণ্টা যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো। গ্রামের অপর প্রান্তে কুণ্টার কুটির। তখনো কুটিরের

দেওয়ালে মাটি লেপা শেষ হয়নি। চালায় খড় বিছানোর কাজও অসম্পূর্ণ। কিন্তু তবু এটা কুণ্টার একান্ত নিজস্ব কুটির। কুণ্টার চোখে এ অতুলনীয়! অমোরো জানালো, না এ কাজে সে ছেলের সাহায্য নেবে না; একাই সব পারবে।

কুণ্টা গ্রামের প্রতিটি প্রান্তে একবার ঘুরে এলো। পরিচিত সকলের সাথে দেখা করে, আকর্ষণীয় স্থানগুলো দেখে সে মনের আশ মেটাচ্ছিলো। সহসা একটা সুপরিচিত কোলাহল কানে এলো। ছাগলের ব্যাঁ ব্যাঁ, পাহারাদার কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ছোট ছেলেদের চীৎকার। কুণ্টার চোখ ব্যাকুল আগ্রহে ল্যামিনের মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। হাসিতে মুখ ভরে ল্যামিন তার দিকেই ছুটে আসছিলো। কিন্তু কুণ্টার নিরুৎসুক ভাব দেখে সে থমকে গেলো। তার চোখে একই সাথে দাদার জন্য গর্ব এবং দূরত্ব বোধের বেদনা। ঈষৎ দ্বিধার স্বরে বললো—'তোমার ছাগল দুটো বড় হয়ে গিয়েছে। বাচ্চা হবে।' কুণ্টা শুনে খুশী হলো। কিন্তু আনন্দ বা বিস্ময় প্রকাশ না করে নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিলো—'খুব ভালো খবর।'

সে নিজের মনে অনুভব করছিলো—এতদিন পর দেখা হতে ভাইকে এমন শীতল অভ্যর্থনা জানানো খুবই অনুচিত। তবু নবলব্ধ পুরুষোচিত অহংকার তাকে স্নেহের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে বাধা দিচ্ছিলো। তাছাড়া এবার থেকে ল্যামিন নতুন পুরুষে পরিণত দাদাকে যথোচিত সমীহ করে চলবে। এ শিক্ষাও তাকে দেওয়া দরকার।

কুণ্টা তার নিজের কুটিরে চলে যাবে। বিণ্টা বিষণ্ণ মুখে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিলো। তীর ধনুক আর গুলতি ছাড়া কী বা তার সম্পত্তি! শোবার জন্য একটা খড়ে ভরা জাজিম, কিছু বাসনপত্র, একটা টুল, বিণ্টার নিজের হাতে বোনা একটা প্রার্থনার আসন। বিণ্টা যখন প্রতিটি জিনিসের উল্লেখ করছিলো, কুণ্টা তার বাবার মতো গম্ভীরভাবে সম্মতিসূচক শব্দ করছিলো। কুণ্টা একটু পরে উকুনের কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে মাথা চুলকাতে শুরু করলো—তবু মায়ের উকুন বেছে দেবার প্রস্তাবে সে দৃঢ় আপত্তি জানায়।

নানা ভাবনা চিন্তায় কুণ্টার ঘুমোতে মধ্যরাত্রি হয়ে গেলো। প্রত্যূষে ইমামের আজান ধ্বনিতে ঘুম ভাঙলো। আজ সে জীবনে প্রথম বার মসজিদে পদার্পণ করবে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে আসনটি হাতে নিয়ে সে নতমস্তকে বড়দের পেছন পেছন মসজিদে ঢুকলো। তার নিজের কাফোর অপর সাথীরাও গিয়েছিলো। তাদের বিজ্ঞ মুখভাব দেখলে কিন্তু মনে হচ্ছিলো তারা বুঝি সারা জীবনই এ কাজে অভ্যস্ত।

বড়দের প্রতিটি আচরণ ও কথার তারা নির্ভুল অনুকরণ করছিলো, সতর্কভাবে আয়াৎ উচ্চারণ করছিলো।

প্রার্থনার পর বিণ্টা তার বড় ছেলের প্রাতঃরাশের জন্য এক পাত্র ধোঁওয়া ওঠা পরিজ তার নতুন কুটিরে নিয়ে গেলো। এর পরে কুণ্টার কাজে যাবার পালা। এই নবীন পুরুষেরা গ্রামের চক্ষুকর্ণের কাজ এত অত্যধিক উৎসাহের সাথে পালন করছিলো যে বড়দের রীতিমত কৌতুক বোধ হচ্ছিলো। মহিলাদের পেছনে সর্বক্ষণ কেউ না কেউ লেগেই থাকতো। উদ্দেশ্য রান্নার বাসন পরীক্ষা করা। কুটিরগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে তারা বড়দের মেরামতের কাজেরও অজস্র ত্রুটি বার করছিলো। কূয়োর জল নির্দোষ কিনা অতি সযত্নে পরীক্ষা করা হচ্ছিলো। গ্রামের সর্বত্র নবীনেরা অতি সতর্ক প্রহরায়।

ক্ষুদ্র গ্রাম জুফরের তুলনায় নবীনের সংখ্যা বেশী। কাজেই গ্রামের চক্ষু কর্ণের কর্তব্য সুসম্পন্ন করেও তাদের হাতে বাড়তি সময় প্রচুর। নিজেদের জমিতে ফসল ফলাবার কাজে সে সময় ব্যয় করা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের সংসদ প্রত্যেকের জন্য এক খণ্ড জমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল অন্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রী করা যায়। সেভাবে পশুর বিনিময়ও চলে।

এক ডজন ছাগলের বিনিময়ে একটা গাভী ক্রয় করা যায়। যারা ব্যবসায়ে পটু আর কর্মঠ স্বভাবের—তারা এ ভাবেই সম্পত্তি বাড়িয়ে নেয়। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়সে বিয়ে করে সংসার শুরু করবার আগেই তারা যথেষ্ট সচ্ছল হয়ে ওঠে। কুণ্টার কর্মকুশলতা আর ব্যবসায়িক বুদ্ধির গুণে কয়েক চন্দ্রকালের মাঝেই তার জিনিসপত্র এত বেড়ে গেলো যে বিণ্টা ঘোরতর আপত্তি জানালো। মাদুর, টুল, বাসন—অন্যান্য জিনিসপত্রের ভীড়ে কুণ্টার নিজের থাকবার জায়গা কম পড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু বিণ্টা তার মা হলেও নারী। মেয়েদের মতামতকে বেশী প্রাধান্য দিতে নেই। তবে বিণ্টা তার সুখসুবিধার জন্য অনেক করে। অর্ধেক চন্দ্রকাল পরিশ্রম করে কুণ্টার শোবার জন্য ভারী আরামের নরম বাঁশের গদি, আর মিহি বুনটের নলখাগড়ার মাদুর তৈরী করে দিয়েছে। সে কথা ভেবে মায়ের অনেক অনধিকার-চর্চাই সে নির্বিকার মনে মেনে নেয়।

বাইশ

কুণ্টার তখন সতেরো বর্ষা বয়স। এক চন্দ্রালোকিত নিশীথে সে একা গ্রামের

প্রান্তে মাচার ওপর বসে। সেদিন তার পাহারা দেবার পালা। সঙ্গে প্রহরী কুকুর। প্রথম দিকে সে ভয় পেতো। একা একা কেবলই চমকে উঠতো। এখন সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। কার্যকারণ সম্পর্ক সহজে বুঝতে পারে। বিভিন্ন পশুর আওয়াজের পার্থক্য ধরতে পারে। দীর্ঘ রজনী কী ভাবে সজাগ থাকতে হয় তাও শিখেছে। মস্তিষ্কের অর্ধেক সতর্ক প্রহরায় রেখেও বাকী অর্ধেক দিয়ে নিজের ভাবনায় নিমগ্ন থাকতে পারে।

আজকাল মাঝে মাঝে সে মেয়েদের কথা ভাবে। কিন্তু মেয়েদের ব্যবহার বড় রহস্যপূর্ণ—বোঝা শক্ত। তার বয়সী মেয়েরা—যাদের সাথে সে খেলেছে; তারা তো তার দিকে ফিরেও তাকায় না। অথচ আর একটু বয়স্ক ছেলেদের দেখে তাদের ন্যাকামোর অন্ত নেই। অমোরোর বয়সী অনেকেই একাধিক বিয়ে করেছে। অমোরোও কি তাই করবে? এ ভাবনা মাথায় আসতেই সে চমকে উঠলো। সত্যি যদি তা হয়, তবে বিণ্টার মনের অবস্থা কি হবে? কিণ্টাঙোর দুই স্ত্রীর মতো তারাও কি দিবারাত্র ঝগড়া করবে? গৃহে তিলমাত্র শান্তি থাকবে না? কুণ্টার কাকাদের তো অনেক বয়স। অথচ তারা এখনো বিয়েই করেনি।

নাঃ সে কাকাদের মতো দেশভ্রমণেই বার হবে। অনেক দূরে যাবে। 'মালি'তে তিন চারশো বর্ষা আগে কিণ্টে বংশের সূচনা হয়। বংশের আদিপুরুষেরা কর্মকার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলো। অগ্নিদেবতাকে জয় করে এমন লোহার অস্ত্র তৈরী করেছিলো যা দিয়ে কৃষিকাজ সহজ হয়েছে।

কুণ্টা গোপনে আরাফাঙের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছে। বিণ্টা কাছাকাছি না থাকলে নিজের কুটিরে ধূলোর ওপর আঙুল দিয়ে দাগ কেটে কতবার পথের নকশা এঁকেছে। আরাফাঙ বলেছে—মালিতে যেতে আসতে পথেই এক চন্দ্রকাল লেগে যাবে। কুণ্টা ঠিক করেছে; এবার সে ল্যামিনকে সাথে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ল্যামিনের পুরুষত্ব শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। পথের জন্য সে বেশ নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হবে। তাছাড়া ল্যামিন সাথে থাকলে তার একাকীত্বও কাটবে।

অন্ধকারে মাচার ওপর বসে এসব ভাবতে ভাবতে সে নিজের মনে হাসছিলো। এ সংবাদ জানলে আনন্দে ল্যামিনের মুখের চেহারা কী হবে সে যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলো। কিন্তু সবার আগে অমোরোকে বলা দরকার। অবশ্য সে জানে অমোরো আপত্তি করবে না। বিণ্টাও এখন আগের মতো উদ্বিগ্ন হবে না। মালি থেকে কুণ্টা তার মায়ের জন্য চমৎকার উপহার নিয়ে আসবে। কয়েক বর্ষা পরে সে আবার ভ্রমণে বেরোবে। সেবার সে বহুদূরের সেই অন্তহীন বালির রাজ্যে যাবে,

যেখানে উট নামে অদ্ভুত জানোয়ারগুলি থাকে। দীর্ঘ পথের জন্য জল সঞ্চয় করে রাখতে তাদের পিঠে দুটো কুঁজ থাকে। পরে কুণ্টা পবিত্র মক্কাতেও তীর্থ করতে যাবে। পবিত্র মক্কা শরীফের দিকে মুখ করে তাকাতে গিয়ে সে দূরের ক্ষেতের ওপারে একটা স্থির হলদে আলো দেখতে পেলো। ফুলানি উপজাতির পশুপালকেরা চারণভূমিতে তাদের প্রাতরাশ রান্না করছে। কুণ্টার খেয়ালই ছিলো না কখন পূব আকাশে প্রত্যূষের আলো ফুটে উঠেছে।

তেইশ

কুণ্টা বাড়ীর দিকে ছুটলো। বুনো ফুলের চেনা সুগন্ধ ভেসে আসছিলো। ঘাসের ওপর শিশিরকণার ঝিকিমিকি। চিলগুলো শিকারের সন্ধানে মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। ক্ষেতের ধারে ধারে খানাখন্দে ব্যাঙের হাঁকাহাঁকি। নীচু ঘন ঝোপগুলোর ধার দিয়ে যেতে যেতে সে গরান গাছের তীব্র মদির গন্ধ পেলো। শুয়োরের পাল সহসা সামনে তাকে দেখে ঘোঁৎঘোঁতানি শুরু করলো। বেবুনগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে কিচিমিচি করতে থাকলো—তাদের পালের গোদাগুলো ভয় পেয়ে দলের মেয়ে ও শিশুগুলোকে নিজেদের পেছনে ঠেলে দিলো। ছোটবেলা সে বেবুন দেখলেই ভেংচি কেটে রাগিয়ে দিতো। কিন্তু সে তো আর ছোট নেই। আল্লাহের সৃষ্ট সব জীবকেই সে এখন সম্মান করতে শিখেছে। এগ্রেট, সারস, বক ও পেলি-কানের শুভ্র ঝাঁক ঘুম ভেঙে উঠে আকাশে উড়লো। কুণ্টা ঝোপের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে নদীর ধারে উপস্থিত হলো। তার পাহারাদার কুকুরটি দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে জলঢোঁড়া আর কচ্ছপগুলোকে তাড়া লাগালো।

রাতের পাহারার পর কুণ্টা প্রায়ই নদীয় ধারে এসে দাঁড়ায়। আজ সে লক্ষ্য করছিলো একটা ধূসর রঙের হেরণ পাখী ছোট ছোট মাছের সন্ধানে ঈষৎ হরিৎবর্ণ জলের ওপর দিয়ে নীচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে। তার পাখার স্পর্শে জলে মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। কুণ্টা জানে, এখানে বড় বড় কুজালো মাছ পাওয়া যায়। কতদিন সে বিণ্টার জন্য এ মাছ ধরে নিয়ে গিয়েছে। বিণ্টা কুজালো মাছের সাথে পেঁয়াজ টোমাটো আর চাল দিয়ে চমৎকার একটা রান্না করে। সে কথা মনে করে তার সকালবেলার ক্ষিধে আরো দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো।

নদীর ধার দিয়ে আরো খানিকটা গিয়ে সে একটা প্রাচীন গরান গাছের নীচু

ডালে উঠে বসলো। এ গাছটিতে সে অসংখ্য বার উঠেছে। কুণ্টা মনে মনে ভাবলো গাছটিও নিশ্চয় তাকে খুব ভালো করেই চেনে। তার পছন্দসই জায়গাটিতে চড়ে বসে প্রথম সূর্যের আলোকে নদীর বাঁক পর্যন্ত চারিদিক সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো। নিদ্রিত জলমুরগীদের পালকে বহুদূর পর্যন্ত যেন কার্পেটে মোড়া। দূরে মেয়েদের ধানের ক্ষেত, আর তার মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে ছোট্ট শিশুদের জন্য তৈরী বাঁশের চালা। শিশু বয়সে সে এর কোন্‌টিতে ছিলো ? এই প্রত্যূষকালে চারিদিকের অপরূপ দৃশ্য কুণ্টার হৃদয় একটা আশ্চর্য প্রশান্তিতে ভরে দিলো। গ্রামের মসজিদে প্রার্থনা সভায় বসেও এ আনন্দ সে পায় না। পৃথিবীর সকল মানুষ এক। প্রকৃতি রাজ্যের সকল প্রাণীই আল্লাহের অধীন—নতুন করে এ সত্য তার উপলব্ধি হলো।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তু—যা সে এখান থেকে দেখছে, শুনছে, উপভোগ করছে—তা কেবলমাত্র তার জন্য নয়। মানুষের স্মরণকালের বহুপূর্ব থেকে এ বস্তু ছিলো। তার অধস্তন বহু পুরুষ পরেও থাকবে।

তার নিজস্ব একটি ঢাক তৈরী করবার উপযুক্ত কাঠ সে অনেকদিন ধরে খুঁজছিলো। ল্যামিনও সেটি বাজাতে পারবে। আজই সে একটি গাছ খুঁজে নিয়ে কেটে ফেলবে। কাঠটি শুকিয়ে ব্যবহারের যোগ্য হতে দেড় চন্দ্রকাল লাগবে। ততদিনে সে আর ল্যামিন মালি থেকে ফিরে আসবে। সামনে মাথা সমান উঁচু ঘাস বনের ভেতর দিয়ে সে একটা গাছের দিকে এগোলো। সেই মুহূর্তে তার কুকুরটা তীক্ষ্ণ চীৎকার করে একটা খরগোশের পেছনে তাড়া করে ছুটলো। ঘাসবনের ভেতর বেশ কয়েকটা গাছ। ভেতরে ঢুকে ভালো দেখে তারই একটা বেছে নিতে হবে। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা মাটির স্পর্শে বড় আরাম লাগছিলো। বনের ভেতরটা অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। সূর্যের আলো সেখানে পৌঁছোয় না। হাতের কুড়োল আর অস্ত্র একটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে সে গাছগুলোতে হাত লাগিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করছিলো।

হঠাৎ তার কানে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ এলো। মাথার ওপর একটা টিয়াপাখী কর্কশস্বরে চীৎকার করে উঠলো। চকিতে পেছন ফিরে কুণ্টা একটা সাদা মুখ আর উদ্যত মুগুর দেখতে পেলো। সাদা মানুষ ! তার চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে গেলো। কুণ্টা প্রাণপণে লোকটার পেটে একটা লাথি কষিয়ে দিলো। ঠিক তখনই কুণ্টার মাথার পেছনে, আর কাঁধের ওপর শক্ত ভারি একটা জিনিস সজোরে আঘাত করলো। অসহ্য যন্ত্রণায় নুয়ে পড়েও সে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে

পড়া লোকটার দিক থেকে পেছনে ঘুরে তাকালো। দুটো কালো মানুষ বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে। আরও একটা সাদা মানুষ,—তার হাতে বেঁটে মোটা মুগুর। কুণ্টা কালো মানুষ দুটোর মুখে ঘুষি মারতে লাগলো। একই সাথে ক্ষিপ্র গতিতে সরে গিয়ে সাদা মানুষটার মুগুরের আঘাত এড়াতে চেষ্টা করছিলো।

সে একেবারে নিরস্ত্র, অসহায়। যে কোন একটা অস্ত্রের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। আঁচড়ে, কামড়ে, লাথি কষিয়ে, ঘুষি মেরে, শুধু হাতে পায়ে সে আপ্রাণ যুদ্ধ করছিলো। তার পিঠের ওপরে অবিরাম মুগুরের ঘা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিলো না। অবশেষে শত্রুপক্ষের তিনজনে একযোগে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো। অতর্কিতে একটা হাঁটু তার পিঠের নিচের দিকে এমন সজোরে এসে ঘা লাগালো যে ব্যথায় কুণ্টার দম আটকে যায়। কুণ্টা হাঁ করে মুখের সামনে যাকে পেলো কামড়ে গায়ের মাংস ছিঁড়ে নিলো। মানুষটার চোখে গভীর ভাবে নখ বসিয়ে দিলো। লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকলো। সেই মুহূর্তে কুণ্টার মাথার ওপর আবার একটা ভারী মুগুর নেমে এলো। হতবুদ্ধি, অর্ধচেতন অবস্থায় সে একটা কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎকার আর সাদা মানুষের গালাগাল শুনতে পেলো—তার পরেই কুকুরটার করুণ আর্তনাদ। কোন রকমে উঠে দাঁড়াতেই আবার অবিরাম মুগুরের আঘাত! মাথা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিলো। তার ভেতর দিয়েই দেখলো—একজন কালো মানুষ নিজের চোখ হাতে ঢেকে রেখেছে। একজন সাদা মানুষ নিজের রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে কুণ্টার প্রিয় কুকুরটির মৃত-দেহের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাকী দুজন উদ্যত মুগুর হাতে কুণ্টার পাশে দাঁড়িয়ে। রাগে অন্ধ হয়ে কুণ্টা এক হাতে মুগুর ঠেকিয়ে অপর হাতে সাদা মানুষটিকে আক্রমণ করলো। ওঃ সাদা মানুষের গায়ে কি বিকট দুর্গন্ধ! তার বমি আসছিলো। হায়! এ কেমন করে সম্ভব হলো? সে আগে থেকে এদের শব্দ শুনতে পেলো না, গন্ধ শুঁকতে পেলো না, তার অন্তরাত্মা এ ভয়ঙ্কর বিপদের আভাস মাত্র পেলো না?

সেই মুহূর্তে আবার তার ওপর মুগুর বর্ষিত হলো। কুণ্টা নতজানু হয়ে বসে পড়লো। তার মাথা শতখণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম! দেহ অবশ, আয়ত্তহীন। নিজের অক্ষমতার রোষে তার হৃদয় জ্বলছিলো। পাণপণ শক্তিতে নিজেকে তুলে ধরে সে চিৎকার করে উঠলো। শূন্য আকাশে আক্রমণ চালালো। চোখের জলে, রক্তে, ঘামে একাকার হয়ে গেলো। এখন শুধু আত্মরক্ষা নয়। সমগ্র পৃথিবী তার কাছে হারিয়ে যাচ্ছে। অমোরো! বিণ্টা! ল্যামিন! সুওয়াডু! ম্যাডি!—

সাদা মানুষটির ভারী মুগুর তার রগে এসে লাগ্‌লো। বিণ্টা ও অমোরো কিণ্টের পরম আদরের ধন কিশোর কুণ্টার চোখের সামনে তার সতেরো বৎসরের পরিচিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লুপ্ত হয়ে গেলো!

চব্বিশ

সে কি পাগল হয়ে গিয়েছে? এ কি দুঃস্বপ্ন?

জ্ঞান ফিরে আসতে কুণ্টা কিছু বুঝে উঠতে পারছিলো না। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, স্যাঁতসেতে গরম, তীব্র দুর্গন্ধ। চিৎকার, কান্না, প্রার্থনা ও বমির একটা মিলিত উৎকট শব্দ। কুণ্টা উলঙ্গ! শিকলবদ্ধ অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার দু'পাশে দু'জন লোক। বুকের ও পেটের ওপর তার নিজের বমির বীভৎস গন্ধ। বন্দী অবস্থায় গত ক'দিনে যত মার খেয়েছে তার দরুণ সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। কাঁধের ওপর, যেখানে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে—সেখানেই যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশী।

একটা ইঁদুর তার গাল ছুঁয়ে গেলো। মুখের কাছে ইঁদুরের ছোঁকছোঁকানি টের পেয়ে সে অপরিসীম ঘৃণায় কুঁকড়ে গেলো। প্রচণ্ড ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতেই অবশ্য সেটা পালালো। কুণ্টার হাতের কবজি, পায়ের গোড়ালি শিকল দিয়ে পাশের লোকের সাথে বাঁধা। রোষে, ক্ষোভে নিজের শিকল ধরে টানাটানি করতেই পাশের লোকের হাতে পায়ে টান পড়ে। সেও তখন যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। রাগে, দুঃখে, যন্ত্রণায় মাথা তুলতেই দুম করে একটা কাঠে লেগে গেলো। মাথার সে জায়গাটা মুগুরের ঘায়ে আগেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছিলো। সে এবং পাশের অদেখা লোকটি—দুজনেই হাতের শিকল ভাঙবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে ঠুকছিলো, মনের দুঃখে চেঁচামেচি করছিলো। ক্লান্ত হয়ে আবার তারা ঢলে পড়লো। কুণ্টার বমি পাচ্ছিলো। ঠেকাবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হলো না। খালি পেটে শুধু খানিকটা টক তরল পদার্থ উদ্‌গীরণ করে সে নিজের মৃত্যু কামনা করলো।

নিজের অবশিষ্ট শক্তি এবং বুদ্ধি রক্ষা করতে হবে। কুণ্টা ভাবলো অনর্থক বল ক্ষয় করা ঠিক হবে না। খানিক বাদে নড়বার শক্তি ফিরে পেলে সে বাঁ হাত দিয়ে সাবধানে তার শেকলে বাঁধা ডান হাত ও পা ছুঁয়ে দেখলো। রক্ত পড়ছে।

শিকলটা আস্তে টেনে দেখলো—তার ডান হাত ও পা পাশের লোকটার বাঁ হাত ও পায়ের সাথে বাঁধা আছে। সে লোকটা সমানে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সকলেই এত কাছাকাছি যে পরস্পরের কাঁধ, হাত, পা ছুঁয়ে আছে।

কুণ্টা মাথার ওপরের কাঠটা মনে রেখে এবার আস্তে মাথা তুললো। উঠে বসবার মতো জায়গা নেই। মাথার পেছনে কাঠের দেওয়াল। তার মনে হলো সে যেন ফাঁদে পড়া চিতা বাঘ। কত বর্ষা আগে তাকে চোখ বেঁধে পুরুষত্ব শিক্ষা-কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সেখানে পেঁ ৗছে কুণ্টা অন্ধকারে চুপ করে বসে-ছিলো। সে কথা মনে পড়ে কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে চারিদিকের পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করলো। দূরে, কাছে সর্বত্র কেবল কান্না আর গোঙানির শব্দ। এই ঘন অন্ধকারে দূরে হোক, কাছে হোক, সবাই একই ঘরের ভেতর আছে তা বোঝা যাচ্ছে—যদি সত্যি এটা ঘর হয়। কান পেতে শুনে মনে হলো সে যেখানে শুয়ে আছে, সেই কাঠের পাটাতনের নীচে থেকেও চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে।

আর একটু মন দিয়ে শুনে সে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাও বুঝতে পারলো। ফুলানি উপজাতীর একজন আরবী ভাষায় বার বার চিৎকার করে বলছিলো 'বেহেস্তের আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন।' সেরেরে উপজাতির একজন তার পরিবারের প্রত্যেকের নাম ধরে পাগলের মতো বিলাপ করছিলো। বেশীর ভাগই মানডিনকা উপজাতির লোক। তারা সিরা কাঙো নামে পুরুষদের গোপন ভাষায় আবোল-তাবোল বকছিলো, সাদা মানুষদের জন্য ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাময় মৃত্যু কামনা করছিলো। অন্যদের কথা কান্নায় এত বিকৃত যে কুণ্টা তাদের বক্তব্য বা ভাষা ভালোভাবে বুঝতে পারছিলো না। কিছু কিছু অচেনা কথা গাম্বিয়া রাজ্যের বাইরের ভাষা।

এতক্ষণ কুণ্টা বহুকষ্টে মলত্যাগ আটকে রেখেছিলো। আর পারলো না। তার প্রবল চেষ্টা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীর থেকে মল জোর করে বেরিয়ে এসে সেই নরককুণ্ডের দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করলো। কুণ্টা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কোন্ পাপের ফলে সে এই শাস্তি ভোগ করছে? যেদিন সকালে তার ঢাকের জন্য কাঠ খুঁজতে বেরিয়েছিলো তারপর থেকে আর নামাজ পড়া হয়নি—সে কথা সত্যি। নতজানু হবার সাধ্য নেই। দিক জ্ঞানও নেই। তবুও সেই অবস্থায় সে চোখ বুজে আল্লাহের করুণা ভিক্ষা করলো।

—খুব ক্ষিদে পেয়েছে। বন্দী হবার পূর্ব রাত্রি থেকে আর খাওরা হয়নি। এর মাঝে সে ঘুমিয়েছে কি? সহসা সে যেন দেখতে পেলো—সে বনের ভেতর দিয়ে

একটা সরু পথে হেঁটে যাচ্ছে। তার পেছনে দু'জন কালো মানুষ। সামনে অদ্ভুত পোশাক পরা বিচিত্র বর্ণ লম্বা চুলের দুটো সাদা মানুষ। কুণ্টা চমকে জেগে উঠলো। হ্যাঁ, সে কখন অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। তখনও বুক ধ্বক ধ্বক করছে। কী দুঃস্বপ্ন! এই পূতিগন্ধময় অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকটাও কি দুঃস্বপ্ন? না, না, এটা সত্যি—দুটোই সত্যি। প্রবল অনীহা সত্ত্বেও তখন তার সব কথা মনে পড়ে গেলো।

গাছগুলো দেখতে গিয়ে ঝোপের ভেতরে সেই কালো গুপ্তচর দুটো আর সাদা মানুষগুলোর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। জ্ঞান ফিরে আসতে টের পেলো শত্রুরা তার মুখ আটকে দিয়েছে। চোখ বাঁধা। হাঁটতে পারার মত ঢিলা রেখে দুই পা শক্ত দড়ি দিয়ে জোড়া করে বাঁধা আছে। সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা। নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলেই শত্রুরা ধারালো কাঠ দিয়ে নির্দয় ভাবে খোঁচা মারছিলো। দরদর ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিলো। তাকে জোর করে দাঁড় করিয়ে এমন ভাবে পিঠে খোঁচা মারছিলো যে ঐ বাঁধা পায়ে হোঁচট খেতে খেতে তাকে যথাশক্তি দৌড়োতে হলো।

কিছুক্ষণ বাদে পায়ের নীচে নরম মাটির স্পর্শে আর অনুভবে কুণ্টা বুঝতে পারলো—তারা নদীর ধারে পেঁ ৗছেছে। সেখানে তাকে একটা নৌকোতে তোলা হয়। তখনো তার চোখ বাঁধা। একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করলেই সাদা মানুষগুলো তাকে মারছিলো। কালো মানুষগুলোই নৌকো চালায়। দ্রুতবেগে নৌকো চালিয়ে আবার একটা ডাঙ্গায় পেঁ ৗছোলো। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে কুণ্টাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা বাঁশের বেড়ার সাথে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে। এবার এক টানে তার চোখের বাঁধন খুলে দেয়—চারদিকে কিছু সাদা মানুষ। একজন তার মুখের কাছে একটা মাংস-খণ্ড ধরেছিলো। কুণ্টা মুখ ফিরিয়ে নিতে লোকটা রাগে গজরাতে গজরাতে তার গলা চেপে ধরে মুখ হাঁ করাবার চেষ্টা করে। কিছুতেই না পেরে কুণ্টার মুখে সে একটা ঘুষি কষিয়ে দেয়।

সকালবেলায় কুণ্টা দেখতে পেলো—তারই মত শেকলে বাঁধা আরো এগারো-জন বন্দী। তার মাঝে ছ'জন পুরুষ, তিনটি মেয়ে এবং দু'টি শিশু। সকলেই নগ্ন। কুণ্টা কখনো নগ্ন নারী দেখেনি। সে সঙ্কোচে মুখ ফিরিয়ে রাখলো। পুরুষদের চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা ও হত্যার স্পৃহা। সর্বাঙ্গে বেত্রাঘাতের রক্তাক্ত চিহ্ন। মেয়েরা কাঁদছিলো। একজন তাদের পুড়িয়ে দেওয়া গ্রামের আর প্রিয়জনেদের নাম ধরে

ডাকছিলো। অপর একজন নিজের কল্পিত শিশুকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে আদর করছিলো আর করুণ স্বরে বিলাপ করছিলো। তৃতীয় জন থেকে থেকে আর্তনাদ করে আল্লাহের কাছে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলো।

অসহ্য ক্রোধে কুন্টা তার বাঁধন খুলে ফেলবার চেষ্টা করতেই আবার মুগুরের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। জ্ঞান ফিরে আসতে দেখতে পেলো তাকেও নগ্ন করা হয়েছে। সকলের মাথা কামিয়ে ফেলেছে আর সারা দেহে তেল মাখানো হয়েছে। দুপুর নাগাদ আরো দু'জন সাদা মানুষ এলো। চর দু'টো এবার এক-গাল হেসে বন্দীদের বাঁধন খুলে দিয়ে তাদের সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে আদেশ করলো। রোষে শঙ্কায় কুন্টার দেহ কঠিন হয়ে উঠলো। নতুন সাদা মানুষদের মাঝে একজনের বেঁটে, শক্তসমর্থ চেহারা। তার চুল সাদা! অপরজনের লম্বা বিরাট চেহারা! মুখমণ্ডলে অনেকগুলো গভীর কাটার দাগ, কপালে ভ্রুকুটি। কিন্তু ভাবে মনে হলো সাদা চুলের লোকটির ভূমিকাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেকের দিকে এক নজর তাকিয়ে লোকটি কুন্টার দিকেই ইঙ্গিত করলো। ভয়ে পিছিয়ে যেতে পিঠের ওপর নিদারুণ কষাঘাতের যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠলো। একটা চর তাকে জোর করে ধরে নতজানু করালো। সাদা চুলের লোকটা কুন্টার ঠোঁট ফাঁক করে দাঁতগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে দেখলো। আর এক ঘা চাবুক মেরে তাকে উঠিয়ে দাঁড়া করানো হলো। লোকটা এক এক করে তার চোখ, বুক, পেট পর্যবেক্ষণ করে দেখলো। পুরুষাঙ্গে হাত পড়তেই কুন্টার কণ্ঠ থেকে আচমকা অবরুদ্ধ চিৎকার নিঃসৃত হলো। দুটো গুপ্তচর বেত মেরে এবার তাকে উবু করে দাঁড় করালো। কুন্টা সভয়ে অনুভব করলো তার পাছা ফাঁক করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কুন্টাকে অবহেলাভরে সরিয়ে দিয়ে অন্যদেরও একই ভাবে পরীক্ষা করা হলো। ক্রন্দনরতা মেয়ে তিনটিকেও। তাদের গোপন অঙ্গ পরীক্ষা করাও বাদ গেলো না। কঠোর শাসন আর কষাঘাতের তাড়নায় বন্দীদের আবার বাঁশের খাঁচায় পুরে ফেলা হলো।

সাদা চুল আর কাটা দাগ লোক দুটো একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিলো। তারপর এগিয়ে এসে অপর একটা সাদা মানুষকে ডাকলো। কুন্টা এবং আরো তিনটি পুরুষ ও দুটি মেয়েকে তাদের পছন্দ হয়েছে। অপর সাদা মানুষটি মহা বিপদগ্রস্ত ভাবে অন্য বন্দীদের দেখিয়ে কাকুতি মিনতি করতে থাকলো। কিন্তু সাদা চুল অটল। অবশেষে এ পক্ষের পীড়াপীড়িতে মহা

বিরক্ত হয়ে সে এক টুকরো কাগজে কিছু একটা লিখে দিলো। অন্য সাদা মানুষটা রাগতভাবে তাই মেনে নিলো।

চরগুলো কুণ্টাকে আবার জোর করে নীচু হয়ে সামনে ঝুঁকে বসতে বাধ্য করলো। কুণ্টা বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিফল হলো। ভয়ে বিস্ফারিত নয়নে সে তাকিয়ে দেখলো—একটা সাদা মানুষ গনগনে আগুন থেকে একটা লাল হয়ে যাওয়া লম্বা সরু লোহার শিক বার করছে। কাঁধের ওপর সেই প্রজ্বলন্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়ে অসহ্য বিস্ফোরক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কুণ্টা বিষম আর্তনাদ করতে লাগলো। একটি একটি করে বন্দীর অপরিসীম যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ আকুল আর্তনাদে বাঁশের ঝোপ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। কুণ্টা অপরের পিঠ দেখে বুঝতে পারলো একটা বিশেষ LL চিহ্ন সকলের গায়ে দেগে দেওয়া হয়েছে।

এক ঘণ্টার মধ্যে বন্দীদের শৃঙ্খলবদ্ধ করে এক সারিতে দাঁড়া করানো হলো। চরেরা বেত হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। যাত্রা শুরু হলো। গভীর রাত্রে যখন তারা নদীর ধারের বিরাট গরান গাছের ডালপালার নীচে লুকানো নৌকো দুটোর কাছে এসে পৌঁছোলো, ততক্ষণে কুণ্টার পিঠ ও কাঁধ চাবুকের অবিশ্রান্ত আঘাতে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। বন্দীদের দু'ভাগ করে সাদা মানুষের প্রহরায় নৌকোতে তোলা হলো।

দূরে রাত্রির অন্ধকারে কোনও বিশাল বস্তুর বহিরাকার দেখা যাচ্ছিলো। কুণ্টা মনে মনে ভাবলো—এই শেষ সুযোগ। চারিদিকের গোলমালের মাঝে সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মহা হৈ হৈ বাধিয়ে দিলো। নৌকো প্রায় উল্টে যায় আর কি! কিন্তু কুণ্টা অপরের সাথে শিকলে বাঁধা। বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। কুণ্টার বুকে, পিঠে, পেটে, মুখে, মাথায় চাবুক আর মুগুরের অবিরল আঘাত যেন সে গ্রাহ্যই করছিলো না। ব্যথার সাথে, তার মুখের ওপর গরম রক্তের ধারা অনুভব করছিলো। সাদা মানুষগুলোর চেঁচামেচিও শুনতে পাচ্ছিলো। নৌকোটা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন বিরাট জিনিসের গায়ে গিয়ে সাজোরে ধাক্কা দিলো। ততক্ষণে কুণ্টাকে দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা হয়েছে। তার আর কিছুমাত্র প্রতিরোধের শক্তি নেই। একটা অদ্ভুত দড়ির মই দিয়ে কুণ্টাকে ঠেলে, টেনে, হিঁচড়ে ওপরে তোলা হচ্ছিলো। আবার সে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিলো। নিজেকে মুক্ত করতে শেষ চেষ্টা করলো। আবার কষাঘাত। চারিদিকে অনেক-গুলো হাত তাকে জাপটে ধরলো। সাদা মানুষের গায়ের উৎকট দুর্গন্ধ তাকে

আচ্ছন্ন করলো। তাদের তীব্র কটূক্তি, আর মেয়েদের আকুল ক্রন্দন সে শুনতে পাচ্ছিলো।

ফুলে ওঠা ঠোঁট, আর রক্তঝরা মুখের ওপর বাহুর আড়াল দিয়ে কুণ্টা তার চারপাশে অনেকগুলো হাত ও পায়ের ভীড় দেখতে পেলো। উপর দিকে তাকাতে সেই সাদা চুল মানুষটাকে দেখা গেলো। সে নির্লিপ্ত মনে একটা ছোট্ট বইয়ের ভেতর পেন্সিল দিয়ে কি সব লিখছিলো। কুণ্টাকে এবার একটা মস্তবড় সমতল জায়গায় অবহেলা ভরে ছুঁড়ে ফেলা হলো। সেখানে অনেকগুলো মোটা কাপড় জড়ানো লম্বা সাদা খুঁটি। চওড়া সমতলটা থেকে আবার তাকে উঠিয়ে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিকষ অন্ধকার জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা অবিশ্বাস্য দুর্গন্ধ আর বহুজনের মিলিত অসহায় আর্তনাদ ও যন্ত্রণার চিৎকার তার নাক ও কানকে একসাথে আক্রমণ করলো।

ধাতুনির্মিত কাঠামোর মধ্যে একটা অনুজ্জ্বল হলদে আলো। সেটাকে আঙটা দিয়ে হাতে ঝুলিয়ে একজন সাদা মানুষ কুণ্টার হাত ও পা দু'পাশের দু'টি মানুষের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে দিলো। তারপর এক ধাক্কায় তাকে শুইয়ে ফেললো। দু'পাশের মানুষ দু'টি সমানে কাতর স্বরে কাতরাচ্ছিলো। সেই উৎকট নারকীয় পরিবেশের বীভৎসতায় কুণ্টা বমি করে ফেললো। আর কিছু সে মনে করতে পারছে না।

পঁচিশ

ডেকের দরজা খোলার শব্দ শুনে বুঝতে হতো সেটা রাত না দিন। তালা খুলবার শব্দ পেলেই সে মাথাটা যথাসম্ভব তুলতো। চারটে সাদা মানুষের ছায়ামূর্তি নেমে আসতো। দু'জনের হাতে দপদপে আলো আর চাবুক। আর দু'জন খাবারের টব ধরে নামাতো। মাঝখানের সরু গলি দিয়ে চলতে চলতে তারা প্রত্যেক বন্দীর পাশে একটা টিনের পাত্রে খাবার রেখে দিয়ে যেতো। ঐ কদর্য নোংরার ওপরেই খাবার রাখতো। কুণ্টা প্রতিদিন না খেয়ে মরবে বলে দাঁতে দাঁত চেপে থাকতো। কিন্তু জঠরের আগুন ক্রমেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো। প্রহারের যন্ত্রণার থেকেও যেন সেটা বেশী। কুণ্টাদের পাটাতনে খাবার দিয়ে লোকগুলো আরো নীচের পাটাতনে চলে যেতো।

মাঝে মাঝে নতুন বন্দী ধরে নিয়ে এসে শক্ত তক্তার ওপর খালি জায়গা-গুলোতে বেঁধে রাখতো। তারা ভয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকতো।

একদিন তাদের মাথার উপর ছাদে একটা নতুন ধরনের চাপা গুমগুমে শব্দ শুরু হলো। পুরো ছাদটা যেন কাঁপছিলো। কুণ্টা উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। আরো যারা শুনতে পেয়েছিলো, কান্না থামিয়ে সবাই ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। মাথার ওপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ। খুব ভারী কী একটা বস্তু খুব ধীরে ধীরে টেনে তোলার ক্যাঁচকেঁচে শব্দ।

কুণ্টা নগ্ন দেহে শক্ত, কর্কশ কাঠের যে তক্তার ওপর শুয়ে ছিলো, তার ভেতর দিয়ে একটা বিচিত্র শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। কুণ্টার বুকের ভেতর একটা উদ্বেগ ও কঠোর প্রতিরোধ ঘনিয়ে এলো—দেহ যেন পাথরের মতো কঠিন হয়ে এলো। চারিদিকে শৃঙ্খলের ঝনঝন শব্দ। বন্দীরা সকলেই যথাসাধ্য দেহ তুলে ধরে একটা অজানা আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে আছে। কুণ্টার শরীরের সকল রক্ত যেন মাথায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। পরমাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যায়। যে ভাবেই হোক, তারা বুঝতে পারছিলো, তাদের এই অস্থায়ী বাসস্থানটা নড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তাদেরকে সে জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। হতভাগ্যের দল কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে আহ্বান করে দয়া ভিক্ষা করতে লাগলো। কাঠের তক্তায়, লোহার শিকলে মাথা ঠুকে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

বুকফাটা আর্তনাদ, অসহায় কান্না, হৃদয় উজাড় করা প্রার্থনা আর থামে না। কুণ্টা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলো, তার জন্মভূমি আফ্রিকাকে সে জীবনে আর দেখতে পাবে না। ততক্ষণে কাঠের তক্তার ভেতর দিয়ে—তার দেহের ভেতর দিয়ে—একটা মৃদু দোলার গতি নিশ্চিতভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। চিৎকার করে করে কুণ্টার বাকশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সে শুধু মনে মনে তীক্ষ্ণ স্বরে অবিরত উচ্চারণ করছিলো—সাদা মানুষদের হত্যা কর, তাদের গুপ্তচর বিশ্বাস-ঘাতক কালোদেরও হত্যা কর।

যখন পাটাতনের ডালা খুলে গেলো, কুণ্টা আপনমনে নিঃশব্দে কাঁদছে। চারটা সাদা মানুষ খাবার নিয়ে নামছিলো। কুণ্টা দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষুধার যন্ত্রণা রোধ করবার চেষ্টা করলো। সহসা কিণ্টাঙোর একটা উপদেশ তার মনে পড়ে। যোদ্ধা এবং শিকারীদের অন্যদের থেকে বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দরকার। উপবাস করে থাকলে শরীরের শক্তি কমে যাবে। সাদা মানুষদের হত্যা করা কঠিন হবে। কুণ্টা এবার ঐ ঘন মণ্ডাকৃতি খাবারে হাত লাগালো। স্বাদে মনে

হয় নিকৃষ্ট জাতের ভুট্টা তেলে জলে সিদ্ধ করে দিয়েছে। অনেকদিন না খেয়ে তার গিলতেও কষ্ট হচ্ছিলো। তবুও জোর করে পুরোটা গলাধঃকরণ করলো। কিন্তু রাখা গেলো না। খাবারটা পেটে গিয়ে যেন দলা হয়ে জমে থাকলো। তারপরেই উপরে উঠে আসতে শুরু করলো। চেষ্টা করেও রোধ করা গেলো না। কাঠের তক্তার ওপরেই বমি হয়ে বেরিয়ে এলো। আওয়াজ শুনে কুণ্টা বুঝতে পারছিলো —অন্যরাও বমি করছে।

বাতিটা কাঠের লম্বা তাকের শেষপ্রান্তে পৌঁছোতে কুণ্টা একটা অদ্ভুত নাটক শুনতে পেলো। প্রথমে একটা শিকলের ঝনঝনানি আর মাথাকোটার শব্দ। তারপরেই একটা লোক মানডিনকা আর সাদা মানুষের ভাষার সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত ভাষায় পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠতেই টব হাতে সাদা মানুষটা অট্টহাস্য করে উঠলো। তার ইঙ্গিতে—যতক্ষণ না লোকটার চিৎকার বন্ধ হয়ে আসে, নির্মম কষাঘাত চলতে থাকে। এবার শুধু করুণ আর্তনাদ আর একটা মৃদু কান্নার আওয়াজ সেই অভিশপ্ত বদ্ধ পাটাতনের হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ব্যাপারটা কী? একজন বন্দী আফ্রিকাবাসী সাদা মানুষের ভাষা বলছে কেন? তবে কি এদের মাঝে কোনও বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর বন্দী হয়ে আছে? হ্যাঁ, তাই হবে। কুণ্টা শুনেছে এই শয়তান সাদা মানুষগুলো বিশ্বাস ভঙ্গ করে নিজেদের সাহায্যকারী কালো চরগুলোকেও কাজের শেষে বন্দী করে ফেলে।

শয়তানগুলো নীচের পাটাতনে নেমে গেলো। খালি টব হাতে উঠে এসে একেবারে ওপরের ডেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কেউ টুঁ শব্দটি করলো না। কিন্তু ডেকের দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র চারিদিকে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শুরু হলো। খানিক বাদে পাটাতনের শেষ প্রান্তে শিকলের ঝনঝনানির সাথে একটা প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার চিৎকার আর সেই একই কণ্ঠের উত্তেজিত তিক্ত অভিশাপ। আবার প্রচণ্ড মার ও অসহায় আর্তনাদ সামান্য নীরবতার পরে সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করে একটা তীক্ষ্ণ আকুল চিৎকার এবং ভয়ানক দম আটকানোর শব্দ,—যেন কারো শ্বাস রুদ্ধ করা হচ্ছে। আবার শিকলের ঝনঝনানি আর শক্ত কাঠের ওপর পা দাবড়ানির শব্দ। তারপর নিথর নিস্তব্ধতা।

কুণ্টার মাথা ঝিমঝিম করছিলো। হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করছিলো। চারিদিকে চিৎকার—'গুপ্তচর'। গুপ্তচরের মরাই উচিত!' ঐ গোলমালের মাঝে কুণ্টাও কখন অন্যদের সাথে চেঁচাতে শুরু করেছে! সহসা পাটাতনের দরজা খুলে গেলো। ভেতরের গোলমাল শুনে কয়েকটি সাদা মানুষ আলো আর চাবুক হাতে নেমে

এসেছে। ততক্ষণে অবশ্য চারিদিক নিস্তব্ধ। সাদা মানুষগুলো মৃতদেহের সন্ধান পেলো না। খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে, অকারণে ডাইনে বাঁয়ে যাকে খুশী কষাঘাত করে চলে গেলো। দীর্ঘকাল সকলে নীরব। অবশেষে মৃতের পার্শ্ববর্তী বন্দী অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে হেসে উঠলো।

পরের বার খাবার নিয়ে আসতে বন্দীরা সকলেই মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে ছিলো। যেন কিছু একটা সন্দেহ করেই কষাঘাতের সংখ্যা বেড়ে গেলো। মৃতদেহ আবিষ্কার করে সাদা মানুষগুলোর উত্তেজিত কথাবার্তা, আনাগোনা বেড়ে গেলো। হাতকড়া ও শিকল খোলার শব্দ শোনা গেলো। হতভাগ্যের দেহাবশেষ খানিকটা বয়ে, খানিকটা টেনে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর তার পাশের বন্দীর ওপর এলোপাথাড়ি বেপরোয়া কষাঘাত। লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলো। বিন্দুমাত্র শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরোলো না। মার খাওয়া লোকের যন্ত্রণার চিৎকার না শুনলে এদের রাগ বেড়ে যায়। সাদা মানুষগুলো ক্রোধে আপ্রাণ চেঁচিয়ে গালিগালাজ করছিলো। একজন ক্লান্ত হয়ে পড়লে আর একজন তার হাত থেকে চাবুক নিয়ে মার চালিয়ে যাচ্ছিলো। সেই অকথ্য অত্যাচার সহ্যের অতীত হতে লোকটা চেঁচাতে শুরু করলো। ভাষা শুনে বোঝা গেলো লোকটা ফাউলা উপজাতির লোক। কুণ্টার মনে পড়লো শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের জন্য ফাউলা উপজাতি খ্যাত। অবশেষে লোকটার চেঁচানোর ক্ষমতাও নিঃশেষ হয়ে গেলো। সাদা মানুষগুলো ক্লান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে, কটুবাক্য বর্ষণ করতে করতে, দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে কোনক্রমে উপরে উঠে গেলো।

ফাউলা লোকটির গোঙানিতে চারিদিক বিদীর্ণ হচ্ছিলো। তারই মাঝে মানডিনকা ভাষায় একটি পরিষ্কার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'সকলে এর বেদনা ভাগ করে নাও। এখানে আমরা এক গ্রামবাসীর মতো।'

এ কোন বয়োজ্যেষ্ঠের কথা। যথার্থ বলেছে। ফাউলা উপজাতির লোকটির সাথে কুণ্টাও দুঃখ ভোগ করছিলো। ক্রোধে তার অন্তরাত্মা জ্বলে যাচ্ছিলো। আবার তার দেহের কোষে কোষে একটা অজানা আশঙ্কার শিহরণও বইছিলো। কখনো বা সে নিজের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করছিলো। কিন্তু না। তাকে প্রতিশোধ নিতে হবে। তার সামনে দু'টি মাত্র বিকল্প। হয় তারা সবাই এই কল্পনাতীত বীভৎসতার মধ্যে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করবে, নতুবা যে কোন প্রকারে এই শয়তানগুলোকে পরাভূত করে হত্যা করতে হবে।

ছাব্বিশ

সেই অচিন্ত্যনীয় কদর্য অপরিচ্ছন্নতার মাঝে মাছি, উকুন অবাধে বৃদ্ধি পেয়ে হাজার হাজার সংখ্যায় পুরো পাটাতন আচ্ছন্ন করে ফেললো। তাদের দংশনের যন্ত্রণা, চুলকানি ক্রমশঃ বাড়ছিলো। শরীরের খাঁজে যে সব জায়গায় চুল জন্মায় সেখানেই এদের অত্যাচার বেশী। দেহ যেন জ্বলে যায়।

কুণ্টার কতবার মনে হয়েছে—উঠে ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু অসহায় রাগে চোখে জল ভরে আসে। নিজের জায়গা থেকে সরে যাবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। ইচ্ছা করে দাঁতের কামড়ে শিকল চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। বন্দীদের মাঝে অনেকেই ইতিমধ্যে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে—তাদের আবোল তাবোল বকুনি শুনলেই তা বোঝা যায়।

কুণ্টাকে বুদ্ধি স্থির রাখতে হবে। এমন কিছুতে মন নিবিষ্ট রাখতে হবে যাতে এই দৈহিক ও মানসিক দুর্ভোগের চিন্তাতেই সর্বক্ষণ আবদ্ধ না থাকে। সে দূরের শব্দ শোনাতে তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলো। কিছুদিনের মধ্যেই কোন্ শব্দ কতদূর থেকে এবং কোথা থেকে আসছে, সে নির্ভুলভাবে স্থির করতে শিখলো। পাশের লোকের নিঃশ্বাসের শব্দে নিদ্রিত কি জাগ্রত বুঝতে পারতো। তার কানই চোখের কাজ করতে অভ্যস্ত হলো। সেই অন্ধকার রাজত্বে শুধু কটূক্তি আর যন্ত্রণার ধ্বনি ছাড়াও সে কাঠের ওপরে মানুষের মাথা কোটার শব্দ শুনতে পেতো। আরো একটা টানা, অদ্ভুত শব্দ শোনা যেতো। দু'খণ্ড ধাতুর ঘর্ষণের শব্দ। কেউ যেন ঘষে ঘষে তার শিকল ক্ষয় করে ফেলার চেষ্টা করছে। আবার শিকলের ঝনঝনানি আর নানা মন্তব্য শুনে বোঝা যেতো—দু'জনের মাঝে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে।

কুণ্টা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। মলমূত্র বমির দুর্গন্ধে চারিদিক বিষাক্ত। কাঠের যে তক্তাগুলোর উপর তারা শুয়ে থাকে, সেগুলো এসব আবর্জনার একটা মিশ্রিত ক্লেদে পরিপ্লুত। অবস্থা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, তখন একদিন চারটা সাদা মানুষ চিৎকার করে গালিগালাজ দিতে দিতে কতকগুলো লম্বা হাতলওয়ালা খুরপির মতো জিনিষ আর চারটে বড় টব নিয়ে নেমে এলো। অবাক কাণ্ড! তারা প্রত্যেকেই বিবস্ত্র! উলঙ্গ সাদা মানুষগুলো প্রথমেই বমি করতে শুরু করলো। তারপর সেই লম্বা হাতলওয়ালা খুরপিগুলো দিয়ে তক্তার ওপর থেকে নোংরাগুলো টেনে টবে ভর্তি করতে লাগলো। টব ভর্তি হয়ে গেলে ওপরে নিয়ে গিয়ে খালি করে আনছিলো। উৎকট পরিবেশে তাদের

মুখ ভয়ানক বিকৃত। বহু কষ্টে নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে কাজ করছিলো। তাদের বিবর্ণ দেহে নোংরা লেগে আরো বীভৎস দেখাচ্ছিলো। লোকগুলো কাজ শেষ করে চলে গেলো। কিন্তু ভেতরের শ্বাসরোধকারী উষ্ণ আর্দ্র দূষিত আবহাওয়ার কিছুমাত্র উন্নতি হলো না।

এর পরে একসাথে প্রায় গোটা কুড়ি সাদা মানুষ নেমে এলো। তাদের হাতে চাবুক, বন্দুক। চারিদিকে তালা খোলার শব্দ আর শিকলের ঝনঝনানি শুনে ভয়ে কুণ্টার বুক শুকিয়ে গেলো। এ আবার কী ব্যাপার? আবার কোন্ ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের প্রস্তুতি! বন্দীদের পায়ের শৃঙ্খল খুলে দেওয়া হলো। সব শিকল খোলা হয়ে গেলে সাদা মানুষগুলো চাবুক আছড়ে চিৎকার করতে শুরু করলো। অর্থাৎ এদের উঠতে বলছে। উঠতে গিয়ে ওপরের কাঠে মাথায় ঠোকর লেগে প্রত্যেকেই ব্যথায় নিজ নিজ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠছিলো। অজস্র ঘুষি আর কষাঘাতের ভেতর এরা কোনক্রমে সেই ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল পথে উঠে দাঁড়ালো। সাদা মানুষগুলো কঠোর হাতে টেনে দু'জন দু'জন করে লাইন করে দিলো। তারপর চাবুক মেরে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ডেকে উঠবার সিঁড়ির দিকে চালিত করলো। পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছিলো। কিন্তু দু'জন করে বন্দীর কবজি তখনো শিকলে বাঁধা। কুণ্টা একটি ওলফ জাতীয় বন্দীর সাথে আবদ্ধ। সকলেই উলঙ্গ ক্লেদাক্ত।

প্রায় পনেরো দিন পর বাইরের দিনের আলো কুণ্টার চোখে শারীরিক আঘাতের মতো সজোরে এসে লাগলো। দেহের যন্ত্রণা সামলে খোলা হাতটা দিয়ে কোনক্রমে চোখে ঢাকা দিলো। নগ্ন পায়ে টের পাচ্ছিলো—নীচের বস্তুটা মৃদু মৃদু দুলছে। নাসারন্ধ্র নোংরাতে প্রায় রুদ্ধ। অন্ধের মতো হোঁচট খেতে খেতে বহু কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। ফাটা ঠোঁটে হাঁ করে সে দীর্ঘ গভীর শ্বাস টেনে নিলো। জীবনে এই প্রথম সমুদ্রের নির্মল হাওয়া গ্রহণ। এই অকল্পনীয় বিশুদ্ধতায় তার ফুসফুস প্রবলভাবে আলোড়িত হলো। কুণ্টা দেহের উপর আয়ত্ত হারিয়ে ফেললো। পাকস্থলী মুহূর্তে সব কিছু বার করে দিলো। কুণ্টা তার সঙ্গীর সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। চারিদিকে বমির শব্দ, নরম মাংসের ওপর চাবুকের আওয়াজ, সাদা মানুষের ক্রুদ্ধ শাসানি আর বন্দীদের আর্তনাদ। মাথার ওপর একটা বিচিত্র পাখা ঝাপটানোর একটানা শব্দ!

অত্যাচারের সীমা ছিলো না। নির্মম কষাঘাতে কুণ্টা ও তার ওলফ সঙ্গীর পিঠ কেটে যাচ্ছিলো। মার এড়াবার চেষ্টায় চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে শয়তানগুলো মাথায় বাড়ি লাগালো। কুণ্টা ঝাপসা ভাবে

দেখতে পেলো—প্রতিটি বন্দীর পায়ের শেকলের ভেতর দিয়ে একটা লম্বা চেন ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নীচে যত সাদা মানুষ দেখা গিয়েছিলো ওপরে তারা সংখ্যায় অনেক বেশী। উজ্জ্বল সূর্যালোকে তাদের আরো বিবর্ণ, আরো ভয়ানক কুৎসিত দেখাচ্ছে। সারা মুখে রোগের কদর্য ক্ষত চিহ্ন। অদ্ভুত লম্বা চুলগুলো বিচিত্র বর্ণ—হলুদ, লাল, কালো। কারো কারো মুখে, চিবুকের নীচেও চুল। কেউ বা হার-জিরজিরে, কেউ অতিরিক্ত মোটা। কারো মুখে বিশ্রী কাটার দাগ। কারো একটা হাত, বা চোখ বা একটা অঙ্গ নেই। অনেকেরই সারা পিঠে কষাঘাতের গভীর চিহ্ন। বেশীর ভাগেরই সামান্য ক'টি মাত্র দাঁত অবশিষ্ট আছে। মুহূর্তে কুণ্টার মনে পড়ে গেলো—ওরা কী ভাবে তাদের দাঁতগুলো পরীক্ষা করছিলো।

রেলিঙের ধারে ধারে মানুষগুলো পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে চাবুক বা লম্বা ছুরি। কারো হাতে একটা ভারী ধাতুর লাঠি। তার একপ্রান্তে ফুটো। আর সকলের পেছনে এক অকল্পনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, অবিস্মরণীয় দৃশ্য। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অনন্ত নীল বারি রাশি! কোনদিকে তার কূল-কিনারা দেখা যায় না। মাথার ওপর সেই পাখা ঝাপটানোর শব্দের দিকে তাকিয়ে কুণ্টা দেখতে পেলো—একাধিক বিশাল সাদা কাপড় বিরাট বিরাট লম্বা খুঁটিতে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাপড়-গুলো হাওয়া লেগে ফুলে উঠেছে। প্রকাণ্ড নৌকোটা মাঝখানে উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে বিভক্ত। বাঁশের অবরোধের ঠিক মাঝখানে ভয়ঙ্কর দর্শন ধাতুর তৈরী একটা বিশাল কালো মুখ। তাতে মস্ত মোটা, ফাঁপা একখানা লম্বা কাণ্ড লাগানো আছে। আশে পাশে আরো অনেক ধাতুর দণ্ড। সবগুলোই এই নিরস্ত্র, নগ্ন বন্দী-দের দিকে মুখ করে রাখা।

একটা লম্বা চেন দিয়ে তাদের সকলের পায়ের শিকল একত্র আবদ্ধ করা হচ্ছিলো। কুণ্টা এবার তার পাশের বন্দীটির দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলো। অমোরোর বয়সী লোক। তার চেহারায় ওলফ উপজাতির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। গায়ের রঙ ঘোরতর কৃষ্ণ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা গা নোংরা মাখানো। তার পিঠে কষাঘাতের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিলো। আর যেখানে গরম লোহা দিয়ে LL চিহ্ন দেগে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে পুঁজ গড়াচ্ছে। ওলফটিও একই বিস্ময়-ভরা চোখে কুণ্টাকে দেখছিলো। এবার অন্য বন্দীদের দিকে তাকাবার সুযোগ হলো। বেশীর ভাগই ভয়ে কাঁপছে। অর্থহীন বকছে। চেহারা, উপজাতিগত বিশেষ উল্কি, মানতের চিহ্ন ইত্যাদি দেখে বোঝা যাচ্ছিলো—ফাউলা, জোলা, সেরেরে, ওলফ সব রকম লোকই এর মাঝে আছে। তবে মানডিনকা উপজাতির লোকই বেশী।

কিছু কিছু বন্দীকে বালতি করে সমুদ্রের জল তুলে স্নান করানো হচ্ছিলো। কিছু সাদা মানুষ লম্বা হাতলের বুরুশ দিয়ে ওদের ঘষছিলো—ওরা যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছিলো। কুণ্টার কাটা ও পোড়া ঘায়ে ঐ লবণাক্ত জল পড়তে সেও যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো। শক্ত বুরুশের ঘষায় শুধু গায়ের সাথে সেঁটে থাকা জমা নোংরা গুলো খসে পড়ছিলো না, ক্ষতের মুখেও খুলে যাচ্ছিলো। রক্ত ও পুঁজ মেশানো জল গড়িয়ে পড়ছিলো। স্নান হয়ে গেলে বন্দীদের ডেকের মাঝখানে জড়ো করা হলো। এত কষ্ট সত্ত্বেও সূর্যের তাপে কুণ্টার আরাম হচ্ছিলো—নিজেকে অনেক দিন পর ভারী পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছিলো।

প্রায় কুড়িটি অল্পবয়সী মেয়ে ও চারটি বালক বালিকা অবরোধের অপর প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এলো। সকলেই নগ্ন ও শৃঙ্খলমুক্ত। পেছনে, চাবুক হাতে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে দু'টি সাদা মানুষ। সাদা মানুষগুলো সবাই বিবস্ত্র মেয়ে-গুলোকে দেখে বিদ্রূপ ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করছিলো। রাগে কুণ্টার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিলো। অতিকষ্টে সে মুখ ফিরিয়ে থাকলো।

রেলিঙের ধারের একটা সাদা মানুষ একধরনের ভাঁজ করা জিনিস একবার টেনে, একবার বন্ধ করে অদ্ভুত ফোঁস ফোঁস শব্দ বার করছিলো। আর একজন একটা আফ্রিকার ঢাক বাজাতে শুরু করলো। দুটো লোক লম্বা দড়ি ধরে থাকলো। বাকীরা এলোমেলো দাঁড়িয়ে এক পা দড়ির ভেতরে দিয়ে তালে তালে লাফাতে লাগলো—যেন বন্দীদের পায়ের লম্বা চেন সত্ত্বেও ঐভাবে লাফাতে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু বন্দীরা ভয়ে অনড় হয়ে রইলো। এবার সাদা মানুষদের মুখের হাসি ভ্রূকুটিতে পরিণত হলো। তারা চাবুক আছড়াতে লাগলো।

মেয়েদের মাঝে সবচেয়ে বয়স্কাটি বিণ্টার বয়সী হবে। সে হঠাৎ মানডিনকা ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো—

'লাফাও।'

বলে সে নিজেও লাফাতে শুরু করলো। তার চকিত দৃষ্টিতে অগ্নি বর্ষিত হচ্ছিলো। সে মেয়েদের আর বালক বালিকাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতে তারাও লাফাতে শুরু করলো। এবার সে নগ্ন পুরুষদের দিকে তাকিয়ে আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বললো—

'লাফাও! সাদা মানুষদের হত্যা কর।' যুদ্ধের নাচের ভঙ্গীতে সে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

তার কথার তাৎপর্য মস্তিষ্কে ঢুকতে একটু সময় লাগলো। তারপর শিকলে

বাঁধা পুরুষেরাও একে একে লাফাতে শুরু করলো—প্রথম দুর্বল পায়ে হোঁচট খেতে খেতে, ক্রমশঃ সহজ ভাবে। ডেকের ওপর শিকলের ঝনঝন আওয়াজ হতে থাকলো। বয়স্কা মহিলার গানের সাথে ক্রমশঃ মেয়েরাও গলা মেলালো। গানের মধুর স্বরে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকলো তার কথাগুলোর ভেতর নিষ্ঠুরতার বিবরণ। তাতে ছিলো—মেয়েদের সাথে সাদা মানুষগুলোর নৃশংস শয়তানীর কাহিনী। প্রতি রাত্রে তারা মেয়েদের টেনে নিয়ে যায়। তাদের সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করে—যথেচ্ছ উপভোগ করে! স্মিত মুখে, হাসতে হাসতে তারা চিৎকার করছিলো—

'সাদা মানুষ মারো!'

নগ্ন পুরুষেরাও লাফাতে লাফাতে তাতে যোগ দিলো 'সাদা মানুষ মারো!'

সাদা মানুষগুলো কিছু না বুঝেই হাসছিলো আর মহা ফূর্তিতে তালে তালে হাততালি দিচ্ছিলো।

সহসা কুণ্টার গলা শুকিয়ে গেলো। সেই বেঁটে সাদাচুল আর লম্বা দাগী মুখের সাদামানুষ দুটো কোথা থেকে আবির্ভূত হয়েছে। এদেরই সামনে কুণ্টাকে অমানুষিক প্রহার করা হয়েছে, গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে। সব বন্দীরাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। অবশিষ্ট সাদা মানুষগুলোও একটু তটস্থ হয়ে উঠলো।

'লোকদু'টো রুক্ষস্বরে অন্য সাদা মানুষগুলোকে সরিয়ে বন্দীদের কাছে এসে তাদের সর্বাঙ্গ ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলো। কষাঘাতের ক্ষত, ইঁদুরের কামড়ে বিষাক্ত পুঁজ গড়ানো ঘা, পোড়া জায়গা—সবগুলোতে একটা বিরাট কৌটো থেকে মলম বার করে লাগালো। হাতে পায়ে শিকলের ঘষা লেগে লেগে কুৎসিত, বিবর্ণ জায়গাগুলোতে একটা টিন থেকে হলদে পাউডার ছড়িয়ে দিলো।

সহসা চারিদিকের চিৎকার হৈ চৈ-এর মাঝে একটি বন্দিনী মেয়ে কোনক্রমে রক্ষীদের হাত ছাড়িয়ে রেলিঙ টপকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মহা উদ্বিগ্ন হয়ে সবাই জলের দিকে তাকিয়ে রইলো। হতভাগিনী ঢেউয়ের সাথে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। একটু পরেই দূরে একজোড়া গাঢ় রঙের চ্যাপ্টা ডানা দ্রুত মেয়েটির দিকে এগিয়ে এলো। এরপর একটা রক্ত ঠাণ্ডা করা তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী চিৎকার। খানিকক্ষণ ঝাপটা-ঝাপটি। তারপর আর কিছু নেই। শুধু খানিকটা প্রগাঢ় রক্ত-চিহ্ন অশান্ত জলরাশির ওপর প্রকট হয়ে উঠলো।

ঘটনার ভয়ঙ্করতায় বিমূঢ় বন্দীদের সেদিন বিনা আয়াসেই আবার শিকলে বেঁধে নীচে নিয়ে যাওয়া গেলো। বাইরের খোলা হাওয়ার পর ভেতরের দুর্গন্ধ

আরো অসহ্য বোধ হচ্ছিলো। উন্মুক্ত সূর্যালোকের তুলনায় নীচে পাটাতনের ভেতরের অন্ধকার যেন আরো দুর্ভেদ্য!

সাতাশ

এরপর থেকে বন্দীদের মাঝে মাঝেই ওপরে নিয়ে যাওয়া হতো। চলতে ফিরতে নির্মম কষাঘাত। লাথিও চলে। দুর্বল দেহে চাবুক যেন ছুরির মতো কেটে বসে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল গায়ে পড়লে ক্ষতগুলো আগুনের মতো জলতে থাকে। এলোপাথাড়ি লাথির ঘায়ে শেকলে বাঁধা কুণ্টা আর তার ওলফ সাথীটি কখনো বা ডেকে আছড়ে পড়ে। ক্রোধে বিদ্বেষে মন উন্মত্ত হয়ে ওঠে, সাদা মানুষগুলোকে খুন করবার অদম্য ইচ্ছায় হৃৎপিণ্ড দাপাদাপি করতে থাকে। তা সত্বেও একান্ত অনিচ্ছুক দেহ মন নিয়ে তারা বাজনার সাথে তালে তালে লাফায়।

কয়েকদিন পর পরই আটজন উলঙ্গ সাদা মানুষ টব হাতে পাটাতনের ভেতরের নোংরা পরিষ্কার করতে আসে। যত দিন যাচ্ছে ময়লার পরিমাণ বাড়ছে। বন্দীরা ক্রমশঃই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তরল ময়লা তক্তা থেকে চুঁয়ে মাঝখানের সরু চলার পথে পড়ছে। শয়তানগুলো সেই পিচ্ছিল ক্লেদে আছাড় খেয়ে পড়ে গালিগালাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

একটি বন্দীর পা বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। পাটাতনের ভেতর অন্ধকারে অসহ্য যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর কান্নাকাটি করছিলো। ওপরে নিয়ে গিয়ে দেখা গেলো— তার পায়ে পচন ধরেছে। নির্মল বাতাসেও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সেদিন তাকে আর নীচে নিয়ে যাওয়া হলো না। পরদিন মেয়েরা গানের মাধ্যমে জানালো— লোকটার পা কেটে ফেলা হয়েছিলো। কিন্তু তাতেও তাকে বাঁচানো যায়নি। অবশেষে হতভাগ্যের দেহ সাগরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

দিনে দিনে বন্দীদের ভেতর একতাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা চলছিলো। এক ভাষার একটি বিশেষ কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে ভাষান্তরিত হয়। এভাবে প্রত্যেকে অন্যান্য উপভাষার সাথে পরিচিত হয়ে উঠছিলো। ভিন্ন গ্রাম বা গোষ্ঠীভুক্ত হলেও বন্দীরা সকলেই একই দেশ বা জাতির অন্তর্গত—পরস্পরের নিকট সম্বন্ধ—এই বোধ ক্রমশঃই বাড়ছিলো। সারা পাটাতন জুড়ে প্রশ্ন ও উত্তর চলতে থাকে।

'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?'

অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে উত্তর আসে—

'কে কবে সে জাহান্নাম থেকে ফিরে এসেছে, যে জানতে পারবো ?'

'কতদিন হলো ?'

একটি বন্দীর কাছাকাছি একটি ছোট ঘুলঘুলি ছিলো। সে জানালো যে সে আঠারোবার প্রভাত হতে দেখেছে।

'এখানে বারাকুণ্ডা গ্রামের কেউ আছে ?'

কথাটা মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে একজনের কাছ থেকে উৎকণ্ঠিত উত্তর এলো—

'আমি জেবন সাল্লা, আমি আছি।'

'জুফরে গ্রামের কেউ আছে?'

কুণ্টা মহা উত্তেজিত হয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো—'হ্যাঁ, আমি কুণ্টা কিণ্টে —জুফরে গ্রামের।'

নামটা মুখে মুখে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। অবশেষে একজন বললো—

'হ্যাঁ, একটি শোকাহত গ্রামের ঢাকে এই নাম শুনেছি।'

কুণ্টা কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার অশ্রুপ্লাবিত চোখের সামনে শোকাহত গ্রামটির ছবি ভেসে উঠলো। মানডিনকা জাতির বিশ্বাস—এ পরিস্থিতিতে একটি সাদা মোরগের গলা কেটে ছেড়ে দিতে হয়। যদি মোরগটি চিত হয়ে মারা যায়—তবে বুঝে নিতে হবে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অমোরো, বিণ্টা, ল্যামিন, স্থওয়াডু এমন কি ছোট্ট ম্যাডি পর্যন্ত—মোরগটিকে ঘিরে বসে আছে, সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে—কল্পনায় এ দৃশ্য কুণ্টাকে অপরিসীম যন্ত্রণা দিলো। সবাই কাঁদছে—আর গ্রামের ঢাকে এই শোকবার্তা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে—গ্রামের প্রিয় সন্তান কুণ্টা কিণ্টে চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছে।

একটি প্রশ্ন কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। 'এ নৌকোর সাদা মানুষগুলোকে কীভাবে হত্যা করা যায় ? কারো কোন উপায় জানা আছে ?'

'ডেকের ওপর কেউ কি শয়তানগুলোর কোন অসতর্কতা বা দুর্বলতা লক্ষ্য করেছে ?'

না, এ প্রশ্নগুলোর সদুত্তর কারো জানা ছিলো না। মেয়েদের গানের মাধ্যমেই যা কিছু খবর মিলতো। এ নৌকোটায় গোটা ত্রিশ সাদা মানুষ আছে। আরো পাঁচটা ছিলো। তারা মারা যেতে জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। সে সময় সাদা চুলের মানুষটা একটা বই থেকে কী যেন পড়ছিলো।

অবশেষে নীচের পাটাতনের বন্দীদের সাথেও যোগাযোগ স্থাপিত হলো।

'নীচে তোমরা ক'জন আছো ?'

'ষাট জন হবে।'

এ ভাবে খবরের আদান-প্রদানই বেঁচে থাকবার একমাত্র আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ালো। নতুন কোন খবর না থাকলে তারা পরস্পরের কাছে, নিজেদের গ্রাম, পেশা, চাষের জমি, পরিবার সম্পর্কে গল্প করে। কবে এবং কীভাবে সাদা মানুষ-গুলোকে আক্রমণ করা হবে—তাই নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। কারো মতে অবিলম্বে আক্রমণ করা উচিত। কেউ বা উপযুক্ত সুযোগের পক্ষপাতী। অবশেষে এক বয়োজ্যেষ্ঠর গলা শোনা গেলো।

'শোন ! আমাদের ভাষা বা গোষ্ঠি আলাদা হতে পারে। কিন্তু আমরা একই জাতি। এখানে আমাদের একই গ্রামবাসীর মতো ব্যবহার করতে হবে।'

একটু পরে আবার শোনা গেলো—

'প্রথমে আমাদের একজন দলপতি নির্বাচন করতে হবে। তারপর সর্বসম্মতি-ক্রমে একটি পরিকল্পনা ভেবে নিয়ে এগোতে হবে।'

এই একতাবোধ কুন্টাকে আশ্বস্ত করলো। তার মনে কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিলো। নোংরা ও দুর্গন্ধ, ইঁদুর ও উকুনের যন্ত্রণাও যেন খানিকটা ভুলিয়ে দিলো। কিন্তু মেয়েরা গানের মাধ্যমে জানিয়ে দিলো—নীচের পাটাতনে সম্ভবত আর একটি গুপ্তচর বাঁধা আছে। ষড়যন্ত্রের কথা সাদা মানুষদের সে-ই আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারে।

এতদিনে কুন্টা বুঝতে পারলো—তাদের গ্রামে বয়োজ্যেষ্ঠদের সভায় বড়রা সবাই, অমোরোও গুপ্তচর নিয়ে এত মাথা ঘামাতো কেন। চারিদিকে এত গুপ্তচর থাকতে পারে, কুন্টারা কল্পনাই করতে পারতো না। অন্ধকারের ভেতর সে যেন তার বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলো। ল্যামিন ও কুন্টাকে কঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন —কখনো একা না ঘুরে বেড়াতে। কুন্টা কেন সে আদেশ মানে নি ! আর তো কখনো সে তার বাবার কথা শুনবার সুযোগ পাবে না। এমন করে কেউ কখনো সস্নেহ নির্দেশও দেবে না। এখন থেকে নিজের ভাবনা নিজেকেই ভাবতে হবে।

আটাশ

ডেকের ওপর মেয়েরা গানের মাধ্যমে জানালো—তারা কয়েকটা ছুরি চুরি করে

লুকিয়ে রেখেছে। বন্দীদের মাঝে কিন্তু মতের পার্থক্য বেড়েছে।—মুখে উল্কি আঁকা ভয়ঙ্কর দর্শন একটি ওলফ এক দলের নেতা। তার মতে সাদা মানুষদের অবিলম্বে আক্রমণ করা উচিত। দিনের বেলায় ডেকের ওপরে যখন সে শিকল বাঁধা পায়ে উদ্দাম নাচে, তখন সে সাদা মানুষগুলোর দিকে ধারালো দাঁত বার করে তাকায়। ওরা ভাবে সে বুঝি হাসছে, তাই হাততালি দিতে থাকে। অপর দলের নেতা একটি ফাউলা। কালো গুপ্তচরটিকে সে-ই খুন করেছিলো। তার মতে আরো রয়ে সয়ে সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

যে দলের মতেই কাজ হোক, কুণ্টা এ কাজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তার স্বজন বা দেশকে দেখতে পাবার আর কোনও আশা নেই। এ দুঃসহ জীবন রেখেই বা কী লাভ! একমাত্র আশঙ্কা—অন্ততঃ একটি সাদা মানুষকে নিজের হাতে হত্যা করবার সুযোগ যদি না মেলে। সেটাই তার বর্তমান জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। কুণ্টা অবশ্য মনে মনে ফাউলা লোকটির অনুগামী। ফাউলা উপজাতির লোকেরা নিজেদের সঙ্কল্পের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত—মানডিনকারা তা ভালোভাবেই জানে। প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা তারা সারা জীবনেও ভোলে না। অনেক সময় এক পুরুষের সাধিত অন্যায়ের প্রতিশোধ পরবর্তী পুরুষেরা নেয়। কিন্তু হত্যার বদলে হত্যা না করতে পারা পর্যন্ত শান্তি হয় না।

ফাউলার অনুগামীরাই বেশী হলো। তাদের প্রতি দলপতির প্রথম নির্দেশ—শ্যেনদৃষ্টিতে সাদা মানুষদের গতিবিধি লক্ষ্য করবে। বন্দিনী মেয়েরা পরামর্শ দিয়েছে—ডেকের ওপর লাফাবার সময় হাসিখুশী ভাব দেখাতে। সে পরামর্শমত চলাই ভালো। তাতে সাদা মানুষগুলোর সতর্কতা কমে আসবে। অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা যায়, এমন যে কোন বস্তু দেখতে পেলে তার ওপর সদাসতর্ক নজর রাখতে হবে—যাতে প্রয়োজনের সময় সেটি ব্যবহার করা যায়। কুণ্টা ওপরে রেলিঙের ধারে একটি তীক্ষ্ণ মুখ লোহার শলা দেখেছিলো। কবে সেটা বর্শার মতো একটা সাদা শয়তানের পেটে বসিয়ে দিতে পারবে, ভেবে তার হাত নিশপিশ করতো।

ডেকের ঢাকনা খুলে যাওয়া মাত্র কুণ্টা বন্য জন্তুর মতো স্থির হয়ে যায়। কিণ্টাঙোর উপদেশ তার মনে পড়ে। আল্লাহ্ স্বয়ং পশুদের যা শিখিয়েছেন, তার থেকেই শিকারীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। গোপনে বিপক্ষের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে। এ শয়তানগুলোর ভেতর কি মনুষ্যত্ব বলে কিছু আছে? অসহায় বন্দীদের ওপর অত্যাচার করে ওরা রীতিমত সুখ পায়। সেটা বেত মারবার সময় ওদের

মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায়। রাতের অন্ধকারে পশুর মতো নির্বিচারে বন্দিনী মেয়েদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের কি আল্লাহ্‌ বা উপাস্য অন্য কোন দেবতা নেই? বিবেক বা ন্যায় অন্যায় বোধ বলে কোন বস্তুই নেই?

ইঁদুর আর উকুনের অত্যাচার ক্রমশঃই বাড়ছিলো। তার চেয়েও বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিলো—কর্কশ কঠিন তক্তার সাথে অবিরত ঘর্ষণে। কাঁধ, কনুই আর নিতম্বের ক্ষতগুলো সর্বক্ষণ পোড়া ঘায়ের মতো জ্বলে!

ক্রমশঃ কিছু লোক মরতে শুরু করলো। প্রথমে এরা কেমন বোধশক্তিহীন জড় পদার্থের মতো ব্যবহার করে। বেত মারলে প্রতিক্রিয়া হয় না। লাফাতে চেষ্টা করে না। হাঁটুতে মাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকে। পিঠের ক্ষত থেকে লালচে রস গড়ায়। বসে থাকতে থাকতে কেউ বা গড়িয়ে পড়েই যায়। কুণ্টার মনে হয় বেঁচে থাকবার ইচ্ছার অভাবেই এরা মরে যায়।

ফাউলা দলপতির কথামত কুণ্টারা হাসি-খুশী ভাব দেখাতে, সাদা মানুষগুলো সত্যিই তাদের প্রতি আরো একটু সদয় ব্যবহার করছিলো। কষাঘাত কমে গেলো। বন্দীরা একটু বেশী সময় ওপরে ডেকে থাকবার অনুমতি পেলো। তারা সর্বক্ষণ সাদা মানুষগুলোর গতিবিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতো। শয়তানগুলো তাদের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে খুব সাবধান। সর্বদা কাছে কাছে রাখে। ডেকের ওপরে বাঁশের অবরোধের গায়ে বিরাট মুখওয়ালা যে লোহার অস্ত্রটা রাখা আছে, সেটা কী ভাবে কাজ করে—কুণ্টা ভেবে পেতো না। ওটা যে মারাত্মক রকম কিছু বিধ্বংসী ব্যাপার ঘটাতে পারে সে বিষয়ে অবশ্য তার সন্দেহ ছিলো না।

কতগুলো সাদা মানুষ ডেকের একধারে বসে সেই প্রকাণ্ড নৌকো বা ক্যানুটার একটা চাকা কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে একটু ঘোরায়। সামনে রাখা একটা গোল বাদামী ধাতুর তৈরী জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকে। সাদা মানুষগুলোকে হত্যা করবার সময় এদের কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নইলে কে তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? একদিন বন্দীরা এবং সাদা মানুষগুলো অবাক বিস্ময়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো। এক ঝাঁক উড়ন্ত মাছ রূপোলী পাখীর মতো দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন করে আকাশে উড়ছিলো। সকলের দৃষ্টি সেদিকে আবদ্ধ ছিলো। সহসা চিৎকার শুনে কুণ্টা ফিরে তাকালো। সেই ভয়ঙ্কর দর্শন ওলফটি বিদ্যুত গতিতে একটা সাদা মানুষের হাত থেকে ধাতুর লাঠিটা কেড়ে নিয়েছে। তারপর মুগুরের মতো ঘুরিয়ে মুহূর্তে সাদা মানুষটার মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলো। চকিতে নির্ভুল, নির্মম আঘাতে আর একজন ডেকে লুটিয়ে পড়লো। চোখের পলকে পাঁচজন

এভাবে নিহত হলো। ততক্ষণে এদের হুঁশ ফিরে এসেছে। একটা লম্বা ছুরির মতো জিনিসের এক ঘায়ে বিদ্রোহীর মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। দেহটি পড়ে যাওয়ার আগেই মাথাটি ডেকে আছড়ে পড়লো। তখনো চোখ খোলা, তাতে অপার বিস্ময়।

চিৎকার, চেঁচামেচির ভেতর পিলপিল করে চারিদিক থেকে সাদা মানুষ এসে জড়ো হলো। ধাতুর লাঠিগুলো গর্জন করে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো। সেই বৃহৎ কালো পিপেটা বজ্রগর্জনে ফেটে পড়লো। তাদের মাথার ওপর দিয়ে গরম হলকা আর রাশি রাশি ধোঁয়া বেগে ধাবিত হলো।

এমন সময় অবরোধের ওপার থেকে সর্দার সাদা মানুষটা আর তার দাগী মুখ-ওয়ালা লোকটা রাগে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলো। প্রথমেই সবচেয়ে কাছের সাদা মানুষটাকে মেরে রক্ত বার করে দিলো। কুণ্টা ফাউলা দলপতির ইঙ্গিতের আশায় কেবলই তার দিকে তাকাচ্ছিলো। কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হলো। বন্দীদের ওপরও কষাঘাত উদ্দাম হয়ে উঠলো। ঘর্মাক্ত রক্তাক্ত হতভাগ্য-দের চোখের সামনে মুণ্ডহীন দেহটাকে মারতে মারতে একটা রক্তমাংসের পিণ্ডে পরিণত করা হলো। এরপর বন্দীদের নির্মমভাবে টেনে খোলের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

ভেতরে ফিরে এসে তারা বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। কুণ্টা ওলফটির সাহসের তারিফ না করে পারছিলো না। অপরিসীম তিক্ততার সাথে সে ভাবছিলো— তখনই আক্রমণ করলে এতক্ষণে ভালোমন্দ যা হোক কিছু ফয়সালা হয়ে যেতো। এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর কী আসবে? এই বিষাক্ত দুর্গন্ধময় অন্ধকারে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভালো।

সে রাত্রে ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিলো। মাথার ওপর ডেকে একটা নতুন ধরণের শব্দ শোনা গেলো। কান পেতে শুনে মনে হলো, প্রবল হাওয়ায় বিরাট সাদা কাপড়গুলো সজোরে আছড়াচ্ছে। আরো একটা শব্দ শুরু হলো। ডেকের ওপর যেন চাল ঝরে পড়ার আওয়াজ। কুণ্টা অনুমান করলো বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের গর্জানি, ক্রমে নিদারুণ বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেলো।

প্রকাণ্ড বড় ক্যানুটি এবার ভয়ানক দুলতে শুরু করলো। শেকলে বাঁধা লোকগুলোর রক্তাক্ত ক্ষতগুলোতে কর্কশ কাঠের ঘষায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো। বিষিয়ে ওঠা, দুর্বল চামড়া ছিঁড়ে অনাবৃত মাংস কঠিন তক্তার সংস্পর্শে এসে আগুনের মতো জ্বলছিলো। চারদিকে আর্তনাদ, যন্ত্রণাকাতর ধ্বনির সাথে এবার

অভাগাদের ভয়ার্ত চিৎকার যোগ হলো। ক্যানুটির খোলের ভেতর জল ঢুকছে। ডেকের ওপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো। তারপরেই একটা বিরাট মোটা কাপড় পুরো ডেকের ওপর টেনে নেওয়া হলো। তাতে জল পড়া বন্ধ হলো বটে, কিন্তু ভেতরের বাতাসও আটকে গেলো। ফলে তাপ ও দুর্গন্ধ নির্গমনের কোন পথই থাকলো না। মুহূর্তে দুর্ভাগাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হলো। চারদিকে উন্মত্তের মতো ছটফটানি আর অর্ধরুদ্ধ, আকুল আর্তনাদ! দেহের উপরে আয়ত্ত হারিয়ে অনেকে অজান্তে মলমূত্র ত্যাগ করে ফেললো।

প্রকাণ্ড ক্যানুটি একবার কোন অতলে তলিয়ে যায়। আবার থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে যেন পর্বতের চূড়ায় ওঠে। খোলের ভেতরের বন্দীরা কেবলই বমি করছিলো। ভয়ে তাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছিলো। হতভাগ্যদের দুরবস্থায় বাইরে কারো খেয়ালই নেই। অবশেষে অবশ, অশক্ত দেহে অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

কুণ্টার জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে যে জীবিত আছে—সেটাই তার কাছে বিস্ময়কর বোধ হচ্ছিলো। গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে দেখলো—মুক্ত বায়ু। পিঠে এমন নিদারুণ যন্ত্রণা যে শয়তানগুলোর সামনেই সে প্রকাশ্যে কেঁদে ফেললো। সাদা মানুষেরা নীচের থেকে শিকলে বাঁধা, জ্ঞানহীন নগ্ন দেহগুলো বহুকষ্টে উপরে বয়ে এনে ডেকের ওপর স্তূপীকৃত করছিলো—যেন সেগুলো কতগুলো প্রাণহীন কাঠ।

ক্যানুটি তখনও প্রচণ্ড দুলছে। সর্দার সাদা মানুষটি তারই মধ্যে বহুকষ্টে চলছিলো। অন্যজন আলো দেখাচ্ছিলো। প্রতিটি বন্দীর মুখের কাছে আলো ধরে তারা তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে। বিশেষ ক্ষেত্রে সর্দারটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে অভিশাপ দিতে থাকে। তার রুক্ষ কণ্ঠের আদেশে অপরজন হতভাগ্যের দেহটি তুলে ধরে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেয়।

কুণ্টা জানে, লোকগুলো মরে গিয়েছে। লোকে বলে আল্লাহ্ সর্বসময় সর্বত্র আছেন। এই মুহূর্তে তিনি কি এখানে উপস্থিত আছেন? সে এই দুর্ভাগাদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করলো। তার হিংসা হচ্ছিলো। সেও কেন মরে গেলো না?

উনত্রিশ

প্রত্যূষে আবহাওয়া শান্ত, আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়ে এলো। কিন্তু জাহাজ তখনও খুব দুলছিলো। ডেকে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর মাঝে কারো কারো দেহে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। কারো বা দেহে দারুণ আক্ষেপ। অতি অল্প ক'জন মাত্র বহুকষ্টে উঠে বসেছিলো। তাদের মুখের চেহারা ভাবলেশহীন। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তারা চরম নিরাসক্ত। এরাই বিদ্রোহের কথা ভাবছিলো! কুণ্টারও সে বিষয়ে চিন্তা করবার বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না। চারিপাশে বন্দীদের মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। কাঁধে, পিঠে, কনুইয়ে উন্মুক্ত ক্ষতগুলো ধূসর, বিবর্ণ। সেখান থেকে বিষাক্ত রক্ত ঝরছে। সর্দার সাদামানুষটা ক্ষতের ওপর ওষুধ মাখানো পট্টি লাগাচ্ছিলো। কিন্তু অনর্গল রক্তক্ষরণে সেগুলো খুলে পড়ে যাচ্ছিলো। সন্ধ্যাবেলা আবার তাদের খোলের ভেতরে নামিয়ে ঠিকভাবে সাজিয়ে শেকলে বেঁধে রাখা হলো। ফাঁকা জায়গাগুলোতে নীচের খোল থেকে বেশী অসুস্থ লোকেদের তুলে আনা হয়েছে। কুণ্টা তিনদিন সংজ্ঞা ও সংজ্ঞাহীনতার মাঝখানে অর্ধআচ্ছন্ন হয়ে রইলো। সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা, প্রবল জ্বর, প্রাণান্তকর কাশি, গলায় অসহ্য ব্যথা ও ফোলা নিয়ে কখনো চেতনার রাজ্যে ভেসে উঠছিলো, আবার তলিয়ে যাচ্ছিলো। এমনি একটা সময়ে একটা ইঁদুর তার দেহ স্পর্শ করতে সে প্রচণ্ড ক্রোধে সেটাকে হাতের মুঠোয় এত জোরে চেপে ধরলো যে সেটার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না।

প্রতিদিন একজন দু'জন করে মারা যাচ্ছে। অন্ধকারে সর্দার শয়তানটা বাতি-হাতে বন্দীদের ক্ষতস্থানে মলম লাগাতে আর ওষুধ খাওয়াতে আসে। তার হাতের স্পর্শমাত্রই কুণ্টার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। এর চেয়ে কষাঘাতও ভালো ছিলো। বাতির হলদেটে আভায় শ্বেতাঙ্গ চেহারার একটা অবয়বহীন অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কুণ্টার মনে তা চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে। ঐ বিকট দুর্গন্ধ আর ঐ অস্পষ্ট শ্বেতকায় ছায়া সে জীবনেও ভুলতে পারবে না।

অসুস্থ দেহে ঐ কদর্য পরিবেশে বিরাট ক্যানুটার পেটের ভিতর কুণ্টা কতদিন শুয়ে আছে—তার হিসাব নিকাশ নেই! যে লোকটি ঘুলঘুলিটার পাশে শুয়ে রোজ সূর্য ওঠার অপেক্ষা করতো সে মরে গিয়েছে। যারা বেঁচে আছে, তাদের সাথে ভাষার যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। তারই মাঝে অকস্মাৎ একদিন একটা অজানা আশঙ্কায় কুণ্টার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা এক চটকায় ভেঙে গেলো। মৃত্যু যেন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমে উপলব্ধি হলো—তার সাথে শিকলে বাঁধা

সাথীর অতিকষ্টে শ্বাস নেবার পরিচিত শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। বহুক্ষণ বাদে কুণ্টা সাহস করে হাত বাড়ালো। কঠিন শীতল স্পর্শ। ভয়ে তার অন্তরাত্মা উড়ে গেলো। আজকাল ডেকের ওপর বন্দীদের গা আর ঘষা হয় না। ঘাগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। কুড়িটি বন্দিনীর মাঝে মাত্র বারোটিকে দেখতে পেয়ে কুণ্টার মন হতাশ বেদনায় বিধ্বস্ত হলো। একটি বন্দীর হাত ও পা থেকে তার মৃত সঙ্গীর শূন্য শিকল ঝুলছিলো। সে একছুটে রেলিঙ টপকে নীচে লাফিয়ে পড়লো। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটি সাদা মানুষ শিকল টেনে ধরতে হতভাগ্য বন্দীটি জাহাজের ধারে ঝুলতেই থাকলো। তার মর্মভেদী আর্তনাদের মাঝে কিছু সাদা মানুষের ভাষা মেশানো। তাহলে এই সেই দ্বিতীয় গুপ্তচর। বন্দীদের মনে মুহূর্তে প্রবল ঘৃণা সঞ্চারিত হলো। লোকটা কখনো বলছিলো—সাদা মানুষদের হত্যা কর। কখনো বা তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করছিলো। সাদাচুলের লোকটা রেলিঙের কাছে এগিয়ে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত কথাগুলো শুনলো। তারপর অনায়াসে শিকলটা ছেড়ে দিলো। দুর্ভাগা চিৎকার করে জলে পড়ে গেলো। সাদা শয়তানটা ফিরে এসে নির্বিকার চিত্তে অন্যদের ঘায়ে ওষুধ লাগাতে থাকলো।

সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করলেও সাদা মানুষগুলোকে হত্যা করবার কথা কুণ্টা আর চিন্তা করে না। সে এত অসুস্থ ও দুর্বল যে ভাবনাচিন্তার ক্ষমতাই তার ছিলো না। তার নিজের জীবন মৃত্যু সম্পর্কেও সে উদাসীন হয়ে গিয়েছে। কোনরকমে ডেকে উঠে শুয়ে পড়ে। সূর্যের তাপে তার দেহের আরাম হয়। আর মৃত্যুর পর সে পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হতে পারবে—সে ভাবনাটুকুতেও তার মনের আরাম।

নীচে খোলের ভেতরে এখানে সেখানে দু'চারটি কথা শোনা যায়। কুণ্টার কথা বলার ক্ষমতা বা উৎসাহ কোনটাই নেই। দিন দিনই তার অসুস্থতা বাড়ছিলো। শীঘ্রই বন্দীদের মাঝে ভয়ানক রকম রক্ত আমাশয় দেখা দিলো। সাদা মানুষগুলো তা দেখামাত্র অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অসুস্থদের তখনই স্থানান্তরিত করা হলো। খুরপি, বুরুশ আর টব নিয়ে এসে আলোর সাহায্যে খুব ভালোভাবে রক্তমিশ্রিত অতি দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে ফেলবার চেষ্টা চললো। চারিদিকে ভিনিগার ও অন্যান্য পরিশোধক ছড়িয়ে দেওয়া হলো। মুখে অবশ্য দুরাত্মারা সমানেই অকথ্য কটূক্তি চালাচ্ছিলো।

কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সংক্রমণ বন্ধ হলো না। ক্রমেই রোগের প্রকোপ বেড়ে চললো। কুণ্টার মাথায় পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। দেহ প্রচণ্ড জ্বরে উত্তপ্ত। প্রবল শৈত্যে সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপে। মনে হয় পেশীর আক্ষেপের চোটে রক্ত ও শ্লেষ্মার

সাথে পেটের অন্ত্রগুলোও বেরিয়ে আসবে। যন্ত্রণায় তার জ্ঞান প্রায় লোপ পায়। চিৎকার করে প্রলাপ বকতে থাকে।

অমোরো—ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের পরে দ্বিতীয় খলিফা অমোরো। কৈরাবা—কৈরাবা মানে শান্তি। চিৎকার করতে করতে তার গলা ভেঙ্গে যায়। কুন্টা প্রলাপের মাঝে তার পিতামহী ইয়াইসা, নিয়ো বটোকেও দেখতে পায়। যেন সে প্রথম কাফোর ছোট্ট শিশু—তাদের কাছে গল্প শুনছে।

শীঘ্রই অসুস্থ বন্দীদের আর হাঁটবার শক্তি পর্যন্ত থাকলো না। রোজই কিছু কিছু লোক মারা যাচ্ছিলো। কুন্টা অন্যদের কান্না শুনতে পায়। আল্লাহের দরবারে প্রার্থনা শুনতে পায়। কিন্তু তার নিজের তাতে বিন্দুমাত্র আসে যায় না। সে একটা যন্ত্রণাময় অর্ধ আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে—সে যেন জুফরের মাঠে চাষের কাজ করছে। নদীর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলে লাফিয়ে পড়ছে। জলন্ত কাঠের ওপর পুষ্ট হরিণ ঝলসিয়ে নিচ্ছে বা মধু-সহযোগে গরম চা তৈরী করছে। আবার জেগে উঠে বুঝতে পারে—সব অলীক স্বপ্ন। পরম অনিচ্ছাভরেও তাকে শুনতে হয়—সে পরিবারের সকলকে দেখবার জন্য আকুল চিত্তে অনুনয় জানাচ্ছে। অমোরো, বিণ্টা, ল্যামিন, সুওয়াড়ু, ম্যাডি—প্রত্যেকের কথা মনে করে আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সে এমন ভাবে তাদের বেদনার কারণ ঘটিয়েছে ভেবে তার হৃদয় ভেঙ্গে যায়। অন্য কথা ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। নিজের জন্য যে ঢাকটা তৈরী করবার কথা ছিলো—সেটার কথা চিন্তা করে। পাহারা দেবার পালা থাকলে নিশীথ রাতে সে একা একা ঢাক বাজানো অভ্যাস করবে ভেবেছিলো। ভুল বাজানো হলেও কেউ শুনতে পেতো না। কিন্তু ঢাকের কথা ভাবলেই যেদিন সে ঢাকের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলো, সেদিনের কথা মনে পড়ে যায়। সেদিন থেকে শুরু করে বর্তমান জীবনের এই অকল্পনীয় সহনাতীত দুঃখের রাশি প্রবল বন্যার মতো তার হৃদয় মথিত করে।

ডেকের ওপর অন্যদের পিঠের ক্ষত দেখে সে নিজের পিঠের অবস্থা বুঝতে পারে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অসুস্থ মাংসের ভেতর দিয়ে সাদা হাড় দেখা যায়। আজকাল শয়তান সাদা মানুষটা অতি সাবধানে নরম স্পঞ্জ দিয়ে বন্দীদের পিঠ পরিষ্কার করে। অবশিষ্ট মহিলা এবং শিশু বন্দীদের শারীরিক অবস্থা অনেকটা ভালো। সম্ভবতঃ পুরুষ বন্দীদের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন কদর্য নরককুণ্ডে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় বাস করতে হয় না বলেই তারা অপেক্ষাকৃত ভালো আছে। এদের মাঝে সবচেয়ে

বয়স্কা মহিলাটি বিণ্টার সমান বর্ষাকালীন হবে! তার নাম মবুটো। সে কেরেওয়ান গ্রামের মানডিনকা। তার চেহারায় এমনই মহিমান্বিত বৈশিষ্ট্য, চলাফেরায় এমন দীপ্ত মর্যাদাবোধ, যে নগ্নদেহেও মনে হয়—সে যেন মহারাজ্ঞীসুলভ রাজকীয় পোশাক পরে আছে। ডেকের ওপর শায়িত অসুস্থ বন্দীদের মাঝে সে অবাধে ঘুরে বেড়ায়। কপালে বুকে স্নেহস্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে সাহস জোগায়। সাদা মানুষের সাধ্য হয় না—আপত্তি জানায়। কুণ্টা তার হাতের কোমল স্পর্শ পেয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে—মা! মা!

আরো কিছুদিন পরে গরম কমে এলো। শীতল হাওয়া বইতে শুরু করলো। লম্বা খুঁটিগুলোর সাথে বাঁধা বিরাট সাদা কাপড়গুলো বাতাসে ফুলে উঠে জাহাজের গতি ত্বরান্বিত করে।

একদিন সকালে সাদা মানুষগুলোর মাঝে মহা উদ্দীপনা দেখা গেলো। অন্যান্য দিন থেকে তাড়াতাড়ি বন্দীদের ডেকের ওপর নিয়ে এলো। ওপরে বাকী সাদা মানুষগুলো, সবাই রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে। সবাই হাসছে, আনন্দ করছে, উত্তেজিত হয়ে দূরের দিকে ইঙ্গিত করছে। ভীড়ের মধ্যে কোনক্রমে ফাঁক করে কুণ্টাও দিগন্তের দিকে তাকালো। তখনো অস্পষ্ট, তবুও সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহের সৃষ্ট পৃথিবীর একটুকরো মাটি দেখা যাচ্ছে। তাহলে এই সাদা মানুষ-গুলোর নিজস্ব দেশ বলে একটা কিছু আছে। কুণ্টার দেহ কাঁপছিলো। তার ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠলো। চোখে জল ভরে এলো। এবার তবে যাত্রা শেষ। কিন্তু কুণ্টা জানে—তাদের জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে না। এ গভীরতর দুর্ভাগ্যের সূচনা মাত্র।

ত্রিশ

নীচে বন্দীরা ভয় স্তব্ধ হয়ে ছিলো। তাদের দ্রুত তাড়িয়ে ওপরে নিয়ে আসা হলো। এবার আর ওদের চিৎকারে কর্ণপাত না করে লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা বুরুশ দিয়ে শরীরে শুকিয়ে থাকা শক্ত নোংরাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া হলো, ক্ষত-স্থানে হলদে গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হলো। অতিরিক্ত রকমের বীভৎস দেখতে ঘা গুলোর ওপর একটা চ্যাপ্টা চওড়া ব্রাশ দিয়ে একরকম কালো পদার্থ লেপে দিলো। তীব্র যন্ত্রণায় কুণ্টা জ্ঞান হারিয়ে ডেকের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

সারা দেহ যেন আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। তারই ভেতর ভয়ার্ত চিৎকার শুনে চোখ মেলে যা দেখলো তাতে মনে হলো বন্দীদের এবার হত্যা করে খাবার উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। সাদা মানুষগুলো নরমাংস খায় এমন কথা আগেই শোনা গিয়েছিলো। এবার যেন তারই প্রস্তুতি চলছে। প্রত্যেকটি বন্দীকে জোর করে নতজানু করে বসিয়ে প্রথমে মাথায় সাদা ফেনার মতো একটা জিনিস মাখানো হচ্ছে। পরে একটা সরু চকচকে জিনিস দিয়ে মাথা কামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুখের ওপর দিয়ে রক্তের ধারা গড়াচ্ছে। কুণ্টারও একই অবস্থা হলো। তারপর সারা গায়ে তেল মাখিয়ে দুটো ফুটোওয়ালা একটা অদ্ভুত বস্ত্রখণ্ডের ভেতর দিয়ে তাদের পা দুটো জোর করে গলিয়ে দেওয়া হলো। তাতে তাদের গোপনাঙ্গ ঢাকা পড়ে গেলো। সর্দারের তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে এবার সকলকে রেলিঙের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। সূর্য মধ্যাকাশে পেঁীছোনো পর্যন্ত তারা সে অবস্থাতেই রইলো।

কুণ্টা একটা অর্ধচেতন হতবুদ্ধি ভাবের মধ্যে ছিলো। এদের মাংস খাওয়া, হাড় চোষা হয়ে গেলে কুণ্টার আত্মা নিশ্চয় আল্লাহের কাছে পৌঁছে যাবে। সে নীরবে প্রার্থনা করছিলো। এরই মাঝে হট্টগোলে চোখ খুলে দেখলো সাদা মানুষ-গুলো মহা উত্তেজিত ভাবে দড়িদড়া টেনে প্রকাণ্ড সাদা কাপড়গুলো নামাচ্ছে। তাদের আনন্দের পরিসীমা নেই।

কুণ্টা নাকে একটা নতুন গন্ধ পেলো। বিশেষ একটা গন্ধ নয়। অনেকগুলো গন্ধের সংমিশ্রণ। বেশীর ভাগই তার অচেনা অজানা। দূরের থেকে যেন একটা বিচিত্র মিশ্রিত শব্দও আসছিলো। শব্দটা ক্রমশঃই বাড়ছিলো। এক সময় প্রকাণ্ড ক্যানুটা সজোরে কোনও কঠিন পদার্থে আঘাত করে এদিক ওদিক দুলতে লাগলো। খানিক পরে, আফ্রিকা ত্যাগ করার সাড়ে চার চন্দ্রকাল পরে—ক্যানুটা একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ওটাকে এবার দড়ি দিয়ে শক্ত করে তটভূমির সাথে বাঁধা হলো।

ত্রাসে বন্দীদের দেহ পাথরের মতো কঠিন! কুণ্টা সজোরে চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে বসে ছিলো। ডেকের ওপরে কী একটা আছড়ে পড়ার শব্দে চোখ খুলে দেখে ডাঙা থেকে ক্যানু পর্যন্ত ফেলা একটা তক্তার ওপর দিয়ে দুটো নতুন সাদা মানুষ ক্যানুতে উঠে আসছে। তাদের নাকের ওপর একটু করো সাদা কাপড় চাপা দেওয়া। তারা এসে সর্দার সাদা মানুষটার সাথে করমর্দন করলো। সে লোকটার এখন আলাদা চেহারা—হাসি হাসি মুখে নবাগতদের মনোরঞ্জনের আপ্রাণ চেষ্টা

করছে। বন্দীদের শৃঙ্খল খু:ল দিতে বলা হলো। কিন্তু বন্দীরা কিছুতেই শিকল ছাড়বে না—যেন সেটা তাদের দেহেরই অচ্ছেদ্য অংশ। অবশেষে কষাঘাতের তাড়নায় তাদের দাঁড় করিয়ে একজন একজন করে লাইন করিয়ে তক্তার ওপর দিয়ে নীচে নামানো হলো।

নীচে জনারণ্য। বন্দী কৃষ্ণাঙ্গদের দেখে জনতা বিদ্রূপ করছে। তারই মাঝখান দিয়ে তাদের কোনক্রমে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এতগুলো সাদা মানুষের মিলিত বদ গন্ধ কুণ্টাকে প্রহারের মতো প্রচণ্ড আঘাত করে। রাস্তায় গাধার মতো দেখতে মস্ত বড় বড় জানোয়ার বাহিত দু' চাকা আর চার চাকার বিচিত্র গাড়ী। সেসব ছাড়িয়ে তারা একটা বাজারের মতো জায়গায় এসে উপস্থিত হলো। সেখানে নানা রঙের কিছু পদার্থ স্তূপীকৃত করা—সম্ভবতঃ ফল ও সবজি। একটি সাদা মহিলাও দেখা গেলো। তার চুলের রঙ খড়ের মতো বিবর্ণ। এদের মাঝেও তাহলে নারী আছে! এরা তাহলে জাহাজে কৃষ্ণাঙ্গিনীদের পেছনে এমন লোলুপ হয়ে ঘুরে বেড়াতো কেন? হ্যাঁ, এসব শ্বেতাঙ্গিনীদের আকর্ষণহীন শুকনো কাঠের মতো চেহারা দেখে অবশ্য তার কারণ কিছুটা বোঝা যায়। আফ্রিকাবাসিনীদের দেহের প্রতি সেজন্যই এদের প্রবল আসক্তি!

কোথায়ও কিছু লোক ভীড় করে মোরগের লড়াই দেখছে। তিনটে সাদা ছেলে একটা অপবিত্র শুয়োরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কী সব অবিশ্বাস্য কাণ্ড! একটি মানডিনকা ও একটি সেরেরা উপজাতীয় লোক সাদা মানুষের পেছনে মাথা নীচু করে হাঁটছে। ওরা তো জাহাজে ছিলো না। তাহলে এ ভয়ঙ্কর দেশে কুণ্টারাই একা নয়। কিন্তু সে লোক দু'টো তো জীবিত আছে! তাহলে হয়ত কুণ্টাদেরও শয়তানগুলো খেয়ে ফেলবে না। তার ইচ্ছা করছিলো—দৌড়ে গিয়ে স্বদেশীয়দের আলিঙ্গন করে। কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন। ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি সর্বদাই নীচের দিকে আবদ্ধ। কুণ্টা গন্ধ শুঁকে দেখলো। না, না। এ গন্ধ তো ঠিক নয়। তাছাড়া এরা কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে এমন বশংবদ হয়ে একটা সাদা মানুষের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? পালিয়ে যাচ্ছে না, বা শয়তানটাকে খুন করবার চেষ্টা করছে না? এ কী ভাবে সম্ভব?

বেশী ভাববার সময় ছিলো না। শুকনো মাটির ইটের তৈরী একটা লম্বা ঘরে তাদের নিয়ে ঢোকানো হলো। দেওয়ালে কয়েকটা ফোঁকর। তাতে লোহার গরাদ বসানো। পায়ের নীচে শক্ত মাটির মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা। একটা দেওয়ালের ধারে পাঁচটা কালো মানুষের অস্পষ্ট আকার দেখা যাচ্ছিলো। তারা এদের দিকে

ফিরেও তাকালো না। সাদা মানুষগুলো কুণ্টার কবজি আর গোড়ালি দেওয়ালে লাগানো লোহার কড়ার সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে দিলো। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিলো।

কুণ্টা তার হাঁটুতে মাথা রেখে সারা রাত বসে থাকলো। একদিনে এত বিচিত্র জিনিস দেখে, শুনে, আঘ্রাণ করে তার মাথা ঘুরছিলো। অজানা আতঙ্কে তার হৃদয় কাঁপছিলো। জাহাজের দুর্গন্ধময় অন্ধকার খোলে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। এখানে আবার নতুন কি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

শেষরাত্রে তার মস্তিষ্কে সহসা বিদ্যুতের চমক লাগলো। সে কিণ্টাঙোর উপদেশবাণী পরিষ্কার শুনতে পেলো। পুরুষত্ব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বলা হয়েছিলো—'বুদ্ধিমান ব্যক্তি পশুর কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে।'

কুণ্টা সোজা হয়ে উঠে বসলো। এ কি বিস্ময়? এ কি আল্লাহ্ প্রেরিত বাণী? এর অর্থ কী? এই পরিস্থিতিতে, এমন দুঃসময়ে পশুদের কাছ থেকে কী শিক্ষণীয় আছে? সে নিজেই তো এখন ফাঁদে পড়া পশু। ফাঁদে পড়া পশুদের চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পশুগুলো পালিয়েও তো যায়। কোন্ পশুর পক্ষে পালানো সহজ? অনেক ভেবে প্রশ্নের উত্তর পেলো—যে পশু খাঁচার ভেতর ক্রোধ ফলিয়ে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে ফেলে না, বা, যারা উপযুক্ত সময় বা সুযোগের জন্য ধৈর্য ধরে শান্তভাবে অপেক্ষা করে। তারাই শত্রুদের অসাবধানতার মুহূর্তে মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য কেবলমাত্র পালিয়ে যাওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য থাকে।

কুণ্টা এবার অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে গেলো। প্রকাণ্ড ক্যানুটাতে যখন সবাই মিলে সাদা মানুষদের হত্যা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তারপরে আর কখনো তার মনে এতটা আশা জাগেনি। সাদা মানুষগুলোর সামনে খুব বশংবদ ভাব দেখাতে হবে। তাদের সামনে রাগ দেখাবে না, বা কোন কাজের বিরোধিতা করবে না। মুক্তি পাবার সব আশা ছেড়ে দিয়েছে এমন ভান করবে। কিন্তু মনে মনে অটুট দৃঢ় সঙ্কল্প থাকবে—যে কোন উপায়ে পালাতেই হবে।

কিন্তু কোথায় পালাবে? এই অচেনা দেশে কোথায় সে আত্মগোপন করবে? জুফরের কাছাকাছি জায়গাগুলি কুণ্টার নিজের কুটিরের অভ্যন্তরের মতো অতি পরিচিত ছিলো। এখানে সে কিছুই চেনে না। সাদা মানুষের দেশে কি জঙ্গল

আছে? যদি বা থাকে, তাতে কি শিকারীদের কাজে লাগবার মতো চিহ্ন বা নির্দেশ আছে? যাহোক্, যথাসময়ে এসব সমস্যার কথা ভাবা যাবে।

প্রত্যূষের প্রথম আলো জানালার ফাঁকে দেখা দিতে কুণ্টা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু খানিক পরেই একটি কৃষ্ণাঙ্গ জল ও খাদ্যের পাত্র নিয়ে এলো। কুণ্টার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছিলো। তবু খাবারের বিশ্রী গন্ধে তার বমি এলো। তার জিভ ফুলে গিয়েছে। ঢোক গিলতেও কষ্ট হচ্ছিলো। প্রকাণ্ড ক্যানুটাতে তার সহযাত্রী যেসব বন্দী ছিলো, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। অপরিচিত পাঁচ জনের মাঝে দু'জনের গায়ের রঙ বাদামী। সে শুনেছিলো সাদা মানুষেরা জোর করে কালো মেয়েদের উপর অত্যাচার করলে এরকম বাদামী রঙের শিশু জন্মায়। একজনের চুল ও জামা শুকনো রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। একটা হাত এমন অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে ঝুলছে—মনে হয় ভেঙে গিয়েছে।

কুণ্টা আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভেঙে দেখে আর একবার খাবার এসেছে। গরম ধোঁয়া ওঠা লপসি জাতীয় জিনিস। কিন্তু এর গন্ধ যেন আরো বিশ্রী। কুণ্টা সেদিকে তাকাবে না ভেবে চোখ বন্ধ করে ছিলো। কিন্তু তার সঙ্গীরা যখন ঐ খাদ্যই গোগ্রাসে গিললো, তখন তার মনে হলো—হয়ত খাবারটা অত খারাপ নাও হতে পারে। তাছাড়া পালাতে হলে তো গায়ে শক্তি থাকা চাই। একটু, সামান্য একটুখানি খেয়ে দেখবে। পাত্রটি ধরে সে মুখের সামনে আনলো। তারপর গপগপ করে কখন যে শেষ কণিকাটুকু পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছে—নিজেই জানে না। নিজের প্রতি প্রবল বিরাগে ঠক্ করে পাত্রটি নামিয়ে রেখে সে সব উগরে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু, না। তাকে বাঁচতে হবে। শক্তি সংরক্ষণ করতে হবে। খাবার তাকে খেতেই হবে।

দিনে তিনবার ঐ ঘৃণিত খাদ্য সে জোর করে খেয়েছে। ইতিমধ্যে জানালার ফাঁকে সে ছ'দিনের সূর্যালোক, পাঁচটি রাত্রি দেখেছে। প্রতি রাত্রে তাদের সহযাত্রিণী মেয়েদের চিৎকার তারা দূর থেকে শুনেছে। কুণ্টা ও তার সাথীরা অসহায় ক্ষোভে সে কান্না সহ্য করেছে। কিন্তু আজ রাতে অবস্থা আরো খারাপ। মেয়েদের কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের আবার নতুন করে কী সর্বনাশ ঘটলো কে জানে।

প্রতিদিন পেট ভরে খাবার পর কুণ্টা একটু ঘুমোতে চেষ্টা করে। ঘুম এলে এই অন্তহীন অত্যাচারের ত্রাস ও দুর্ভাবনা সে সাময়িক ভাবে ভুলে থাকতে

পারে। আল্লাহের সেরকমই বিধান। কিন্তু কুণ্টা বেশীর ভাগ সময়ই ঘুমোতে পারে না। সে সময়টা নিজেকে বহুকষ্টে সংযত রাখতে হয়। পরিবারের লোকেদের বা গ্রামের কথা মনে পড়লেই সে আর কান্না সামলাতে পারে না।

একত্রিশ

সপ্তম দিন সকালের খাবার দেবার পর দু'জন সাদা মানুষ এক বোঝা জামা কাপড় হাতে ঘরে ঢুকলো। ভীত বন্দীদের বাঁধন খুলে দিয়ে সেগুলো কী করে পরতে হয় দেখিয়ে দেওয়া হলো। একটা বস্ত্রে পা থেকে কোমর পর্যন্ত, অন্য একটায় উর্ধ্বাঙ্গ ঢাকতে হয়। কুণ্টার ঘাগুলো সেরে এসেছিলো। জামা কাপড় পরা মাত্র সেগুলো চুলকাতে শুরু করলো।

বাইরে লোকজনের কথাবার্তার কোলাহল ক্রমে বাড়ছিলো। ক্রমশঃই লোক জমছিলো। কুণ্টারা জামাকাপড় পরে বিমূঢ় হয়ে বসেছিলো—কি জানি এর পরে কপালে কী আছে।

সাদা মানুষ দুটো ফিরে এসে প্রথমে রাখা বন্দীদের মাঝে তিনজনকে বার করে নিয়ে গেলো। তারপরেই বাইরের আওয়াজের ধরণটা বদলে গেলো। কুণ্টা অবাক হয়ে কতকগুলো অবোধ্য চিৎকার শুনছিলো।

'নিখুঁত স্বাস্থ্য! অফুরন্ত কর্মশক্তি।'

অন্য কোন সাদা মানুষের গলা—

'তিনশো পঞ্চাশ!'

'চারশো!'

প্রথম সাদা মানুষটির চীৎকার শোনা গেলো। 'ছয়! কে ছয় বলবেন? তাকিয়ে দেখুন। দুর্দান্ত কর্মক্ষমতা!'

কুণ্টা ভয়ে শিউরে উঠছিলো। তার মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিলো। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। যখন চারজন সাদা মানুষ ঘরে ঢুকলো—সে যেন অসাড়! কুণ্টাকে স্পর্শ করতে সে রাগে ভয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। তখনই মাথায় একটা প্রবল আঘাত পেয়ে তার বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেলো। সচেতন হয়ে উঠতে দেখতে পেলো—উজ্জ্বল দিবালোকে আরো দু'জনের সাথে সেও বাইরে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে শত শত সাদা মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তারই মাঝে দুটো কালো মানুষ শিকল হাতে দাঁড়িয়ে। মুখের ভাব দেখে মনে

হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তারা একান্ত উদাসীন। চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, লক্ষ্যহীন।

'সদ্য গাছ থেকে পেড়ে আনা।'

'বাঁদরের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন!'

'সব কিছু শিখিয়ে নেওয়া যাবে!'

সাদা মানুষটা পায়চারী করতে করতে হাত নেড়ে কুণ্টার আপাদমস্তক নির্দেশ করে কথাগুলো চিৎকার করে বলছিলো। তারপর কুণ্টাকে জোর করে ঠেলে সামনে একটা বেদীর মতো উঁচু জায়গায় ওঠালো।

'একেবারে সরেস মাল! টাটকা আর কচি। নিজের ইচ্ছামত গড়ে নেওয়া যাবে!'

কুণ্টা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে লক্ষ্যও করেনি কখন চারদিকের লোকজন এগিয়ে এসে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে।

'তিনশো ডলার!'—'তিনশো পঞ্চাশ!'

'পাঁচশো!' 'ছয়!'

সাদা মানুষটা ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে উঠলো—'বাজারের সেরা মাল। তরুণ যুবা। কেউ কি সাড়ে সাত বলবেন?'

একজন চেঁচিয়ে উঠলো—

সাড়ে সাত!'

'আট! আট!'

ডাক উঠলো—'আট!' আর কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই আবার শোনা গেলো—

'সাড়ে আট।'

ডাক আর চড়লো না।

যে সাদামানুষটা এদিক থেকে চেঁচাচ্ছিলো, সে কুণ্টার শিকল খুলে দিয়ে তাকে সামনে একজনের দিকে ঠেলে দিলো। এই নতুন সাদা মানুষটার পেছনে একজন কালো লোক। শিকলের প্রান্তটা তারই হাতে দেওয়া ছিলো। তার প্রতি কুণ্টাব অনুনয়পূর্ণ চাহনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। সে লক্ষ্যহীন নির্বিকার দৃষ্টিতে কুণ্টাকে শিকলশুদ্ধ টেনে একটা চার চাকার বাক্সের সামনে নিয়ে এলো। বাক্সটার সামনে একটা বিরাট গাধা জাতীয় পশু। কালো লোকটা রূঢ়ভাবে কুণ্টাকে বাক্সের মেঝেতে ঠেলে ফেলে দিয়ে শিকলটা কোথায় আটকে দিলো। কিছুক্ষণ পরে কুণ্টা

গন্ধে অনুভব করলো—সাদা মানুষটা ফিরে এসেছে। সে গাড়ীর ওপরে চড়ে বসতে, কালো লোকটিও সামনের সীটের মাথায় উঠে বসে একটা চামড়ার ফিতে পশুটার পিঠে আছড়ে ফেললো। অমনি বাক্সটা গড়িয়ে চলতে শুরু করলো।

কুণ্টা শিকলটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। বড় ক্যানুতে তাদের যে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিলো, তার থেকে এটা হালকা ধরনের। প্রাণপণে চেষ্টা করলে কি ছেঁড়া যাবে না ? কিন্তু এখন গাড়ী থেকে লাফাবার উপযুক্ত সময় নয়।

কুণ্টা একবার মাথা তুলে সাদা মানুষটার দিকে তাকালো। সেই মুহূর্তে সেও পেছন ফিরে তাকাতে তাদের চোখাচোখি হয়ে গেলো। ভয়ে কুণ্টার দেহ হিম। কিন্তু সাদা মানুষটার মুখে ভাবের লেশমাত্র ছিলো না।

পথের ধারে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। বিভিন্ন রঙের শস্য দেখা যাচ্ছে। তার মাঝে ভুট্টা সে চিনতে পারলো। জুফরেতে ফসল কাটবার সময় যেমন দেখতে হয়, তেমনি। খানিকক্ষণ পর সাদা মানুষ এবং কালোটি দু'জনেই শুকনো রুটি আর মাংস বার করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো। কুণ্টার খুবই খিধে পেয়েছিলো। খাদ্যের সুগন্ধে তার জিভে জল এসে গেলো। তবুও সামনের কালো লোকটি যখন পেছন ফিরে তাকে এক টুকরো রুটি দিতে চাইলো, সে তার মুখ ফিরিয়ে নিলো।

সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো। তাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে আর একটি গাড়ী বিপরীত দিকে ছুটে গেলো। তাতে তিনটি প্রথম কাফোর বয়সী কালো শিশু। গাড়ীটির পেছনে চরম ক্লান্তিভরে দ্রুত পদক্ষেপে চলছিলো মোটা কাপড়ের পুরোনো ছেঁড়া পোশাক পরা সাতটি কালো মানুষ। তাদের মুখে গভীর হতাশার ছাপ। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে কুণ্টাদের গাড়ীটা পাশের ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়লো। দূরে গাছের ফাঁকে একটা বিরাট সাদা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। এবার কি হবে ? এখানেই কি তাকে হত্যা করে খাওয়া হবে ?

বাড়ীটার কাছে এসে কুণ্টা আরো কালো মানুষের গন্ধ পেলো। অন্ধকারের ভেতর তিনটি মানুষের আকার বোঝা যাচ্ছিলো। একজনের হাতে আলো ঝোলানো। বড় ক্যানুর অন্ধকার খোলের ভেতর এ ধরণের আলো কুণ্টা দেখেছে। কেবল এটার চারপাশে একটা স্বচ্ছ চকচকে আবরণ, তার ভেতর দিয়ে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। কালো লোকগুলোর পাশ দিয়ে একটা সাদা মানুষ এগিয়ে এলো। গাড়ীটা থেমে যেতে একজন আলোটা উঁচু ক'রে ধরলো। ভেতরের সাদা মানুষটা নেমে এসে নতুন লোকটার সাথে করমর্দন করলো। তারপর দু'জনে হাসিমুখে বাড়ীর দিকে চলে গেলো।

কুণ্টার মনে একটু আশা হলো। এবার কালো লোকেরা তাকে ছেড়ে দেবে না? কিন্তু এ কেমন কালো লোক? তারা তাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে! নিজের স্বজাতির লোক নিয়ে এরা পরিহাস করছে? ছাগলের মত সাদা মানুষের হুকুমে কাজ করে? এদের আফ্রিকাবাসীর মতো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এরা কখনো তা হতে পারে না।

গাড়ীটা কুণ্টাকে নিয়ে এগিয়ে গেলো। অন্য কালো লোকগুলো হাসাহাসি করতে করতে পাশে পাশে চললো। কিছুদূর গিয়ে গাড়ীটা থামতে, চালক নেমে এসে শিকলের অপর প্রান্ত খুলে রূঢ় ভঙ্গীতে টান মেরে কুণ্টাকে নামতে ইঙ্গিত করলো।

কুণ্টার ইচ্ছা করছিলো চারটে কালো লোকেরই গলা টিপে মারতে। কিন্তু এখন নয়। সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। লোকগুলো জোর করে তাকে নামালো। তারপর একটা খুঁটির সাথে শিকলটা আবার বেঁধে দিলো। কুণ্টা দৈহিক যন্ত্রণা, ত্রাস, ক্রোধ ও ঘৃণাতে অভিভূত হয়ে সেখানে পড়ে থাকলো। একজন তার সামনে এক পাত্র জল ও এক পাত্র খাদ্য নামিয়ে রাখলো। খাদ্যটা যেমন অদ্ভুত দেখতে, তেমনি অদ্ভুত তার গন্ধ। তবুও তা দেখেই কুণ্টার রসনা লালায়িত হয়ে উঠলো। কিন্তু কুণ্টা মুখ ফিরিয়েই থাকলো। কালো লোকগুলো তা দেখে আবারও বিদ্রূপের হাসি হাসলো। গাড়ীর চালক আলোটা তুলে ধরে মোটা খুঁটির কাছে গিয়ে শিকলটা জোরে টেনে কুণ্টাকে দেখিয়ে দিলো—ওটা ছেঁড়া যাবে না। তারপর খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে শাসানির ভঙ্গী করলো। সবাই হাসতে হাসতে চলে গেলো।

কুণ্টা অপেক্ষা করতে লাগলো—কখন সবাই ঘুমোবে, কখন সে পালাবার সুযোগ পাবে। এরই মধ্যে একটা কুকুর এসে তার খাবারের পাত্র খালি করে দিয়ে গেলো। রোষে কুণ্টার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো। সে খানিকটা জল পান করে নিলো। কিন্তু তাতে শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলো না। আল্লাহ্ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। কিন্তু কি অপরাধে? এমন কি ভয়ঙ্কর পাপ সে করেছে? কুণ্টা তার শৈশব থেকে শুরু করে যেদিন ঢাকের জন্য কাঠ কাটতে গিয়েছিলো, শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ বড় দেরী করে শুনতে পেয়েছিলো—সেদিন পর্যন্ত জীবনের সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা একে একে স্মরণ করে দেখলো। হ্যাঁ, জীবনে যতবার সে শাস্তি পেয়েছে—প্রত্যেকটির মূলে ছিলো—তার নিজেরই অমনোযোগ আর অসাবধানতা।

পালাবার অদম্য ইচ্ছা অতি কষ্টে দমন করে সারারাত সে জেগে কাটালো। সে জানে শিকল ভাঙবার চেষ্টা করলেই ঝনঝনানির শব্দে পাশের কুটিরের লোক ছুটে আসবে। ইতিমধ্যেই কুকুরের ডাকে গাড়ীর চালকটি একবার বেরিয়ে এসে শিকল পরীক্ষা করে গিয়েছে।

প্রত্যূষের প্রথম আলো ফুটে উঠতেই সে বহুকষ্টে নিজের ক্লিষ্ট কাতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নতজানুর ভঙ্গীতে এনে সুবার নামাজ শুরু করলো। কিন্তু মাটিতে মাথা ঠেকাতে গিয়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে পাশে গড়িয়ে পড়লো। নিজের শারীরিক অক্ষমতায় তার ভারী রাগ হয়ে গেলো। সে এতো দুর্বল হয়ে পড়েছে!

পূবের আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছিলো। কুণ্টা আর একটু জল পান করলো। এমন সময় সেই কালো লোক চারটা দ্রুত পায়ে এসে কুণ্টাকে টেনে তুলে আবার সেই গড়ানো বাক্সের মতো গাড়ীটাতে চড়ে বসলো। তারপর গাড়ী বড় রাস্তা দিয়ে আগের দিনের মতই চললো। কুণ্টার দুই চক্ষু অপরিসীম ক্রোধ ও ঘৃণায় সামনের মানুষগুলোর পিঠের ওপর অগ্নিবর্ষণ করতে থাকলো। যদি এদের খুন করা যেতো! কিন্তু বুদ্ধি স্থির রাখতে হবে। মাথা গরম করলে চলবে না। অযথা শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই।

কিছু দূর গিয়ে ঘন বন দেখা গেলো। কতক জায়গায় গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। আবার কিছু জায়গায় জঙ্গল পোড়ানো হচ্ছে। ধূসর বর্ণ ধুঁয়োর রাশি উঠছিলো। সাদা মানুষরাও কি জুফরের মতো গাছপালা পুড়িয়ে জমির ফলন শক্তি বৃদ্ধি করে?

আরো খানিকটা দূরে কাঠের তৈরী একটি ছোট্টো চৌকো কুটির, আর তার সামনে পরিষ্কার এক খণ্ড জমি। একটা ষাঁড়ের পেছনে বাঁকানো হাতলওয়ালা কী একটা মস্ত জিনিস। একজন সাদা মানুষ হাতল দুটো চেপে ধরেছে। তাতে পেছনের মাটি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আরো দুটো রোগামতন সাদা মানুষ গাছের নীচে উবু হয়ে আছে। তিনটে রোগা পটকা শুয়োর আর কিছু মুরগী চারপাশে ছুটোছুটি করছে। কুটিরের দরজায় একটি লালচুলের সাদা মেয়েমানুষ। তিনটে সাদা বাচ্চা খেলে বেড়াচ্ছিলো। তারা গাড়ীতে কুণ্টাকে দেখে হাত নেড়ে চেঁচাতে লাগলো। কুণ্টার ভাব দেখে মনে হলো সে হায়না শিশু দেখছে! এতদিনে সে সত্যি একটি সাদা মানুষের পুরো পরিবার দেখতে পেলো। পথে যেতে যেতে আগের মতো আরো দুটো মস্ত সাদা বাড়ী দেখা গেলো। প্রত্যেকটি উঁচুতে একটার ওপর আর একটা চাপানো—দুটো বাড়ীর সমান। প্রত্যেকটিরই

কাছাকাছি বেশ কিছু ছোট ছোট অন্ধকার কুটির। কুণ্টা আন্দাজ করলো— সেগুলোতেই কালো লোকেদের বাস। আর চারিপাশ ঘিরে বিস্তীর্ণ তুলোর ক্ষেত। অল্পদিন আগে ফসল তোলা হয়েছে। তখনও গোছা গোছা তুলো চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো।

পথে কুণ্টা আর একটি অদ্ভুত জিনিসের দেখা পেলো। রাস্তার ধার দিয়ে দু'জন বিচিত্রদর্শন লোক যাচ্ছিলো। প্রথমে সে ভেবেছিলো—তারা বুঝি কালো। কাছাকাছি আসতে দেখা গেলো তাদের গায়ের রঙ কেমন লালচে বাদামী। দীর্ঘ কালো চুল দাড়ির মতো পাকানো হয়ে পেছনে ঝুলছে। হালকা জুতো পায়ে. কোমরে সম্ভবতঃ চামড়ার তৈরী এক ধরনের আচ্ছাদন ঝুলিয়ে লোক দুটো দ্রুত পায়ে হাঁটছিলো। সাথে তীর ধনুক। তারা সাদা মানুষ নয়। আবার আফ্রিকা-বাসীও নয়। তাদের গায়ের গন্ধই আলাদা। গাড়ী দেখে তারা ভ্রুক্ষেপও করলো না।

সূর্যাস্তের সময় কুণ্টা পূবদিকে মুখ করে সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনা সারলো। পুরো দু'দিন উপবাসের পর তার দুর্বল লাগছিলো। চারিদিকে কী ঘটছে সে বিষয়ে তার আর উৎসাহ ছিলো না। কিছু সময় পরে গাড়ীর চালক বাক্সর পাশে একটা আলো ঝুলিয়ে দিলো। আবার খানিকটা পর সাদা মানুষটা কী যেন বলাতে গাড়ীর চালক কুণ্টার দিকে একটা চাদর ছুঁড়ে দিলো। নিজেরাও গায়ে চাদর জড়িয়ে নিলো। কুণ্টা শীতে কাঁপছিলো। কিন্তু ওদের দেওয়া চাদর সে কিছুতেই ব্যবহার করবে না। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে আবার গায়ের চাদর দেবার বদান্যতা কেন? কালো লোকটাকেও বলিহারি! সেই অগ্রণী হয়ে সাদা মানুষটাকে এসব কাজে সাহায্য করছে! কুণ্টাকে পালাতেই হবে। না হয় সে চেষ্টাতে তার প্রাণটাই যাবে। জীবনে আর কখনো জুফরে দেখবার সৌভাগ্য হবে না। যদি হয়, তবে সে গাম্বিয়ার ঘরে ঘরে সাদা মানুষের এই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার কাহিনী বলবে।

গাড়ীটা বড় রাস্তা থেকে এবার একটা অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তায় ঢুকলো। দূরে আর একখানা ভূতুড়ে সাদা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আজ রাত্রে আবার কপালে কী আছে কে জানে! কুণ্টা বাড়ীর সামনে পৌঁছেও সাদা বা কালো মানুষের কোন চিহ্ন বা গন্ধ পেলো না। সাদা মানুষটা গাড়ী থেকে নেমে কয়েকবার আড়মোড়া ভেঙে শরীরের আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিলো। তারপর সে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলো। গাড়ীটা আরো খানিকটা এগিয়ে একটা কুটিরের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ীর চালক কোনক্রমে নিজেকে ওপর থেকে নামিয়ে নিলো। বাতিটা হাতে

নিয়ে অতি কষ্টে পা টেনে টেনে ঘরের দিকে রওয়ানা দিয়ে কী যেন ভেবে ফিরে এলো। গাড়ীর সীটের নীচে হাত বাড়িয়ে শিকলটা খুলে নিয়ে সে আবার যাবার উপক্রম করলো। কুণ্টা সাথে আসছে না দেখে শিকল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে তার উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ স্বরে কিছু বলে উঠলো। মুহূর্তে কুণ্টা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচণ্ড পরাক্রমে হায়নার শক্তিশালী চোয়ালের মতো কঠিন হাতে তার কণ্ঠনালী টিপে ধরলো। বাতিটা মাটিতে পড়ে গেলো। কালো লোকটার গলা দিয়ে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বেরোলো। সে তার বলিষ্ঠ দুই হাতে কুণ্টার মুখে ও বাহুতে যথাসাধ্য আক্রমণ চালালো। কিন্তু কুণ্টার গায়ে তখন অযুত হাতীর বল। সে নিজের শরীর বাঁকিয়ে শত্রুর ঘুষি, হাঁটুর গুঁতো, পায়ের লাথি এড়াবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু হাতের চাপ শিথিল হতে দেয় নি। অবশেষে লোকটার গলায় একটা ঘরঘর শব্দ হতে থাকলো। তার শক্তিহীন নিঃসাড় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

কুণ্টা ভূলুণ্ঠিত দেহ আর উল্টেপড়া বাতির কাছ থেকে দ্রুতবেগে সরে গেলো। ক্ষেতের অসমান কর্কশ জমির উপর দিয়ে সে নীচু হয়ে দৌড়োতে লাগলো। এতদিনের অব্যবহারে শরীরের পেশীগুলো যন্ত্রণায় প্রচণ্ড আর্তনাদ করছিলো। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়াতে তার আরাম বোধ হচ্ছিলো। আর মুক্তির আনন্দে সর্বদেহ মন আতশ বাজির মতো ফেটে পড়তে চাইছিলো।

বত্রিশ

কাঁটা ঝোপে কুণ্টার পা কেটে যাচ্ছিলো। দু'হাতে গাছপালা সরিয়ে সে বনের গভীরে ঢুকতে চেষ্টা করলো—অন্ততঃ সে তাই ভেবেছিলো। কিন্তু ক্রমশঃ গাছপালা হালকা হয়ে এলো। সামনে আর একটা তেমনি বিস্তীর্ণ তুলোর ক্ষেত। দূরে একটা মস্ত সাদা বাড়ী। তার কাছাকাছি ছোট ছোট কুটির। কুণ্টার মন আতঙ্ক ও হতাশায় ভরে গেলো। দুটো সাদা মানুষের খামার আর বাড়ীঘরের মাঝখানে যে সরু এক ফালি জঙ্গল সীমানা নির্দেশ করছে—এতক্ষণের চেষ্টায় সে মাত্র সেটুকু পার হয়েছে। একটা গাছের পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে সে শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শুনতে পাচ্ছিলো। বাহুতে, হাতে, পায়ে বড় যন্ত্রণা। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখতে পেলো, সারা গা কেটে রক্ত ঝরছে। কিন্তু চাঁদও অস্ত যাচ্ছে।

শীঘ্রই দিনের আলো ফুটে উঠবে। যা করবার এই বেলা করে নিতে হবে। তার দেহে আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। বেশী দূরে পালানো সম্ভব নয়—এখানেই জঙ্গলের ভেতর লুকোতে হবে। বড় বড় গাছগুলোর নীচে ঝরা পাতার নরম আস্তরণ বিছানো। অর্থাৎ পাতা ঝরে পড়ছে। কাজেই গাছে চড়ে পাতার ফাঁকে লুকোনো সম্ভব নয়। হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে বেশ ভালোভাবে নিজেকে ঢেকে নিলো। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না। বহুদিন আগে বাদাম গাছের বাগানে তার প্রভুভক্ত বিশ্বাসী কুকুর নিয়ে কতবার রাতভর পাহারা দিয়ে কাটিয়েছে—সে সব কথা মনে পড়ে যায়।

তখনই দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেলো। বোধ হয় মনের ভুল। তবুও উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। আবার শোনা গেলো। এবার দুটো কুকুরের ডাক। আর সময় নেই। পূর্বদিকে মুখ করে নতজানু হয়ে সে আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করলো। এবার আরো কাছ থেকে মোটা গভীর কণ্ঠের ডাক ভেসে এলো। সে কোথায় আছে ওরা জানে! এবার কুকুরের ডাকের পেছনে মানুষের কণ্ঠস্বরও শোনা গেলো। কুণ্টা ঝোপের ভেতর দিয়ে যথাসাধ্য নিঃশব্দে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। অকস্মাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠে সে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেলো। কোনক্রমে উঠে বসতে না বসতে কুকুর দুটো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কুণ্টা দু'হাতে নিজেকে যথাসাধ্য রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলো। পেছন থেকে মানুষের চিৎকার শোনা গেলো। প্রথমেই সে যার গলা টিপে ধরেছিলো সেই কালো মানুষটা। তার এক হাতে মস্তবড় ছুরি। অপর হাতে বেঁটে মুগুর আর দড়ি। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হত্যার সঙ্কল্প! এবার সে কুণ্টাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে! কালো লোকটির পেছনে কালকের সাদা মানুষটা। ঘর্মাক্ত রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল। আরো একটা সাদা মানুষ। তার হাতে লোহার লাঠি। এ জিনিস সে বড় ক্যানুতে দেখেছে। কুণ্টা অগ্নিবর্ষণ ও বিস্ফোরণের অপেক্ষা করছিলো। কালো লোকটা উদ্যত মুগুর হাতে কুণ্টার দিকে তেড়ে এলো। কিন্তু সাদা মানুষটা চিৎকার করে বারণ করলো।

একান্ত অনিচ্ছায় কালো লোকটাকে থেমে যেতে হলো। সাদা মানুষটার শাসনে কুকুরগুলোও পিছিয়ে গেলো। তার ইঙ্গিতে কালো লোকটা এবার দড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলো। প্রথমেই মাথায় প্রচণ্ড প্রহারে কুণ্টার বোধশক্তি প্রায় লোপ পেলো। এটা আল্লাহের কৃপাই বলতে হবে। কারণ তারপরেই

কুণ্টার ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হলো। দড়ি দিয়ে এমন কষে বাঁধা হলো যে বাঁধন গা কেটে বসে গেলো। হিঁচড়ে টেনে জঙ্গলের ধারে এনে একটা গাছের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে প্রচণ্ড প্রহার শুরু হলো। তার দেহ যেন কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে প্রায় জ্ঞানহীন অবস্থায় সেই বড় গাধার মতো পশুর পিঠে চড়িয়ে বেঁধে নিয়ে সবাই মিলে রওয়ানা হলো। চেতনা ফিরে আসতে টের পেলো—সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার হাত পা আলাদা ভাবে চারটি লোহার শিকলে ঘরের চারকোণার চারটি খুঁটিতে বাঁধা। সামান্য নড়াচড়ায় সারা দেহে ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট।

এক ধারের দেয়ালের গায়ে একটা গর্তের ভেতর কিছু পোড়া কাঠ ও ছাই। আর এক ধারে একটা প্রশস্ত চ্যাপ্টা কাপড়ের পিণ্ড। ভেতর থেকে খড়ের মতো জিনিস দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় জিনিসটা বিছানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে একটা অদ্ভুত শিঙে ফোঁকার শব্দ হলো। কোথা থেকে দলে দলে কালো লোক রাস্তায় চলতে শুরু করলো। একটু পরে রান্নার সুঘ্রাণ পাওয়া গেলো। পিঠের ও হাতে পায়ের কাটা ঘায়ের যন্ত্রণা আর মাথায় বিদীর্ণ হয়ে যাবার মতো তীব্র বেদনার সাথে এবার ক্ষুধার আক্ষেপ যোগ হলো। এ তার নিজেরই অদূরদর্শিতার ফল। সে কেন আরো উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করলো না? এই বিচিত্র দেশ আর ঘৃণ্য, বিধর্মী মানুষগুলোর আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আরো একটু ওয়াকিবহাল হয়ে নেওয়া উচিত ছিলো।

কুটিরের দরজায় সামান্য শব্দ হলো। সেই কালো লোকটা—যাকে সে শ্বাস-রুদ্ধ করে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো, যে তাকে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করেছে। কুণ্টা চোখ বুজে ঘুমের ভান করলো। কিন্তু পাঁজরে সজোরে একটা মারাত্মক লাথি এসে পড়তে চোখ খুলতেই হলো। কালো লোকটা ভয়ানক কটূক্তি করে একটা খাবারের পাত্র ঠকাস্ করে তার সামনে নামিয়ে দিলো। তারপর কুণ্টার গায়ে একটা চাদর ছুঁড়ে ফেলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো। পিঠের প্রহারের মতো খাদ্যের ঘ্রাণও শারীরিক আঘাতের মতই তার দেহকে পর্যুদস্ত করলো। চোখ মেলে দেখলো একটা চ্যাপ্টা গোল টিনের ওপর কীসের যেন মণ্ড আর কিছু মাংস জাতীয় খাবার। পাশে জলের পাত্র। হাত দিয়ে তোলার উপায় নেই। মুখ এগিয়ে এক গ্রাস খাদ্য তুলে নেওয়ার চেষ্টা করতেই অপবিত্র শুয়োরের মাংসের গন্ধ পেলো। মুহূর্তে দেহের গভীর অন্তর্দেশ থেকে পিত্ত

উঠে এলো। সারা রাত ভাঙা ভাঙা ঘুমের মাঝে কুণ্টার এ কথাই মনে হতে থাকলো—এরা কেমন মানুষ ? দেখতে আফ্রিকাবাসীর মতো। অথচ শুয়োর খায় ? এরা কোনক্রমেই আল্লাহের করুণা লাভের যোগ্য নয়। বিশ্বাসঘাতক কাফেরের দল !

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আবার সেই বিচিত্র শিঙে ফোঁকার আওয়াজ, তার পরেই রান্নার ঘ্রাণ, বহু লোকের চলাফেরার শব্দ। সেই সাক্ষাৎ শয়তান, পরম শত্রু কালো লোকটা আবার খাদ্য পানীয় হাতে ঘরে ঢুকলো। আগের রাত্রির খাবারের অবস্থা দেখে ক্রোধে জলে উঠে সেগুলো সে কুণ্টার মুখে মাখিয়ে দিলো। তারপর নতুন খাবার নামিয়ে রেখে দুমদাম চলে গেলো। একটু পরে দরজা খোলার শব্দ, সাথে সাথে সাদা মানুষের গন্ধও পাওয়া গেলো।

কুণ্টা তাকাবে না ভেবেছিলো। কিন্তু ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আওয়াজে লাথি খাবার ভয়ে চোখ মেললো। সাদা মানুষটার মুখ রোষে রক্তবর্ণ হয়ে আছে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো—খাবার না খেলে কুণ্টার মহা বিপদ হবে। অত্যাচারের প্রতিমূর্তি সাদা মানুষটা চলে যেতে কুণ্টা বহু কষ্টে যেখানে দুশমনটা দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানকার শক্ত মাটি খিমচে তুলে নিলো। চোখ বন্ধ করে একান্ত মনে অশুভ শক্তির কাছে সাদা মানুষটা এবং তার পরিবারের প্রত্যেকের চরম সর্বনাশ প্রার্থনা করলো।

তেত্রিশ

চার দিন তিন রাত্রি কুণ্টা সেই কুটিরে শুয়ে শুয়ে পাশাপাশি অন্যান্য কুটিরের কালোদের গান শুনলো। গান শুনে তার মনে হচ্ছিলো যেন সে আফ্রিকাতেই আছে। এই সাদা মানুষদের দেশে এদের গান গাইবার মনোবৃত্তি হয়—সেটাই আশ্চর্য ! তাদের কি সংসারে কারো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই ?

সূর্যের সাথে কুণ্টা একটা বিশেষ ধরণের আত্মীয়তা বোধ করে। বড় ক্যানুর খোলের ভেতরে অন্ধকারে বয়োজ্যেষ্ঠটি বলেছিলো—'আফ্রিকা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। সেখান থেকেই সূর্য উদিত হয়। প্রত্যহের নতুন সূর্য আমাদেরকে যেন স্বদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

তার হাতের শিকল আপ্রাণ কামড়ে দেখেছে। শিকলের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। দাঁত ভেঙ্গে তারই মাথা পর্যন্ত যন্ত্রণা করে উঠলো।

পঞ্চম দিন সকালের শিঙ্গে ফোঁকার পর সেই কালো লোকটা কুণ্টার ঘরে ঢুকলো। এবার তার হাতে বেঁটে মুগুর ছাড়াও দুটো মোটা হাতকড়া। সে প্রথমে কুণ্টার পা দুটোতে কড়া পরিয়ে দিয়ে চারিদিকের শিকল খুলে দিলো। কুণ্টা লাফিয়ে উঠে পড়বার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড গাঁট্টা খেলো। পেছন দিকে সরে আবার উঠতে গেলে পাঁজরে নিদারুণ একটা লাথি এসে পড়লো। রোষে ও যন্ত্রণায় যতবার উঠতে চেষ্টা করছিলো আরো জোরে এসে প্রহার বর্ষিত হচ্ছিলো। ক'দিন শুয়ে থেকে কুণ্টা কত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো—আগে বুঝতে পারেনি। অসহায় হৃতশক্তি বন্দীর অত্যাচারিত দেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কালো রাক্ষসটা নিজের প্রভুত্ব জাহির করছিলো।

এবার সে কুণ্টাকে উঠে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলো। কুণ্টা কিছুতেই পেরে উঠছিলো না। দেখে সে রূঢ় ভঙ্গীতে এক হ্যাঁচকা টান মারলো। শৃঙ্খলাবদ্ধ পায়ে কুণ্টা বেঢপ চালে কোনক্রমে এগোতে লাগলো।

বাইরে দিনের পরিপূর্ণ আলোতে কুণ্টার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে সে দেখতে পেলো এক সারি কালো লোক একজন একজন করে লাইন করে দ্রুতপদে হাঁটছে। পাশে একটা সাদা মানুষ ঘোড়ায় চেপে চলছে। হ্যাঁ, সে শুনেছে—এই বিচিত্র জানোয়ারটার নাম ঘোড়া। কুণ্টাকে কুকুর দিয়ে তাড়া করিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলো এই সেই সাদা মানুষটা। দশ বারোজন কালো লোক। মেয়েদের মাথায় লাল বা সাদা কাপড় বাঁধা। পুরুষদের ও বাচ্চাদের মাথায় জীর্ণ সোনার টুপি। কারো কারো মাথা খালি। দেখে বিস্ময় লাগে—কারো গলায় বা বাহুতে কবচ বা তাবিজ কিছুই নেই। দলটা একটা মস্ত বড় বিস্তৃত ক্ষেতের দিকে এগোচ্ছে। এরাই নিশ্চয় রাত্রে গান করে। ঘৃণায় কুণ্টার মন বিষিয়ে গেলো। গোটা দশেক কুটির দেখা যাচ্ছিলো। এখানকার কুটিরগুলো খুব ছোট ছোট, তাদের গ্রামে যেমন হয় তেমন মজবুতও নয়।

সহসা কালো লোকটা কুণ্টার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললো—'তুমি—তুমি টবি!'

কুণ্টার কিছুই বোধগম্য হলো না। তার মুখ দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছিলো। কালো লোকটা বার বার কুণ্টার বুকে আঙুল ঠেকিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছিলো। লোকটা সাদা মানুষের ভাষায় কিছু বোঝাতে চাইছে? এবার লোকটা নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললো—

'আমি স্যামসন ! স্যামসন। তুমি টবি ! ট—বি ! মালিক বলেছেন—তোমার নাম টবি !'

কথাটা বুঝে উঠতে কুণ্টার সর্বাঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন জ্বলে উঠলো। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করলো—আমি কুণ্টা কিণ্টে। পবিত্র পুরুষ কৈরাবা কুণ্টা কিণ্টের পুত্র অমোরোর প্রথম পুত্র !

কুণ্টার নির্বুদ্ধিতা দেখে কালো লোকটির ধৈর্যচ্যুতি হলো। আর বোঝাবার চেষ্টা না করে তাকে টানতে টানতে অন্য একটা কুটিরে নিয়ে গেলো। সেখানে একটা বড় টিনের পাত্রে জল ছিলো। কালো লোকটা এক টুকরো কাপড় আর এক খণ্ড খয়েরী রঙের বস্তু কুণ্টার দিকে ছুঁড়ে দিলো। গন্ধে মনে হলো জিনিসটা সাবান জাতীয় কিছু। লোকটা কুণ্টাকে স্নান করে নিতে ইঙ্গিত করলো। স্নানের পর তাকে আর এক প্রস্থ সাহেবী পোশাক আর অন্যদের মতো একখানা হলদে সোলার টুপি দেওয়া হলো। কাফেরগুলো এই গবমেই মূর্চ্ছা যায় ! আফ্রিকায় থাকলে না জানি এদের কি গতি হতো ! অন্য একটা কুটিরে নিয়ে গিয়ে তাকে খাবার দেওয়া হলো। কুণ্টা এবার বেশ আগ্রহের সাথে খেয়ে নিলো। কালো লোকটা তারপর একটা লম্বা শক্ত ছুরি হাতে নিয়ে দূরের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কুণ্টাকে সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করলো। কুণ্টার পা তখনো শেকলে বাঁধা। কোন ক্রমে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিলো। সে দূরে কিছু কৃষ্ণাঙ্গিনী মেয়ে ও অল্পবয়স্কদের নীচু হয়ে কাজ করতে দেখলো। তাদের সামনের বয়স্ক পুরুষেরা লম্বা ধারালো ছুরির ঘায়ে ভুট্টার শুকনো গোডাগুলো কেটে নামাচ্ছিলো। মেয়েরা ও বাচ্চারা সেগুলো কুড়িয়ে জড়ো করছিলো। লোকগুলোর নগ্ন পিঠ ঘামে চকচক করছিলো। তাদের পিঠে ছ্যাঁকা পোডাব চিহ্ন ছিলো না, কেবল কষাঘাতের চিহ্ন। সাদা মানুষটা তার ঘোডায় চডে কাজ পরিদর্শন করছিলো।

কালো লোকটা ডজন খানেক ভুট্টার গোড়া কেটে ফেলে কুণ্টাকে সেগুলো তুলতে ইঙ্গিত করলো। সাদা মানুষটা ঘোডায় চেপে এগিয়ে এলো। বেত উঁচিয়ে ভ্রু কুঁচকে রোষ কষায়িত নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, কুণ্টা ঠিক ভাবে আদেশ পালন করে কিনা। নিজের অসহায় অবস্থায় কুণ্টার ভয়ানক রাগ হচ্ছিলো। বাধ্য হয়ে নীচু হয়ে দু' আঁটি তুললো। একটু ইতস্ততঃ করে আরো দু' আঁটি তুললো। পাশাপাশি সারির অন্য কালোরা উদ্বিগ্ন চিত্তে লক্ষ্য করছিলো। তারা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কুণ্টা আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো ঘোড়ার পাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। মাথা না তুলেও কুণ্টা দেখতে পাচ্ছিলো সাদা মানুষটা ঘোড়ার

পিঠে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারো কাজের বিন্দুমাত্র গাফিলতিতে তার পিঠে সপাং করে বেত পড়ছে। আর সাদা মানুষটা রাগে চিৎকার করে উঠছে।

দূরে পথ দেখা যাচ্ছে। কপালে দরদর ঘামের ধারায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার ভেতর দিয়েও কুণ্টা পথে কখনো একজন অশ্বারোহী কখনো বা একটা মাল-বাহী গাড়ী দেখতে পাচ্ছিলো। অন্য দিকটায় তাকাতেই সেদিনের সেই জঙ্গলটা দেখতে পেলো—যেখানে সে পালাবার চেষ্টা করেছিলো। সে আগে বুঝতে পারেনি সত্যিই খুব সঙ্কীর্ণ জঙ্গল। কুণ্টা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। সেদিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সে পালাবার লোভ সামলাতে পারবে না।

শেকলে বাঁধা পায়ে পাঁচ পা-ও একসাথে এগোনো যাচ্ছিলো না। এর পরে পালাবার চেষ্টা করতে হলে আগেই যে কোনও একটা অস্ত্র যোগাড় করে রাখতে হবে। মানুষ, কুকুর, আহত মহিষ বা ক্ষুধার্ত সিংহ কেউই আল্লাহের বান্দাকে আর ঠেকাতে পারবে না। অমোরো কিণ্টের পুত্র কখনো সিদ্ধিলাভের চেষ্টা ছেড়ে দেবে না।

সূর্যাস্তের পর দূরে কোথাও আবার শিঙা বাজলো। কালো লোকগুলো দ্রুত-পদে সারিবদ্ধ হলো। এদের দেখতে আফ্রিকা দেশের মনে হলেও আসলে এরা বিধর্মী কাফের। বড় ক্যানুতে যারা এসেছে, তাদের সাথে মিশবার উপযুক্ত নয়।

যারা ক্ষেতের কাজ করছিলো—বেশীর ভাগই ফুলানি উপজাতির। সাদা মানুষগুলো ভয়ানক নির্বোধ। ফুলানিদের গো-পালনের কাজ না দিয়ে তাদের দিয়ে ক্ষেতের কাজ করাচ্ছে। সকলেই জানে ফুলানিদের জন্মগত পেশা গো-পালন। তারা গরুদের ভাষা পর্যন্ত বুঝতে পারে। কুণ্টা কুকুরের ডাক শুনতে পেলো। কিছু-দিন আগেই কুকুর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সেকথা ভেবে একটু সন্ত্রস্ত হলো। তাকে যখন বন্দী করা হয়, তখন নিজের ওয়ালো কুকুরটার শত্রুর হাতে মৃত্যু হয়েছিলো সে ঘটনাটাও এক লহমায় মনে পড়ে গেলো।

নিজের কুটিরে ফিরে এসে সে প্রার্থনায় বসলো। কাজের মাঝে দুটো প্রার্থনার সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রার্থনার পর উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ঋজু করে বসে কুণ্টা নীচুগলায় গোপন সিরা কাঙ্গো ভাষায় তার পূর্বপুরুষদের সাথে কথা বলতে লাগলো। তাঁদের কাছে এই অপরিসীম দুঃখ সহ্য করবার শক্তি প্রার্থনা করলো। সে দুটো মোরগের পালক যোগাড় করেছিলো। আর একটা ডিম যোগাড় করতে পারলেই পালক আর টাটকা ডিমের চূর্ণ খোসা মিলিয়ে প্রেত পূজার একটা শক্তিশালী

উপকরণ তৈরী করতে পারতো। তার সাহায্যে একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই জুফরেতে ফিরতে পারতো।

শয়তানগুলোর হাতে বন্দী হবার ঘটনা সহস্রতমবার তার মনে দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে উঠলো। পায়ের চাপে শুকনো ডাল ভাঙবার শব্দ যদি সে আর মুহূর্তকাল আগে শুনতে পেতো—তবে সে এক লাফে তার বর্শাটা হাতে তুলে নিতে পারতো। রোষে দুঃখে কুণ্টার চোখে জল উচ্ছলিত হয়ে উঠলো। মাসের পর মাস এই নিরন্তর তাড়না, পশুর মতো বন্ধন যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!

না, সে হাল ছেড়ে দেবে না। সে এখন সতেরো বৎসরের পূর্ণ যুবক। চোখের জল তাকে মানায় না। শুকনো খড়ের তৈরী অসমান গদিতে দেহ রেখে কুণ্টা একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু শয়তানগুলোর দেওয়া নাম 'টবি' মনে পড়তেই ক্রোধে পুনরায় অঙ্গ জ্বলে ওঠে। প্রচণ্ড রোষে পা ছুঁড়তে লোহার শিকল সজোরে তার গুলফে আছড়ে পড়লো। অসহায় বেদনায় তার চোখে আবার জল ভরে এলো।

সে কি কখনো অমোরোর মতো বড় হবে? তার বাবা কি এখনো কুণ্টার কথা ভাবেন? তাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় মাতৃহৃদয়ের যে স্নেহ আধারশূন্য হয়ে পড়লো, সে স্নেহ কি তার মা ল্যামিন, সুওয়াডু ও ম্যাডিকে বণ্টন করে দিয়েছেন? সে জুফরের প্রত্যেকের কথা ভাবছিলো। জুফরে গ্রাম সম্পর্কে তার অতল গভীর অনুরাগ আগে সে এমন করে উপলব্ধি করেনি। সেখানকার নানা দৃশ্য তার মানস পটে কেবলই ভেসে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে অর্ধরাত্রি পার করে তার চোখ ক্লান্তিতে বুজে এলো।

চৌত্রিশ

যতদিন যেতে লাগলো, কুণ্টার পায়ের শিকল অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠলো। তবু সে টুঁ শব্দটি করলো না। যদি এমনই নির্বোধের মতো ভাবলেশহীন মুখ করে থাকে, তবেই হয়তো ব্যাটাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে। তাতেই হয়তো পালাবার সুযোগ মিলবে। কুণ্টা তার চোখ, কান, নাক—প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রখর করে রেখেছিলো। কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, কোথায় এদের দুর্বলতা, সব জেনে নিতে হবে। যখন দুরাত্মারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার শিকল খুলে দেবে—সে আবার পালাবে।

সকালবেলা প্রথম শিঙে ফোঁকার সাথে সাথে কুন্টা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসে। অন্যান্যদের মতো কুয়োর ধারে বালতির তোলা জলে মুখ ধুয়ে নেয়। জুফরে গ্রামে মেয়েরা প্রত্যূষে উদুখলে প্রাতঃরাশের শস্য চূর্ণ করে। সে দৃশ্য, সে শব্দ তার মনে পড়তে থাকে। রাঁধুনী বুড়ীর কুটিরে ঢুকে কুন্টা যা খাবার পায়, তাই খেয়ে নেয়। শুধু অপবিত্র বরাহ মাংস তার চলে না। খাবার সময় তার চোখ কেবলই সুবিধামত কোন অস্ত্র খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু উনুনের ওপয় ঝুলিয়ে রাখা কতকগুলো কালো কালো বাসন আর তারই মতো ক্রীতদাসেদের খেতে দেবার জন্য চ্যাপ্টা গোলাকার পাত্রগুলি ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। কুন্টা হাত দিয়েই খায়। বুড়ী কিন্তু একটা ধাতুর তৈরী পাতলা বিচিত্র বস্তু দিয়ে খাবার তুলে খায়। তাতে পাশাপাশি কতকগুলো তীক্ষ্ণ ডগা। জিনিসটা ছোট, তবু কাজে লাগতেও পারে। কুন্টা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

আজকাল সকালবেলা শস্যক্ষেত্রে তুষারকণা জমে থাকে। খানিকটা বেলা না হওয়া পর্যন্ত চারিদিক কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে। সর্বশক্তিমান আল্লাহের ক্ষমতা দেখে কুন্টার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বিরাট জলরাশি পার হয়ে এত দূরে এই সাদা মানুষগুলোর দেশেও আকাশে সূর্য চন্দ্র উদিত হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে। অবশ্য এখানে সূর্যের তেমন তাপ নেই, চন্দ্রেরও সেই সৌন্দর্য নেই। এই অভিশপ্ত দেশে কেবল মানুষগুলোই আল্লাহের সৃষ্ট নয়। সাদা মানুষগুলো সাক্ষাৎ শয়তান। কালোদেরও বুঝবার উপায় নেই।

সূর্য যখন মধ্য গগনে তখন আবার শিঙা বাজে। ঘোড়ার মতো বড় অথচ গাধার মতো দেখতে একরকম জানোয়ার চাকাবিহীন একটা কাঠের গাড়ী টেনে আনে। জানোয়ারটাকে নাকি খচ্চর বলে। গাড়ীটার পাশে সেই রাঁধুনী বুড়ী। সে সারিবদ্ধ প্রত্যেকের হাতে একখণ্ড করে রুটি আর একপাত্র ঝোল ধরিয়ে দেয়। সকলেই বসে বা দাঁড়িয়ে খাবার খেয়ে নিয়ে গাড়ীতে রাখা একটা জালা থেকে জল তুলে খায়। কুন্টা রোজই ঝোলের পাত্রটির গন্ধ শুঁকে বুঝতে চেষ্টা করে তাতে শূকরের মাংস মেশানো আছে কিনা। কিন্তু ওটা নিরামিষ সবজির ঝোল। তাতে কোন মাংসই থাকে না। খাদ্যের মধ্যে কুন্টার রুটিটাই বেশী প্রিয়। সে দেখেছে—এখানেও কালো মহিলারা আফ্রিকাবাসীদের মতো হামানদিস্তায় পাথরের নোড়া দিয়ে শস্য চূর্ণ করে নিয়ে রুটি তৈরী করে। বিণ্টার নোড়াটা অবশ্য কাঠের তৈরী ছিলো।

মাঝে মাঝে তারা দেশের পরিচিত খাদ্য পেতো। নামটা অবশ্য এদেশে ভিন্ন।

তরমুজ নামে একরকম বিরাট ফল এখানকার লোকেদের খুব পছন্দ। তবে আল্লাহ্ এদের আম, তাল, রুটি ফল আরো অনেক সুস্বাদু ফল থেকে বঞ্চিত করেছেন—যা আফ্রিকাতে যত্রতত্র অজস্র জন্মায়।

কুণ্টাকে যে সাদা মানুষটা এ জায়গায় এনেছে, যাকে এখানে সবাই 'প্রভু' বা মালিক বলে ডাকে—সে মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতে চলে আসে। অন্য যে সাদা মানুষটার ওপর ক্ষেত দেখাশোনার ভার, তার সাথে কথাবার্তা বলে। সে সাদা মানুষটাকে বলা হয় 'ওভারসীয়ার'।

প্রতিদিনই কিছু নতুন বা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কুণ্টা রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে সব কথা ভাবতে থাকে। এখানকার কালো লোকগুলোর প্রভুকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কোনও উচ্চাভিলাষ নেই। সাদা মানুষটাকে দেখলেই যেন তাদের কাজের আগ্রহ বেড়ে যায়। প্রভুর যে কোন আদেশ পালন করতে এরা এক পায়ে খাড়া। এদের বিচারবুদ্ধি কী ভাবে লোপ পেলো, কী করে এরা ছাগল বা বাঁদরের সমপর্যায়ে নেমে গেলো—কুণ্টা ভেবে পায় না। সম্ভবতঃ এদের জন্মই এ দেশে। প্রখর সূর্যালোকে ঘর্মাক্ত দেহে নিজেদের দেশে নিজেদের লোকের জন্য পরিশ্রম করবার আনন্দ এরা কখনো পায়নি।

কিন্তু কুণ্টা কখনো এদের মতো হয়ে যাবে না। তাকে এ ঘৃণিত দেশ ছাড়তেই হবে। প্রতি রাত্রে সে তার পালাবার ব্যর্থ চেষ্টার কথা ভেবে দেখে। এর পরের বারে আরো আটঘাট বেঁধে কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ তাকে একটি মন্ত্রপূত তাবিজ বা কবচ তৈরী করে নিতেহ বে। দ্বিতীয়তঃ তাকে যাহোক কিছু অস্ত্র যোগাড় করতে হবে। একটা ধারালো মুখওয়ালা লাঠি হাতে থাকলেও সেদিন কুকুরগুলোর পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতো। তাহলেই অন্যরা পৌঁছোবার আগে সে পালিয়ে যেতে পারতো। সর্বশেষে তাকে এ অঞ্চলের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে হবে—যাতে লুকোবার জায়গাগুলো আগে থেকে ভালোভাবে জানা থাকে।

অর্ধেক রাত্রি জেগে কাটালেও কুণ্টার অতি প্রত্যূষে মোরগ ডাকার আগে ঘুম ভেঙে যায়। এখানকার পাখীগুলো শুধু কিচিরমিচির করে আর গান করে। জুফরের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী এসে চেঁচামেচি শুরু করে দেয় না। এখানে টিয়াপাখী বা বাঁদর বোধহয় নেই। সকালবেলা বাঁদরের ক্রুদ্ধ হৈ চৈ বা ডাল ভাঙার শব্দ শোনা যায় না। ছাগলও যে দেখা যায় না, এটা আশ্চর্য। অবশ্য এরা যে শূকর পোষে বা খায় তার চেয়ে বিস্ময়কর আর কী আছে? সাদা মানুষ-

গুলোও শুয়োরের মতোই ঘৃণ্য। মানডিনকা বা আফ্রিকার অন্য কোনও ভাষা শুনবার জন্য কুণ্টার প্রাণ আকুল হয়ে থাকতো। তার বড় ক্যানুর সাথীরা কোথায়? তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এমনি অন্য কোন সাদা মানুষের খামারবাড়ীতে? তারাও কি নিজেদের ভাষা শুনবার জন্য অস্থির? কুণ্টার মতোই একাকী এবং উপেক্ষিত বোধ করছে? পালাবার জন্যও এদেশের ভাষা শেখা দরকার। সে ইতিমধ্যেই এদের কতকগুলো শব্দ বুঝতে পারে। বিশেষ করে—'আজ্ঞে হ্যাঁ, মালিক!' কালোরা তো সর্বক্ষণই সাদা মানুষদের ঐ বলছে। বড় বাড়ীতে যে সব সাদা মহিলা থাকে তাদের বলা হয় 'মিসেস'। সে একবার বড় বাড়ীর বাগানে এমনি একজনকে ফুল তুলতে দেখেছিলো। কাঠির মতো চেহারা! ব্যাঙের পেটের তলার দিকের মতো গায়ের রঙ!

তবে সাদা মানুষদের ভাষার বেশীর ভাগই এখনো তার কাছে রহস্যজনক। মুখে একটা নির্বিকার ভাবের মুখোস এঁটে থাকলেও সে মন দিয়ে তাদের প্রতিটি কথা শুনে অর্থ বুঝবার চেষ্টা করে। একটা শব্দ সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। সাদা এবং কালো মানুষ সকলেই সেটা বার বার উচ্চারণ করে নিগ্রো বা নিগার।—জিনিসটা কী?

পঁয়ত্রিশ

ক্ষেতের ফসলের গোড়া কেটে আঁটি বাঁধার কাজ শেষ হলো। ওভারসীয়ার এবার কালোদের বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিলো। কুণ্টার কাজ হলো লতা গাছ থেকে এক ধরণের ভারী ও বিরাট হলুদ রঙের সবজি নামিয়ে কাঠের গাড়ীতে সাজিয়ে দেওয়া। জুফরেতেও অনেকটা এ ধরণের সবজি আছে। গ্রামের মেয়েরা সেগুলো কেটে শুকিয়ে নিয়ে তার খোলাটা খাবার রাখার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

কাঠের গাড়ী করে সবজিগুলো খামারবাড়ী নামে এক বিরাট বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু কালো লোক বড় বড় গাছ কেটে চিরে জ্বালানী কাঠ তৈরী করছে। বাচ্চা ছেলেরা আবার সেগুলো সাজিয়ে উঁচু করে আলাদা আলাদা গাদা করে রাখছে। অন্য একটা জায়গায় দুটো লোক খুঁটির ওপরে বড় বড় পাতা শুকোবার জন্য ঝুলিয়ে দিচ্ছে। এ পাতার গন্ধ তার চেনা। একবার বাবার সাথে

বেড়াতে গিয়ে সে চিনেছিলো। এগুলো কাফেরদের ব্যবহৃত অপবিত্র তামাক পাতা। কুন্টাদের গ্রামের মতোই বিভিন্ন সবজি আর নানাবিধ বস্তু শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত করে রাখা হচ্ছিলো।

গাছ থেকে কুমড়ো তুলে, খামারবাড়ীতে জমা দেওয়া পর্যন্ত কাজটি সম্পূর্ণ হলে কুন্টাকে অন্য কাজ দেওয়া হলো। তাকে এবং আরো কয়েকজনকে এক-জাতীয় গাছ দেখিয়ে দেওয়া হলো। নাড়া দিলেই তার নীচে বাদাম ঝরে পড়ে। প্রথম কাফোর বয়সী বাচ্চারা সেগুলো কুড়িয়ে ঝুড়িতে তুলছিলো। কুন্টা একটা বাদাম জামার নীচে লুকিয়ে রাখলো। পরে খেয়ে দেখলো—মন্দ নয় খেতে।

এ কাজটাও শেষ হয়ে যেতে কালোদের কিছু মেরামতের কাজে লাগানো হলো। কুন্টা একজনকে একটা বেড়া বাঁধতে সাহায্য করে। মেয়েরা এ সময় কুঠিবাড়ী এবং নিজেদের কুঁড়েগুলো পরিষ্কার করে। কাপড় জামা কাচে। প্রথমে সেগুলো একটা বিরাট টবে গরম করে নেয়। তারপর সাবান জলে রগড়ে নেয়। অবাক ব্যাপার, এরা ঠিকমত কাপড় কাচতে পর্যন্ত জানে না! কাপড়গুলো পাথরে আছড়ে নেবে তো!

আজকাল কালোদের ওপর ওভারসীয়ারদের অত্যাচার বা কষাঘাতের পরিমাণ কমে গিয়েছে। জুফরেতে ফসল তুলে গুদামজাত করবার পর চারিদিকে যেমন একটা শান্তি ও স্বস্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়—এখানেও যেন তেমনি। সন্ধ্যাবেলা শিঙে বাজার সময় পর্যন্ত কাজ চলার কথা। এখন তার আগেই কালোদের মাঝে নাচ, গান স্ফূর্তি শুরু হয়ে যায়। ওভারসীয়ার যেন দেখেও দেখে না। ক্রমশঃ আরো লোক এসে স্ফূর্তিতে যোগ দেয়। মেয়েরা ছাই ভস্ম কী যে গান করে, অর্থ বোঝা যায় না। কুন্টার বিরক্তির সীমা থাকে না। শিঙে বেজে উঠলে সে যেন রক্ষা পায়।

সন্ধ্যাবেলা কুন্টা তার কুঁড়েঘরের দরজার সামনে পা ছড়িয়ে বসে। শিকলের বোঝাটা তাতেই সবচেয়ে কম বোধ হয়। তার মন উড়ে যায় জুফরেতে। ফসল তোলার ঋতুতে সবাই সেখানে আগুনের পাশে বসে গল্পগুজব করে। দূরে চিতা-বাঘের গর্জন হায়নার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসে।

এখানে ঢাকের বাজনা শোনা যায় না। আফ্রিকা ছাড়ার পর সে আর ঢাকের আওয়াজ শুনতে পায়নি। সাদা মানুষেরা বোধ হয় কালোদের ঢাক বাজানো পছন্দ করে না। কিন্তু কেন? ঢাকের আওয়াজে ধমনীর রক্ত কেমন দ্রুত হয়ে ওঠে। কচি শিশু থেকে দন্তহীন বৃদ্ধ পর্যন্ত কেমন পাগলের মতো নাচতে থাকে—তা কি সাদা

মানুষেরা জানে? নাকি সেজন্যই ঢাককে তারা ভয় পায়? মল্লবীরদের শৌর্যবীর্য ঢাকের তালের ছন্দে জেগে ওঠে, ঢাকের বাজনার সম্মোহনী শক্তি তাদের অমিত বলশালী করে তোলে, শত্রুকে জয় করতে উদ্বুদ্ধ করে—এ সব তত্ত্ব কি এই দুরাচারদের জানা আছে? অথবা হয়তো এর মাধ্যমে সাদা মানুষের অজ্ঞাত কোন বার্তা এক খামার থেকে অন্য খামারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে—এই তাদের ভয়।

কিন্তু শুধু সাদা মানুষ নয়, এখানকার পাপিষ্ঠ কালোগুলোও ঢাকের ভাষা জানে না। কুন্টা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের মনে বিচার করে দেখলো, এই মূর্খগুলো হয়তো একেবারে সংশোধনের বাইরে নয়। নেহাৎ অজ্ঞমূর্খ হলেও নিজে-দের অজান্তেই এরা অনেক কাজ খাঁটি আফ্রিকাবাসীর মতোই করে। যেমন বিস্ময় হলে বিশেষ শব্দ উচ্চারণ, মুখের অভিব্যক্তি, হাত নাড়ার ধরণ, বিভিন্ন দেহভঙ্গী। হুবহু একই জিনিস কুন্টা শিশুকাল থেকে অসংখ্যবার দেখেছে। জুফরের লোকেদের মতো এরাও নিজেদের ভেতর যখন হাসাহাসি করে—সারা দেহ কাঁপিয়ে হাসে।

এখানকার মেয়েদের কেশসজ্জাও কুন্টাকে আফ্রিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। এরা ঠিক তেমনি করে দড়ি দিয়ে খুব আঁটো করে বিনুনী বাঁধে। অবশ্য আফ্রিকাতে মেয়েরা রঙীন পুঁতি দিয়ে বিনুনীগুলো অলংকৃত করে। এখানকার মেয়েরাও মাথায় কাপড় বাঁধে—যদিও এদের বাঁধাটা ঠিক নিয়মমাফিক হয় না। আফ্রিকার মতো এখানেও কিছু কালো লোক মাথায় ছোট ছোট বিনুনী করে।

কুন্টা লক্ষ্য করেছে এখানেও কৃষ্ণাঙ্গরা শিশুদের বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি উপযুক্ত বিনয় ও সম্মান দেখাতে শেখায়। কোলের বাচ্চারা পর্যন্ত যখন দু'পায়ে মায়ের শরীর আঁকড়ে থাকে, তারি মধ্যে পা দুটো একটু আলগা করে রাখে, যাতে মায়ের গায়ে পা না লাগে। সন্ধ্যাবেলা বড়রা গাছের সরু ডাল থেঁতো করে দাঁতন তৈরী করে দাঁত মাজে। জুফরেতেও তাই করতো। অবশ্য এ অবস্থাতেও কী করে এরা নাচ গান করে কুন্টা বুঝতে পারে না। তবে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ এদের স্বভাবের গভীরে—সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেটা আফ্রিকাবাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

এদের সম্পর্কে কুন্টার কঠিন শীতল মনোভাব দ্রব হতে শুরু করেছিলো অন্য কারণে। গত এক চন্দ্রকাল যাবৎ লক্ষ্য করছে কু[illegible]ার প্রতি এখানকার কালোদের রূঢ় আচরণ কেবল ওভারসীয়ার বা মালিকের উপস্থিতিতে। অন্য সময় তাকে দেখলেই হেসে কথা বলে। শেকল লেগে তার বাঁ পায়ের গোড়ালীতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য উদ্বেগ জানায়। কুন্টা অবশ্য তাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না।

তাদের প্রতি অগ্রাহ্য ভাব দেখিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে যায়। মনে মনে কিন্তু সে তাদেরই সঙ্গ কামনা করে।

এমনই এক গভীর রাত্রে কুণ্টা ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। অন্ধকার রজনীর নিস্তব্ধতায় তার মনে একটা নতুন অনুভূতি এলো। আজ যে সে চরম দুর্দশার প্রান্তদেশে উপস্থিত হয়েছে—তা আল্লাহের ইচ্ছায় এবং তাঁরই নির্দেশে! এটা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এই হতভাগ্য কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বৃহৎ পরিবারে সে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেবে। কারা এদের পূর্বপুরুষ, কোথায় এদের মূল স্বদেশ—কিছুই এরা জানে না। কুণ্টা জানে। সে তাদের জানিয়ে দেবে। আফ্রিকাদেশের মহান ঐতিহ্যের বাণী তাদের মাঝে প্রচার করবে।

কোনও বিচিত্র উপায়ে সে তার অতি নিকটে পিতামহের উপস্থিতি অনুভব করছিলো। কুণ্টা অন্ধকারে হাত বাড়ালো। না, কেউ নেই। তবু সে পবিত্র পুরুষ কৈরাবা কুণ্টা কিণ্টের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুরু করলো। তাকে কেন এই সুদূর দেশে আনা হয়েছে, ঘটনার উদ্দেশ্য কী, জানাবার জন্য মিনতি করতে লাগলো। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে কুণ্টা নিজেই বিস্মিত হচ্ছিলো। এ প্রবাসে সে আজ পর্যন্ত আল্লাহ ছাড়া কারো সাথে একটি কথাও বলেনি। কেবল কখনো কষাঘাতের তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে।

পরদিন সকালে কুণ্টা অন্যদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়েও নিবৃত্ত হলো। আজকাল সাদা মানুষদের অনেক কথাই সে বোঝে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। সহসা তার মনে হলো—এখনকার কালোরাও হয়তো তারই মতো মনোভাব গোপন করে রাখে। কতবার সে দেখেছে—সাদা মানুষগুলো পেছন ফিরলেই—এই হতভাগ্যদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সর্ব অবয়ব তিক্ততায় ভরে ওঠে। ইচ্ছা করে তারা কাজের যন্ত্রপাতি ভেঙে রাখে। অথচ ওভারসীয়ার বকাবকি করলে এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই তারা জানে না। সাদা মানুষ কাছে থাকলে ব্যস্ততা দেখায় বটে, কিন্তু সবটাই ভাণ। কার্যতঃ অকারণে দ্বিগুণ সময় লাগিয়ে দেয়।

এটাও সে বুঝতে পারছিলো, মানডিনকার সিরা কাঙ্গো ভাষার মতো এদের একটা নিজস্ব গোপন ভাষা আছে। ক্ষেতে কাজ করবার সময় এদের সামান্যতম ইঙ্গিত, অতি মৃদু শির সঞ্চালন কিছুই কুণ্টার নজর এড়ায় না। কখনো বা ওভারসীয়ারের অগোচরে উচ্চারিত সংক্ষিপ্ততম শব্দ বা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি তার কানে এসেছে। আবার কখনো তারা গান জুড়ে দেয়। বড় ক্যানুর মেয়েদের

গানের মতো, এ গানের মাধ্যমে যে কিছু একটা বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে তাও সে জানে।

রাতের অন্ধকারে যখন বড় বাড়ীর জানালাতেও আর আলো থাকে না, দু'একজন কালো লোক গোপনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, কয়েক ঘণ্টা বাদে তেমনি সংগোপনে ফিরে আসে। কুণ্টার প্রখর শ্রবণে সব আওয়াজই ধরা পড়ে। কোথায় এরা যায়, কেনই বা ফিরে আসে—কে জানে! পরদিন দিনের আলোতে সে লোকগুলোকে চিনতে চেষ্টা করে। ভবিষ্যতে এদেরকেই তো বিশ্বাস করতে হবে।

রাতের খাবারের পর রাঁধুনী বুড়ীর আগুনের চারপাশে কালোরা রোজই গোল হয়ে ঘিরে বসে গল্প করে। এ দৃশ্য তৎক্ষণাৎ জুফরের কথা মনে করিয়ে দেয়। কুণ্টার মন বিষাদে ভরে ওঠে। অবশ্য একটু তফাৎ আছে। এখানে ছেলেরা ও মেয়েরা একসাথে বসে। আর কেউ কেউ বিধর্মীদের তামাকও ফুঁকতে থাকে। রাতের অন্ধকারে আগুনের ফুলকিগুলো জ্বলে, নেভে। কণ্ঠস্বর শুনে কুণ্টা কল্পনা করে নিতে পারে—কে কথা বলছে। প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর ও চেহারা তার জানা। নিজের অনুমান মতো তারা কে কোন উপজাতির, তাও স্থির করে নিয়েছে। কার কেমন স্বভাব তাও অজানা নয়।

আসরে সকলেরই কণ্ঠস্বরে অপরিসীম তিক্ততা। সাদা মানুষগুলোর কথার ভঙ্গী অনুকরণ করে বিদ্রূপের হাসিতে তারা গড়িয়ে পড়ে। হাসাহাসির পর নিজেদের বিষয়েই কথাবার্তা বলে। কারো কণ্ঠে সীমাহীন হতাশা, কারো ক্রোধ। কোন মহিলা হয়তো তার দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর গান শুরু হয়। গানের ভাষা কুণ্টার অনধিগম্য। কিন্তু সেই করুণ সুরের গভীর বেদনা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আঘাত করে।

হাওয়া ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। কুণ্টার স্মরণকালে এমন শীত সে পায়নি। গাছগুলি পত্রহীন। একদিন ওভারসীয়ার কালোদের সকলকে ক্ষেতের পরিবর্তে খামারবাড়ীতে নিয়ে এলো। সেখানে প্রভু, প্রভুপত্নী এবং আরো কিছু সুসজ্জিত সাদা মানুষ উপস্থিত। খাওয়া দাওয়া গানবাজনার ব্যবস্থা ছিলো। কালোদের মাঝে এক বৃদ্ধ তারের যন্ত্র তুলে নিয়ে বাজাতে লাগলো। ঠিক যেন কুণ্টার অতি পরিচিত 'কোরা'র আওয়াজ। অন্য কালোরা উঠে এসে নাচতে শুরু করলো। সাদা মানুষেরা খুশীতে হাততালি দিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। নাচ উদ্দাম হয়ে উঠতে সাদা মানুষেরাও নাচের আসরে নামলো। বৃদ্ধটি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে

পাগলের মতো বাজাতে শুরু করলো। বাকী কালোরা চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে আসরে সরগরম করে তুললো।

রাত্রিবেলা দিনের ঘটনাগুলি চিন্তা করে কুণ্টার মনে হলো—কোন গভীর রহস্যময় কারণে সাদা এবং কালো মানুষেরা পরস্পরের সাথে বিচিত্রভাবে সংবদ্ধ। উভয়ের উভয়কে প্রয়োজন। নতুবা তাদের জীবনে পরিপূর্ণতা আসে না।

কুণ্টার বাঁ গুলফের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সর্বক্ষণ পুঁজ গড়াচ্ছে। চলাফেরা ক্রমশঃ কঠিনতর হচ্ছে। ওভারসীয়ার কাছে এসে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। স্যামসনকে বললো শিকল খুলে দিতে।

শিকল খুলেও চলতে কষ্ট হচ্ছিলো। কিণ্টা আনন্দের চোটে তা গ্রাহ্যই করলো না। সে রাতেই আবার পালালো।

ছত্রিশ

প্রথমবার যেদিকে পালিয়েছিলো, এবার কুণ্টা তার বিপরীত দিকে ছুটলো। এ পাশের জঙ্গলটা আয়তনে বড়, আরো ঘন। একটা খাদের ধারে পৌঁছে কুণ্টা একটু থামলো। দূরে শব্দ শোনা যাচ্ছে না? আবার তার বুক দুরু দুরু করতে থাকলো। হ্যাঁ, পদধ্বনি এগিয়ে আসছে। স্যামসনের ক্রুদ্ধ গর্জনও শোনা যাচ্ছে।

'টবি! টবি!'

কুণ্টা একটা গাছের ডাল বর্শার মতো চোখা করে রেখেছিলো। আশ্চর্য রকমের শান্ত মনে প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে সে অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করতে থাকলো। স্যামসন আর একটু এগিয়ে আসতে কুণ্টা প্রাণপণে বর্শাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু নাঃ! এক চুলের জন্য সে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে।

এবার কী করবে? দৌড়বে? কিন্তু পায়ে জোর নেই। স্যামসন তার বিশাল দেহের ভারেই কুণ্টাকে ধরাশায়ী করে ফেলে তার দেহে অবিরল ধারায় ঘুষি লাগাতে থাকলো। কুণ্টা কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আঁচড়াতে ও কামড়াতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু স্যামসন আবার তাকে প্রবল আঘাতে ধরাশায়ী করলো। এবার আর কুণ্টার উঠবার সাধ্য হলো না।

স্যামসন হাঁফাতে হাঁফাতে কুণ্টার দুই কব্জি দড়ি দিয়ে কষে বাঁধলো।

তারপর হিড়হিড় করে টেনে খামারবাড়ীর দিকে নিয়ে চললো। ক্ষণে ক্ষণে নির্দয় লাথি। মুখে অকথ্য গালিগালাজ। কুণ্টার ঘরে পৌঁছে আরো দু চারটে লাথি কষিয়ে তাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্যামসন চলে গেলো।

কুণ্টার দেহে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না। তবু দাঁত দিয়ে কামড়ে বহু কষ্টে হাতের বাঁধন খুললো। তারপর অঝোরে কান্না। সে আবার ব্যর্থ হয়েছে! কাঁদতে কাঁদতে সে আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করতে বসলো।

কুণ্টা বুঝতে পারছিলো তার ওপর খুব কড়া নজর রাখা হয়েছে। তবু বাইরে সে এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই ঘটেনি। বরঞ্চ আগের চেয়ে আরো বেশী পরিশ্রম করে। সে লক্ষ্য করেছে যারা বেশী পরিশ্রম করে, আর হাসিমুখে থাকে তাদের প্রতি ওভারসীয়ারের নজর কম। মুখে হাসি আনা কুণ্টার পক্ষে অসম্ভব। তবে বেশী পরিশ্রম করার ফলে কষাঘাতের পরিমাণ কমেছে দেখে মনে মনে খুশী হলো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজের পর কুণ্টা পথে একটা লোহার গোঁজ দেখতে পেলো। সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে চকিতে সেটি তুলে নিয়ে জামার তলায় লুকিয়ে রাখলো। নিজের ঘরে এসে মেঝের মাটি খুঁড়ে সেটি গোপনে রেখে দিলো। ওটা কী কাজে লাগবে সে জানে না। যদি পালাবার সময় কোন কাজে লেগে যায়! ক্ষেতে কাজ করবার জন্য যেলম্বাছুরিগুলো ব্যবহার করা হয় তার একটা পেলে হতো। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় কালোদের কাছ থেকে ফেরৎ নেবার সময় ওভারসীয়ার সেগুলো গুণে রাখে।

প্রায় মাস খানেক পরে এক শীতের সন্ধ্যায় কুণ্টা আর একজনের সাথে বেড়া বাঁধতে যাচ্ছিলো। অবাক হয়ে দেখলো আকাশ থেকে নুনের মতো কী যেন ঝরছে। জিনিসটা প্রথমে হালকা ভাবে, পরে বেশ দ্রুত আর ঘন হয়ে ঝরতে লাগলো। কালোরা চেঁচামেচি করছিলো—বরফ! বরফ! কুণ্টা নীচু হয়ে ছুঁয়ে দেখলো ভয়ানক ঠাণ্ডা। মুখে দিয়ে দেখলো স্বাদহীন, অতি শীঘ্র জিনিসটা কেমন জল হয়ে মুখে মিলিয়ে যায়। মাঠের অপর প্রান্তে পৌঁছতে পৌঁছতে বরফ পড়া থেমে গেলো। বরফগুলো মিলিয়ে গেলো। বেড়ার ধারে একটি কালো লোক অপেক্ষা করে ছিলো। দু'জনে মিলে একরকম ধাতুর সুতো—এরা তাকে বলে 'তার'—দিয়ে বেড়া বাঁধতে লাগলো। কাছেই একটা জায়গায় লম্বা ঘাস গজিয়েছে। বেড়া বাঁধতে বাঁধতে সেখানে পৌঁছে লোকটা লম্বা ছুরি দিয়ে ঘাস-গুলো কেটে নিলো। ছুরিটা দেখে কুণ্টা উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় উদগ্র হয়ে উঠলো।

তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। ছুরিটা পাশেই পড়ে আছে। লোকটা আপন মনে কাজ করছে। ওভারসীয়ার সেদিন অন্য এক মাঠে ঘুরছে। স্যামসন দৃষ্টির সীমানায় নেই।

আল্লাহের দরবারে নীরবে প্রার্থনা ক'রে কুণ্টা দুই হাত ওপরে তুলে তার দুর্বল দেহের সর্বশক্তি দিয়ে লোকটার ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো। লোকটা নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো। লম্বা ছুরিটা তুলে নিয়ে কুণ্টা একবার ভাবলো লোক-টাকে শেষ করে দেয়। কিন্তু এ তো আর শয়তান স্যামসন নয়। কুণ্টা লোকটার হাত পা তার দিয়ে বেঁধে রেখে জঙ্গলের দিকে ছুটলো। মনে হচ্ছিলো, সে যেন স্বপ্নে দৌড়োচ্ছে। দেহের কোন ভার নেই।

কিছু দূরে গিয়েই লোকটার পরিত্রাহি চিৎকার শুনতে পেলো। নিজের ওপর কুণ্টার ভয়ঙ্কর রাগ হলো। ভুল হয়ে গিয়েছে। লোকটাকে জ্যান্ত রাখা উচিত হয়নি। সে যথাসাধ্য দ্রুত ছুটতে লাগলো। জঙ্গলের ভেতর কুণ্টা পশুর মতোই থাকবে। খরগোশ, ইঁদুর জাতীয় জীব ফাঁদ পেতে ধরে ধূমহীন আগুনে পুড়িয়ে খাবে। আফ্রিকাতে সে ওসব বিদ্যা শিখেছে। এ দেশেও তার জ্ঞান অনেক বেড়েছে।

যতক্ষণ দিনের আলো ছিলো—সে ছুটতেই থাকলো। একটা অগভীর নদী পায়ে হেঁটে পার হলো। অবশেষে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসতে সে থামলো। কিছু কী শোনা যাচ্ছে? কুকুরের শব্দ? না। সত্যি কি সে এবার তাহলে মুক্তি পাবে?

তখনই মুখে একটা শীতল স্পর্শ পেলো। হাতে ছুঁয়ে দেখলো—বরফ। আবার বরফ পড়ছে। চারিদিক ছেয়ে গেলো। তার সর্বাঙ্গ বরফে ঢেকে গেলো। নিঃশব্দে ঝরছেই। কুণ্টা কি বরফে চাপা পড়ে যাবে? তার দেহ ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলো। আর পারা যাচ্ছে না। মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন চাই। কুণ্টা আবার দৌড়োতে শুরু করলো। বেশ খানিকটা গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লো। ব্যথা লাগলো না। কিন্তু পেছন ফিরে তাকিয়ে আতঙ্কে বুক শুকিয়ে গেলো। বরফের ওপর দিয়ে তার পায়ের ছাপ গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। আরো দূরে, আরো অনেক দূরে পালাতে হবে। কিন্তু ভোর হয়ে আসছে। সারারাত দৌড়ে দেহ ক্লান্ত। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। পূর্বাকাশ আলোকিত হয়ে উঠছে। দূরে শিঙে ফোঁকার ক্ষীণ আওয়াজ। চারিদিকের এই বিভীষিকাময় শ্বেত শুভ্র হিম আস্তরণের মাঝে কোথায় সে আত্মগোপন করবে?

দূরে কুকুরের ডাক শোনা যেতে কুন্টা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সে তাড়া খাওয়া নেকড়ের মতো দৌড়োতে লাগলো। বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুকুরগুলোও তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। এবার কুন্টা প্রাণপণ শক্তিতে তাদের প্রতি আক্রমণ করলো। লম্বা ছুরির এক আঘাতে প্রথম কুকুরটার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলো। দ্বিতীয় কুকুরটার দুই চোখের মাঝখানে এক কোপ লাগালো। তারপর আবার ছুটতে শুরু করলো। কিন্তু পেছনে বন্দুকের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। পায়ে গুলি বিঁধতে সে তীব্র যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আবার গুলি! এবার তার মাথার ওপরে একটা গাছে বিঁধলো। 'আমাকে ওরা মেরে ফেলুক। আমি বীরের মতো মরবো।' আবার একই পায়ে আর একটা গুলি এসে যেন প্রচণ্ড আঘাতে কুন্টাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিলো। সামনে ওভারসীয়ার এবং আর একটা সাদা মানুষ। কুন্টা লাফিয়ে তাদের উদ্যত বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পায়ের নিদারুণ যন্ত্রণা তাকে অক্ষম করে ফেলে।

সাদা মানুষটা কুন্টার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে রাখলো। ওভারসীয়ার তার জামাকাপড় টেনে খুলে দিলো। চারিদিকের বরফের মাঝে কুন্টাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করা হলো। শুভ্র বরফের ওপর তার পায়ের রক্ত গড়িয়ে লাল করে তুলছিলো। এবার তারা কুন্টাকে একটা গাছের দিকে মুখ করিয়ে তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলো। হাত দুটো বেঁধে রাখা হলো গাছের অপর দিকে।

তারপর কষাঘাত। ওভারসীয়ারের হুহুঙ্কার আর নির্মম প্রচণ্ড প্রহার। কুন্টার সর্বদেহপ্রাণ প্রতিটি আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হচ্ছিলো। একান্ত অনিচ্ছায় শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক আর্তনাদ তার কণ্ঠ চিরে বাহির বিশ্বে আছড়ে পড়লো। তাতে সেই অমানুষিক প্রহার বন্ধ হলো না। তার কাঁধ পিঠ দীর্ঘ, গভীর উন্মুক্ত ক্ষতে ভরে উঠছিলো। কখন সে জ্ঞান হারিয়েছে, ঠাণ্ডা বরফের ওপর লুটিয়ে পড়েছে—জানে না।

নিজের ঘরে সংজ্ঞা ফিরে আসতে সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। সামান্য নড়াচড়ায় তীব্র ব্যথায় চোখে জল এসে যাচ্ছিলো। হাত পা শিকলে বাঁধা। সবচেয়ে দুর্বিষহ চারিপাশের বিকট দুর্গন্ধ। কুন্টার সর্বদেহ একটা মস্তবড় কাপড়ে জড়ানো। কাপড়টা শুয়োরের চর্বিতে ভেজানো। রাঁধুনী স্ত্রীকে দেখা গেলো। তার চোখেও করুণার আভাস।

দু'দিন পরে প্রত্যূষে উৎসবের শব্দে তার ঘুম ভাঙলো। কালো লোকগুলো সাদাদের বলছিলো—'ক্রীসমাসের শুভকামনা, মালিক!'

কী করে যে এরা আনন্দ উৎসব করে—আশ্চর্য ! কুণ্টা নিজের মৃত্যু কামনা করছিলো। সে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে চায়। সেই ভালো ! এই শ্বাসরোধকারী দুর্গন্ধময় পরিবেশে সে এক ফোঁটা বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করতে পারছে না। ক্রোধের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। শয়তানগুলো তাকে মানুষের মতো মারতে পারলো না কেন ? কেন তাকে নগ্ন করলো ? এবার ভালো হয়ে উঠলে সে কঠিন প্রতিশোধ নেবে। আবার পালাবে। না হয় মরবে।

সাঁইত্রিশ

কুণ্টা যখন আবার তার কুটির থেকে বেরোতে পারলো, তার দুই গুলফে শিকল বাঁধা। কালোরা সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে। সে যেন বন্য পশু—সকলের ভয়ের পাত্র। কেবল রাঁধুনী বুড়ি আর শিঙে-ফোঁকা বুড়ো সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলো। স্যামসন ধারে কাছে কোথায়ও নেই। কোথায় গিয়েছে কে জানে ! যাক্ ভালোই হয়েছে। ওভারসীয়ারটা এখন ছুতোয় নাতায় কুণ্টাকে বেত মারে। কুণ্টা জানে তাকে কঠোর নজরদারীতে রাখা হয়েছে। এখন সেও অন্যদের মতো সাদা মানুষদের সামনে তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে বা ব্যস্ততার ভাব দেখায়। যা আদেশ করা হয় ঠিকমত পালন করে। কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা হৃদয়ের গভীরে তার বুকভাঙা হতাশা আর অপরিসীম মনোবেদনা বহন করে নিজের জীর্ণ কুটিরে ফিরে আসে।

অন্ধকারে একা একা কল্পনায় সে তার পরিবারের প্রত্যেকের সাথে কথা বলে—

'বাবা, এই কালো লোকগুলো আমাদের মতো নয়। এদের অস্থি, মজ্জা, রক্ত, হাত, পা কিছুই এদের নিজস্ব নয়। সবই যেন শয়তানের কাছে বিক্রী করে দেওয়া। তাদের জীবন, শ্বাস-প্রশ্বাস সবই সাদা মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত। নিজস্ব বলে কিছুই নেই। নিজের সন্তানেরা পর্যন্ত নয়। তাদের দুধ খাইয়ে, খাবার খাইয়ে, লালনপালন করা হয় পরের সুবিধার জন্য।'

'মা, এখানকার মেয়েরা মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকে বটে, কিন্তু কী করে কাপড়টা বাঁধতে হয়, তা পর্যন্ত জানে না। অপবিত্র শুয়োরের মাংস বা চর্বি ছাড়া যেন এরা রাঁধতেই জানে না। আর এদের মাঝে অনেকেই তো শয়তান সাদা মানুষটার সাথে শুয়েছে। সেটা ওদের বাদামী রঙের পাপের সন্তান দেখেই বোঝা যায়।'

কুণ্টা তার ভাই ল্যামিন, সুওয়াডু বা ম্যাডির সাথে পর্যন্ত কথা বলতো।

'সাদা মানুষেরা যে কতবড় শয়তান, তা অতি জ্ঞানী বয়োজ্যেষ্ঠরা পর্যন্ত জানে না। জঙ্গলের হিংস্র বন্য পশুগুলো পর্যন্ত সে তুলনায় বহুগুণে ভালো। এ কথা কখনো যেন ভুলো না।'

বেশ কিছু চন্দ্রকাল কেটে গেলো। বরফ পড়া শেষ হয়েছে। গাঢ় লালচে মাটি ভেদ করে সবুজ ঘাসে চারিদিক ছেয়ে গিয়েছে। গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। পাখীরা আবার গান গাইতে শুরু করেছে। ক্ষেতে চাষ শুরু হয়েছে। মাটি ক্রমশঃ এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—বেশীক্ষণ পা রাখা যায় না।

কুণ্টা অপেক্ষা করে আছে—কখন কর্তাব্যক্তিরা একটু অসতর্ক হয়ে পড়বে। তার ওপর সদা প্রখর দৃষ্টি থাকবে না। নিজের একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সে আজকাল সাদা মানুষদের উপস্থিতিতে অন্য কালোদের মতোই আচরণ করে। অবশ্য মুখে হাসি সে কিছুতেই আনতে পারবে না। তবু মোটামুটি তাদের সাথে সহযোগিতা করে চলে। আর সর্বদাই অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাণ করে। এখন সে ওদের ভাষা অনেক বেশী বুঝতে পারে। ওদের কথাবার্তা উৎকর্ণ হয়ে শোনে। নিজে না বললেও তাদের কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এদেশের প্রধান ফসল তুলো। খুব সহজে জন্মায়। ফুলগুলো খুব তাড়াতাড়ি শক্ত, সবুজ, গোলাকার বলে পরিণত হয়। কেটে ফেললে ভেতরের নরম ফোলা ফোলা তুলো দেখা যায়। মাঠের পর মাঠ সাদা তুলোতে আকীর্ণ হয়ে থাকে। সে তুলনায় জুফরে গ্রাম তো অতি ক্ষুদ্র।

ফসল তোলার সময় হয়েছে। ঘুম ভাঙার শিঙে আজকাল শীঘ্র বাজে। ওভারসীয়ার বেত সপাং সপাং করতে থাকে, যাতে ক্রীতদাসেরা অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করে। হ্যাঁ, কালোদেরকে এরা 'ক্রীতদাস' বলে।

অন্যদের অনুকরণে মাঠে কুণ্টা পিঠ ঝুঁকিয়ে লম্বা ক্যানভাসের থলিটা এমন ভাবে বহন করে, যাতে সেটা মাটিতে ঠেকে থাকে। তার ফলে পুরো ওজনটা কুণ্টাকে বইতে হয় না। থলিটা ভর্তি হয়ে গেলে মাঠের ধারে একটা মাল বওয়া গাড়ীতে সেটা খালি করে আনতে হয়। কুণ্টা দিনে দু' থলি তুলো তোলে। গড়পড়তা সবাই তাই। অবশ্য কয়েকজন আছে—যাদের ক্রীতদাসেরা সবাই ঘৃণা করে আর হিংসা করে। তারা মালিককে খুশী করবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে। দিনে তারা তিন থলি তুলো তোলে। এগুলি সবই খামারবাড়ীতে তুলে রাখা হয়। পাশাপাশি আরো বড় কতকগুলো ক্ষেতে তামাকের চাষ হয়। কুণ্টা

লক্ষ্য করেছে—তামাকভর্তি কতকগুলো গাড়ী রাস্তা ধরে দূরে কোথায়ও চলে যায়। চারটা খচ্চর টানা সে সব গাড়ী ফিরে আসতে চারদিন সময় লেগে যায়। আর স্যামসন বা অন্য কোন চালক যখন সে সব গাড়ী নিয়ে ফিরে আসে—তাকে বড়ই ক্লান্ত দেখায়।

হয়তো ওসব গাড়ীতে যেতে পারলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে মুক্তির সন্ধান পাবে। উত্তেজনায় পরের কয়েকদিন আর কাটে না। কেমন করে গাড়ীর পেছনে লাফিয়ে উঠে তামাক পাতার নীচে লুকিয়ে থাকবে, মনে মনে সেই চিন্তা আর তারই পুনরাবৃত্তি চলে। কাফেরদের ব্যবহৃত অপবিত্র তামাক কুণ্টা চিরদিন পরিহার করে চলেছে। সে জিনিসের কটু গন্ধও অসহ্য। কিন্তু নিতান্ত অপারগ হয়ে যদি সে ঐ পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে মার্জনা করবেন।

কুণ্টা শৌচাগারের পেছনে গোপনে গুলতি দিয়ে একটা খরগোশ মারলো। চামড়া ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে মাংসটা সরু সরু ফালি করে রোদে শুকিয়ে নিলো। ভবিষ্যতের জন্য খানিকটা খাদ্য সঙ্গে থাকা দরকার। একটা ভোঁতা বাঁকা মরচে ধরা ছুরির ফলা কুড়িয়ে পেয়েছিলো। সেটাকে পাথর দিয়ে ঘষে কাজের যোগ্য করে নেয়। তারপর একটা কাঠের বাঁট তৈরী করে লোহার তার দিয়ে কষে সেটাকে ফলার মতো বেঁধে নিলো। আরো একটা মস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সে তৈরী করে নিয়েছিলো—নিজের জন্য একটা রক্ষা কবচ। প্রেতেদের আকর্ষণ করার জন্য মোরগের পালক, সামর্থ্যের জন্য ঘোড়ার চুল, সাফল্যের জন্য পাখীর বুকের হাড় একসাথে শক্ত করে বেঁধে এক টুকরো চটে জড়িয়ে সেলাই করে নিয়েছিলো। কোন পবিত্র লোককে দিয়ে কবচটা শোধন করিয়ে নিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সে তো আর এখানে সম্ভব নয়।

সারা রাত কুণ্টা ঘুমায়নি। কিন্তু তার ক্লান্তি বোধ হচ্ছিলো না। বরঞ্চ উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ফুটছিলো। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে নির্বিকার ভাবে সে ক্ষেতের কাজ সেরে নিলো। আজ রাতটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যে ভাবে হোক কাজ হাসিল করতেই হবে। রাতে খাওয়ার পর পকেটের ভেতর ছুরি আর মাংসের শুকনো ফালিগুলো একবার কম্পিত হাতে অনুভব করে নিলো। কবচটা ডান হাতের ওপর দিকে কষে বেঁধে নিলো। রাতের অভ্যস্ত কাজকর্ম, করুণ সুরের টানা সঙ্গীত,—ইত্যাদি শেষ করে কখন সবাই শুয়ে পড়বে—কুণ্টা অধীর চিত্তে তারই অপেক্ষা করছিলো। এরা ঘুমিয়ে না পড়লে কুণ্টার পালাবার জো নেই।

অবশেষে তার নিজের তৈরী ছুরিটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধার সে রাতের

অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। নীচু হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বড় রাস্তার দিকে দৌড়োতে লাগলো। যদি আজ মালের গাড়ী না আসে? এ চিন্তা তীক্ষ্ণ শলাকার মতো তার বুকে বিঁধলো। যদি গাড়ীর চালকের কোন সহকারী পেছন দিকে লক্ষ্য রাখতে থাকে? ভয়ে কুণ্টার হাত পা অবশ হয়ে আসে। কিন্তু তাকে তো খানিকটা ঝুঁকি নিতেই হবে।

হ্যাঁ, একটা গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ক্রমশঃ তার মিটমিটে আলোও চোখে পড়লো। কিন্তু এমন গুটি গুটি চলছে যেন এগোচ্ছেই না। অবশেষে সেটা তার সামনে এসে হাজির হলো। অতি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। সামনের আসনে আধো অন্ধকারে দু'টি মূর্তি। কুণ্টার সারা অন্তঃকরণ চিৎকার করে উঠতে চাইলো। সে আড়াল থেকে বেরিয়ে নীচু হয়ে গাড়ীর পেছনে চলতে শুরু করলো। সামনেই একটা অসমান জায়গা। সেখানে পেঁৗছে গাড়ীটা ঝাঁকুনি খেতেই কুণ্টা পেছন দিকটা আঁকড়ে ধরে এক লাফে গাড়ীর পর্বতাকার তামাকের স্তূপের ওপর চড়ে বসলো। যাক্, তাহলে সে উঠতে পেরেছে।

সে পাগলের মতো ঐ স্তূপের ভেতর ফাঁক করে ঢুকবার চেষ্টা করতে থাকলো। খুব শক্ত করে বাঁধা। যাক্, কোনক্রমে দেহটা আড়াল করা গেলো। দুর্গন্ধে তার বমি পাচ্ছিলো। তবুও একটু একটু করে শরীরটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে যথাসাধ্য আরাম করে বসবার চেষ্টা করলো। গাড়ীর দুলুনী আর তামাকপাতার উষ্ণতায় তার তন্দ্রা এসে গেলো।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনীতে ঘুম ভেঙে গিয়ে প্রথমেই তার মহা দুশ্চিন্তা হলো। গাড়ীটা কোথায় যাচ্ছে? কতক্ষণ লাগবে? সেখানে পেঁৗছে কি সে গোপনে পালাতে পারবে? আবার ধরা পড়বে না তো? এসব কথা আগে ভাবেনি কেন? কুকুর-গুলো, স্যামসন আর বন্দুক হাতে সাদা মানুষটার কথা মনে পড়তে কুণ্টা শিউরে উঠলো। গতবার তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিলো। এবার ধরা পড়লে হয়তো তাকে মেরেই ফেলবে।

নাঃ, গাড়ী থেকে নেমে পড়াই ভালো। পাতাগুলো দু'হাতে সরিয়ে সে মাথা উঁচু করলো। বাইরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পারাপারহীন শস্যক্ষেত্র, আর নির্জন গ্রামাঞ্চল। এখানে লাফানো চলবে না। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মুহূর্তে সে ধরা পড়ে যাবে। অবশ্য যত দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই ভালো। কুকুরগুলোর পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন হবে। তবুও প্রতিবার গাড়ীটা ঠক্কর খেলেই সে চমকে উঠে ভাবছিলো—এই বুঝি যাত্রার শেষ!

বহুক্ষণ পর সে উঁকি মেরে দেখলো—ভোর হয়ে আসছে। না, না। এবার তাকে নামতেই হবে। প্রকাশ্য দিনের আলোয় শত্রুর সম্মুখীন হওয়া কোন কাজের কথা নয়। সে তার দেহটি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিলো। গাড়ীটা আর একবার ধাক্কা খেতে কুণ্টা নেমে পড়লো। হাল্কা পায়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে মুহূর্তে ঝোপের আড়ালে চলে গেলো।

দূরে দু'দিকে দুটো সাদা মানুষের খামারবাড়ী দেখা যাচ্ছে। প্রভাতের শিঙে বেজে উঠতে শান্ত সমীরণে সে আওয়াজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যালোক প্রখর হয়ে উঠতে কুণ্টা ক্রমশঃ গভীর বনের ভেতর ঢুকে গেলো। ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা। শিশিরের ছিটা গায়ে লাগতে তার বেশ আরাম হচ্ছিলো। মনে বড় আনন্দ। বিকালবেলা একটা ছোট নদীর ধারে বসে অঞ্জলি ভরে জল খেলো। এক টুকরো শুকনো মাংস চিবালো।

আবার ছুটতে শুরু করলো। বিকালের নামাজ সেরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে পর্যন্ত সে ছুটলো। গাছের পাতায় আর ঘাসে তৈরী বিছানায় রাত কাটালো। প্রত্যূষের প্রথম আলোর আভাসে ঘুম ভেঙে আবার ছুট। সে কেবল গভীর জঙ্গলই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। সে রাত্রে কুণ্টা অন্য একটা নদীর ধারে বিশ্রাম করলো। বনের ফল, শুকনো মাংস আর নদীর জল—এই তার খাদ্য ও পানীয়। মাঝে মাঝে সে কাল্পনিক কুকুরের ডাক শুনে উচ্চকিত হয়ে পড়ে। মানুষ থেকে কুকুরকেই তার বেশী ভয়।

পরদিন সকালে কুণ্টা ভাবতে বসলো—সে কোথায় যাচ্ছে? সে কোথায় আছে, তাই তো জানে না। সে কেবল মানুষের সান্নিধ্য পরিহার করবার চেষ্টা করছিলো আর সূর্যোদয়ের দিকে ছুটছিলো। ছোটবেলা মানচিত্রে দেখেছে—আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমে বিরাট জলরাশি। কাজেই পূর্বদিকে যেতে থাকলে অবশেষে এক সময়ে তো সে সমুদ্রধারে পৌঁছোবেই—এই তার ধারণা। কিন্তু তারপর কী হবে? যদি সে ধরা নাও পড়ে, তবু সেই অগাধ বারিরাশি কী করে পার হবে? পথ দেখিয়ে দিতে পারলেও এ বিশাল বারিধি উত্তরণ করা কি সাধারণ নৌকার সাধ্য? ভয়ে তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। দৌড়োতে দৌড়োতে প্রার্থনার সময়েও সর্বক্ষণ সে তার কবচটা যথাসাধ্য স্পর্শ করে থাকে।

সে রাত্রে ঝোপের আড়ালে শুয়ে সে মানডিনকা জাতির শ্রেষ্ঠ বীর সুনডিয়াটার কথা ভাবছিলো। সুনডিয়াটা একজন আফ্রিকাবাসী প্রভুর ক্রীতদাস ছিলো। প্রভুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে যায়। তারপর তারই মতো

পলাতক অন্যান্য ক্রীতদাস নিয়ে এক সামরিক বাহিনী গঠন করে। তারাই মানডিনকা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্থদিন সকালে ছোটা শুরু করে সে ভাবতে থাকলো—সেও এই সাদা মানুষের দেশে তারই পলাতক আফ্রিকাবাসীদের নিয়ে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলবে—স্বদেশে ফিরে যাওয়াই তাদের পণ হবে। হয়তো তারা একটা বিরাট ক্যানু তৈরী করবে। তারপর—

একটা ভয়ঙ্কর শব্দ না ? মুহূর্তে কুণ্টা নিশ্চল হয়ে গেলো। না, না। এ হতেই পারে না। কিন্তু নির্ভুলভাবে আবারও শিকারী কুকুরের ডাক ! পাগলের মতো সে ঝোপের ভেতর ঢুকে গেলো। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো, আবার উঠে দাঁড়ালো। আর সে পারে না। ছুরিটা মুঠোয় ধরে সে চুপ করে বসে অপেক্ষা করে। আর শব্দ শোনা যায় না।

সত্যি কি কুকুরের ডাক শুনেছিলো ? নাকি তার কল্পনা ? কিন্তু তাকে ছুটতেই হবে। তা ছাড়া উপায় নেই। তার আগে একটু শোবে। বেশ একটু সময় সে চোখ বুজে থাকবে। তারপর আবার দৌড়োবে।

সহসা যেন তড়িতাহত হয়ে জেগে উঠলো। সর্বাঙ্গে দরদর ঘাম। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, কীসে ঘুম ভাঙলো ? অকস্মাৎ আবার শোনা গেলো। তাহলে এতেই ঘুম ভেঙেছে। এবার আরো কাছের থেকে কুকুরের ডাক ! সে লাফিয়ে উঠে ছুটলো। একটু বাদেই মনে পড়লো ভয়ের তাড়ায় সে ছুরিটা নিতে ভুলে গিয়েছে। ফিরে গিয়ে মনের উদ্বেগে, শঙ্কায় ছুরিটাও খুঁজে পাচ্ছিলো না। কুকুরের চিৎকার ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। ছুরিটা না পাওয়া গেলে সে রক্ষা পাবে না। অন্ধের মতো হাতড়িয়ে অবশেষে একটা বড় পাথরের টুকরো সংগ্রহ করে কুণ্টা গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলো।

সারা রাত ধরে যেন সে প্রেতাবিষ্টের মতো দৌড়োলো। পায়ে লতা জড়িয়ে কখনো পড়ে যাচ্ছে আবার উঠছে। একটু থেমে দম নিচ্ছে। কিন্তু কুকুরগুলো ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। ভোরবেলা সেগুলো তার দৃষ্টিসীমার মাঝে এসে গেলো। আবার সেই দুঃস্বপ্ন। আর তো তার ছুটবারও সামর্থ্য নেই। সে ফিরে দাঁড়ালো। ডান হাতে একটা গাছের ডাল, বাঁ হাতে একটা প্রস্তরখণ্ড নিয়ে সে মরণের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

কুকুরগুলো এগোতেই কুণ্টা প্রচণ্ড বিক্রমে হাতের লাঠি ঘুরিয়ে এমন উৎকট গর্জন করে উঠলো যে সেগুলো ভয়ে পিছিয়ে গেলো। কিন্তু তাদের পেছনে ঘোড়ার পিঠে যমদূতের মতো দু'টি সাদা মানুষ।

এদের কুণ্টা আগে কখনো দেখেনি। অল্পবয়স্কজন তার দিকে বন্দুক উঁচালো। কিন্তু অধিকবয়স্ক অন্য একজন তাকে বারণ করে নিজে ঘোড়া থেকে নেমে কুণ্টার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার হাতে লম্বা কালো চাবুক।

কুণ্টা বিস্ফারিত নয়নে কম্পিত দেহে স্তব্ধ হয়ে রইলো। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো সাদা মানুষের এতদিনের কতো বিচিত্র ধরনের অত্যাচারের স্মৃতি তার মনে চমকিত হতে লাগলো। জুফরের বনে ঝোপের আড়ালে সেই প্রথম দেখা সাদা মানুষের মুখ। বড় ক্যানুতে ডেকের ওপরে বা খোলের ভেতরে বন্দী অবস্থায়, এই সুদূর প্রবাসের বন্দীশালায়, বাজারে কেনাবেচার হাটে, দুরাত্মাদের চাষের ক্ষেতে, নানা অবস্থায় এই শয়তানদের বিভিন্ন ভঙ্গীর মুখচ্ছবি, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়ে আরো তিনবার অমানুষিক প্রহার, কষাঘাত, বন্দুকের গুলি। সামনের সাদা মানুষটা চাবুক তুলে মারতে উদ্যত হতেই কুণ্টা সর্বশক্তি দিয়ে হাতের পাথরটা ছুঁড়লো।

সাদা মানুষটা চিৎকার করে উঠলো। কুণ্টার কান ঘেঁষে বন্দুকের গুলি ছুটলো। কুকুরগুলো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কুণ্টা তাকিয়ে দেখলো একটা সাদা মানুষের মুখের ওপর দিয়ে দরদর ধারে রক্ত ঝরছে। প্রচণ্ড আক্রোশে কুণ্টা হিংস্র পশুর মতো মুখ বিকৃত করে ভীম গর্জন করছিলো। সাদা মানুষদুটো কুকুর-গুলোকে নিবৃত্ত করে বন্দুক হাতে এগিয়ে এলো। তাদের চোখেমুখে হত্যার সঙ্কল্প জাজ্বল্যমান। কুণ্টা পরোয়া করে না। সাদা মানুষদুটো তাকে ধরবার চেষ্টা করলে কুণ্টা নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রবল বিক্রমে লড়াই করতে লাগলো। সে আরবী ও মানডিনকা ভাষায় উন্মত্তের মতো চিৎকার করছিলো। অবশেষে সাদা মানুষদুটো জোর করে তাকে চেপে ধরে একটা গাছের কাছে নিয়ে এলো। তার জামাকাপড় ছিঁড়ে খুলে দিলো। তারপর গাছের সাথে কষে বাঁধলো। কুণ্টা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

অকস্মাৎ রক্তেমাখা সাদা মানুষটা থমকে দাঁড়ালো। তার চোখে একটা বিচিত্র দৃষ্টি, মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠলো। রুদ্ধস্বরে অল্পবয়সী লোকটাকে কিছু বললো। সে হেসে মাথা নেড়ে তার ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে জিনে আটকানো একটা ছোট হাতলওয়ালা কুড়োল নিয়ে এলো। কুঠারটা দিয়ে প্রথমে একখণ্ড গাছের গুঁড়ি কেটে এনে সেটা কুণ্টার ডান পায়ের নীচে রাখলো। তারপর পা-টা কষে গাছের সাথে শক্ত করে বাঁধলো। আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত কুণ্টা চিৎকার করে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে না করতে রক্তাক্ত মুখ সাদা মানুষটা বিদ্যুৎগতিতে কুঠারের

এককোপে কুণ্টার ডান পায়ের পাতার সামনের অর্ধ অংশে বিচ্ছিন্ন করে দিলো। চামড়া, শিরা, উপশিরা, মাংস, অস্থি সব কিছু। কুণ্টা তার পায়ের নরম মাংসে শাণিত কুঠার সজোরে এসে আঘাত করার ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেলো। গভীর তীব্র যন্ত্রণার বিস্ফোরণে তার মস্তিষ্ক যেন শতধা হয়ে গেলো। সারা দেহে অপরিসীম ক্লেশের আক্ষেপ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো। উর্ধ্বাঙ্গ প্রবল তাড়নার শিহরিত হলো। তার দুই হাত যন্ত্রচালিতের মতো ডান পা-টিকে বাঁচাবার চেষ্টায় সামনে আছড়ে পড়লো। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ শোণিতধারা ফোয়ারার মতো বেগে উৎক্ষিপ্ত হলো। কুণ্টার চেতনার জগৎ নিঃসীম অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেলো।

আটত্রিশ

কুণ্টা সাময়িকভাবে অনুভূতির রাজ্যে ভেসে উঠছিলো আবার ডুবে যাচ্ছিলো। তার চক্ষু নিমীলিত। মুখের পেশী শ্লথ। ঠোঁটের কোণে ফেনা। সে জীবিত, এ বোধ জন্মাতে ক্রমশঃ দেহের নানান জায়গায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো। মাথার অসহ্য বেদনা সারা শরীরে তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ছিলো। ডান পা অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। চোখ খোলার সামর্থ্য ছিলো না। মনে মনে অতীত ঘটনাগুলি স্মরণ করবার চেষ্টা করছিলো। অকস্মাৎ সব মনে পড়ে গেলো। সাদা মানুষটার ক্রোধে রক্তবর্ণ বিকৃত মুখমণ্ডলী—সেই সমুদ্যত কুঠারের ঝলক, পায়ের ওপর ধারালো অস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতের বীভৎস আওয়াজ আর আপন দেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত ছিন্ন খণ্ড। মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় কুণ্টা আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

আবার যখন চোখ খুললো কুণ্টা ছাদে একটা মাকড়সার জাল দেখতে পেলো। একটু নড়াচড়া সম্ভব হতে অনুভব করলো—তার কবজি, বুক, পায়ের গুলফ শিকলে বাঁধা। শুধু মাথা এবং ডান পা একটু উঁচু কিছুর উপর রাখা। তার পরণে একটা লম্বা পোশাক। চারদিকে আলকাতরা জাতীয় কোন বিশ্রী পদার্থের উৎকট দুর্গন্ধ। কুণ্টা ভেবেছিলো চরম দুঃখের অভিজ্ঞতা তার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমানের দুঃসহ যন্ত্রণা যে অতীতের কষ্টের শতগুণ।

কুণ্টা আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করছিলো। সহসা কুটিরের দরজা খুলে যেতে থেমে গেলো। একজন অপরিচিত লম্বা সাদা মানুষ একটি ছোট কালো ব্যাগ হাতে ঢুকলো। মুখখানা রাগী। কিন্তু সে রাগ যেন কুণ্টার প্রতি নয়। হাত দিয়ে

মাছি তাড়িয়ে সে কুণ্টার পাশে এসে বসলো। পায়ে একটু হাত লাগতেই অকল্পনীয় যন্ত্রণায় কুণ্টা মেয়েদের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। সাদা মানুষটা কুণ্টার কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করলো। তার কবজি স্পর্শ করে বহুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলো। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্টার পীড়িত ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলী লক্ষ্য করে রুক্ষস্বরে ডাকলেন—

'বেল!'

শক্তসমর্থ গড়নের ছোটখাটো একটি কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা একটা পাত্রে জল নিয়ে ঢুকলো। কোন বিচিত্র কারণে কুণ্টার তাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিলো। অর্ধচেতন নির্মম দুঃখকঠিন দিনগুলোতে এই মহিলাই কি তার সেবা করেছে, স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে সাহস জুগিয়েছে, শুষ্ক অধরে পানীয় দিয়েছে?

সাদা মানুষটি তার কালো ব্যাগ থেকে কোন কিছু বার করে এক কাপ জলে মিশিয়ে দিলো। মহিলাটি কুণ্টার পাশে নতজানু হয়ে বসে এক হাতে তার মাথাটি তুলে ধরে অপর হাতে জলটুকু পান করাতে লাগলো। কুণ্টা তাকিয়ে দেখলো ডান পায়ের নীচের দিকে একটা বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাতে শুকনো রক্তের ছোপ। শিউরে উঠতে চেষ্টা করেও ব্যাহত হলো। সে একেবারেই অশক্ত হয়ে পড়েছে। অতিশয় কটু স্বাদের পানীয়টুকু তার মুখে ঢালবার চেষ্টাতেও বাধা দেবার সাধ্য ছিলো না।

কুণ্টা নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে সহসা বুঝতে পারছিলো না—সে কোথা, কেনই বা তার ডান পা-টাতে অসহ্য কষ্ট। আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন ছায়ামূর্তি নিরালম্বভাবে তার মানসপটে ভেসে যাচ্ছিলো—তারা কখনো পরিস্ফুট, কখনো বা আকারহীন। লঘু মেঘের মতো ছায়া ফেলে আয়ত্তের বাইরে উধাও হয়ে যাচ্ছিলো। একবার বিণ্টাকে দেখতে পেয়ে কুণ্টা জানালো তার খুব ব্যথা লেগেছে, কিন্তু বিণ্টা যেন চিন্তা না করে। সে একটু ভালো হয়ে উঠেই বাড়ী ফিরে যাবে। তারপর সে দেখলো—এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে। অকস্মাৎ একটি পাখী বাণবিদ্ধ হলো। এবার কুণ্টা যেন নিজেই নীচে পড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে ব্যাকুল আগ্রহে আঁকড়ে ধরবার কোনও অবলম্বন খুঁজছিলো। কিন্তু চারিদিক শূন্য আশ্রয়হীন। অসহায় কুণ্টা তার পতন প্রতিরোধ করতে পারছিলো না।

অগত্যা হতাশ হয়ে সে জলপটি লাগাতে থাকলো। কিন্তু কুণ্টা তার হাতের সেবাকে ঘৃণা করে। মহিলাটি সাবধানে কুণ্টার মাথাটি তুলে ধরে খানিকটা স্যুপ

খাইয়ে দিলো। তাতে মহিলাটির মুখে যে পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠলো, তা দেখেও কুণ্টার ক্রোধের সীমা রইলো না। অবশেষে মোমবাতিটি পাশে রেখে দিয়ে মহিলাটি জানতে চাইলো কুণ্টার আর কিছু দরকার আছে কিনা। কুণ্টা ভ্রূকুটি কঠিন চোখে তার দিকে তাকালো। মুখে কটু বাক্যে উচ্চারণের প্রয়োজন হলো না। মহিলাটি ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

কুণ্টা বোধ হয় মরেই যাবে। অবশ্য মরে যাওয়া অর্থই চিরদিনের মতো আল্লাহের কাছে চলে যাওয়া। তাঁর কাছে থাকা কেমন কেউ তা ফিরে এসে বলেনি। তেমনি সাদা মানুষের কাছে থাকা কেমন তাও কেউ কোনদিন ফিরে এসে জানায়নি।

বেল পরের বার এসে কুণ্টার রক্তবর্ণ চক্ষু, অতি ক্লিষ্ট চেহারা, দেহের প্রচণ্ড তাপ ইত্যাদি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। এক সপ্তাহ আগে যখন কুণ্টাকে এখানে আনা হয়েছিলো—তখন থেকে অবস্থার অবনতিই হয়েছে। বেল ফিরে গিয়ে একটা মোটা চাদর, দুটো কম্বল আর দুটো ফুটন্ত জলের পাত্র নিয়ে এলো। কুণ্টার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কী একটা পাতার পুলটিশ বানিয়ে তার খোলা বুকে চেপে চেপে বসালো। এবার একটা গরম জলের পাত্রে মোটা কাপড় নিংড়ে পুলটিশের ওপর চাপা দিলো। তারপর কম্বল দুটো দিয়ে কুণ্টার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিলো।

কুণ্টার সর্ব দেহ থেকে দরবিগলিত ধারায় ঘাম তার চারপাশের মাটি ভিজিয়ে তুলছিলো। বেল বসে বসে কুণ্টার বন্ধ চোখের ওপর থেকে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছিলো। অবশেষে পুলটিশ ঠাণ্ডা হয়ে আসতে বেল কুণ্টার বুক ভালো করে মুছে পুলটিশের চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে গেলো।

পরদিন সকালে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করলেও কুণ্টা বুঝতে পারছিলো তার জ্বর গিয়েছে। এ মহিলা কোথা থেকে এই চিকিৎসা শিখেছে? এ যে বিণ্টার চিকিৎসা। আল্লাহের দেওয়া গাছপালা থেকে এ ওষুধ তৈরী হয়। কৃষ্ণাঙ্গী মহিলার গোপনীয়-তার প্রয়াস থেকে কুণ্টা আন্দাজ করতে পারলো—এ সাদা মানুষের ওষুধ নয়। সাদা মানুষ এর বিষয়ে জানে না, তাকে জানানো উচিতও হবে না। কুণ্টা কালো মহিলাটির মুখখানি স্মরণ করতে চেষ্টা করছিলো। কী যেন নাম? 'বেল!'

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুণ্টাকে স্বীকার করতে হলো—বেলের চেহারায় মানডিনকা উপজাতির ছাপ আছে। কুণ্টা কল্পনায় জুফরে গ্রামের কৃষ্ণকায়া মহিলাদের মাঝে বেলকে প্রক্ষিপ্ত করে। যেন বেল উদূখলে প্রাতঃরাশের শস্য

চূর্ণ করছে, বা মাথায় ফসলের রাশ বহন করে আনছে। নাঃ, কুন্টার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই সাদা মানুষদের দেশের বিধর্মী অপবিত্র কৃষ্ণকায়দের সাথে তার আপন গ্রাম জুফরের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

কুন্টার পায়ের অসহনীয় যন্ত্রণা ক্রমশঃ কমে এসেছে। কিন্তু চারদিকে মাছির বড় উৎপাত। কুন্টা কোথায় আছে? এ তার আগের কুটিরটি নয়। বাইরে লোকেদের কথাবার্তা শুনে অনুমান হয়—সে তার অপরিচিত নতুন কোন খামার-বাড়ীতে আছে। কুন্টা শুয়ে শুয়ে রান্নার গন্ধ পায়। কালোদের সন্ধ্যাবেলার গল্প-গুজব, গান, প্রার্থনা, সকালবেলার শিঙে ফোঁকার আওয়াজ—সবই শুনতে পায়।

রোজ সেই লম্বা সাদা মানুষটা এসে পায়ের ব্যাণ্ডেজ বদলে দেয়। খুব ব্যথা লাগে। বেল দিনে তিনবার খাবার আর জল নিয়ে আসে। তার মুখে হাসি। কুন্টার কপালে তার হাতের স্পর্শটিও উষ্ণ। তবুও কুন্টা হৃদয় কঠিন করে রাখে। এখানকার বিবেকহীন দুষ্ট সাদা মানুষ আর কালো লোকগুলোতে কোনও তফাৎ নেই—এ কথা জোর করে মনে রেখে দেয়। হয়তো এরা দুজনে তার কোন ক্ষতি করবে না। দেখা যাক। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ শ্যামসনই তাকে মেরে মৃতপ্রায় করেছিলো। একটা শ্বেতকায় লোকই তাকে নির্মম কষাঘাত করেছে, গুলি করেছে, তার পা কেটে ফেলেছে। কুন্টা যত সুস্থ হয়ে উঠছিলো, ততই সে ক্রোধে দগ্ধ হচ্ছিলো। সতেরো বর্ষাকাল যাবৎ সে যথেচ্ছ ছুটেছে, লাফিয়েছে, গাছে চড়েছে। আজ সে এমনই অক্ষম, অসহায়, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে নড়বার সামর্থ্য নেই। এর কি কোন অর্থ হয়? কোন মানুষ কি এ অবস্থা মেনে নিতে পারে?

কুন্টা তার এই অপমান ও আক্রোশের শোধ নিতো বেলের উপর দিয়ে। মানডিনকা ভাষায় চিৎকার করে গালিগালাজ করে, বাসনপত্র আছড়ে ফেলে তার ক্রোধের প্রকাশ করতো। এই কাফেরদের দেশে এর আগে কদাচিৎ সে কারো সাথে কথা বলেছে, চিৎকার করা তো দূরে থাক্। এত বকাবকি সত্ত্বেও বেলের চোখে হৃদয়ের উষ্ণতা ফুটে উঠতে দেখে কুন্টার রাগ আরো বেড়ে যায়।

প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে কাটাবার পর একদিন সাদা মানুষটা এসে তার পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলো। কেটে ফেলা পায়ের বীভৎস ক্ষত দেখে কুন্টার মাথা ঘুরতে থাকে। চিৎকার করে ওঠার ইচ্ছা সে অতি কষ্টে সংযত রাখলো। সাদা মানুষটা ক্ষতের ওপর একটা গুঁড়ো ওষুধ ছাড়িয়ে হালকা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। তারপর কালো ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলো। পরের দু'দিন বেল ঠিক সেভাবেই পায়ে নতুন করে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। তৃতীয় দিনে

সাদা মানুষটা দুটো শক্ত লাঠি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। লাঠি দুটোর ওপর দিকটা দু' পাশে ছড়ানো। কুণ্টা জুফরেতে খোঁড়া লোকেদের ওরকম লাঠির সাহায্যে চলতে দেখেছে। অপরের সামনে কুণ্টা লাঠি দুটো কিছুতেই ব্যবহার করবে না। ওরা চলে যেতে কুণ্টা অতি কষ্টে নিজেকে দেওয়ালের পাশে দাঁড় করালো। কয়েকদিন আগে হাতের ও কোমরের শিকল খুলে দেবার পর সে বহু আয়াসে অঙ্গগুলোর সাড় ফিরিয়ে এনেছে। এখন নিজেকে সোজা করে দাঁড় করাতেই তার প্রাণান্ত হলো। দরদর ধারে ঘাম ঝরছিলো। অতি কষ্টে লাঠি দুটোর ওপর দিকটা দুই বগলের নীচে গুঁজে দিলো। তারপর কোন ক্রমে দেওয়াল ঘেঁষে দু'চার পা এগোলো।

পরের দিন প্রাতঃরাশ নিয়ে এসে মাটির মেঝেতে লাঠি দুটোর চিহ্ন দেখে বেলের মুখে আনন্দ ফুটে উঠতে দেখে রাগে কুণ্টার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো। কেন সে চিহ্নগুলো মুছে দেয়নি। বেল ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে খাবার ছুঁলোই না। পরে অবশ্য চটপট খেয়ে নিলো। তার এখন শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। কয়েকদিনের মাঝেই লাঠি দুটোর সাহায্যে সে ঘরের ভেতরে অনেক সহজভাবে চলাফেরা করতে পারলো।

উনচল্লিশ

এই খামারবাড়ীটা একেবারে অন্যরকম। এখানে কালোদের কুটিরগুলোর অবস্থা অনেক ভালো। প্রত্যেকটি চুনকাম করা এবং পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভেতর একটি টেবিল। দেওয়ালের গায়ে তাক। তাতে খাবার বাসনপত্র রাখা আছে। কুণ্টা আজকাল এসবের নাম শিখেছে। 'চামচ', 'কাঁটা চামচ', 'ছুরি'। আহারের থালা এবং জলের পাত্রও আছে। সাদা মানুষগুলো একান্ত বুদ্ধিহীন বলেই 'কাঁটা চামচ' ও ছুরির মতো জিনিস তার নাগালে রেখেছে।

এখানে তার শোবার গদিটা অপেক্ষাকৃত মোটা। কতকগুলো কুটিরের পেছনে ফুল গাছের ছোট বাগানও আছে।

সপ্তাহ দুই পরে কুণ্টা তার কুটির থেকে একটু একটু বেরোতে লাগলো। বেল আজকাল আর কুণ্টার খাবার নিয়ে আসে না শা কুণ্টার কাছে আসে না। একদিন তাকে বড় বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে দেখা গেলো। ওঃ তাহলে বেল আর পাঁচটা লোকের মতোই সাধারণ। তার মাঝে অসামান্যতা কিছু নেই। সেই

লম্বা সাদা মানুষটাকেও দু'ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ী করে মাঝে মাঝে কোথায়ও যেতে দেখা যায়।

এখানকার কৃষ্ণকায়দের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। সারাদিনের কাজের পর পুরুষেরা গোলাবাড়ীর চারপাশে কিছু একটা কাজ নিয়ে থাকে। মেয়েরা দুধ দোয়ায়, মুরগীগুলোকে খেতে দেয়। বাচ্চারা জল তোলে বা জ্বালানী কাঠ কুড়োয়। এরা জানে না, ঠিকমত আঁটি বাঁধতে পারলে একসাথে আরো অনেক বেশী কাঠ মাথায় করে বয়ে আনা যায়।

কুণ্টা লক্ষ্য করলো এরা অন্যান্য খামারবাড়ী থেকে অনেক ভালো ভাবে থাকবার সুযোগ পেলেও বুদ্ধিবৃত্তি বা অনুভূতিতে কোন অংশে শ্রেয় নয়। নিজেদের সম্পর্কে এদের বিন্দুমাত্র সম্মানবোধ নেই। এরা যে ক্রীতদাসের জাতে পরিণত হয়েছে সে বোধটুকু পর্যন্ত নেই। কোন রকমে মার খাওয়া এড়াতে পারলে. পেট ভরে খেতে আর ঘুমোতে পারলেই এদের আত্মার শান্তি। এর বেশী কিছু এদের চাই না। অথচ স্বদেশবাসীর এই দুর্গতিতে অসহায় আক্রোশে কুণ্টার রাতের পর রাত বিনিদ্র কেটে যায়। কিন্তু যাদের জন্য এই দগ্ধানি তাদের তো কিছুমাত্র চিন্তা নেই। যত দিন যাচ্ছে কুণ্টার আত্মা যেন একটু একটু করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলাফল যাই হোক, বা যত বাধাই আসুক, তার দেহে যতদিন প্রাণ আছে, পালাবার চেষ্টা সে ছাড়বে না। এই জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? জুফরে গ্রাম থেকে যখন তাকে চুরি করে ধরে নিয়ে আসে, তারপর এই বারো চন্দ্রকালের মাঝে তার বয়স বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে।

কুণ্টা বুঝতে পারতো, স্থানীয় কৃষ্ণকায়েরা কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। সেও অবশ্য কাউকে বিশ্বাস করে না। একদিন ডাক্তার সাদা মানুষটার গাড়ীতে চালকের পাশে আরো একজন দোআঁশলা বাদামী রঙের লোক দেখা গেলো। সাদা মানুষটাকে বড় বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ীটা কালোদের মহল্লায় চলে এলো। লোকটার একটা হাত এক ধরনের শক্ত সাদা মাটিতে আটকে রাখা হয়েছে। বোধ-হয় হাতটাতে কোন আঘাত লেগেছিলো। ভালো হাতটার সাহায্যে গাড়ী থেকে নেমে দোআঁশলা লোকটা একখানা অদ্ভুত দেখতে বাক্স হাতে একটা খালি কুটিরে ঢুকে গেলো।

কুণ্টা কিছুদিন যাবৎই খুব একাকী বোধ করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। বিষণ্ণতায় মন ছেয়ে যায়। এ যেন একটা রোগের মতো ক্রমশঃই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো। মানুষের সঙ্গ বা

ভালবাসার অভাব তাকে এমন ভাবে পীড়িত করে ফেলবে সে আগে ভাবতে পারেনি। এই নতুন আসা বাদামী লোকটাকে দেখে কুণ্টা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলো। পরদিন সকালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। লোকটা একেবারে দরজার গোড়াতেই বসে ছিলো। স্থির দৃষ্টিতে দু'জন পরস্পরকে দেখে নিলো। লোকটার চোখ মুখ সম্পূর্ণ নির্বিকার।

'কী চাই ? তুমি নিশ্চয় আর একটি খাস আফ্রিকার নিগ্রো?' কুণ্টা নিগ্রো কথাটা বহুবার শুনেছে। বাকী কথাগুলো বুঝতে পারলো না। 'ঠিক আছে। এখন যাও!'

কুণ্টা তার কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় বিস্মিত হলো। অপ্রস্তুত ভাবে পেছন ফিরলো।

এর পরে ঐ দোআঁশলা লোকটার কথা মনে পড়লেই তার রাগ হয়ে যেতো। মনে মনে বলতো—'আমি তো তবু খাঁটি কালো। তোমার মতো মেশানো রঙের নই।'

পারতপক্ষে কুণ্টা আর ওদিকে ফিরেও তাকাতো না। কিন্তু আশ্চর্য রোজ রাতে খাওয়ার পর কালোদের ভীড় জমতো ঐখানেই। কুণ্টা নিজের ঘর থেকে কান পেতে শুনতো।

বাদামী লোকটি এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে। অন্যেরা মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়ছে। আবার কখনো কখনো অন্যেরা তাকে প্রশ্নে জেরবার করে দিচ্ছে। লোকটা কে ? কী করে ?

এর সপ্তাহ দুই পরে একদিন লোকটার সাথে শৌচাগারের বাইরে দেখা। লোকটার হাতের সেই বিরাট সাদা খোলসটা নেই। খড়ের আঁটি নিয়ে দু'হাতে বিনুনী পাকাচ্ছে। তাকে দেখেই কুণ্টার সর্বাঙ্গ রাগে জলে উঠলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! লোকটা ইঙ্গিতে কুণ্টাকে ডাকলো। অবাক হয়ে কুণ্টা তার পেছন পেছন লোকটার ঘরে উপস্থিত হলো। তখনও সে বিনুনী পাকিয়েই চলেছে। কুণ্টা ভাবল—'আফ্রিকাতে যে এভাবেই বিনুনী পাকায়, সে কথা কি লোকটা জানে ?

'তোমার কথা আমি শুনেছি। তুমি পাগল। খুব ভাগ্য ভালো যে তোমাকে ওরা খুন করেনি। মেরে ফেললেও সেটা তাদের বেআইনী হতো না। এই তো আমার হাতটাই ভেঙে দিলো। আইনে আছে পালাবার চেষ্টা করলেই ক্রীতদাসকে হত্যা করা যায়। সেজন্য কোন শাস্তি পেতে হবে না। ক্রীতদাসের প্রতি প্রযোজ্য আইনগুলি ছ'মাস পর পর একবার করে গীর্জাতে পড়া হয়। সাদা মানুষদের আইনের কথা আর বলো না। নতুন বসতি স্থাপন হলে সবচেয়ে প্রথম নতুন নতুন

আইন তৈরী কববার জন্য একখানা আদালত বাড়ী তৈরী করে, তারপর একখানা গীর্জা। আদালতগুলির প্রধান কাজই হলো নিগ্রোদের জব্দ করবার জন্য আইন তৈরী। নিগ্রোদের বন্দুক রাখা আইনে বারণ। এমন কি মোটা লাঠি পর্যন্ত রাখা বারণ। 'পাশ' ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া বারণ। অমান্য করলে কুড়ি ঘা বেত। সাদা মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে দশ ঘা বেত। সাদা মানুষের বিরুদ্ধে কথা বললেই ত্রিশ ঘা। নিগ্রো সমাবেশ—সব অবস্থাতেই এমন কি শোকযাত্রা হলেও বারণ। কোন সাদা মানুষ যদি শপথ করে বলে যে তুমি মিথ্যা কথা বলেছো, তোমার কান কাটা যাবে! যদি সে বলে—তুমি দু'বার মিথ্যা কথা বলেছো, তবে দু' কান কাটা যাবে। আইন বলে সাদা মানুষকে হত্যা করলে তোমার ফাঁসি হবে। কিন্তু কালো মানুষকে হত্যা করলে শুধু বেতের ঘা। নিগ্রোদের লেখাপড়া শেখানো বা কোন বই দেওয়া আইনত বারণ। আফ্রিকা দেশের ঢাক বাজানোও নিগ্রোদের পক্ষে আইনত বারণ।'

কুণ্টা সব কথা বুঝতে পারছিলো না। তবুও যেন বাদামী রঙের লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু কিছু বুঝতেও পারছিলো। এত দিন পর কেউ একজন তার সাথে সহমর্মী মানুষের মতো কথা বলছে! কুণ্টা হাসবে না কাঁদবে?

'এই তো তোমার পা। শুধু হাত পা কেন এরা কথায় কথায় মাথা কেটে নিচ্ছে। এমন মার লাগায় যে মাংস ভেদ করে হাড় বেরিয়ে যায়। ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখায়। জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটায়। মালিকের অত্যাচারে ক্রীতদাস মারা গেলে কেউ দায়ী হবে না। এই হলো আইন। ভাবছো এর চেয়ে বেশী অত্যাচার আর কী হতে পারে? ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে আখের আবাদে আরো কী হয় কারো কাছে শুনে নিয়ো।'

প্রথম কাফোর বয়সী একটি ছোট ছেলে বাদামী লোকটির রাতের খাবার দিয়ে গেলো। কুণ্টাকে সেখানে দেখতে পেয়ে সে দৌড়ে গিয়ে তার জন্যও খাবার নিয়ে এলো। নীরবে খাওয়া শেষ করে যাবার উদ্যোগ করতে লোকটি তাকে বাধা দিলো।

কিছুক্ষণ বাদে একে একে সবাই এসে হাজির হলো। এমন কি বেলও! বাদামী লোকটিই প্রধান বক্তা। বোধ হয় সে ও দেশের ভাষায় কিছু একটা গল্প বলছিলো। কারণ হঠাৎ গল্প থেমে যেতেই সবাই হেসে উঠলো। তারপর প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

ঘরে ফিরে এসে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কুণ্টা আবেগের ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্বেলিত

হচ্ছিলো। একবার কুণ্টা একটা ভালো আম কিছুতেই ল্যামিনকে দিতে রাজী হয়নি। তখন অমোরো তাকে বলেছিলো—'তুমি যদি হাত মুঠো করে থাক, তবে কেউ তোমার হাতে কিছু দিতে পারবেনা।' কুণ্টা অবশ্য জানে এখানকার কালো লোকগুলো সম্পর্কে তার মনোভাব অমোরো সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতো। তবুও প্রতি রাত্রে ঐ বিশেষ কুটিরে কালোদের বৈঠকটি কুণ্টাকে তীব্র আকর্ষণ করতে থাকে। সন্ধ্যাবেলায় সে নিজেকে অতি কষ্টে সংযত রাখে। কিন্তু বাদামী রঙের লোকটি যখন একা থাকে কুণ্টা খোঁড়াতে খোঁড়াতে একবার তার কাছে যাবেই। লোকটি একাই কথা বলতে থাকে। কুণ্টা নীরবে শোনে।

'সাদা মানুষরা বলে—আফ্রিকার লোকেরা শুধু জানে একটা মাটির ঘর তুলে কোনমতে বাস করতে আর পরস্পরে মারামারি খাওয়াখাওয়ি করবে। এই যে হাতে একটা কবচ বেঁধেছো—ওতে ছাই হবে! পরিস্থিতি ভালো করে ভাবতে, বুঝতে শেখো। নিজেকে বর্তমান অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে চেষ্টা কর। কী? চুপ করে আছ কেন? কিছু বুঝতে পারছো, টবি?'

কুণ্টার মুখ রোষে রক্তিম হয়ে উঠলো। নিজের চিৎকার শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলো।

'টবি নয়, কুণ্টা কিণ্টে!'

'আরে, এ দেখি কথাও বলতে জানে! শোনো, ওসব আফ্রিকান কথা ভুলে যাও। ওতে সাদা মানুষের রাগ চড়ে যায়। তোমার নাম 'টবি'। আমার নাম 'ফিডলার'। আমি বেহালা বাজাতে পারি বলে ওরা আমাকে 'ফিডলার' নাম দিয়েছে। বেহালা কাকে বলে জান?'

সেই অদ্ভুত দেখতে বাক্সটা খুলে সে একটা আজব রকম হালকা বাদামী কাঠের জিনিস বার করলো। তার সরু কালো গলা। গায়ে আঁট করে বাঁধা তার রয়েছে।

'বেহালা!' ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। কুণ্টা উচ্চারণ করলো—'বেহালা!'

বাদামী লোকটি খুশী হয়ে বেহালাটি বাক্সে তুলে রাখলো।

চারদিকে তাকিয়ে একটা জিনিস নির্দেশ করে বললো—'বালতি!'

কুণ্টা কথাটির পুনরাবৃত্তি করলো।

'এবার জল!'

এভাবে বেশ ক'টা জিনিসের প্রতিশব্দ কুণ্টার অল্প সময়ে আয়ত্ত হয়ে গেলো। 'তোমাকে যতটা বুদ্ধু দেখায়, আসলে ততটা নও।'

এরপর কিছুকাল যাবৎ কুণ্টার শিক্ষা পর্ব চললো। কুণ্টা এখন সাদা মানুষের ভাষা কেবল বুঝতে পারে না, মোটামুটি বোঝাতেও পারে। সে কেন তার পৈত্রিক নাম, বংশের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকতে চায়, এই ক্রীতদাসের বন্দীজীবন থেকে সে মৃত্যুও কেন শ্রেয় মনে করে, এসব কথা কুণ্টা এই নতুন শেখা ভাষাতে যথাসাধ্য প্রকাশ করে বললো।

এর দু'একদিন বাদেই সে ঘরে কুণ্টার এক বৃদ্ধের সাথে দেখা হলো। তাকে আগে সে বড় বাড়ীর বাগানে কাজ করতে দেখেছে। বুড়ো মানুষটা বললো—'তুমি নাকি চারবার পালিয়েছো! আশা করি এতদিনে তোমার শিক্ষা হয়েছে। তুমি নতুন কিছু করনি। পালিয়ে কোথায় যাবে? অন্য একটা রাজ্যে হয়তো পৌঁছোলে। কিন্তু কাগজে খবরটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকেই তোমাকে ধরে আনা হবে। আকাশকুসুম কল্পনা করো না। বর্তমান অবস্থাকে মেনে নাও। আমিও একসময় তোমার মতো মাথা গরম করে বহুবার পালাতে চেষ্টা করেছি। সুফল হয়নি। এখন বড় বাড়ীতে বাগানের কাজ করছি। বেলের কাছে শুনেছি, তোমাকেও নাকি আমার সাথে কাজে জুড়ে দেওয়া হবে।'

বৃদ্ধটি অবশ্য কুণ্টার ভালোর জন্যই ওসব কথা বলেছে। এদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবুও কুণ্টা কী করে অতীত ভুলে যাবে? এক পঙ্গু ক্রীতদাসের ভূমিকায় সারা জীবন কাটাতে হবে—ভাবতেও সারা মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

সে রাত্রে একটি লোক কুণ্টার জন্য এক জোড়া জুতো নিয়ে এলো। মালিকের আদেশে নাকি কুণ্টার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী। ডান পায়ের জুতোর সামনের দিকে অনেকটা তুলো গুঁজে দেওয়া হয়েছে। কুণ্টা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিস দু'টো বারবার দেখলো। তারপর পায়ে পরবার চেষ্টা করলো। সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ডান পায়ের সামনের দিকে খানিকটা তুলো গোঁজা থাকায় পায়ে চমৎকার মাপসই হয়েছে। খানিকটা হেঁটে দেখলো। অভ্যাস হয়ে গেলে হাঁটার জন্য বগলে লাঠি গুঁজতে হবে না।

সে সপ্তাহেই মালিক বাইরে থেকে ফিরলেন। তার গাড়ীর কৃষ্ণাঙ্গ চালক এসে কুণ্টাকে ফিডলারের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলো। তাদের দু'জনের মাঝে খানিকক্ষণ কথাবার্তা হলো। তারপর ফিডলার কুণ্টাকে সব কথা বুঝিয়ে বললো। এখানে বড় বাড়ীতে যে সাদা মানুষটি থাকেন তাঁর নাম উইলিয়াম ওয়ালার। কুণ্টার প্রথম মালিক জন ওয়ালার তাঁর ভাই। উইলিয়াম ওয়ালার ভাইয়ের কাছ থেকে কুণ্টাকে কিনে নিয়েছেন। কাজেই কুণ্টা এখন তাঁরই সম্পত্তি। কুণ্টার মুখের ভাবে তার

মনের কথা প্রকাশ পেলো না। ক্রোধে গ্লানিতে তার হৃদয় বিধ্বস্ত হচ্ছিলো—কুণ্টা কি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি?

চল্লিশ

আফ্রিকার মতো এখানেও প্রতি চন্দ্রহীন রাতের পরদিন সকালে কুণ্টা একটা পাত্রে একটি করে পাথরের টুকরো ফেলছিলো। প্রথম খামারবাড়ীটিতে বারোটি পাথর জমেছিলো, এখানে ছ'টি জমেছে। জুফরেতে তার সতেরো বর্ষাকালে ২৪০টি পাথর জমেছিলো। তাহলে এখন তার উনিশ বৎসর চলছে! নিজেকে যতই বৃদ্ধ মনে হোক সে তো আসলে তরুণ যুবক। জীবনের বাকী অংশ কি তাকে এভাবেই কাটাতে হবে? দিনে দিনে আশা আকাঙ্ক্ষা, আত্মাভিমানের সমাধি ঘটবে, বেঁচে থাকার আনন্দ বা উদ্দেশ্য লুপ্ত হবে? সময় চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাবে? ভাবতেও যে তার ভয় করে। এই বৃদ্ধ মালীটি একেবারেই অশক্ত হয়ে পড়েছে। কোন ক্রমে এক বেলা কাজ করে। বিকালের দিকে তার বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কুণ্টাকে একা সবদিক সামলাতে হয়।

বেল বড় বাড়ীর রাঁধুনী। সে রোজ সকালে দিনের সবজি নিতে আসতো। কিন্তু যতক্ষণ বাগানে থাকে সে কুণ্টার দিকে ফিরেও তাকায় না। কুণ্টা তার ব্যবহারে হতবুদ্ধি! রাগও হতো। অসুখের সময় বেলের আন্তরিক সেবা যত্ন সে সর্বদাই মনে করে—তাহলে এখন কী হলো? নাঃ, বেলকে সে পরিহার করেই চলবে।

একদিন সকালে বুড়ো মালীর দেখা নেই—হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কুণ্টা তাড়াতাড়ি বাগানে চলে এলো—বেল যদি সবজি নিতে এসে ফিরে যায়। খানিক পরে বেল এসে কোনদিকে না তাকিয়ে সবজি তুলতে লাগলো। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে কুণ্টার দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে সবজির ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে গটগট করে চলে গেলো। সে কি ভেবেছে বুড়ো মালীর মতো কুণ্টাও ঝুড়িটা বয়ে নিয়ে যাবে? রাগে তার সর্বাঙ্গ জলে গেলো। জুফরেতে পুরুষেরা যখন বিশ্রাম করে, মেয়েরা কি মাথায় মাল বয়ে নিয়ে যায় না? কিন্তু বেল মালিকের কাছের লোক। কী হতে কী হয়ে যাবে। সে বেলের পেছন পেছন ঝুড়িটা নিয়ে দরজায় গোড়ায় নামিয়ে দিলো। তারপর প্রচণ্ড ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বাগানে ফিরে এলো।

সেদিন থেকে কুণ্টাই বাগানের মালী বনে গেলো। বুড়ো আর হাঁটতেও পারে না। প্রত্যহ বেলের কাছে ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়াই কুণ্টার সবচেয়ে অপছন্দ। তার সাথে কুণ্টা যথাসম্ভব রূঢ় ব্যবহার করে। কিন্তু বেলের রান্নার সুগন্ধে তার রসনা লালায়িত হয়ে ওঠে—সেটা সে নিজের মনে স্বীকার না করে পারে না।

কয়েক মাস পর বেল একদিন তাকে রান্নাঘরের ভেতর ডেকে নিলো। রান্না-ঘরের সাজ-সরঞ্জাম দেখে কুণ্টা হতবাক! বেল তার হাতে বিস্কিটের মতো একটা জিনিস ধরিয়ে দিলো। তার দু'পরতের মাঝখানে একফালি মাংস। কুণ্টা বোকার মতো জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বেল বললো—

'কখনো স্যাণ্ডউইচ দেখনি? ওটা তোমাকে কামড়াবে না। একটু মুখে দিয়ে দেখ। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।'

ক্রমে বেল তাকে হাত ভরে প্রচুর খাদ্য দিতে লাগলো। কত রকম খাবার, কী তার স্বাদ গন্ধ। সবজিগুলো তো কুণ্টার নিজের হাতে ফলানো। সরষে শাক, মটরশুঁটি, ভুট্টা, সবুজ নধর আরো অনেক রকমের ফসল। বেল কখনো তাকে শুয়োরের মাংসের খাবার দেয়নি। কুণ্টা মুখে কখনো প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করতো না—যদিও তৃপ্তি তার আচরণে ফুটে উঠতো।

চন্দ্রকালকে এখানে 'মাস' বলে। সময় কেটে যাচ্ছিলো। গ্রীষ্মকাল পার হয়ে ফসল তোলার ঋতু এলো। এখন সবাই খুব ব্যস্ত। বেলকে পর্যন্ত বাইরে ক্ষেতে কাজ করতে হয়। কুণ্টাকে কিন্তু হালকা কাজই দেওয়া হতো। সে মুরগী ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর দেখাশোনা করে আর বাগানের কাজ করে। তুলোর ফসল তোলার কাজ যখন তুঙ্গে, তখন সে গাড়ী চালিয়ে মাল আনা নেওয়া করে। শুয়োর-গুলোকে খেতে দেওয়া ছাড়া অন্য কাজগুলো তার অপছন্দ নয়। আজকাল কাজের চাপে দিনের আলো থাকতে বাড়ী ফেরা হয় না। মাঝে মাঝে সে এত ক্লান্ত থাকে, না খেয়েই ঘর্মাক্ত দেহে শুয়ে পড়ে।

গাড়ীগুলোতে তুলো বোঝাই হলো। খামারবাড়ী শস্যে পূর্ণ। সোনালী তামাক পাতাগুলি শুকোবার জন্য ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শূকর মাংস ঝলসানো শুরু হয়ে গিয়েছে। শীতের হাওয়া বইছে। ফসল তোলার উৎসব হবে। তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। চারদিকে চরম উত্তেজনা। কুণ্টা ভাবলো—কৃষ্ণাঙ্গদের আল্লাহ তো মুখ ফিরিয়েই রেখেছেন। এর বেশী কী আর ক্ষতি হবে! এদের নাচগানের অনুষ্ঠানটা কী ব্যাপার, একবার নিজের চোখে দেখে আসবে।

সে যখন পৌঁছোলো উৎসব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বেহালাবাদক বেহালা

বাজাচ্ছে। আর একজন দুটো হাত বাজিয়ে তাল ঠুকছে। নাচিয়েরা জোড়ায় জোড়ায় এগিয়ে এলো। তাদের নৃত্য কাজেরই অনুকরণ। বীজ রোপণ, তুলো আহরণ, কাস্তে চালানো, কাঠ কাটা, ফসল তোলা, গাড়ীতে মাল বোঝাই—নাচের সুনিপুণ, সুললিত ভঙ্গীতে এসব কাজেরই অভিনয়। জুফরে গ্রামের ফসল তোলার উৎসবের সাথে এর কোনও পার্থক্য নেই। কখন অজান্তে কুন্টাও পা ঠুকে তাল দিতে শুরু করেছে। সম্বিত ফিরে আসতে চকিত হয়ে চারদিকে তাকালো। কিন্তু, না। কেউই তাকে লক্ষ্য করেনি। আসলে সবাই তখন একটি ছিপছিপে, শ্রীময়ী চতুর্থ কাফোর বয়সী মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। পালকের মতো হালকা মেয়েটি অতি মনোরম, সুচারু ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিলো। ক্রমে অন্য নাচিয়েরা সবাই থেমে গিয়ে মুগ্ধ নয়নে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকেই দেখছিলো। মেয়েটির নৃত্যসঙ্গীও তার সাথে পাল্লা দিয়ে পারছিলো না। তাদের নাচ থেমে যেতে চারিদিকে প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি উঠলো। মালিক ওয়ালার সাহেব যখন মেয়েটিকে আধ ডলার পুরস্কার দিলেন তখন কোলাহল আরো উদ্দাম। মালিক হাসিমুখে একবার বেহালাবাদকের দিকে তাকিয়ে তুমুল কোলাহলের মাঝে সেখান থেকে চলে গেলেন। নতুন করে আর এক দফা নাচ শুরু হলো। এ বোধহয় সারা রাতই চলবে।

পরদিন সকাল থেকে অন্য ধরনের কাজ আরম্ভ হলো। মেয়েরা চর্বি, ক্ষার ও জল একসাথে ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করে সাবান তৈরী করছিলো। কেউ কেউ একরকম আঠালো লাল মাটি, জল আর শুয়োরের শুকনো লোম একসাথে মিলিয়ে তাই দিয়ে বাড়ীর ফাটলগুলো মেরামত করছিলো। সবচেয়ে বিশ্রী হলো—অন্য আর এক দল আপেল, পীচ ইত্যাদি ফল পচিয়ে একরকম দুর্গন্ধ তরল পানীয় তৈরী করছিলো। তার নাম নাকি ব্র্যাণ্ডি। গদিগুলোতে নতুন করে খড় ঢুকানো হচ্ছিলো। মালিকের জন্য হাঁসের পালকের একটি নতুন গদি তৈরী হলো।

যারা কাঠের কাজ করে, তারা কাপড় ধোবার জন্য নতুন টব তৈরী করলো। যারা চামড়ার কাজ করে—ঘোড়ার জিন, জুতো ইত্যাদি তৈরী করছিলো। মেয়েরা সূতীর কাপড় রঙ করছিলো। ঠিক জুফরের মতোই চারিদিকের ঝোপ-ঝাড়গুলোতে লাল নীল হলুদ বস্ত্রখণ্ড শুকোচ্ছে।

ক্রমশঃ হাওয়া শীতলতর হলো। আকাশ ধূসরবর্ণ। তারপর ধরাতল আবার তুষারে আবৃত হয়ে গেলো। ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অস্বস্তিজনক। সকলেই এবারে বড়দিনের কথা আলোচনা করতে শুরু করলো। নাচগান, খাওয়া-দাওয়া, উপহার দেবার ধুম পড়ে যাবে। সাদা মানুষের আল্লাহ্ এতে জড়িত

থাকবেন। কুণ্টা তার মাঝে থাকতে চায় না। বিধর্মীদের এ উৎসব না শেষ হওয়া পর্যন্ত কুণ্টা আর ঘর ছেড়ে বেরোবে না।

এর পরে এলো বসন্তকাল। কুণ্টা বীজ বপন করতে করতে জুফরের কথা ভাবছিলো। এ সময় জুফরেতে ক্ষেতগুলো কেমন সজীব শ্যামলের বন্যায় পরিপ্লুত হয়ে যায়। সে যখন দ্বিতীয় কাফোর ছেলে, এই সবুজের সমারোহের মাঝে কী অপরিসীম আনন্দে ক্ষুধার্ত ছাগলগুলোকে চড়াতে নিয়ে যেতো। এখানে জানোয়ারগুলোকে বলে 'মেষ'। সেগুলো চিৎকার করে লাফাতে থাকে। জোর করে ধরে তাদের নোংরা ঘন লোম কেটে নেওয়া হয়। সেগুলো পরিষ্কার করে, তাই দিয়ে নাকি শীতবস্ত্র তৈয়ারী হয়। মেয়েরা তার থেকে সুতোও নাকি বোনে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে এরা সে সময়টাকে বলে 'জুলাই'—শেষবারের মতো ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। খুব পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু পেট ভরে খাবার মতো প্রচুর খাদ্য তখন খামারবাড়ীতে জমা থাকে। কুণ্টা ভাবে —জুফরেতে এ সময় খাদ্যের সবচেয়ে আকাল। খাদ্যের অভাবে আজেবাজে বস্তু খেয়ে লোকেদের পেটে কেবলই যন্ত্রণা।

এই সময় এখানকার লোকেরা বেড়াতে যাবার ছুটি পায়। গাড়ী করে দূরে যাবার অনুমতিও মেলে। চারিদিক শূন্য, লোকের অভাবে খাঁ খাঁ করছে। কুণ্টার পালিয়ে যাবার অঢেল সুযোগ। কিন্তু সে জানে কোনক্রমে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে বটে, বেশী দূরে পালিয়ে যাবার ক্ষমতা আর তার নেই। গভীর লজ্জার সাথে নিজের মনে এ কথাও স্বীকার করতে হয়—পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে, বর্তমান অবস্থাই তার কাছে অধিক কাম্য। অন্তরের গভীরে সে জেনেছে—জীবনে আর কখনো সে বাড়ী যেতে পারবে না। তার সত্তার অতি মহার্ঘ দুর্লভ কোন বস্তু ক্রমশঃই হারিয়ে যাচ্ছে। তবু আশা বেঁচে থাকে। তার পরিবারের কাউকে সে জীবনে আর দেখতে পাবে না। কিন্তু তার নিজেরই একটি পরিবার তো ভবিষ্যতে গড়ে উঠতে পারে।

একচল্লিশ

আরো এক বৎসর কেটে গিয়েছে। পাত্রের পাথর গুণে দেখা যাচ্ছে, কুণ্টার বয়স এখন কুড়ি বৎসর। আবার শীত আসছে। আকাশে বাতাসে বড়দিনের আভাস।

আল্লাহ্ সম্পর্কে তার নিজের মনোভাব বদলায়নি। কিন্তু কালোরা যখন বড়দিন উপলক্ষ্যে এতটা আনন্দ পাচ্ছে, তখন ঐ উৎসবে সামান্য সময়ের জন্য যোগ দিলে আল্লাহ হয়তো কুণ্টার ওপর নারাজ হবেন না।

বড় বাড়ীতে বেলের রান্নার আর শেষ নেই। কত রকমের মাংসই যে হচ্ছে। কুণ্টা সে সব আগে কখনো দেখেনি। এ সব খেতে প্রথমে তার খুবই আপত্তি ছিলো। কিন্তু রান্নার রসনাসিক্তকারী সুগন্ধে পরে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারেনি। কেবল শূকর মাংস ছাড়া সবই সে খেয়েছে।

অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এলো। পান ও আহারের ধুম পড়ে গেলো। কুণ্টার ঘরের দরজা থেকে দেখা যায়—মালিকের অতিথিরা দুপুরে খাবার জন্য একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। পরে কৃষ্ণাঙ্গরা বড় বাড়ীর কাছে দলে দলে এসে একত্রে গান শুরু করলো। বেল সর্বাগ্রে। মালিক ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গরা খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হেসে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ফিডলারকেও ডেকে পাঠানো হলো।

হ্যাঁ, মালিকের আদেশ তো মানতেই হবে। কিন্তু এ কাজে কালোদের এত ফুর্তি আসে কোথা থেকে? আর শ্বেতাঙ্গরা যদি ক্রীতদাসেদের এতই ভালোবাসে, তবে তাদের প্রকৃত সুখ দিতে চায় না কেন? কেন তাদের মুক্তি দিচ্ছে না?

কিন্তু সে নিজেই বা কী? সে কি তাদের চেয়ে কোন অংশে শ্রেয়? সেও তো তাদের জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। বিদেশী কাফের, অ-কৃষ্ণাঙ্গ ফিডলারের প্রতি তার প্রীতি গাঢ়তর হচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গরা কালোদের নিগ্রো বলে। ফিডলার যে ভাবে 'নিগ্রো' কথাটা উচ্চারণ করে, সেটা অবশ্য কুণ্টার খুবই অপছন্দ। কিন্তু কুণ্টাকে সে-ই তো কথা বলতে শিখিয়েছে। কালোদের সাথে মিশতে শিখিয়েছে। কুণ্টার মনে ফিডলার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জাগে। ইচ্ছা আছে একদিন সুযোগ মতো জিজ্ঞাসা করে নেবে। কিন্তু সে সুযোগ আসবার আগে কুণ্টার পাত্রে আরো দুটো পাথর পড়ে গেলো।

বিয়াল্লিশ

কুণ্টা কিছুদিন যাবৎ বাগানে কাজ করছে। বেহালাবাদক বা ফিডলার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। ভাবতে গিয়ে মনে হলো বুড়ো মালী সম্পর্কেও সে কম অজ্ঞ

নয়। বেল সম্পর্কেই বা সে কী জানে? রোজই যদিও তাদের মাঝে কথাবার্তা হয়। অবশ্য সেটা একতরফা। বেল তাকে যাই খেতে দিক, কুণ্টা নীরবে খেতে থাকে আর বেল অনর্গল কথা বলে যায়। কুণ্টা লক্ষ্য করেছে—বেল আর বুড়ো মালী হয়তো কথা বলছে, কুণ্টা এসে পড়লেই ওরা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। ওরা দু'জনেই সাবধানী লোক। কুণ্টার বেলা যেন সে সতর্কতা আরো বেড়ে যায়। নাঃ। এদের ভালো করে জানতেই হবে।

কুণ্টা 'প্যাটি রোলার্স' কথাটা নতুন শুনছিলো। পরদিন বুড়ো মালীর সাথে দেখা হতে সে কথাটার মানে জিজ্ঞেস করলো। বুড়ো মালী ক্রুদ্ধস্বরে বললো—'গরীব সাদা মানুষ, যারা নিজেরা নিগ্রো ক্রীতদাস রাখতে পারে না—তাদেরকেই 'প্যাটি রোলার্স' বলা হয়। নিগ্রোদের উপর অত্যাচার করতে ওদের মহা উৎসাহ। কোন নিগ্রো যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া ভ্রমণ করে, ধরা পড়লে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্যাটি রোলার্সেরা রাস্তায় কোন ক্রীতদাসকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখতে পেলেই সর্বসমক্ষে তাকে নগ্ন করে মনের আনন্দে কষাঘাত করে।

আমাদের মালিক অবশ্য খুব ভালো লোক। তিনি ওভারসীয়ার রাখাই পছন্দ করেন না। নিগ্রোদের প্রহার করাতে তাঁর মহা আপত্তি। তিনি বলেন, নিগ্রোরা নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করবে—নিয়মভঙ্গ করবে না।

আমাদের মালিকের মনটা খুব উঁচু। সত্যিকারের বড় ঘরের মানুষ। অনেকে আছে ভাগ্যের সন্ধানে এদেশে এসে বহুকষ্টে একটুখানি জমি করে একখানা দু'খানা ক্রীতদাসকে দিয়ে প্রাণান্তকর খাটিয়ে সম্পত্তি শুরু করে। কোন কোন আবাদে দেখবে মাত্র পাঁচ ছ'জন নিগ্রো। আমাদের এখানে কুড়িজন।'

কুণ্টা জিজ্ঞেস করলো—'তোমার বয়স কত?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে মালী বললো—

'রেল ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধের সময় আমি খুব ছোট ছিলাম।'

সহসা সে আফ্রিকান সঙ্গীতের দু'কলি গেয়ে উঠলো।

কুণ্টা অপার বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো।

'এ গান আমার মায়ের কাছে শোনা। সে তার মায়ের কাছে শিখেছে। তোমার মতো আমার দিদিমাও আফ্রিকা থেকে এসেছে।'

মনে হচ্ছে সেরেরা ভাষা। আমি এ ভাষা শুনেছি—কিন্তু জানি না।'

'এ গান গাইবার জন্য আমার শাস্তি হয়েছিলো। নিগ্রোদের নিজেদের ভাষায় কথা বলা বারণ।'

লোকটি গাম্বিয়ার জোলফ জাতিভুক্ত। তার খাড়া নাক, চ্যাপটা ঠোঁট আর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেখেই বোঝা যায়। কুণ্টা সে কথার উল্লেখ না করে জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধ কোথা থেকে কবে এ খামারে এসেছে।

আবার খানিকক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর সে কথা শুরু করলো।

'অনেক দুঃখ পেরিয়ে এখানে এসেছি। এক সময়ে পায়ের ওপর লোহার রড বাঁকাতে পারতাম। একটা বয়স্ক লোককে এক হাতে তুলতে পারতাম। একটা খচ্চরে বইতে পারে না—এত ভারী বোঝা বইতে পারতাম। এখন আমি অথর্ব, শক্তিহীন। লক্ষ্য করেছি তুমি বাগানের কাজ ভালোই কর। যদি প্রয়োজন হয়, বলো। মাঝে মাঝে তোমাকে সাহায্য করবো। কিন্তু বেশীক্ষণ কাজ করার সাধ্য আর নেই।'

কুণ্টা বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানালো—কিন্তু তার প্রতি মনে কোন সহানুভূতি বোধ করলো না। যে লোক কাপুরুষের মতো নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাকে সে মেনে নিতে পারে না।

এবার তাকে বেলের সাথে কথা বলতে হবে। সে জানে মনিব ওয়ালার সাহেবের প্রসঙ্গ বেলের সবচেয়ে পছন্দ। জিজ্ঞেস করলো—মনিব বিয়ে করেননি কেন।

বিয়ে তো করেছিলেন। আমি প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, তখন তিনি মিস প্রিসিলাকে বিয়ে করেন। ভারী সুন্দর দেখতে। ছোট্ট-খাটো মানুষটি। প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই মারা গেলেন। মেয়েটিও বাঁচলো না। সাহেব একেবারে ভেঙে পড়েন। আর কখনো আগের মতো হলেন না। নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিলেন। যেন অতিরিক্ত পরিশ্রম দিয়েই নিজেকে মেরে ফেলবেন। কাউকে পীড়িত বা আহত দেখলে সহ্য করতে পারেন না। অসুস্থ বেড়ালই হোক আর আহত নিগ্রোই হোক, তার সেবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। হাতভাঙ্গা ফিডলারের জন্য তাই তাঁর দরদ। তোমার পা কেটে ফেলার কথা শুনে তো রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। নিজের ভাই জনের কাছ থেকে তোমাকে কিনে নিলেন। জন নাকি তোমাকে ধরবার জন্য প্যাটি রোলার্স ভাড়া করেছিলো।

কুণ্টা উপলব্ধি করছিলো কালোদের মাঝে যেমন, সাদা মানুষদের মাঝেও তেমনি অন্তরের গভীরতায় তফাৎ আছে। তাদের ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণাও আছে। অবশ্য তাই বলে তাদের কাজগুলো সমর্থন করা যায় না। তার বৃদ্ধা পিতামহী নিয়ো বটোর কাছে শোনা ফাঁদে পড়া কুমীর ও তাকে সাহায্য করতে আসা ছোট

ছেলের গল্পটি মনে পড়লো। সংসারে মন্দ ব্যক্তির উপকার করতে যাবার ফল সব সময় ভালো হয় না।

বাড়ীর কথা মনে পড়তে কুণ্টার আরো একটা কথা মনে পড়লো। এ কথাটা তার বহুদিন ধরে বেলকে বলবার ইচ্ছা। বেলের গায়ের রঙ বাদামী। তা ছাড়া তার দেহের গঠন, মুখের আকৃতি সবই মানডিনকা বংশীয়া সুন্দরী নারীর মতো।

বেল কিন্তু কথাটা শুনেই চটে গেলো—'কি বোকার মতো কথা বলছো? সাদা মানুষেরা কেন যে জাহাজ ভর্তি আকাট মূর্খ নিগ্রো ধরে আনে, বুঝি না।'

তেতাল্লিশ

বেল রাগ করে কুণ্টার সাথে একমাস কথাই বললো না। সবজির ঝুড়িটা পর্যন্ত নিজেই বয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারপর এক সোমবার সকালে ছুটতে ছুটতে বাগানে হাজির। দুই চোখ উত্তেজনায় বিস্ফারিত।

'উত্তরে বস্টন নামে একটা জায়গায় দারুণ যুদ্ধ হচ্ছে। সাগরপারের লোকেরা কী একটা ট্যাক্স ধার্য করেছে বলে নাকি এই যুদ্ধ। মালিক লুথারকে গাড়ী জুততে বলেছেন—কোথায়ও যাবেন। খুব অস্থির হয়ে আছেন।'

খাবার সময় ফিডলারের ঘরের চারপাশে ভিড়। ফিডলার অনেক জায়গায় ঘুরেছে। বুড়ো মালী ক্রীতদাসের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ। সবাই তাদের কথা শুনতে উৎসুক।

একজন জিজ্ঞেস করলো—'এ কবেকার ঘটনা?'

মালী বললো—'উত্তরের খবর। আসতে কিছু সময় নিশ্চয়ই লেগেছে।'

ফিডলার যোগ দিলো—বস্টন থেকে ঘোড়ায় চেপে আসতেও অন্ততঃ দশ দিন সময় লাগে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর রোগীদের বাড়ী ঘুরে মালিকের গাড়ী ফিরে এলো। চালক লুথার টাটকা খবর দেবার জন্য দ্রুত ক্রীতদাস মহল্লায় চলে এলো। বস্টনের অধিবাসীদের সাথে রাজার সৈন্যদলের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। সৈন্যরা গুলি চালিয়েছে। একজন নিগ্রো মারা গিয়েছে। চারিদিকে হৈহৈ পড়ে গিয়েছে।

কিছুদিন ধরে উত্তেজনার আর সীমা নেই। কুণ্টা বুঝতে পারছিলো না—এত দূর দেশের একটা ঘটনা নিয়ে সাদা মানুষদের, এমন কি কালোদেরও এত উত্তে-

জনার কারণ কী। মালিক দূর দূর জায়গায় রোগী দেখতে যাচ্ছেন। কখনো বা অন্য সাদা মানুষের বাড়ী যাচ্ছেন। লুথার ফিরে এসে তার নিজস্ব খবর বা অন্য সহিসদের কাছে শোনা খবর সরবরাহ করছে।

ফিডলার কুণ্টাকে বললো—সাদা মানুষদের চারপাশে এত নিগ্রো আছে, যে তাদের কাছ থেকে কিছু গোপন রাখা সাদাদের পক্ষে অসম্ভব। খাবার টেবিলে যা কিছু আলোচনা হচ্ছে, যে কৃষ্ণাঙ্গী পরিচারিকা পরিবেশন করছে, সে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। যেটুকু তারা বুঝতে পারছে না, কাজ থেকে ফিরে এসেই একটু শিক্ষিত নিগ্রোর কাছে সে কথাগুলোর পুনরুচ্চারণ করে তার অর্থ জেনে নিচ্ছে। মোটের ওপর সব কথা না জানা অবধি তাদের শান্তি নেই।

সারা গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ধরে উত্তর অঞ্চলের খবর একটু একটু করে আসছিলো। লুথার জানালো—সাগরপারের লোকেরা ট্যাক্স বসিয়েছে, সেটাই সাদাদের রাগের একমাত্র কারণ নয়। অনেক জায়গাতে কালোরা সংখ্যায় সাদাদের ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমন কি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। সাদাদের কাছে এ এক মহা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাগরপারের রাজা যদি নিগ্রোদের স্বাধীনতা দিয়ে নিজেদের দলে এনে সাদাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দেয়—তবে মহা সর্বনাশের ব্যাপার ঘটবে। সাদারা এই ভয়েই অস্থির হয়ে আছে।

কুণ্টা এর পর রাতের পর রাত বিনিদ্র শুয়ে ভেবেছে—স্বাধীনতা জিনিসটা কী? তার মানে নিশ্চয় তাদের মাথার ওপর কোন মালিক থাকবে না। তারা নিজের খুশীমত যা ইচ্ছা করবে, যেখানে খুশী যাবে। তাই কখনো হয়? স্বাধীনতা দেবার জন্য কি আর সাদা লোকেরা এত দূর থেকে ক্রীতদাস ধরে এনেছে?

বড়দিনের কিছু পরেই ওয়ালার সাহেবের আত্মীয়স্বজনেরা বেড়াতে এলো। তাদের নিগ্রো ড্রাইভারেরা খেতে খেতে রান্নাঘরে বসে বেলের সাথে গল্প জুড়ে দিলো। জর্জিয়াতে জর্জ লীল নামে এক নিগ্রোকে নাকি কালোদের ধর্মোপদেশ দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকার লোকেদের জন্য নাকি সাভানাতে আলাদা করে একটি গীর্জাও তৈরী হবে। আরো খবর—উত্তর অঞ্চলে যে গোলমাল চলছে, তাই নিয়ে গণ্যমান্য শ্বেতাঙ্গরা ফিলাডেলফিয়াতে একটি সভা করেছে।

বেল এসব জানতো। বেলের আসলে সামান্য সামান্য পড়বার মতো বিদ্যা ছিলো। মালিকের ভার্জিনিয়া গেজেট পত্রিকাটি বহুকষ্টে পড়ে সে ফিডলার ও বুড়ো মালীকে কিছু কিছু সংবাদ দিতো। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়—কুণ্টাকে পর্যন্ত

বিশ্বাস করে জানায়নি। আফ্রিকা থেকে ধরে আনা লোকেদের তুলনায় কুণ্টার বুদ্ধি, বিবেচনা, গাম্ভীর্য, বিশ্বাস রক্ষা করবার ক্ষমতা অনেক বেশী—সে কথা সত্যি। কিন্তু বেল পড়তে জানে—মালিকের কানে এ খবর পৌঁছোবার গুরুত্ব হয়তো সে বুঝবে না। ঘুণাক্ষরে এ খবর প্রকাশ পেলেও মালিক সেই মুহূর্তে তাকে বিক্রী করে দেবেন।

১৭৭৫ সালের গোড়াতে সঙ্কট দ্রুত ঘনিয়ে আসছিলো। ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তির সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। প্যাট্রিক হেনরী নামে শ্বেতাঙ্গটি নাকি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। কথাটা শুনতে ভালোই। কিন্তু কুণ্টা ভাবছিলো কথাটার অর্থ কী? শ্বেতাঙ্গরা তো স্বাধীন আছেই।

মাসখানেকের মাঝেই লেক্সিংটনে দু'পক্ষে মারাত্মক যুদ্ধ হয়ে গেলো। রাজার সৈন্যরা প্রচণ্ডভাবে হারলো। তাদের লাল পোশাক এ দেশের লোকেদের হাসির খোরাক যোগালো—'রক্তের দাগ লুকোতেই এরা লাল পোশাক পরে।'

লুথার খবর দিলো—'শোনা যাচ্ছে, নিগ্রোরাও রাজার সৈন্যের পাশে দাঁড়িয়ে রক্ত দিচ্ছে।' ফলে ভার্জিনিয়ার ক্রীতদাসেদের মালিকেরা তাদের অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলো।

ক্রীতদাসেদের মাঝে এখন লুথারের খুব সমাদর। তার কাছে খবর শুনবে বলে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে। জুন মাসে সে এসে খবর দিলো জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক সাহেব সেনাদলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। তার মস্ত আবাদ, বহু ক্রীতদাস। নিউ ইংল্যাণ্ডের কিছু ক্রীতদাসকেও লাল জামা পরা রাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ফিডলার মহা বিরক্তিভরে বললো—'এখন তো মুক্তি দেবেই। যুদ্ধ শেষ হলেই আবার বেত মারতে শুরু করবে।'

'নাও হতে পারে। শুনেছি কোয়কার নামে একদল সাদা লোক ফিলাডেল-ফিয়াতে দাসত্বপ্রথা বিরোধী দল গড়েছে। কিছু লোক সত্যি নিগ্রোদের ক্রীতদাস করবার বিপক্ষে।'

বেলও কিছু কিছু খবর আনছিলো। অবশ্য আজকাল ওয়ালার সাহেবের অতিথি এলে বেলকে আর খাবার ঘরে থাকতে দেওয়া হয় না। তাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—টেবিলে খাবার রেখেই সে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেল তাতে ক্ষুব্ধ। যাই হোক, তাকে বাধ্য হয়ে দরজার চাবির ফুটোতে কান পেতেই খবর সংগ্রহ করতে হয়। খবর এই যে—ইংরাজরা নাকি এক জাহাজ ভর্তি সৈন্য

পাঠাচ্ছে। ভার্জিনিয়াতে ক্রীতদাসের সংখ্যা কুড়ি লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। পাছে এরা রাজার সৈন্যের সাথে যোগ দেয় এই দুশ্চিন্তা।

লুথার জানালো—জেনারেল ওয়াশিংটন সৈন্যদলে আর নিগ্রো নিচ্ছেন না। কিন্তু উত্তর অঞ্চলের কিছু মুক্তি পাওয়া ক্রীতদাস নাকি বলছে—এ দেশ তাদেরও। কাজেই এ দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়বে।

ফিডলারের মন্তব্য—'যত সব পাগলের দল!'

দু'সপ্তাহ পর আরো নিদারুণ খবর এলো। ভার্জিনিয়ার ইংরাজ গবর্ণর লর্ড ডানমোর ঘোষণা করেছেন—যে সব ক্রীতদাস আবাদ ছেড়ে ইংরাজদের জেলে নৌকো বা নৌবাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের মুক্তি দেওয়া হবে।

বেল বললো—মনিব তো হাত পা ছুঁড়ছেন। যারা বাইবে থেকে সাহেবের বাড়ীতে আসছে, খেতে খেতে তাদের সাথে নানা পরামর্শ হচ্ছে। সন্দেহজনক গতি-বিধির ক্রীতদাসেদের শিকলে বেঁধে বা জেলে ভরে রাখা উচিত। লর্ড ডানমোরের ফাঁসি হওয়া উচিত, ইত্যাদি।

ওয়ালার সাহেবের মুখ ক্রমশঃই কঠিন হয়ে উঠছিলো। তাঁর অতিথিবর্গের মুখ উত্তেজিত। সাদা মানুষের আনাগোনা ক্রমেই বাড়ছিলো। কুণ্টার কাজ ছিলো অতিথিদের ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দেওয়া। ঘোড়াগুলো দেখেই বোঝা যেতো দীর্ঘ কঠিন পথ উত্তরণ করে তারা অত্যন্ত শ্রান্ত। কেউ কেউ অবশ্য নিজের গাড়ী নিজেই চালাতো। মালিকের ভাই জন ওয়ালারও আসতো। ঐ পরম ঘৃণিত মুখ কুণ্টা দেখামাত্র চিনেছিলো। জন ওয়ালারের ভাবভঙ্গীতে অবশ্য চেনার কিছু-মাত্র লক্ষণ দেখা যেতো না।

ফিডলার বলে—'এতে অবাক হবার কী আছে? ওর মতো সাদা মানুষ তোমার সাথে কথা বলবে, ভেবেছিলে?'

পরের কয়েক সপ্তাহে জানা গেলো—জার্জিয়া, সাউথ ক্যারলিনা, ভার্জিনিয়া থেকে হাজার হাজার ক্রীতদাস লর্ড ডানমোরের দলে যোগ দিয়েছে। আবার তাদের মাঝে অনেকে উত্তরেও পালিয়েছে। সাদা মানুষেরা সবাই একমত—আরো অনেক ব্লাডহাউণ্ড কুকুর পোষা দরকার।

একদিন ওয়ালার সাহেব বেলকে ডেকে ভার্জিনিয়া গেজেট থেকে একটা অংশ পড়ে শোনালেন। তারপর বললেন—'যাও, সবাইকে দেখিয়ে আন।' লেখা ছিলো—'নিগ্রোরা, কোন প্রলোভনে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনো না। আমাদের ছেড়ে গেলে, আমাদের থেকে তোমাদের সর্বনাশ বেশী হবে।'

কাগজের লেখা শুনে সকলের রাগ আরো বেড়ে গেলো। গেজেট ফেরৎ দেবার আগে বেল নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিগ্রো বিদ্রোহের আরো কিছু কিছু খবর পড়ে নিলো। কাগজ তাড়াতাড়ি ফেরৎ না দেবার জন্য পরে অবশ্য সাহেবের কাছে বকুনিও খেতে হলো। কিছুদিন পর কাগজ মারফৎ আরো একটি বার্তা তাদের জানানো হলো—'বিদ্রোহী ক্রীতদাসেদের মৃত্যুকালে ধর্মযাজকের উপাসনা হবে না।'

সে বৎসর নামেমাত্র বড়দিন হলো। চারদিকে নানারকম গুজব। লর্ড ডানমোর একদল বিদ্রোহীকে তার জাহাজে আশ্রয় দিয়েছেন। নরফোক বোমা বিধ্বস্ত করে ভস্মরাশিতে পরিণত করা হয়েছে। খাদ্য নেই। পানীয় নেই। ঘরে ঘরে রোগ। মৃতদেহ ভাসছে।

কুণ্টা এসব ভয়ঙ্কর ঘটনার পেছনে কোন অদৃশ্য আল্লাহের নির্দেশ অনুভব করছিলো। যা কিছু হচ্ছে—তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে। সাদা বা কালো সকলেরই ভবিষ্যত তাঁরই পরিকল্পনা মতো হবে।

১৭৭৬ সালের প্রথম দিকে শোনা গেলো—জেনারেল কর্ণওয়ালিস ইংল্যাণ্ড থেকে জাহাজ ভর্তি সৈন্য নিয়ে আসছিলেন, ঝড়ে সব ছত্রখান হয়ে গিয়েছে। তারপর শোনা গেলো—ভার্জিনিয়ার একদল সাদা মানুষ ইংল্যাণ্ডের অধিপতিত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গে ৪ঠা জুলাইয়ের মীটিঙের পর থেকে জন হ্যাঙ্ককের কথা খুব শোনা যেতে লাগলো। বাল্টিমোরে নাকি অত্যাচারী রাজার কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে। বুড়ো মালীর মতে অবশ্য—ক্রীতদাসেদের কপালে সবই এক। এখানকার মালিকই বা কী আর ইংল্যাণ্ডের মালিকই বা কী! সবই তো সাদা মানুষ!

সে বছরেই গরমকালে বেল খবর দিলো খাবার টেবিলের এক অতিথি বলেছে—এবার থেকে সৈন্যদলে ড্রাম বাজানো, বাঁশী বাজানো আর পায়োনিয়ারের কাজে নিগ্রোদের নেওয়া হবে।

'পায়োনিয়ার মানে কি?'

'মানে হলো, একেবারে সামনে থেকে মৃত্যু বরণ করা।'

অনেকরকম গুজব শোনা যেতে লাগলো। ভার্জিনিয়ার কাছে বিলি ফ্লোরা নামে এক ক্রীতদাস সৈনিক সেতুর তক্তা তুলে ফেলে ইংরাজ সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করেছে।

'একটা সেতুর তক্তা ভেঙে নেওয়া। সে তো একেবারে দত্যির মতো গায়ের জোর!'

কুণ্টা কিন্তু কালোদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়াটা মোটেই পছন্দ করছিলো না। সর্বক্ষেত্রেই সাদাদের হাতে বেশী অস্ত্র থাকবে। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কোন ফল হবে না। কুণ্টা জানে, আফ্রিকাতেও সাদা মানুষেরা দুষ্ট সর্দার বা রাজাদের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত কালোরা কালোদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছে, বন্দী স্বজাতিদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে বা বিক্রী করে দিয়েছে।

বেল খবর আনলো অন্ততঃ পাঁচ হাজার কৃষ্ণকায় যুদ্ধে লড়ছে। তাদের মাঝে ক্রীতদাস এবং স্বাধীনতা পাওয়া—দু'রকমই আছে। লুথার বললো—কালোদের একটা পুরো বাহিনী আছে। তাতে কর্ণেল থেকে নীচে পর্যন্ত সবাই কালো। কর্ণেলের নাম মিডলটন। ফিডলারের দিকে কটাক্ষপাত করে বললো—'বল তো সে কে? সেও একজন বেহালাবাদক।'

লুথার একটা নতুন গানের সুর ভাঁজতে লাগলো। ক্রমে অন্যেরাও তার সাথে যোগ দিলো। কেউ বা তাল ঠুকতে লাগলো। আর ফিডলার যখন বেহালা বাজাতে শুরু করলো অল্পবয়সীরা হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো।

১৭৮১ সালের অক্টোবরে খবর এলো ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়ালিস হেরে গিয়েছে। যুদ্ধ শেষ। দেশ স্বাধীন।

বেল বললো—কত বছর পর মালিকের মুখে হাসি দেখছি। লুথারের বিশ্রাম ঘুঁচে গেলো। রাতদিন শুধু গাড়ী চালাচ্ছে। সাদাদের মতো নিগ্রোরাও সমান উল্লাসে মাতামাতি করেছে। তবে তাদের আনন্দটা নিগ্রো বীর পুরুষ বিলি ফ্লোরাকে নিয়েই বেশী।

বেল চেঁচিয়ে সবাইকে জড়ো করলো—মালিক বলেছেন ইউনাইটেড স্টেটসের প্রথম রাজধানী ফিলাডেলফিয়া। লুথার শীঘ্রই একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এলো। জেফারসন সাহেব ইমানসিপেশন অ্যাক্ট করেছেন। ফলে আইনতঃ মালিকদের ক্রীতদাসেদের মুক্তি দেবার অধিকার থাকবে। অবশ্য মুক্তি দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয় আর বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেলো কোন মালিকই মুক্তি দিতে ইচ্ছুক নয়। যদিও কোয়কার নামে একটি ছো সংগঠন ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী, কার্যতঃ এই অ্যাক্টে কালোদের কিছুই সুবিধা হলো না।

১৭৮৩ সালের নভেম্বরে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে

'সাত বছরের লড়াই' নামে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো। বেল বললো—মালিক বলেছেন, এইবার শান্তি।

ফিডলার তিক্তস্বরে বললো—শান্তি কীসের? যতদিন সাদা মানুষেরা আছে, শান্তির আশা নেই। লোক খুন করবার চেয়ে প্রিয় কাজ তাদের আর কিছু নেই। দেখো, এবার নিগ্রোদের অবস্থা আরো খারাপ হবে।'

সে রাত্রে কুণ্টা প্রতি অমাবস্যার পর একটি একটি করে জমানো বহুবর্ণ উপলখণ্ডগুলি গুণতে বসলো। বারোটি বারোটি করে এক এক ভাগে সাজিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সতেরো ভাগ পাথর জমেছে! হায় আল্লাহ্! জুফরেতে তার জীবনের যত কাল কেটেছে, এই কাফেরদের দেশেও ততকাল কেটে গিয়েছে? সে কি এখনো নিজেকে আফ্রিকাবাসী বলে দাবী করতে পারে? নাকি সত্যি সত্যি এরা যাদের নিগ্রো বলে, তাই বনে গিয়েছে? সে কি নিজেকে পুরুষ বলেই দাবী করতে পারে? এখন তার যে বয়স, কুণ্টা তার বাবাকে সর্বশেষ সে বয়সেই দেখে এসেছে। অথচ এত বয়সেও কুণ্টার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, স্বগ্রাম, স্বদেশ বা স্বদেশবাসী বলে দাবী করবার মতো কিছুই নেই। অতীত যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যত বলেও কিছু নেই। গাম্বিয়া কি স্বপ্ন? নাকি সে নিজে এখন স্বপ্নের ঘোরে আছে? যদি তাই হয়, এ দুঃস্বপ্ন কখনো ভাঙবে না?

চুয়াল্লিশ

কুণ্টাকে বেশীদিন ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামাতে হলো না। ঝড় উঠলো। শেরিফের সাথে মালিক রুদ্ধকক্ষে আলোচনায় বসলেন। বন্দী করে ধরে আনা ক্রীতদাসটি বেলকে কাঁদতে কাঁদতে জানালো—পালাতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে। আর প্রচণ্ড কশাঘাতে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে—মালিকের ড্রাইভার লুথার তাকে পথের হদিস দিয়েছিলো।

কথাটা জানাজানি হতে লুথার ভয়ে পালিয়ে যাবার আগেই মালিক ওয়ালার সাহেব ও শেরিফ ক্রীতদাসদের বাসস্থানে এসে তার সম্মুখীন হলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলেন—খবরটা সত্যি কিনা। আতঙ্কিত লুথার ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করতে পারলো না। ক্রোধে রক্তবর্ণ ওয়ালার সাহেব প্রথমেই তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। লুথারের কাতর অনুনয়ে হাত নামিয়ে এক দীর্ঘ মুহূর্ত তিনি লুথারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ক্রোধ অশ্রুতে পরিণত হয়ে তাঁর দুই চক্ষু ভরে দিলো।

অবশেষে শান্ত কণ্ঠে শেরিফকে বললেন—'একে বন্দী করে জেলে নিয়ে যান। পরের নীলামেই একে বিক্রী করা হবে।' লুথারের করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত না করে নীরবে তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন।

মালিকের ড্রাইভার এবার কে হবে তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হতে না হতেই কুণ্টার বড় বাড়ীতে ডাক পড়লো। কুণ্টা আগে কখনো মালিকের সাথে কথা বলেনি বা এই ষোলো বছরের মাঝে বড় বাড়ীতে রান্নাঘরের ওপারে যাবার তার দরকার হয়নি। কম্পিত বক্ষে সে বেলের অনুগামী হলো।

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে বড় হলঘরে যেতে ঝকঝকে পালিশ মেঝে আর সুউচ্চ, সুসজ্জিত দেওয়াল দেখে কুণ্টার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত। বেল কারুকার্য করা মস্তবড় দরজায় করাঘাত করতে গভীর কণ্ঠে আওয়াজ এলো—'ভেতরে এসো।' ভেতরে ঢুকে ঘরের আয়তন দেখে কুণ্টা হতবাক্। পুরো খামারটাই যেন সে ঘরে এঁটে যাবে। ওক কাঠের পালিশ করা মেঝে দামী কার্পেটে ঢাকা। দেওয়ালে কত না ছবি আর নানা ধরণের সজ্জা! দামী আসবাবপত্রে মহার্ঘ মেহগনি পালিশ। তাকের পর তাক বই। ওয়ালার সাহেব একটি তৈলদীপের সবুজ কাঁচের ঢাকনার গোলাকার আলোকবৃত্তে বসে বই পড়ছিলেন। এক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে তাকালেন।

'টবি, আমার গাড়ীর একজন চালক দরকার। তুমি এখানেই বড় হয়েছো। আশা করি তুমি বিশ্বাসী ও অনুগত হবে।'

তাঁর নীলবর্ণ চক্ষুদ্ব'টি তীক্ষ্ণ শলাকার মতো কুণ্টার অন্তঃস্থল পর্যন্ত বিদ্ধ করছিলো।

'বেলের কাছে শুনেছি, তুমি কখনো মদ্যপান কর না। আমি নিজেও কখনো তোমার বেচাল দেখিনি।'

বেলের চকিত দৃষ্টির খোঁচায় কুণ্টা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—'হ্যাঁ, স্যার।'

'লুথারের পরিণতি জানো তো?' সাহেবের চক্ষু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। কণ্ঠস্বর কঠিন ও শীতল হলো। 'তোমাদের যদি সুবুদ্ধির অভাব ঘটে, তোমাকে বা বেলকে বিক্রী করে দিতে আমার মুহূর্তকাল দেরী হবে না—জেনে রেখো।'

'ঠিক আছে। কাল আমাকে নিউ পোর্ট নিয়ে যাবে। আমি পথ চিনিয়ে দেবো।' বেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একে উপযুক্ত পোশাক যোগাড় করে দিয়ো।' আর বেহালাবাদককে বললেন, 'কাল থেকে টবির বদলে তুমি বাগানের কাজ করবে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

বেল পোশাক এনে দিলো। কিন্তু পরদিন ভোরে কুণ্টার সে পোশাকে সজ্জিত হওয়া ফিডলার এবং বুড়ো মালীর সাগ্রহ তত্ত্বাবধানে সমাধা করতে হলো। শক্ত ইস্ত্রী করা ক্যানভাসের ট্রাউজার ও সুতীর শার্ট দেখতে মন্দ ছিলো না। কিন্তু তারা যে কালো টাইটি সযত্নে গলায় পরিয়ে দিলো, সেটি কুণ্টার বড়ই অপছন্দ হ'চ্ছিলো।

ফিডলার তীক্ষ্ণ সমালোচনার চোখে কুণ্টাকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। তার দৃষ্টিতে আনন্দ ও ঈর্ষা দুই-ই। 'তুমি তো খুব জব্বর লোক বনে গেলে হে! দেখো, আবার মাথা গরম করে ফেলো না।'

সে উপদেশের প্রয়োজন ছিলো না। এত বৎসর পরেও কুণ্টা সাদা মানুষের অধীনে কোন কাজেই মর্যাদা খুঁজে পেতো না। কেবল তার কাকা জানেহ্‌ এবং সালোয়ামের মতো নতুন দেশ পরিভ্রমণের সম্ভাবনায় সে কিছুটা উত্তেজিত বোধ করছিলো। কিন্তু শীঘ্রই কাজের অতিরিক্ত চাপে তার ভ্রমণের আনন্দ ঘুচে গেলো। রোগীদের প্রয়োজনে ওয়ালার সাহেব দিবারাত্রির যে কোন সময় কুণ্টাকে ডেকে নিতেন। তারপর আবাদের সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে মারাত্মক বেগে মাইলের পর মাইল ছুটতে হতো। গর্ত, খানাখন্দ, বরফগলা জলে পিচ্ছিল লাল মাটির কর্দমাক্ত রাস্তা—কুণ্টা সবই নিপুণ দক্ষতার সাথে পার করে দিতো।

একদিন প্রত্যূষে ওয়ালার সাহেবের ভাই জন উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া চালিয়ে এসে হাজির। তার স্ত্রীর নির্ধারিত সময়ের দু'মাস আগে প্রসব-যন্ত্রণা উঠেছে। জন সাহেবের ঘোড়া ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছিলো। কুণ্টা ওয়ালার সাহেবের গাড়ী করেই দু'জনকে কোনক্রমে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিলো। একটু পরেই নব-জাতিকার কান্না শোনা গেলো। পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটি কন্যা জন্মেছে। তার নাম রাখা হয়েছিলো অ্যান।

সেবার গ্রীষ্ম ও শরৎকালে কালোদের মাঝে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়। প্রচুর পরিমাণ কুইনাইন খাইয়ে কিছু লোকের জীবন রক্ষা করা গিয়েছিলো। মৃতের সংখ্যা অগণ্য। কুণ্টা ওয়ালার সাহেবকে নিয়ে দিবারাত্র গাড়ী চালিয়েছে। অসংখ্য অচেনা জায়গায় তাকে খেতে হয়েছে, বিশ্রাম বা তন্দ্রায় কাটাতে হয়েছে। অসংখ্য রোগীর যন্ত্রণার আক্ষেপ শুনেছে আর প্রভুর প্রত্যাবর্তনের আশায় অন্তহীন কাল অপেক্ষায় থেকেছে।

কিন্তু সেটাই রুটীন নয়। কখনো বা পুরো সপ্তাহে একবারও সাহেবের ডাক

আসে না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করে ছুটির মেজাজে তাঁর দিন কাটে। বসন্তকালে বা গ্রীষ্মে মাঠগুলিতে প্রস্ফুটিত কুসুম, স্ট্রবেরি আর ব্লেকবেরি নিবিড় ঘন হয়ে থাকে। সবুজ, সতেজ লতিয়ে ওঠা আঙুরলতায় বেড়াগুলো ছাওয়া। পীড়িতজনের ত্রাণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবার তাড়া নেই। তামাটে রঙের বলিষ্ঠ একজোড়া ঘোড়ার পেছনে গাড়ীটি অলসগতিতে গড়িয়ে চলে। প্রখর রোদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদনটির নীচে ওয়ালার সাহেব তখন নিশ্চিন্তে ঝিমোতে থাকেন। বিচিত্রবর্ণ পাখীর দল নির্বিঘ্ন সুখে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর মধুর স্বরে ডাকাডাকি করে। পথের ওপর যে সাপটি পরম আয়াসে রোদ পোহাচ্ছিলো—গাড়ীর শব্দে বিরক্ত হয়ে এঁকেবেঁকে পালিয়ে যায়। মরা খরগোশটি ছেড়ে দিয়ে বাজপাখী উড়ে যায়। সে সব দিনে কুণ্টার অলস দৃষ্টিও চারিদিকে ভেসে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু বিরাট ক্ষেতের মাঝে একটিমাত্র প্রাচীন ওক গাছের দৃশ্য তাকে মুহূর্তে সচেতন করে তুলতো। তার বিচলিত মন কোন সুদূর আফ্রিকায় চলে যেতো। জুফরের কথা চকিতে মনে পড়তো। সেখানকার বয়স্ক গ্রাম্যপ্রধানেরা বলতেন—যেখানেই একটি বাওবাব গাছ দেখবে--জানবে সেখানে একদিন জনপূর্ণ বসতি ছিলো। গাছটি ঘিরে গ্রাম গড়ে উঠেছিলো।

ওয়ালার সাহেবের মা বাবা এনফিল্ডে থাকতেন। তাঁদের বাড়ীর পথে দু'ধারে বৃহৎ প্রাচীন গাছের সারি। বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটিকে একটি বিরাট পত্রবহুল ওয়ালনাট গাছের নীচে গাড়ীটি দাঁড়াতো। বাড়ীটি ওয়ালার সাহেবের বাড়ী থেকে অনেক বড় আর সুসজ্জিত। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে। নীচে একটি ক্ষীণকায়া শান্ত নদী।

কুণ্টা যখন প্রথম সাহেবের গাড়ী চালাতে শুরু করে, অন্যান্য সাহেববাড়ীর রাঁধুনীরা তাচ্ছিল্যভরে সহজে তার সাথে কথা বলতো না। কুণ্টার তাতে কিছু এসে যেতো না। সে খাবার পর নীরবে নিজের থালাটি পরিষ্কার করে রেখে যেতো। তার গাম্ভীর্যই সকলকে আকৃষ্ট করতো। কিছুদিনের মধ্যেই সবাই আগ বাড়িয়ে এসে তার সাথে আলাপ করে নিতো।

মাঝে মাঝে ওয়ালার সাহেব নিউ পোর্টে যেতেন। সেখানে তাঁর বৃদ্ধ কাকা ও কাকীমা থাকতেন। সাহেবদের খাবার ঘরে পরি বেশন শেষ করে নিয়ে এসে বাড়ীর রাঁধুনী কুণ্টাকে রান্নাঘরে খেতে দিতো। একটা চাবির রিঙে এক গুচ্ছ চাবি গর্বভরে ঝনঝনিয়ে দেখানোতে তার মহা আনন্দ ছিলো। কুণ্টা লক্ষ্য করেছে সব সাহেব বাড়ীতেই পুরোনো রাঁধুনীরা চাবির গোছা দেখিয়ে প্রতিপন্ন করতে

চাইতো—সে মালিকের কত বিশ্বাসভাজন। একবার নিউপোর্টের রাঁধুনী নিজের ঠোঁটে আঙুল চেপে অতি সন্তর্পণে কুন্টাকে বাড়ীর ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়েছিলো। মহা আড়ম্বরে কোমরে রাখা চাবির গোছা থেকে চাবি বার করে ঘর খোলা হলো। একটি দেওয়ালে গৃহকর্তার অস্ত্রশস্ত্র সাজানো ছিলো। সেগুলো দেখে কুন্টার মুখে সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠতে রাঁধুনী মহা খুশী। বাইরে বেরিয়ে এসে এনফিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল জন ওয়ালারের সমাধিস্থল দেখালো।

'ওপরে গেলে দেখতে পাবে মস্ত মস্ত ছত্রিওয়ালা খাট। এত উঁচু যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সেসব খাট, চিমনীর ইঁট, বাড়ীর বীম, দরজার কবজা সব নিগ্রো ক্রীতদাসের তৈরী।'

পেছনের উঠোনে নিয়ে গিয়ে সে কুন্টাকে তাঁতঘর, ক্রীতদাসদের বাসস্থান, পুকুর এবং আর একটু দূরে ক্রীতদাসদের কবরস্থান দেখিয়েছিলো। কুন্টা বিস্মিত হয়ে রাঁধুনীর কাণ্ড কারখানা দেখছিলো। মনে ভাবছিলো—কী করে এরা পারে! এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এ সব কিছু সম্পত্তির মালিক রাঁধুনীই। সে যে সেখানে ক্রীতদাসীমাত্র সে খেয়ালই নেই।

পঁয়তাল্লিশ

'মালিক জনসাহেবের আবাদে এত ঘন ঘন যাচ্ছেন কেন বল দেখি? পরস্পরের মাঝে এত টান তো আগে কখনো দেখিনি!'—বেল অবাক হয়ে কুন্টাকে জিজ্ঞেস করলো।

কুন্টা দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে ক্লান্ত কণ্ঠে বললো. 'ওদের ঐ ছোট্ট মেয়েটির জন্য সাহেব পাগল!'

'আহা! মিস অ্যানকে দেখে সাহেবের নিশ্চয় নিজের মরা মেয়েকে মনে পড়ে যায়।'

কুন্টার মনে অবশ্য এ সম্ভাবনার কথা কখনোই জাগেনি। শ্বেতকায়দের হৃদয় বলে কোনও বস্তু আছে বলে সে ধারণাই করতে পারতো না।

'এই নভেম্বরে মেয়েটি এক বৎসরের হবে। তাই না?'

কুন্টা নির্বিকার ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো। কুন্টার তাতে কী এসে যায়? এই দুই আবাদের মধ্যে গাড়ী চালাতে চালাতে সে শ্রান্ত। তবু ভালো পরের সপ্তাহে

মালিকের ভাই দাদার কাছে বেড়াতে আসবেন। কুণ্টার কষ্ট করে সেখানে যেতে হবে না।

বেল মহা উৎসাহে বলছিলো—'আজ সাহেব তাঁর ভাইঝিকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছিলেন। দু'জনের সে কি হাসি!'

কুণ্টা ওসব মোটেই লক্ষ্য করেনি। করবার ইচ্ছা কোনকালে ছিলোও না। হবেও না। বেল অদ্ভুত লোক! কী করে যে বেলের ওসব লক্ষ্য করতে ভালো লাগে—সে বুঝে উঠতে পারে না।

কিছুদিন পর গাড়ী চালাবার পথে মালিকের তীক্ষ্নস্বরে তার সম্বিত ফিরে এলো। একটা বাঁকের মুখে সে ভুল রাস্তা ধরেছিলো।

এইমাত্র যা সে দেখে এসেছে তাতে কুণ্টার আর কাণ্ডজ্ঞান ছিলো না। আগের রোগীটির বাড়ীতে পেছনের উঠোনে এক বিরাটকায়া ঘন কৃষ্ণবর্ণ ওলফ-জাতীয়া দেখতে স্ত্রীলোক বসেছিলো। তার দুই বৃহদাকার স্তনে দুইটি শিশু লালিত হচ্ছিলো। একটি শ্বেতকায়, অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। কুণ্টা দেখে স্তম্ভিত, শিহরিত হয়েছিলো। বুড়ো মালী কিন্তু শুনে বলেছিলো—'ভার্জিনিয়াতে কালো মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়নি এমন সাদা বাচ্চা কমই আছে।'

আরো একটা জিনিস দেখে কুণ্টার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠতো। সব খামার-বাড়ীতেই দেখা যেতো—সমবয়সী কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ ছেলেমেয়েদের খেলায় সাদারা মালিক সাজতো। খেলাচ্ছলে কালোদের মারবার ভান করতো। অথবা কালোরা ঘোড়া সেজে চার হাত পায়ে চলে বেড়াতো। সাদারা তাদের পিঠে চাপতো। স্কুল স্কুল খেলা হলে সাদারা অবশ্যম্ভাবী মাস্টারমশাই সেজে কালোদের ওপর হম্বি তম্বি চালাতো আর তাদের নিরেট বুদ্ধু বলে গালাগাল দিতো। কিন্তু এটাই বিস্ময়কর যে এত কাণ্ডের পরও দুপুরে খাবার শেষে সাদা আর কালো বাচ্চারা অনেক সময় বাইরের খাটিয়ায় পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়তো।

বেল, বুড়ো মালী আর ফিডলারকে কুণ্টা বলতো—সাদা মানুষদের সে একশো বছরেও চিনে উঠতে পারবে না। ওরা শুনে হাসতো। বলতো—সারা জীবন ধরেই এমন ব্যাপার ওরা দেখে আসছে। তাতে দোষের কী আছে! বেল বলেছিলো—শিশুকাল থেকে একসাথে বড় হয় সাদা ও কালো মেয়েদের মাঝে অনেক সময় এমন বন্ধন গড়ে ওঠে, একে অপরকে না দেখে থাকতে পারে না। কালোটি কোন কারণে অন্যত্র বিক্রী হয়ে গেলে সাদাটির অসুস্থ হয়ে জীবন সংশয় পর্যন্ত হতে শোনা গিয়েছে।

বুড়ো মালীর গল্প—সাদা ছেলেরা অনেক সময় নিজেদের কালো ক্রীতদাস সঙ্গীদের কলেজে নিয়ে যায়। কার ক্রীতদাস কতটা লেখাপড়া শিখেছে, তাই নিয়ে রেষারেষিও হয়। 'আহা! আমার চেনা একটি ছেলে লিখতে পড়তে এমন কি অঙ্ক কষতেও শিখেছিলো। জানি না সে এখন কোথায়!'

ফিডলার মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলো—'দেখ, বেঁচে আছে কিনা! সাদা লোকেদের মতো সন্দিগ্ধ মনের লোক আর হয়? সব সময়ই তাদের ভয়—লেখাপড়া শিখলেই বুঝি কালোরা বিদ্রোহ করবে। তাই বলি, কখনো বেশী শিখো না। আর কানটি খোলা রাখ। মুখটি বন্ধ রাখ।'

কথাটা যে কত সত্যি, কয়েকদিনের মাঝেই কুণ্টা তা বুঝতে পারলো। ওয়ালার সাহেব তাঁর এক বন্ধুকে গাড়ী করে পোঁছে দিচ্ছিলেন। সামনের চালকের আসনে যে কুণ্টা বসে আছে যেন তাঁদের খেয়ালই ছিলো না। মালিকের বন্ধু বলছিলেন—'সুতীর কাপড়ের বিরাট চাহিদা : অথচ উৎপাদন বাড়াবার যো নেই। ক্রীতদাসেরা বীজ থেকে তুলো ছাড়াতে বড় সময় নেয়। অথচ ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়ানো শক্ত। দাসব্যবসায়ীরা এমন দাম চড়িয়েছে—যেন দিনে ডাকাতি শুরু করেছে।'

'তা বটে। তবে ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়াবার বিপদ আছে। ওরা যত বেশী সংখ্যায় একত্র হবে—ততই ওদের দল পাকাবার, বিদ্রোহ করবার সুবিধা। হচ্ছেও তো আকচার। আমি বহুদিন যাবৎ বলে আসছি—শ্বেতকায়দের থেকে ক্রীতদাসদের সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে আমাদের সমূহ বিপদ।'

'যা বলেছো। কে যে তোমার গলা কাটবার মতলব আঁটছে—তুমি ধরতেই পারবে না। এরা জাত বেইমান। কখনোই বিশ্বাস করা যায় না।'

কুণ্টার দেহ কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেলো। সে শুনতে পেলো, মালিক বলছেন—'ডাক্তার হিসাবে বহু মৃত্যু দেখেছি। সবগুলোই সন্দেহের উর্ধ্বে এমন মনে করতে পারিনি।'

আশ্চর্য! এরা কি তার অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছে? গত দু বছরের অভিজ্ঞতায় কুণ্টাও তা জেনেছে। রাঁধুনীদের আর অন্যান্য দাসীদের হাসিতে ইঙ্গিতে প্রভুদের খাবারে নোংরা বা অখাদ্য মেশাবার কাহিনী তার অজানা নয়। কাঁচের গুঁড়ো, আর্সেনিক বা অন্য বিষ মেশাবার কথাও সে শুনেছে। শ্বেতকায় শিশুদের মাথায় সূঁচ ফুটিয়ে মেরে ফেলা বা অন্যভাবে অঙ্গহানি করার কাহিনীও তার জানা ছিলো। সম্ভবতঃ কৃষ্ণকায় পুরুষদের থেকে মেয়েরাই বেশী বিদ্রোহিনী বা প্রতিহিংসাপরায়ণা।

হতে পারে সেটা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল। তবে একটি কালো মেয়েকে ধর্ষণ করবার প্রতিশোধে তার বাবা শ্বেতকায় ওভারসীয়ারটিকে গলায় দড়ি দিয়ে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলো বটে। স্থানে স্থানে বিদ্রোহের আভাস সে পেয়েছে। কিন্তু সে জানে তার পঙ্গু পা নিয়ে তাদের সাথে যোগ দিয়েও কোনও লাভ নেই। তাদের সাফল্য সে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে। কিন্তু সত্যি কি তারা জয়লাভ করবে? রান্নাঘরের ছুরি, চাষের হাতিয়ার আর চুরি করা সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাদাদের হারিয়ে দিতে পারবে? অসম্ভব।

তবে ক্রীতদাসদের সবচেয়ে বড় শত্রু তাদের নিজেদের অজ্ঞতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অনীহা। সামান্য কিছু অল্পবয়স্ক দাস মুক্তির স্বপ্ন দেখে। বাকী বিপুল-সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাদের যা করতে বলা হয় তাই করে। মনিবের শিশুকে লালন করে। ঘরের মেয়েদের মনিব টেনে নিয়ে গেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

কুণ্টা নিজেও কি সেরকম হয়ে যাচ্ছে? না কি তার বার্ধক্য এসেছে? জানে না। শুধু জানে—আর সে যুদ্ধ করতে বা পালাতে পারবে না। না, কারো সঙ্গ আর সে চায় না। তাকে নিয়ে কেউ যেন মাথা না ঘামায়। সে নিজের মনে একা থাকতে চায়।

ছেচল্লিশ

একবার মালিকের সাথে রোগীবাড়ীতে গিয়ে সে তাদের খামারের পেছনের উঠোনে ঝিমোচ্ছিলো। সন্ধ্যাবেলায় কাজ শেষ হবার শিঙ্গে বেজে উঠতে কুণ্টা চমকে উঠে চোখ কচলালো। সে ভুল দেখছিলো না তো? বিশ ত্রিশজন ক্রীতদাস হাতমুখ ধুয়ে খাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো—তার মধ্যে চারজন শ্বেতকায়। একটি পুরুষ, একটি নারী ও দুইটি অল্পবয়স্ক কিশোর। রাঁধুনীর কাছ থেকে জানতে পেলো এদের সমুদ্রপারের দেশ থেকে আসবার খরচ তাদের মনিব দিয়েছেন। সাত বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে খাটলে সে দেনা শোধ হবে—এরাও স্বাধীন হয়ে যাবে।

এ কথা সত্যি, এ দেশের কিছু স্বাধীন হতদরিদ্র সাদা মানুষ থেকে কালোরা ভালো আছে। কুণ্টার সেই অতি দুঃস্থ সাদা মানুষদের অবস্থা দেখবার সুযোগ

হয়েছে। কায়ক্লেশে তাদের দিন কাটে। এক ঘরের ঝুপড়িতে গাদাগাদি করে পুরো পরিবারকে থাকতে হয়। তাদের মাঝে কিছু লোক এতই দরিদ্র যে দিনান্তে খাওয়া জোটে না। দিবারাত্র সস্তা দামের মদ খেয়ে মাটিতে গড়ায় আর নির্লজ্জের মতো পরস্পরকে গালাগাল দেয়। বৌকে মারবার বা অন্য কোন মেয়েকে ধর্ষণ করবার অপরাধে জেলও খাটে। কিন্তু নিজেদের মাঝে এরা যতই মারামারি করুক কুণ্টা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে—কালোদের ওপর অত্যাচার করবার সুযোগ পেলেই তাদের চরম আনন্দ। যখন জাহাজ থেকে কুণ্টাদের সর্বপ্রথম এদেশের তীরে এনে ফেলা হয়েছিলো, এদের নারী পুরুষেরাই হতভাগ্য বন্দীদের বিদ্রূপ করে, লাঠির খোঁচা মেরে যতদূর সম্ভব যন্ত্রণা দিয়েছে। জন ওয়ালারের আবাদে দরিদ্র শ্বেতকায় ওভারসীয়ারই তাকে নির্মম কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে। পলাতক ক্রীতদাসদের ধরে আনবার জন্য নিযুক্ত দরিদ্র শ্বেতকায়রাই নিষ্ঠুরতম অট্টহাস্যে শাণিত অস্ত্রে তার পা দ্বিখণ্ডিত করেছে। ভাগ্যহত অসহায় কত শত ক্রীতদাসের দেহ ছিন্নভিন্ন, চেনার অযোগ্য করে এরা মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাদের পুরুষত্বহানি পর্যন্ত করেছে। কুণ্টা বুঝতে পারতো না—কালোদের ওপর এই দরিদ্র শ্বেতকায়দের এত আক্রোশ কেন। হয়তো ধনী শ্বেতকায়দের ওপর আক্রোশের এটা একধরণের প্রতিফলন। ধনীদের অর্থ, ক্ষমতা, সম্পত্তি সব কিছু আছে। ক্রীতদাসও আছে—যাদের তারা খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে। অথচ এই হত-দরিদ্রদের কিছুই নেই। ন্যূনতম খাওয়া পরার প্রয়োজনও ভালোভাবে মেটে না। অহর্নিশ বেঁচে থাকবার যুদ্ধ করতেই সর্ব শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এই অক্ষমতার ক্রোশ তারা অক্ষমতরদের ওপর মেটায়। তা হোক্। এদের প্রতি কুণ্টার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিলো না। অতি গভীর ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই তাদের প্রাপ্য নয়। কুণ্টার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ—স্বাধীনতা পাবার আশা তারা হরণ করেছে।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে নানা ধরণের কাহিনী শোনা যেতে লাগলো। কোয়কারদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তারা ক্রীতদাসদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করছে। তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে, লুকিয়ে রাখতে এবং উত্তর দেশে নিরাপদে পৌঁছে দিতে কোয়কাররা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। কুণ্টা এসব কাহিনী সর্বাংশে বিশ্বাস করতো না। তবুও কোয়কারেরা যদি এমন কিছু করে, যাতে মালিকেরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যায়—তবে সেটা ভালোই। বেহালাবাদক এক নাচের আসরে বাজাতে গিয়েছিলো। সে খবর নিয়ে এলো—জন প্লেজেণ্ট নামে এক কোয়কার মালিক উইল করে তার দুই সহস্রাধিক ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়েছে। বেল বড় বাড়ী

থেকে খবর আনলো—ওয়ালার সাহেব ও তাঁর অতিথিরা মাসাচ্যুসেটস নামে উত্তরের এক রাজ্যের ক্রীতদাসপ্রথা বিলোপ নিয়ে অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে আলোচনা করছিলেন। কাছাকাছি অন্যান্য রাজ্যেরও নাকি নতুন নীতি গ্রহণ করা হবে।

কুণ্টা জিজ্ঞেস করল—'বিলোপ কথাটার মানে কি?'

বুড়ো মালী বললো—'তার ফলে একদিন সব নিগ্রোরা স্বাধীন হয়ে যাবে।'

সাতচল্লিশ

শহর থেকে ঘুরে এসে বলবার মতো নিজের কানে শোনা বা চোখে দেখা কাহিনী প্রায়ই থাকতো। তেমন কিছু কাহিনী রোজ না থাকলেও ইদানীং কুণ্টার ফিডলারের ঘরের সামনের আড্ডাটিতে যোগ দিতে বেশ ভালোই লাগছিলো। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেলো, সে বুড়ো মালী আর বেলের সাথেই বেশী কথা বলছে। বেহালাবাদকের সাথে তার সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, তা নয়। কিন্তু আজকাল কুণ্টার বাইরে যাবার এবং খবর সংগ্রহের সুযোগ বেশী—এই পরিস্থিতিটা বেহালা-বাদকের সম্মানে ঘা দিচ্ছিলো। তার কথাবার্তা এই জন্য কমে আসছিলো। এদের কাছে আর মুখ খুলতে চাইতো না, বাজাতেও চাইতো না।

অবশ্য মালিকের ডাকে সাহেবদের পার্টিতে তাকে বাজাতেই হতো। একবার তেমনি একটা ভোজের আসরে কুণ্টা অন্য ড্রাইভারদের সাথে একটা গাছের নীচে গল্প করছিলো। হঠাৎ ব্যাণ্ড বেজে উঠলো। বেহালাবাদক তার পরিচালক। লঘু মাত্রার এমন উচ্ছল তার স্বর—সাদা মানুষরাও পা স্থির রাখতে পারছিলো না।

নাচের পর লম্বা টেবিলে মোমবাতির আলোকে রাশিকৃত খাবার সাজানো হলো। কুণ্টাদের ক্রীতদাস বসতির সবাই মিলে এক বছরেও সে খাবার শেষ করে উঠতে পারবে না। ড্রাইভারদের জন্য রাঁধুনী পড়ে থাকা বাড়তি খাবার আর জগ ভরতি লেমনেড পাঠিয়ে দিলো। মালিক যদি তাড়াতাড়ি ফিরতে চান—এই ভয়ে কুণ্টা শুধু একটি মুরগীর ঠ্যাং, আর একটি ভারী সুস্বাদু রসালো মিষ্টি মুখে দিয়েছিলো। সবাই বলছিলো মিষ্টিটির নাম নাকি—'এক্লেয়ার'। মালিক কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরলেন না। সাহেবরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পে কাটাতে লাগলেন। তাঁদের পরনে সাদা স্যুট, হাতে লম্বা চুরুট। অলস ভঙ্গীতে সুরায় চুমুক দিচ্ছিলেন। মাথার ওপর আলোর ঝাড়। আর তাঁদের মেমসাহেবদের পরণে অতি সূক্ষ্ম মহার্ঘ পোশাক। তাঁরা হাতপাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন আর রুমাল ঘোরাচ্ছিলেন।

এ সব পার্টিতে এলে কুণ্টার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হতো। বিস্ময়, সম্ভ্রম আর ক্রোধ, দ্বেষ, ঘৃণা। একই সাথে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। সবচেয়ে বেশী তার হতো—গভীর বিষাদ ও একাকীত্ববোধ। এর জের কাটতে পুরো এক সপ্তাহ কেটে যেতো। এমন অভাবনীয়, অপরিমেয় ধনসম্পদ কারো থাকতে পারে—বিশ্বাস করা যায় না। এর দীর্ঘকাল পরে সে বুঝতে পেরেছিলো সেই আপাত বিলাসের সব কিছুই মিথ্যা, অবাস্তব ও অলীক স্বপ্ন। শ্বেতকায়েরা অসম্ভবের ভিত্তিতে কল্পনার অট্টালিকা গড়ে নিজেদের ভোলাচ্ছিলো। মন্দ থেকে কখনো ভালোর সৃষ্টি হতে পারে না। যে দুর্ভাগাদের রক্ত ও পরিশ্রমে সে ঐশ্বর্যের সৃষ্টি, যে মায়েদের স্তনদুগ্ধে ওদের শিশুদের পুষ্টি—তাদের নিপীড়ন করে কখনো সত্যিকারের বৈভব সৃষ্ট হতে পারে না।

এসব কথা তার বেল বা বুড়ো মালীকে বলতে ইচ্ছা করতো। কিন্তু এদের বিজাতীয় ভাষায় এত কথা বুঝিয়ে বলবার মতো জ্ঞান তখনো তার হয়নি। তাছাড়া বহুদিন যাবৎ এরা এ দেশে সাহেবদের মাঝে মানুষ হয়েছে। কুণ্টার মতো স্বাধীন জীবন কখনো যাপন করেনি। তার দৃষ্টিভঙ্গী এরা পাবে কোথায়? এত বছর পরেও এই নিঃসঙ্গতা নতুন করে তাকে পীড়ন করলো।

মাস তিনেক পরে এনফিল্ডে ওয়ালার সাহেবের বাবা মার বাড়ীতে থ্যাঙ্কস গিভিঙের পার্টিতে কুণ্টা প্রথম তার সন্ধান পেয়েছিলো। কাছেই কোথায়ও কোয়া কোয়া নামে ঢাকের মতো একরকম বাজনাতে কেউ হাতের তালুর পেছনের ও সামনের অংশ দিয়ে সজোরে আঘাত করছিলো। সে বাজনার সতেজ ধ্বনি ও তালমাত্রাই আলাদা। খাঁটি আফ্রিকাবাসী ছাড়া ওরকম বাজাবার সাধ্য কারো হয় না।

কুণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্থির হয়ে গেলো। সাহেব ভেতরে ঢুকে গেলে ঘোড়ার রাশ আস্তাবলের ছেলেটির হাতে ছুঁড়ে দিয়ে তারা আধখানা পা নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পেছনের উঠোনে ছুটলো। আওয়াজ ক্রমশঃ, জোরদার হচ্ছিলো। ওয়ালার সাহেবরা ক্রীতদাসদের জন্যও থ্যাঙ্কস গিভিঙ উপলক্ষ্যে কিছু ফুর্তির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এক সারি আলোর নীচে কালোরা গোল হয়ে হাততালি দিয়ে নাচছিলো। তার মাঝখান থেকেই বাজনার শব্দ আসছিলো। কুণ্টা সকলের ক্রুদ্ধ আপত্তি অগ্রাহ্য করে সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। শীর্ণ, পক্ব কেশ একটি নিকষ কালো লোক মাটিতে বসে কোয়া কোয়া বাজাচ্ছিলো। এই আকস্মিক আলোড়নে লোকটি মুখ তুলে তাকালো। পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

করে এক মুহূর্ত কাল। তারপরেই লোকটি চারিদিকের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে লাফিয়ে উঠে কুণ্টাকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করলো।

আহ্‌সালাকিয়াম—সালাম!

মালাকিয়াম—সালাম!

এমন ভাবে কথাগুলো বেরিয়ে এলো যেন কেউ কোনকালে দেশ ছাড়া হয়নি। কুণ্টা লোকটির দু'কাঁধে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে ধরে ভালো করে তাকালো—

'আগে তো দেখিনি কখনো এখানে!'

'অন্য আবাদ থেকে সদ্য বিক্রী হয়ে এসেছি।'

'আমার মালিক তোমার মালিকের ছেলে। আমি তাঁর গাড়ী চালাই।'

চারপাশের কালোদের নাচ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বাজনার অভাবে তারা অধীর হয়ে উঠেছিলো। আফ্রিকার চালচলনের এমন অবাধ প্রকাশও তাদের পছন্দ হচ্ছিলো না। না, এদের চটানো উচিত হবে না। কে আবার মালিকের কাছে কী লাগাবে! কুণ্টা বললো—'আবার দেখা হবে।'

'সালাকিয়াম সালাম!' কোয়া কোয়া বাদক মাটিতে বসে পড়লো। কুণ্টা একটু অপ্রতিভ হয়ে, অতৃপ্ত নিরাশ মনে বেরিয়ে এলো।

তারপরের কয়েক সপ্তাহ কুণ্টার দিবারাত্রির ভাবনা সেই কোয়া কোয়া বাদক। সে কোন গোষ্ঠীর লোক? মানডিনকা তো নয়। গাম্বিয়াতে বা বড় নৌকোয় যে সব গোষ্ঠীর লোক সে দেখেছে—এ সেসব জাতের নয়। পাকা চুল দেখে বোঝা যাচ্ছিলো সে বয়সে অনেক বড়। কত বড়? অমোরোর মতো বয়স হবে? আচ্ছা, দেখা হওয়া মাত্র কী করে দু'জনেই বুঝতে পারলো তারা আল্লাহের বান্দা? লোকটি যেমন অনায়াসে এই বিজাতীয়দের ভাষা ও ইসলামের ভাষা বলছিলো তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিলো বহু বর্ষা সে এদেশে কাটিয়েছে। তাহলে এনফিল্ডে আসবার আগে সে কোথায় ছিলো? এই তিন বৎসর গাড়ী চালাতে চালাতে অনেক আফ্রিকাবাসীকেই সে দেখেছে। তার মাঝে মানডিনকার গোষ্ঠীর লোকও ছিলো। দাস নীলামের বাজারের পাশ দিয়ে কখনো সখনো তাকে গাড়ী চালাতে হয়েছে। কিন্তু ছ'মাস আগেকার ঘটনাটির পর পারতপক্ষে সে ও পথ মাড়াতো না। শৃঙ্খলবদ্ধ একটি জোলা উপজাতির অল্পবয়স্ক মেয়ে করুণ আর্তনাদ করছিলো। কুণ্টা তাকিয়ে দেখেছে মেয়েটি আতঙ্কিত বিস্ফারিত নয়নে তার মুখ চেয়েই কাতর আবেদন জানাচ্ছে। মুখে যন্ত্রণার চিৎকার। লজ্জায়, অসহায় তিক্ত

বেদনায় কুন্টা তীব্র কশাঘাতে ঘোড়া ছুটিয়েছে। ভয় হয়েছিলো—ঝাঁকুনি খেয়ে সাহেব না জানি বকুনী লাগান। কিন্তু তিনি কিছু বলেননি। আরো একদিন সাহেবের সাথে বাইরে গিয়ে আফ্রিকা থেকে সদ্য আগত এক ক্রীতদাসের দেখা হয়েছিলো। কিন্তু ভিন্ন উপজাতির বলে কেউ কারো ভাষা জানতো না। সে লোকটি তখনো সাদা মানুষের ভাষা শিখে ওঠেনি। এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে এই সাদা মানুষের দেশে কুড়ি বৎসর পর তার নিজের কথা প্রাণ খুলে বলার মতো একজন লোক জুটলো।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বসন্তকাল এসে গেলো। সাহেবের আর এনফিল্ডে নিজের বাবা মার কাছে যাবার সময়ই হলো না। একবার ভেবেছিলো সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে নিজেই সেখানে ঘুরে আসবে। কিন্তু কীসের থেকে কী কথা উঠবে, সাত পাঁচ ভেবে তার যাওয়া হয়নি। নিজের মনের অশান্তিতে মেজাজ ঠিক রাখতে পারছিলো না। বেলের ওপর কথায় কথায় বিরক্ত হয়ে উঠছিলো। তার একটা কারণ এই যে বেলকে সে মন খুলে সব কথা বলতে পারছিলো না। বেল এ দেশেই জন্মাবার ফলে সে আফ্রিকাবাসীদের নামই শুনতে চাইতো না। কুন্টার মনের অবস্থা বুড়ো মালী বা ফিডলারের পক্ষেও বুঝে ওঠা সম্ভব ছিলো না। অবশেষে এক রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সাহেবের এনফিল্ডে যাবার মর্জি হলো। কুন্টার সেখানে যাবার উৎসাহ দেখে বেল বিস্ময়ে হতবাক্।

এনফিল্ডের রাঁধুনী লিজা কুন্টাকে দেখে মহাখুশী। কুন্টা সম্পর্কে তার একটু দুর্বলতা ছিলো। হাতে দু'খানা স্যাণ্ডউইচ ধরিয়ে দিয়ে তার সাথে বসে একটু গল্পগুজব করবার বাসনা হলো। কুন্টা পালাতে পারলে বাঁচে! অবশেষে কোনক্রমে তাকে এড়িয়ে বাঞ্ছিত কুটিরটির দুয়ারে এসে ঘা দিলো।

'কে?' সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর!

'আহ্-সালাকিয়াম সালাম!'

দ্রুত দরজা খুলে গেলো। আফ্রিকাবাসীরা নিজেদের মনের আগ্রহ সহজে ব্যক্ত করে না। কারোরই ব্যবহারে অধীরতা প্রকাশ পেলো না। বয়স্ক লোকটি কুন্টাকে ঘরের একমাত্র চেয়ারটি এগিয়ে দিলো। কুন্টা তাদের দেশের মতো মাটিতে উবু হয়ে বসাই পছন্দ করে দেখে লোকটির কণ্ঠে সন্তোষসূচক আওয়াজ হলো। টেবিলে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে সেও একই ভঙ্গীতে মাটিতে বসে পড়লো।

'আমি ঘানা থেকে এসেছি। আকান গোষ্ঠীর লোক। সাদা মানুষেরা আমার

নাম দিয়েছে পম্পে। আমার সত্যিকারের নাম বটেঙ বেডিয়াকো। এ দেশে বহুদিন আছি। তোমার পরিচয় বল।'

কুণ্টা তারই মতো সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট ভাষায় নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করলো। গাম্বিয়ার কথা, জুফরের কথা, মানডিনকা গোষ্ঠী ও তার নিজের পরিবারের কথা জানালো। তার বন্দীত্বের ইতিহাস, পলায়নের চেষ্টা, অঙ্গহানি, মালীর কাজ ও পরে গাড়ী চালাবার কাজ সবই একে একে বললো।

ঘানাবাসী গভীর মনোযোগের সাথে সব শুনলো। খানিকক্ষণ নীরবে থেকে বললো—'আমরা সবাই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছি। এ দুঃখের দহন থেকে হয়তো বা আমাদের কিছু শিখবারও আছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো—'তোমার বয়স কত?'

'সাতত্রিশ বরষা।'

'আমার ছেষট্টি। তোমার জন্মের আগে থেকে আমি এদেশে আছি। এতদিনে যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, প্রথম থেকে তা থাকলে অনেক উপকার হতো। যাই হোক্, তোমার এখনো বয়স কম, শিখবার বয়স আছে। আমাদের দেশে বাচ্চারা তাদের ঠাকুরমার কাছ থেকে গল্প শোনে। আমিও তোমাকে বড় হওয়া সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান শোনাচ্ছি।

আমাদের আকান উপজাতির গোষ্ঠীপ্রধান একটি হাতির দাঁতের সিংহাসনে বসতেন। একজন সর্বক্ষণ তাঁর মাথায় ছাতা ধরে থাকতো। আর একজন লোক থাকতো, যার মাধ্যমে গোষ্ঠীপ্রধান অন্যদের সাথে কথা বলতেন। তিনি কাউকে কিছু বলতে চাইলে অথবা অন্য কেউ তার সাথে কথা বলতে চাইলে সেই লোকের মাধ্যমে বলতে হতো। গোষ্ঠীপ্রধানের পায়ের কাছে একটি ছেলে বসে থাকতো। ছেলেটি প্রধানের আত্মার প্রতীক। সে তাঁর বার্তা অপরের কাছে পৌঁছে দিতো। বার্তাবহন কালে তার সাথে একটি মোটা পাতের তলোয়ার থাকতো। এই তলোয়ার দেখেই লোকে তার পরিচয় পেতো। আমি ছিলাম সেই বার্তাবহ। সেই কাজেই আমি সাদা মানুষের হাতে ধরা পড়েছিলাম।

গোষ্ঠীপ্রধানের ছাতার ওপর আঁকা থাকতো একটি হাত। সে হাতে একটি ডিম ধরে রাখা। ক্ষমতা অমনি করে ভারসা— রক্ষা করে ধারণ করতে হয়—ছবিতে আঁকা প্রতীকের বক্তব্য তাই। আর যে লোকটির মাধ্যমে প্রধান কথা বলতেন তার হাতে থাকতো একটি দণ্ড। তাতে একটি কচ্ছপ খোদাই করা। কচ্ছপ হলো ধৈর্যের প্রতীক। কচ্ছপের গায়ে খোদাই করা একটি মৌমাছি।

কচ্ছপের শক্ত খোলসের ভেতর দিয়ে মৌমাছিও হুল ফোটাতে পারে না—এই হলো তার মর্মার্থ।'

কুটিরের ভেতরে মোমবাতির কম্পিত শিখা। ঘানাবাসী একটু থেমে বললো—'আমি তোমাকে এ শিক্ষাই দিতে চাই। সাদা মানুষের দেশেও এ শিক্ষাই আমি পেয়েছি। নিজেকে ঘিরে কঠিন বর্ম গড়ে তোলো। আর অসীম ধৈর্য ধর।'

কুণ্টার মনে হলো, আফ্রিকায় থাকলে এ মানুষ গোষ্ঠীপ্রধান না হলেও অন্ততঃ প্রধান শিক্ষক তো হতোই। সে নিজের মনোভাব কী বলে প্রকাশ করবে স্থির করতে না পেরে চুপ করেই থাকলো।

'মনে হচ্ছে তোমার দু'টোই আছে।' একটু হেসে লোকটি আবার বললো—'আমাদের দেশে মানডিনকা গোষ্ঠীর ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক বলে প্রসিদ্ধি আছে।'

এতক্ষণে কুণ্টা কথা খুঁজে পেলো। 'ঠিক কথা। আমার কাকারা পরিব্রাজক ছিলেন। তাঁদের কাছে কতদেশের গল্প শুনেছি। কত জায়গায় ওঁরা গিয়েছেন। আমি আমার বাবার সাথে একবার একটা নতুন গড়ে তোলা গ্রাম দেখতে অনেক দূর গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম টিমবাকুট, মালি আর মক্কা পরিভ্রমণে যাবো। তার আগেই সাদা মানুষের হাতে বন্দী হ'লাম।'

'এখানে আমার কথা বলবার লোক নেই। আমার মনের কথা আমি কোয়া কোয়া বাজনার ভেতর দিয়ে বলবার চেষ্টা করি। সেদিন তুমি সেখানে ছিলে জানা না থাকলেও মনে হচ্ছে বাজনার ভেতর দিয়ে তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

অভিভূত কুণ্টা বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘানাবাসীর দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণে টেবিলের ওপর রাখা লিজার দেওয়া স্যাণ্ডউইচ দু'টোর দিকে কুণ্টার দৃষ্টি গেলো। সে দিকে ইঙ্গিত করে মৃদু হাসলো। ঘানাবাসী বললো—'খাবার জন্য তাড়া কীসের? দেশে হলে এতক্ষণে কথা বলতে বলতে তোমাকে উপহার দেবার জন্য একটা কিছু খোদাই করে ফেলতে পারতাম।'

কুণ্টা আক্ষেপ জানালো—গাম্বিয়াতে সে শুকনো আমের আঁটির ওপর খোদাই করতে পারতো। তার কত সময় ইচ্ছা হয়েছে এখানে যদি দেশের মতো একটা আম গাছ থাকতো। একটা বীজ পেলে সে বপন করতো।

ঘানাবাসী গম্ভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। 'বীজ তোমার অনেক আছে। একটি স্ত্রী থাকলেই বপন করতে পারতে।'

এই অপ্রত্যাশিত স্থূল ইঙ্গিতে কুণ্টা অত্যন্ত বিড়ম্বিত বোধ করলো। ঘানাবাসী

হাত বাড়িয়ে দিলো। আফ্রিকাবাসীদের রীতি অনুযায়ী তারা বাঁ হাতে হস্ত মর্দন করলো। তার অর্থ—আবার শীঘ্র দেখা হবে।

'আহ্‌ সালাকিয়াম সালাম।'

'মালাইকা সালাম।'

সেদিন বাড়ী ফেরার পথে কুণ্টার সর্ব ইন্দ্রিয় কোথায় উধাও হয়েছিলো। হাতের লাগাম বা ঘোড়া ছুটবার শব্দ কিছুই অনুভব করতে পারছিলো না। যেন বহুকাল পর সে তার পিতা অমোরোর সাথে কথা বলে এলো। এমন সার্থক সন্ধ্যা তার জীবনে আর বুঝি আসেনি।

আটচল্লিশ

'টবিকে দেখেছো? তার হলো কি? সে যে আজকাল আমাদের চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না।' ফিডলার বুড়ো মালীকে জিজ্ঞেস করলো। বেলের কাছে ব্যাপার জানতে চাইলে সে বললো, 'কে জানে। অসুখ করলে বলবে তো অন্ততঃ! এমন অদ্ভুত ব্যবহার করছে যে ওর সাথে কথা বলা-ই ছেড়ে দিয়েছি।'

ওয়ালার সাহেব পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন. তাঁর নির্ভরযোগ্য মিতবাক গাড়ীর চালকটি যেন অন্য লোকে বিচরণ করছে। কোনও গুরুতর রোগের পূর্বলক্ষণ নয় তো? একবার তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—তার শরীর সুস্থ আছে কিনা। কুণ্টার ত্বরিত উত্তরে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর গাড়ী চালানো হলেই হলো। বেশী খবরে দরকার কী?

ঘানাবাসীর সাথে সাক্ষাতে কুণ্টার অন্তরের অন্তর্দেশ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলো। দিনে দিনে, বছরের পর বছরে সে নিজেকে কোথায় বিসর্জন দিচ্ছে? বেহালাবাদক, বুড়োমালী বা বেলের সাথে পরিচয়ে সে নতুন অনেক কিছু শিখেছে বটে, কিন্তু তাদের সাথে কুণ্টার জীবনের পটভূমিকা ও আচার-ব্যবহারে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাদের মতো একজন হয়ে ওঠা কুণ্টার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। ঘানাবাসীর তুলনায় তাদের কথাবার্তা, চালচলন সম্পূর্ণ বিস্বাদ, বর্ণহীন ও বিরক্তিজনক। তারা আজকাল কুণ্টার সঙ্গ পরিহার করছে, দূরে দূরে থাকছে—সে একরকম ভালোই হয়েছে। ছিঃ ছিঃ কুণ্টা কোথায় নেমে গিয়েছে? দিনান্তে আফ্রিকার কথা, গাম্বিয়ার কথা, জুফরের কথা, এই হীন পরাধীনতার কথা তার

একবারও মনে পড়ে না! যখন প্রতি পদে পদে অত্যাচার সহ্য করেছে আর নতজানু হয়ে আল্লাহের কাছে শক্তি ভিক্ষা করেছে—সে দিনগুলোই ভালো ছিলো। কারণ তখনো সে মনে প্রাণে আফ্রিকাবাসী ছিলো, মানুষ ছিলো।

সাদা মানুষের ভাষা শেখা-ই এই অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ। সেজন্যই মানডিকা ভাষার কথাগুলো আজকাল তার মনে জাগে না। হ্যাঁ, আজকাল সে চিন্তাও করছে সাদা মানুষের ভাষায়। তার চালচলনও হয়ে গিয়েছে এখানকার কালোদের মতো। শুধু একটা ব্যাপারে সে নিজেকে দৃঢ় রেখেছে। এই বিশ বৎসরের মধ্যেও অপবিত্র শূকর-মাংস স্পর্শ করেনি।

তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের আর কিছু কি অবশিষ্ট আছে? হ্যাঁ, আছে। তার প্রচণ্ড মর্যাদাবোধ। জুফরেতে অশুভ প্রভাব এড়াবার জন্য যেমন করে অতি সযত্নে কবচ ধারণ করে থাকতো, এখানে তেমনি করে সে তার মর্যাদাবোধকে প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছে। কুণ্টা সঙ্কল্প করলো এখন থেকে এই মর্যাদাবোধকে সে আরো বেশী করে কাজে লাগাবে। নিজেদেরকে যারা নিগ্রো বলে অভিহিত করে সেই তাদের, আর তার নিজের মাঝখানে এই উগ্র মর্যাদাবোধ একটা নিরেট ভারী রুদ্ধ দুয়ারের কাজ করবে। এরা কী অজ্ঞ! নিজেদের পূর্বপুরুষের পরিচয় পর্যন্ত জানে না! কুণ্টা নিজের মনে মনে পূর্বপুরুষের নাম স্মরণ করলো। সেই মালী অঞ্চলের প্রাচীন বংশ তালিকা থেকে শুরু করে বর্তমানে গাম্বিয়াতে তার ভাইদের নাম অবধি। তার কাফোর সবাই এ বংশ-তালিকা জানে।

কুণ্টা এবার বাল্যকালের বন্ধুদের কথা মনে করতে চেষ্টা করলো। সে বিস্মিত হলো, অবশেষে মনে নিদারুণ আঘাত পেলো—সহজে তাদের নাম স্মরণে এলো না! মুখগুলো অস্পষ্টভাবে কল্পনায় ভেসে এলো। গ্রামের বাইরে পরিব্রাজকদের পেছনে ছুটছে বা মাথার ওপর বাঁদরগুলোর দিকে লাঠি ছুঁড়ছে, পাল্লা দিয়ে কে কত তাড়াতাড়ি ছ'টা আম খেতে পারে—দেখাচ্ছে। এমনি আরো কত যে দৃশ্য ছায়াছবির মতো কল্পনায় চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো। কিন্তু নাম? বিভ্রান্ত কুণ্টার চারিপাশে তার কাফোর সহপাঠীরা যেন অবাক নয়নে ভ্রূকুটি করে দাঁড়ালো।

অবসর সময়ে নিজের কুটিরে অথবা মালিকের গাড়ী চালাবার সময়—দিবারাত্রি ভাবতে ভাবতে অবশেষে নামগুলি একটি একটি করে স্মরণে এলো। সিটাফা সিলা তো তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলো। তারপর—কালিলু কণ্টে। কিণ্টাঙ্গোর আদেশে সে টিয়াপাখীটা ধরেছিলো। সেফো কেলা—। ইত্যাদি। ধীরে ধীরে গ্রামবয়স্কদের মুখ

এবং ক্রমশঃ তাদের নাম মনে আসতে থাকলো। কিন্টাঙোর নাম ছিলো সিলা বা বিবা। ছোটবেলার মাষ্টারমশায়ের নাম কুজালি ডেম্বা। মনে পড়লো—কুণ্টা তার তৃতীয় কাফো উত্তীর্ণ হবার পরীক্ষায় এত ভালো কোরান পাঠ করেছিলো যে অমোরো ও বিণ্টা, ব্রিমা সিসে নামে তার আরাফাঙের শিক্ষকতায় খুশী হয়ে তাকে একটি মোটা খাসী উপহার দিয়েছিলো। একে একে বহু কাহিনী মনে পড়ে গিয়ে যেমন আনন্দ হলো, তেমনি গভীর বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। বয়স্করা নিশ্চয় এতদিনে বেঁচে নেই। তার সমবয়সী সেই অল্পবয়স্ক বালকেরা এখন তারই মতো পরিণত বয়স্ক। মা, বাবা? বহুদিন পর সে রাত্রে কুণ্টা হৃদয় উজাড় করে কাঁদলো।

কিছুদিন পর গুজব শোনা গেলো উত্তরের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসেরা একটা 'নিগ্রো ইউনিয়ন' করেছে। ক্রীতদাস ও স্বাধীন সব কৃষ্ণকায়দের একসাথে আফ্রিকায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কুণ্টা এ সম্ভাবনায় খুবই উত্তেজনা বোধ করলো, কিন্তু খবরটাতে সে সর্বাংশে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সাহেবদের ক্রীতদাস কেনায় তো কোন কমতি দেখা যাচ্ছিলো না, বরঞ্চ বাজারে ক্রীতদাসের দাম চড়ার দিকে। ভাবলো একবার বেহালাবাদককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখবে। তার কাছে সব সময়ই খাঁটি খবর পাওয়া যায়। কিন্তু দু'মাস যাবৎ সে তাদের তিনজনের সাথেই ভালো করে কথা বলেনি—তারা কি এখন কুণ্টাকে পাত্তা দেবে? কুণ্টার যে তাদের খুব পছন্দ তা নয়। কিন্তু তাদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে তার একাকীত্ববোধ আরো বাড়ছিলো। পরের অমাবস্যায় আবার একটি নুড়ি পাত্রে জমা হলো—আর অবর্ণনীয় হতাশায় মন অবসন্ন হয়ে গেলো। সে সম্পূর্ণ একা! পৃথিবীতে তার নিজের বলে কেউ নেই।

ঘানাবাসী যে বীজবপনের কথা বলেছিলো—কিছুদিন যাবৎ কুণ্টার মনে সে চিন্তাটাই ঘোরাফেরা করছিলো।

উনপঞ্চাশ

আসলে ঘানাবাসীর সাথে দেখা হবার আগে থেকেই একটা চিন্তা কুণ্টাকে পীড়ন করছিলো। জুফরেতে থাকলে এতদিনে তার স্ত্রী ও তিন চারটি সন্তান হয়ে যেতো। এখানেও ক্রীতদাসেরা নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করে একত্র বাস করে।

বিয়ে মানে এদের নিজেদের অদ্ভুত বিবাহপ্রথা অথবা মালিকদের প্রচলিত বিধর্মীয় প্রথা। কুণ্টার কোনটাই পছন্দ নয়। দ্বিতীয়তঃ মানডিনকাদের মাঝে কনের বয়স সাধারণতঃ চোদ্দ থেকে ষোলো এবং বরের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। এদের মাঝে চোদ্দ তো দূরের কথা, চব্বিশ বছরের মেয়েগুলো পর্যন্ত এত বোকার মতো হাসা-হাসি, ঢলাঢলি করে, আর রঙ মেখে সঙের মতো সাজে, দেখে মন বিরূপ হয়ে যায়।

কুড়ি থেকে বেশী বয়সের মেয়েরা বুদ্ধিমতী ও সুনিপুণা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহেব বাড়ীর রাঁধুনী। এর মাঝে একমাত্র পছন্দসই ছিলো এনফিল্ডের লিজা। সে একা থাকে এবং কুণ্টা সম্পর্কে তার যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় সে পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে নিজে থেকে কুণ্টা লিজাকে এ বিষয়ে কিছু জানাতে পারবে না। মরে গেলেও না।

তাছাড়া—যদি লিজার সাথে বিয়ে হয়ই। অনেক স্বামী স্ত্রীর মতো তাদেরকেও আলাদা আবাদে থাকতে হবে। শুধু সপ্তাহান্তের ছুটিতে মালিকের অনুমতি নিয়ে দেখাশোনা। সে বড় বিশ্রী। অবশ্য লিজার মালিক কুণ্টার মালিকের বাবা। কাজেই মালিকদের মাঝে রেষারেষি বা অন্যত্র বিক্রী করে দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তবুও—কীসে যেন আটকাচ্ছিলো। অবশেষে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সহসা তার মনে বিদ্যুত চমকের মতো একটা নাম খেলে গেলো।

বেল! সে কি পাগল হয়ে গেলো? বেলের বয়স মনে হয় চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে। কুণ্টা জোর করে বেলের কথা মন থেকে দূর করবার চেষ্টা করলো। বেল তাকে যত অপমানজনক ও বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে, মনে করতে লাগলো। আগে কুণ্টা যখন বড় বাড়ীর রান্নাঘরে বাগানের সবজি পৌঁছে দিতো, বেল ঠাস করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতো। কুণ্টা যখন বলেছিলো—বেল মানডিনকা গোষ্ঠীর মেয়ের মতো দেখতে, তখন তার কী রাগ! বেল বিধর্মী। তাছাড়া বড় তর্ক করবার আর সর্দারি করবার স্বভাব। কথাও বড় বেশী বলে।

কিন্তু কুণ্টা যখন মৃত্যুশয্যায়? তখন অবশ্য দিনে পাঁচ ছ'বার করে তার কাছে যাওয়া, তার সেবা করা, খাইয়ে দেওয়া এমন কি বিনা দ্বিধায় তার মলমূত্র পরিষ্কার করা অবধি সবই বেল হাসিমুখে করেছে। এসব কথাও ভোলা উচিত নয়। কুণ্টার বিরামহীন জ্বর বেলের তৈরী পাতা সেদ্ধর গরম পুলটিশেই সেরেছিলো। বেল স্বাস্থ্যবতী, সবলা। আর অতি চমৎকার রান্না করে।

যতই বেলকে বাঞ্ছনীয়া মনে হচ্ছিলো, তার প্রতি কুণ্টার ব্যবহার ততই রূঢ়তর

হচ্ছিলো। কোনও কাজে রান্নাঘরে যেতে হলে যেন বেরোতে পারলে বাঁচতো। এতে বেলের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছিলো। কুণ্টার অপস্য়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে বেলের মনোভাব দিন দিন শীতলতর হচ্ছিলো।

ফিডলারে সাথে নতুন করে আলাপ করতে গিয়ে অনেক কঠিন কথা শুনতে হয়েছিলো। তবুও কুণ্টা একদিন যেচে ফিডলার ও বুড়ো মালীর সাথে কথা শুরু করলো।

'এখানে আসবার আগে বেল কোথায় ছিলো ?' এ প্রশ্নে ওরা দুজনেই মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠলো। বুড়ো মালী বললো—

'সে তো বলতে পারবো না। বেল নিজের সম্পর্কে কিছুই বলে না। তোমার দু'বছর আগে সে এ আবাদে এসেছে—এটুকুই জানি।'

ফিডলারও ওটুকুই জানতো। কিন্তু দুজনের মুরুব্বী চালের মুখের ভাব দেখেই কুণ্টার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলো।

ফিডলার তার ডান কান চুলকে মন্তব্য করলো—'ওর কথা জিজ্ঞেস করে ভালোই করেছো। আমরা তো তাই বলাবলি করছিলাম। যে জন্য মন আকুলি বিকুলি করছে, সে প্রয়োজনটা তোমরা মিটিয়ে ফেললেই পার তো !'

ক্রুদ্ধ, স্তম্ভিত কুণ্টা কিছু বলতে পারার আগেই সে চকিত, ধূর্ত চাহনিতে আবার বললো—'তার গড়ন তো বেশ সুপুরুষ্টু।' কুণ্টাকে মুখ খুলতে না দিয়ে বুড়ো মালীও তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলো—'কতদিন নারী সংস্পর্শে আসনি ?'

কুণ্টার শাণিত দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ফিডলার মন্তব্য করলো—'কুড়ি বৎসর তো হবেই।'

বুড়ো মালী বলে উঠলো—হা ঈশ্বর ! শুকনো কাঠ বনে যাওয়ার আগে কিছু একটা কর।'

কুণ্টার আর সহ্য হলো না। লাফিয়ে উঠে সদর্পে পা ফেলে চলে গেলো।

পঞ্চাশ

গাড়ী চালাবার কাজ না থাকলে কুণ্টা সে সপ্তাহটা সকাল বিকাল দু'বেলা গাড়ী পালিশ করছিলো। সকলের চোখের সামনেই থাকা হয়। অথচ এমন ব্যস্ত, যে কারো সাথে কথা বলবার সময় নেই। ফিডলার বা বুড়ো মালীর ওপর রাগ তার পড়েনি।

কাজ করতে করতে অবশ্য বেলের কথাই ভাবতো। বেলের কোনও বিরক্তি-জনক ব্যবহার মনে পড়লে তার পালিশের হাত দ্রুত হয়ে উঠতো। আবার যখন তার সম্পর্কে মন দুর্বল হয়ে পড়তো, অতি সযত্নে, সোহাগের হাতে গাড়ীর সীট মুছতে থাকতো। কখনো বা একটা বিশেষ সুমিষ্ট স্মৃতিতে তার হাত থেমেই যেতো। বেলের যতই ত্রুটি থাকুক, কুণ্টার জন্য সে অনেক করেছে। কুণ্টাকে সাহেবের ড্রাইভার নিয়োগ করার ব্যাপারেও বেলের নেপথ্য ভূমিকা ছিলো। সারা আবাদে মালিকের ওপর বেলের মতো কর্তৃত্ব আর কারো নেই—এটা অবিসংবাদী সত্য। ছোট ছোট বহু ঘটনা মনে পড়ে যেতো। বাগানে মালীর কাজ করবার সময় কুণ্টার চোখের অসুখ করেছিলো। বেল লক্ষ্য করেছিলো—সে ঘন ঘন চোখ রগড়াচ্ছে। শীঘ্রই একদিন ভোরবেলা শিশির সমেত একটা বুনো পাতা এনে বেল বিনা আড়ম্বরে কুণ্টার চোখে বুলিয়ে দিয়েছিলো। তাতেই তার চোখের চুলকানি সারে।

কিন্তু বেলের পাইপে করে তামাক ফোঁকার ব্যাপারটা কুণ্টার একেবারেই পছন্দ নয়। সে কথা মনে পড়তেই তার পালিশের হাত অতি দ্রুত হয়ে উঠলো। তাছাড়া কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে বেলের নাচের ধরণটাও তার পছন্দ নয়। পেছনটা বড় বেশী দোলায়। বেলের পেছন নিয়ে কুণ্টার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বেলের নিজের তো একটু আত্মমর্যাদাজ্ঞান থাকবে! আর তার রসনা। সে তো জুফরের নিয়ো বটোর থেকেও ক্ষুরধার।

জুফরের বৃদ্ধদের কথা মনে পড়ে গেলো। কাঠের ওপর তারা কত সুন্দর সুন্দর খোদাই করতো। কত যত্ন সহকারে প্রথমে ঠিক কাঠটি বেছে নিতো। সহসা কুণ্টা যে কাঠের টুকরোটির ওপর বসে ছিলো—সেটি উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে লাগলো। লোহার টুকরো দিয়ে ঠুকে দেখলো—নিরেট ভালো কাঠ। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো—কেউ কোথায়ও নেই। তাড়াতাড়ি কাঠটি গড়িয়ে তার কুটিরে নিয়ে গেলো।

রাত্রে সাহেবকে নিয়ে ফিরে আসতে পথ যেন আর ফুরোচ্ছিলো না। সুস্থির মতো বসে খাবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না। খাবার নিয়ে সে নিজের ঘরে চলে এলো। খাবার ভুলে মোমবাতির কম্পমান শিখায় মাটিতে বসে কাঠের টুকরোটি গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলো। অমোরো বিণ্টার জন্য যে উদূখল ও নোড়া নিজের হাতে খোদাই করে দিয়েছিলো—কল্পনার চোখে সে তাই দেখছিলো।

কুণ্টা নিজের মনকে বোঝাচ্ছিলো—নেহাৎ অবসর সময়টা কাটাবার জন্যই সে কাজটা নিয়েছে। শস্য চূর্ণ করবার জন্য একটা উদূখল। কাজ শুরু করে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো—কুড়ি বর্ষার বেশী জুফরের খোদাই কাজে দক্ষ বৃদ্ধদের কাজ না দেখেও তার হাত বেশ নিপুণ ভাবে চলছিলো। উদূখলটির বাহির ভিতর ভালোভাবে খোদাই হয়ে গেলে সে আবার কাঠের সন্ধানে বেরোলো। তার হাতের মতো মোটা আর ঋজু একটি পাকা কাঠের খণ্ড যোগাড় হলে, সেটি দিয়ে নোড়া তৈরী হলো। উপরের অংশের পালিশের কাজটিতে বড় কুশল হাতের স্বাক্ষর থাকলো। দু'সপ্তাহের ওপর জিনিস দু'টি তার ঘরেই পড়ে রইলো। মাঝে মাঝে সে দিকে দৃষ্টি গিয়েছে। ভেবে দেখেছে সে জিনিস তার মায়ের ঘরেও বেমানান হতো না। এবার কী করবে? অবশেষে একদিন সকালে মালিকের কখন গাড়ী লাগবে জিজ্ঞেস করতে যাবার সময় কুণ্টা জিনিস দুটো হাতে তুলে নিলো। বেল তার দিকে শীতল, হ্রস্ব দৃষ্টিপাত করে জানালো—সে বেলায় সাহেবের কোথায়ও যাবার কথা নেই। সে পেছন ফিরতেই কুণ্টা সিঁড়ির ওপর জিনিস দুটো রেখে দ্রুত ফিরে চললো। সিঁড়িতে দুম করে শব্দ হতে বেল ফিরে তাকালো। কুণ্টা অন্যদিন থেকে অনেক দ্রুত চলেছে যেন! এবার তার দৃষ্টি সিঁড়ির ওপর পড়লো। কুণ্টা চোখের আড়ালে যেতে কাছে এসে জিনিস দুটো দেখে বেল হতবুদ্ধি। তুলে নিয়ে এসে কঠিন পরিশ্রমে তৈরী সূক্ষ্ম কারুকার্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দুই চক্ষু জলে ভরে গেলো।

ওয়ালার সাহেবের আবাদে তার জীবনের দীর্ঘ বাইশ বৎসরে এই প্রথম এক-জন পুরুষ তার জন্য নিজের হাতে কিছু তৈরী করে দিয়েছে। কুণ্টার প্রতি ইদানীং সে ভালো ব্যবহার করেনি। সে কথা মনে করে অনুতাপে তার মন ভরে গেলো। বেহালাবাদক ও বুড়ো মালীর ইঙ্গিতগুলির অর্থও পরিষ্কার হলো। তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো। কুণ্টার আফ্রিকাবাসীদের মতো অদ্ভুত চালচলন ও গোমড়া-মুখো নীরবতার অর্থ সে-ই বুঝতে পারেনি।

এখন কী করবে? দুপুরের পরে আবার সে এলে কী বলবে তাকে? কুণ্টাও তার বিজন ঘরে বসে বিমূঢ় চিত্তে একই কথা চিন্তা করছিলো। ভেতরে যেন দুটো সত্তা। একজন তার এই অপরিণত বুদ্ধির 'রিচয়ে লজ্জিত, অপদস্ত বোধ করছিলো। অপরজন আনন্দ ও উত্তেজনার তুঙ্গে। কী করে সে এ কাজ করতে পারলো? বেল কী ভাবছে? দুপুরের পরে আবার যখন ওখানে যেতে হবে, কী করে মুখ দেখাবে?

নির্ধারিত সময়ে কুণ্টা বহুকষ্টে নিজেকে টেনে নিয়ে চললো—যেন বধ্যভূমিতে যাচ্ছে। সিঁড়ির ওপর জিনিস দু'টো না দেখতে পেয়ে একই সাথে উৎফুল্ল ও অবসন্ন বোধ করলো। বেল যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে দরজা খুললো। কুণ্টার প্রশ্নের উত্তরে জানালো সাহেব কোথায়ও যাবেন না। আরো যা বলবে ভেবে-ছিলো, কিছুই তার মনে পড়লো না। কুণ্টা চলে যেতে উদ্যত হলে মরিয়া হয়ে জিনিস দুটোর দিকে ইঙ্গিত করে বললো—'এটা কী?'

কুণ্টার 'তখন ধরণী দ্বিধা হও' গোছের অবস্থা। অতি কষ্টে যেন প্রায় রুষ্ট কণ্ঠে বললো, 'তোমার শস্য কোটার জন্য।' স্তব্ধ বেলের দিকে তাকিয়ে সে দ্রুত প্রস্থান করলো। বেল মূর্খের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো।

পরের দু'সপ্তাহ দু'জনের মাঝে সাধারণ কথাবার্তার বাইরে আর কিছু হলো না। তারপর একদিন বেল নিজের হাতে শস্য কুটে একটি গোল কেকের মতো রুটি কুণ্টার হাতে তুলে দিলো। সদ্য তৈরী, গরম মাখনে ডোবানো, অতি সুস্বাদু খাদ্যটি নিজের ঘরে বসে কুণ্টা পরম তৃপ্তিভরে খেলো। গভীর আবেগে তার হৃদয় মথিত হয়ে উঠেছিলো। বিকালে বেলকে কী বলবে, বহুবার নিজের মনে আবৃত্তি করে নিলো।

'রাতে খাবার পরে তোমার সাথে একটু কথা আছে।'

'ঠিক আছে।'

কিন্তু কখন কোথায় দেখা হবে সেটা বলবার কথা দুজনেই ভুলে গেলো। কুণ্টা মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগলো—রাত্রে যেন সাহেবের কাছ থেকে জরুরী ডাক আসে। তাহ'লে আর যেতে হবে না। কিন্তু ডাক যখন এলো না, দেখা না করবার অজুহাত থাকলো না। হাতে ঘোড়ার রাসখানা নিয়ে সে বেলের ঘরের দিকে চললো। সহসা কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে সে যেন বোঝে কুণ্টা কাজেই যাচ্ছে। বেলের দরজায় অতি সন্তর্পণে করাঘাত করতেই দরজা খুলে গেলো।

একবার হাতের রাস আর একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেল নীরবে বাইরের পথ ধরলো। আকাশে আধখানা চাঁদ। তারই ম্লান আলোতে তারা নীরবে চলতে লাগলো। একটা আঙুরলতা জুতোয় জড়িয়ে কুণ্টা বেলের গায়ে পড়ে যাচ্ছিলো। বেল কি ভাবলো কুণ্টা ইচ্ছা করে এটা করেছে? লজ্জায় সঙ্কোচে তার মাথা কাটা যাচ্ছিলো। অবশেষে বেলই নীরবতা ভাঙলো। সবই অবশ্য তার মালিকের গল্প, তাঁর ছোট ভাই জন এবং বাচ্চা মেয়ে অ্যানের গল্প। তবুও সে যে কথা চালিয়ে যাচ্ছিলো তাতেই কুণ্টা কৃতজ্ঞ।

'এবার আমাদের ফিরতে হবে।' ফেরার পথেও বেল যখন বুঝতে পারলো কুণ্টা তার মনের কথা বলবে না, আবার সে আবোল তাবোল বকতে শুরু করলো। বেলের ঘরের সামনে এসে পুনরায় অস্বস্তিকর নীরবতা। অবশেষে কুণ্টা বললো—'আজ সত্যি দেরী হয়ে গিয়েছে। কাল আবার আসবো।'

সে চলে যেতে বেলের খেয়াল হলো—কুণ্টা যা বলতে এসেছিলো, তার কিছুই বলা হলো না।

এর পরেও রান্নাঘরে বেলই কথা বলে যেতো। কুণ্টা নীরব শ্রোতা। একদিন কথায় কথায় বেল বলে উঠলো—'সাহেবের মতো আমিও আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করবো না।'

চমকে উঠে কুণ্টার হাত থেকে কাঁটা চামচ পড়ে যাচ্ছিলো। বেলের আগে বিয়ে হয়েছে! সে কুমারী নয়!

দু'সপ্তাহের নীরবতার পর বেল তাকে এক রাতে নিজের ঘরে খাবার নেমতন্ন করলো। কুণ্টা স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এ কেমন প্রস্তাব! জীবনে সে কখনো মা বা ঠাকুরমা ছাড়া অন্য নারীর সাথে একা একঘরে থাকেনি। এ উচিত নয়। কিন্তু তার মুখে কথা যোগালো না।

স্নানের সময় সাবান আর কর্কশ কাপড়ের টুকরো দিয়ে নিজেকে সে অতি সযত্নে ঘষে পরিষ্কার করলো। একবার নয়, তিনবার। ভালো করে গা মুছে পোশাক পরবার সময় গুনগুন করে গানও ধরলো। 'তোমার দীর্ঘ গ্রীবাটি বড় সুন্দর।' বেলের গ্রীবা দীর্ঘ নয়। সে সুন্দরীও নয়। তবুও তার সঙ্গটি আনন্দদায়ক। সে জানতো—বেলও তার সঙ্গ পছন্দ করে।

বেলের কুটিরটি আবাদের অন্য সমস্ত কুটির থেকে বড় আর বড় বাড়ীর কাছাকাছি। সামনে ছোট ফুলবাগান। বড় বাড়ীর রান্নাঘরের মতই বেলের নিজস্ব ঘরটি ঝকঝকে পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। ঘরটিতে পা দিয়ে কুণ্টার বড় আরাম হলো। পরিপাটি করে সাজানো—সর্বত্র সুরুচির পরিচয়। কুণ্টা লক্ষ্য করলো বেলের দু'টি ঘর, তার নিজের মতো একটি নয়। দু'টি ঘর, দু'টি জানালা। জানালায় খড়খড়ি। প্রয়োজনমত বন্ধ করে বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা হাওয়া আটকানো যায়। পর্দাঢাকা পেছনের ঘরটিতে নিশ্চয় সে শোয়। বারবার তার দৃষ্টি ঘর দু'টির মাঝখানকার পরদাতে আটকে যাচ্ছিলো। সামনের ঘরের মাঝখানটিতে একটি লম্বাটে টেবিল। তার ওপর একটি পাত্রে ফুল। অপর একটি পাত্রে কাঁটা, চামচ। মাটির মোমবাতিদানে দু'টি মোমবাতি জ্বলছে। দু'পাশে দুটি বেতে ছাওয়া

চেয়ার। ফায়ার প্লেসের সামনে একটি দোলনা চেয়ার। বেল কুণ্টাকে সেটিতে বসতে অনুরোধ করলো। কুণ্টা অমন ধরণের চেয়ারে কখনো বসেনি। কিন্তু আনাড়িপনা দেখানো চলবে না। সাবধানেই বসলো।

'এত ব্যস্ত ছিলাম, আগুন জ্বালানো হয়নি।'—এতক্ষণে একটা কাজ করবার সুযোগ পেয়ে কুণ্টা লাফিয়ে উঠলো। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালালো। কুণ্টা যেমন ভালোবাসে, তেমনি করে মুরগী রাঁধা হয়েছিলো। সে অসীম পরিতৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেলো। বেলের অনুরোধের উত্তরে জানালো—আর পেটে কণামাত্র স্থান নেই, আর খেলে তার পেট ফেটে যাবে।

কিছুক্ষণ এটা সেটা কথাবার্তার পর কুণ্টা যাবার জন্য উঠে পড়লো। দরজার কাছে দু'জন দু'জনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্ষণেক থমকালো। কিন্তু কেউই কিছু বললো না। বেল দৃষ্টি ফেরালো। কুণ্টা নিজের ঘরের দিকে এগোলো।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে মনে হলো আফ্রিকা ছাড়ার পর এমন সুদিন আর আসেনি। কথাটা কিন্তু চাপা থাকলো না। সবাই বলাবলি করছিলো—বেলের রান্নাঘরে আজকাল কুণ্টার হাসিব আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কী ব্যাপার!

সপ্তাহে দু'দিন করে কুণ্টার বেলের ঘরে নেমন্তন্ন থাকছিলো। কুণ্টা আপত্তি করবে ভেবেও করে উঠতে পারেনি। বেল সর্বদাই কুণ্টার প্রিয় খাদ্যগুলি রান্না করতো। গাম্বিয়াতে যে সবজি জন্মায় বলে শুনেছিলো, চেষ্টা করে সেগুলোই সংগ্রহ করে আনতো।

ওদের কথাবার্তায় অন্য কোনও বিষয়ের আভাস মাত্র থাকতো না। কিন্তু কেউই তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছিলো না। বেলের গল্পের প্রিয় বিষয় ছিলো ওয়ালার সাহেব। তাঁর বিষয়ে বেলের আগ্রহ বা জ্ঞানের সীমা পরিসীমা ছিলো না।

'সাহেবের ব্যাঙ্কে বিশ্বাস নেই। টাকা ঘরে লুকিয়ে রাখেন। কোথায় রাখেন আমি ছাড়া কেউ জানে না।' তারপর—'নিগ্রোদের জন্য সাহেব অনেক কিছুই করেন। কিন্তু তা বলে কারো বেচাল সহ্য করবেন না। একদণ্ডে তাকে বিক্রী করে দেবেন।'

'দোআঁশলা মানুষ সাহেব তাঁর আবাদে রাখেন না। লক্ষ্য করে দেখো—এক বেহালাবাদক ছাড়া সবাই এখানে কালো নিগ্রো। উনি বলেন ক্রীতদাসীর গর্ভে অনেক সাদা মানুষের সন্তান জন্মাচ্ছে। এ ঠিক নয়। নিজেদের রক্তে যাদের জন্ম তাদেরকে নিয়ে বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে।' ইত্যাদি।

বেলের সব কথায় কুণ্টা শুধু সায় দিয়ে যেতো। বেশীর ভাগ সময় বেলের কথা তার এক কান দিয়ে ঢুকে অপর কান দিয়ে বেরোতো। তার মন পড়ে থাকতো বহু দূরের এক দেশে।

বেল যখন কুণ্টার তৈরী উদূখলে শস্য কুটে কেক তৈরী করে, কুণ্টা মানসচক্ষে দেখে—সে আফ্রিকা দেশের এক গ্রাম্য গৃহকর্ত্রী। কুণ্টার মায়ের মতো শস্য কুটে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করছে।

মাঝে মাঝে বেল বুড়ো মালী ও বেহালাবাদকের জন্যও বিশেষ কিছু সুখাদ্য তৈরী করে দিতো। কুণ্টা তা পৌঁছে দিতো। সে সময়টাতে তাদের সাথে কুণ্টার দেখাসাক্ষাৎ কমই হচ্ছিলো। কিন্তু ওরা তার কারণ জানতো বলে মনে কিছু করতো না। বরঞ্চ দীর্ঘ অদর্শনের পর দেখা হলে আড্ডার আনন্দটা জমতো বেশী।

কিন্তু আসল ব্যাপারটার কী করা যায়? বেলের সামনের দিকের ঘরটাতে একটা মস্ত বড় হলুদ চুলের যীশুর ছবি। বিধর্মীরা যে কথায় কথায় 'হে প্রভু।' বলে—এই যীশু তার কোন আত্মীয় বলে কুণ্টার ধারণা। বেলকে একবার জিজ্ঞেস করতে সে তির্যক উত্তর দিয়েছিলো। 'যাবার জায়গা তো মোটে দু'টো। হয় স্বর্গ, নয় নরক। কোথায় যাবে তা তোমার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।' ব্যস! আর কোন কথা নয়। কুণ্টা এর পরে আর কিছু বলতে পারেনি। ভেবে দেখেছে—ভুল পথে চালিত হলেও বেলের নিজের বিশ্বাস নিয়ে থাকবার অধিকার আছে। কুণ্টারও নিজের ধর্মের ওপর প্রগাঢ় আস্থা সকল অবস্থায় অটল। সে আল্লাহের বান্দা। তাঁর কৃপায় জন্মেছে। মৃত্যুর পর তাঁরই কাছে যাবে। কুণ্টার এ বিশ্বাস যুক্তির অতীত।

বেলের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার পর থেকে অবশ্য নিয়মিত প্রার্থনা করা হয়ে উঠছিলো না। কিন্তু সে ত্রুটি আল্লাহ নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন। এবার থেকে সে বিষয়ে কুণ্টা আরো সতর্ক হবে।

খৃষ্টান বিধর্মী হলেও নিজের ধর্মে যার দৃঢ় আস্থা, সে খারাপ লোক হতে পারে না। কুণ্টার মতো পরধর্মাবলম্বীর সাথে তো সে ভালো ব্যবহারই করছে। না, বেল তার জন্য অনেক করে। বেলের জন্য বি[illegible] কিছু একটা করে দেওয়া কুণ্টার খুবই উচিত। এর পরের বার জন সাহেবের বাড়ী থেকে মিস অ্যানকে নিয়ে আসবার সময় কুণ্টা পথের ধার থেকে ভালো জাতের শর গাছ তুলে আনলো। সূক্ষ্মভাবে সেগুলো চিরে নিলো। নরম ভুট্টার ভেতরের অংশটা তাতে জুড়ে নিয়ে বিনুনী

পাকিয়ে পাকিয়ে বেশ জটিল কারুকার্যের একটি মাদুর তৈরী করলো। মাঝখানটাতে বড় করে একটা মানডিনকা নক্সা। যেমনটি করবে ভেবেছিলো, জিনিসটা হয়ে দাঁড়ালো তার চেয়ে অনেক সুন্দর। তার পরের বার বেলের ঘরে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সেটি তাকে উপহার দিলো। বেলের বিমুগ্ধ দৃষ্টি মাদুরের ওপর থেকে কুণ্টার মুখের ওপর পড়লো।

'এর ওপর কাউকে কোনদিন পা দিতে দেবো না।'—মাদুরটি নিয়ে বেল তার ভেতরের ঘরটিতে অন্তর্হিত হলো। কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এলো। একটি হাত পেছনে। 'এটা তোমার জন্য বড়দিনের উপহার। অবশ্য পরে আরো কিছু দেবো।' বেলের হাতে অতি সূক্ষ্ম পশমের এক জোড়া মোজা। তার একটির পা অর্ধেকখানা। সামনের বাকী অংশটি নরম উলে ভর্তি। দুজনেই রুদ্ধবাক। রান্নার জায়গা থেকে রসনালুব্ধকর সুগন্ধ ও ভাজার শব্দ আসছিলো। কিন্তু আরো শক্তিশালী কোন আবেগ কুণ্টাকে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ করে তুলছিলো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেল সহসা এক ফুঁয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে কুণ্টার হাত ধরে সজোরে টানলো। কুণ্টা প্রবল স্রোতে ঝরা পাতার মতো ভেসে গেলো। পরদা-ঢাকা দরজা পেরিয়ে তারা ভেতরের ঘরে বিছানার ওপর আছড়ে পড়লো। কুণ্টার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেল হাত বাড়ালো। কুণ্টা উনচল্লিশ বছরের জীবনে এই প্রথম তার দু'বাহুর বন্ধনে একটি নারীদেহ খুঁজে পেলো।

শীঘ্রই বিবাহের সুখবর ক্রীতদাস বসতিতে ছড়িয়ে পড়লো। সাহেবও অনুমতি দিলেন। বড় দিনের আগের রবিবার দিনটা বেল কুণ্টার জন্য সাহেবের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিলো। সেদিন সকলের ছুটি। সবাই যতদূর সম্ভব সাজগোজ করে উপস্থিত। ওয়ালার সাহেব, মিস অ্যান, তার মা ও বাবাও এসেছিলেন। কুণ্টা সবচেয়ে খুশী হয়েছিলো সেই ঘানাবাসীর আগমনে। সে জানতো এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা—সে ব্যক্তি। বেলের বন্ধু আণ্ট সুকে বিবাহের প্রার্থনা পরিচালনা করেছিলো। 'সমবেত সকলে এই নবীন দম্পতির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। এরা যেন সুখী হয়, একত্র থাকতে পারে।' একটু থেমে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে আবার বললো—'প্রার্থনা করুন, এদের কাউকে যেন অন্যত্র বিক্রী না করা হয়, যেন কখনো এদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে হয় এবং এদের সন্তান যেন স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়।'

কুণ্টার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। তার মানসচক্ষে জুফরের বিবাহসভার দৃশ্যগুলি ভেসে আসছিলো। সেখানকার নর্তকের দল, গায়কের দল, প্রার্থনা,

ঢাকের শব্দের মাধ্যমে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিবাহের আনন্দবার্তা প্রেরণ—সবই সে দেখতে পাচ্ছিলো, শুনতে পাচ্ছিলো। আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করেন। এই বিধর্মীদের ঈশ্বরের কাছে এরা যাই বলুক, কুণ্টার একমাত্র উপাস্য আল্লাহ। সহসা যেন কত দূর থেকে তার কানে আণ্ট স্থকের প্রশ্ন ভেসে এলো—'তোমরা দু'জন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাও?' কুণ্টার পাশ থেকে বেল মৃদুকণ্ঠে বললো—'চাই।' আণ্ট স্থকে তার দৃষ্টি কুণ্টার দিকে ফিরিয়ে আবার প্রশ্ন করলো। সে দৃষ্টি তার গায়ে তীরের মতো বিঁধছিলো। বেল বাহুর কঠিন নিষ্পেষণে কুণ্টাকে ইঙ্গিত করছিলো। বহু কষ্টে সে উচ্চারণ করলো—'চাই।' 'তাহলে যীশুর নামে বিবাহের পবিত্র ভূমিতে ঝাঁপ দাও।'

তাদের সামনে একটি ঝাঁটা রাখা ছিলো। দুজনেই উঁচু হয়ে লাফিয়ে নির্বিঘ্নে সেটি পার হয়ে গেলো। বেল তার আগের দিন বার বার করে কুণ্টাকে এই লাফ দেওয়া শিখিয়েছে। কুণ্টার ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়েছিলো। কিন্তু বেল বলেছিলো—লাফাবার সময় কারো পা ঝাঁটায় ছুঁয়ে গেলে বড়ই অমঙ্গলজনক। তাছাড়া যার পা ছুঁয়ে যাবে—তারই প্রথম মৃত্যু হবে।

ঝাঁটা উল্লঙ্ঘনের পর সমবেত করতালি ও সহর্ষ অভিনন্দনের কোলাহল থামলে আণ্ট স্থকে বললো—'ঈশ্বর যাদের যুক্ত করেছেন, মানুষের সাধ্য নেই তাদের বিযুক্ত করে।' কুণ্টার চোখের ওপর দৃষ্টি ফেলে দৃঢ়স্বরে বললো—'খৃষ্টের স্থযোগ্য শিষ্য হও।'

এরপর ওয়ালার সাহেব এগিয়ে গিয়ে বললেন—'বেল এবং টবি দুজনেই ভালো লোক। আমি এবং আমার পরিবারের সবাই তাদের সৌভাগ্য কামনা করি।'

ক্রীতদাসেদের নিজেদের মতো করে আনন্দ করবার স্থযোগ দিয়ে সাহেব সপরিবারে বড় বাড়ীতে ফিরে গেলেন। মিস অ্যানের খুশীর চিৎকার ও লাফালাফির অন্ত ছিলো না।

একান্ন

বেলের পিঠে কশাঘাতের গভীর চিহ্ন দেখে কুণ্টা শিহরিত হয়েছিলো। বেল বলেছিলো—'এ চিহ্ন নিয়েই কবরে যাবো। কিন্তু তোমার পিঠের অবস্থা তো

আরো খারাপ।' কুণ্টা চমকে উঠেছিলো। কুড়ি বৎসর আগের সেই কঠিন কশা-ঘাতের স্মৃতি তার মনে তখন প্রায় বিলীন।

কুণ্টার দিনগুলো উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। বেলের মস্ত লম্বা বিছানায় নরম গদি। লেপগুলো কোমল ও আরামদায়ক। দেহের নীচে ও উপরে দুটি চাদর নিয়ে শোবার অভিজ্ঞতাও অভিনব। শার্টগুলো গায়ের মাপসই। রোজই ধোওয়া ও ইস্ত্রী করা হয়। সেই প্রথমটির মতো এক পায়ে অর্ধেক উল ভরা আরো অনেক জোড়া মোজাই তার জন্য তৈরী।

বছরের পর বছর রাত্রে সাহেবকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে নিজের একা ঘরে কুণ্টা ঠাণ্ডা খাবার খেয়েছে। এখন বাড়ীতে আগুনের ওপর সযত্নে রাখা গরম খাবার তার জন্য অপেক্ষা করে। বেলের নিজস্ব ঝকঝকে প্লেট ও কাঁটা চামচে খেয়ে তার খুবই তৃপ্তি হয়। বেল তার বাড়ীটি ভিতর বাইরে চুনকাম করেছে। না, না। শুধু বেলের নয়। কুণ্টা নিজেকে স্মরণ করালো এবার থেকে ওটা তাদের দুজনের বাড়ী। কুণ্টার বিস্ময়ের অন্ত নেই—এখন তো বেলের সব কিছুই তার ভালো লাগে। এতগুলো বছর তবে কেন সে অপচয় করেছে, কষ্টে থেকেছে? সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার হাতের অতি কাছেই তো সঞ্চিত ছিলো!

ঝাঁটা উল্লঙ্ঘনের পর থেকে এতদিনে তারা পরস্পরের অনেক কাছের মানুষ হয়েছে। তবুও কুণ্টার মাঝে মাঝে মনে হতো বেল তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। তার সাথে গল্প করতে করতে কী একটা কথা যেন বলি বলি করেও সহসা সে অন্য কথায় চলে যেতো। আত্মসম্মান বজায় রাখতে কুণ্টা অতিকষ্টে নিজের ক্রোধ গোপন করতো। বড় বাড়ীর দরজার চাবির ফুটোতে কান পেতে বা চোখ রেখে সাহেবের যেসব গোপন খবর বেল সংগ্রহ করে আনতো, তা সে সরাসরি নিজের স্বামীকে জানাতো না! ফিডলার বা বুড়ো মালীর মাধ্যমে কুণ্টাকে জানতে হতো। অথচ কুণ্টা শহর থেকে ফিরে এসে নতুন সব খবরই সরল মনে ওদের তিনজনকে জানিয়েছে। তারপর থেকে কুণ্টাও সপ্তাহের পর সপ্তাহ বেলকে বাইরের খবর বলেনি। তাতে কাজ হলো। রবিবার রাত্রের বিশেষ খাওয়া-দাওয়াটির পর একদিন বেল কুণ্টার কাঁধে হাত রেখে ধীরস্বরে বললো—'তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি।' শোবার ঘর থেকে ভার্জিনিয়া গেজেটটি এনে একটু ইতস্তত করে বললো—'আমি পড়তে জানি। মালিক জানলেই বিক্রী করে দেবেন বলে কথাটা গোপন রেখেছি। ছোটবেলায় আমার মালিকের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেই শিখেছি। তারা মাস্টারমশাই সেজে আমাকে শেখাতো। সাহেব মেমসাহেব ব্যাপারটাকে কোন

গুরুত্ব দিতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল—নিগ্রোদের মাথা নিরেট। তাদের শেখালেও শিখবে না—মাথায় কিছু ঢুকবে না।

কুণ্টার মনে পড়লো স্পটসিলভেনিয়ার শহরের কোর্টে সে এক বৃদ্ধ ঝাড়ুদারকে দেখেছে। দিনের শেষে ফেলে দেওয়া কাগজগুলো দেখে বৃদ্ধ হাতের লেখা মক্শ করতো। নকল করায় তার হাত কত পাকা হয়েছিলো, সাদা মানুষদের কল্পনার অতীত ছিলো। আবাদের বাইরে যাবার অনুমতিপত্র নকল করে আর সই জাল করে সে কালোদের কাছে বিক্রী করতো।

বেল তার আঙুল কাগজের একটা লেখার ওপর বুলিয়ে বললো—'এই যে, এখানে লিখেছে ইংল্যাণ্ড কিছু নিগ্রোকে আফ্রিকায় ফেরৎ পাঠিয়েছে। সিয়েরা লিওন নামে একটা জায়গা ইংল্যাণ্ড ওখানকার রাজার কাছ থেকে কিনেছিলো। সেখানে প্রায় চারশো নিগ্রোকে পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেককে কিছু জমি আর টাকাও দেওয়া হয়েছে।'

কুণ্টা জিজ্ঞেস করলো—'সাহেবের কাগজ নিয়ে এসে পড়ছো। বিপদ হবে না তো?'

'না, আমি খুব সাবধানে থাকি। একবার ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বসার ঘরে ধুলো ঝাড়বার সময় একটা বই দেখছিলাম। হঠাৎ সাহেব এসে হাজির। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছিলাম। সাহেব একমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কিছু বলেননি অবশ্য। কিন্তু সেদিন থেকেই বইয়ের আলমারী চাবি আটকানো।'

বেল কাগজটা বিছানার নীচে রেখে দিলো। খানিকক্ষণ নীরব। কুণ্টা তার মুখ দেখে বুঝতে পারছিলো—আরো কিছু বলবার আছে। শুতে যাবার উদ্যোগ করছে—হঠাৎ বেল টেবিলের পাশে বসে গেলো। মুখে কিছু একটা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। একটা গোপন গর্বের ভাবও ফুটে উঠলো। অ্যাপরনের পকেট থেকে একটা কাগজ ও পেন্সিল বেরোলো। কাগজটা হাত দিয়ে সোজা করে নিয়ে খুব মন দিয়ে একটা একটা করে অক্ষর লিখতে শুরু করলো। 'এটা কী জান? আমার নাম। বি-ই-এল-এল। এটা তোমার নাম। কে-ইউ-এন-টি-এ।'

কুণ্টা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। সাদা মানুষের লেখা থেকে সে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করছে। তার মনে হ ়া ঐ লেখার ভেতরেও সর্বনাশা কোন বিপদ লুকোনো আছে। কিন্তু সেদিন অজান্তেই সে কাছে সরে গিয়ে ঐ অদ্ভুত দাগগুলো ঝুঁকে দেখলো। বেল একমুখ হাসি নিয়ে তার দিকে তাকালো।

তার পরেই কাগজটা গোল করে পাকিয়ে আগুনে ছুঁড়ে দিলো। 'এই লেখা ধরা পড়লে খুব বিপদ হবে।'

কয়েক সপ্তাহ ধরেই একটা বিরক্তি কুন্টার মনের ভেতরে বেড়ে উঠছিলো। বেল সেদিন মহাগর্বভরে, সে কেমন লিখতে পড়তে জানে—তাই দেখছিলো। সাদা মানুষদের মতই আবাদে জন্মালে কালোরাও ভাবে আফ্রিকা থেকে যারা আসে তারা বুঝি অজমূর্খ। সদ্য গাছ থেকে নেমে এসেছে। লেখাপড়ার ধার ধারে না।

একদিন রাত্রে খাবার পর যেন অনেকটা আপন মনেই কুন্টা ফায়ারপ্লেসের ছাই টেনে নিয়ে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে নিলো। তারপর একটা কাঠি দিয়ে তার ওপর আরবী অক্ষরে নিজের নাম লিখলো। বেল অবাক হয়ে দেখছিলো। অপার বিস্ময়ে তার মানে জিজ্ঞেস করলো। কুন্টা বললো। তারপর হাত দিয়ে লেখাটা মুছে দিয়ে দোলনা চেয়ারে এসে বসলো। কী ভাবে লেখাপড়া শিখলো—এ প্রশ্নের উত্তরে তার পূর্ব ইতিহাস সব এতদিনে উজার করে দিলো। সেদিন পালাবদলের দিন। রোজ বেল কথা বলে। কুন্টা নীরব শ্রোতা। এখন কুন্টা বলছে। নিস্তব্ধ বেল শুনছে। কেমন করে তাদের গ্রামের শিশুরা লেখাপড়া শেখে, তাদের শুকনো শর-কাঠির কলম, রান্নার কালির গুঁড়োর সাথে জল মিশিয়ে লেখার কালি, সকালে বিকালে আরাফাঙের কাছে পড়া। বেল বাক্যহারা। এই নতুন অভিজ্ঞতা কুন্টাকে আরো অনেক কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করলো। স্নাতক হবার আগে জুফরের ছেলেদের কোরান পাঠ শিখতে হতো। কুন্টা কোরান আবৃত্তি করে শোনালো। বেলকে আফ্রিকা সম্পর্কে এতটা আগ্রহী দেখে কুন্টা বিস্ময় বোধ করছিলো।

বেল টেবিলটা আঙুল দিয়ে ঠুকে বললো—'আফ্রিকাতে একে কী বলে?'

এতদিন পরেও কুন্টার বলতে একমুহূর্ত দেরী হলো না। 'মেসো।'

বেল চেয়ারের দিকে হাত দেখালো।—

'সিরাঙো।'

কুন্টার মাতৃভাষা বলতে এত ভালো লাগছিলো, সে নিজেই উঠে পড়ে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে নাম বলছিলো। ফায়ারপ্লেসের ওপর কেটলী—কালেরো। টেবিলের ওপর মোমবাতি—কাণ্ডিয়ো। ক্যানভাসের বস্তা জুতো দিয়ে ঠেলে—বটো। একটা শুকনো লাউয়ের খোলার দিকে—মিরাঙো। বুড়ো মালীর বোনা একটা বাস্কেট—সিনসিঙো। বেলকে সে এবার শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। বিছানার দিকে দেখিয়ে বললো—লারাঙো, বালিশ—কুঙলারাঙ। তারপর জানালার দিকে তাকালো—জানিরিঙো। আর ছাদ—কানকারাঙো।

বিছানার ওপর বসে কুণ্টা বললো—এবার কুণ্ডলারাঙে মাথা রাখবার সময় হয়েছে। বেল ভ্রু কুঁচকে মনে করবার চেষ্টা করলো। তারপর হেসে কুণ্টাকে জড়িয়ে ধরলো। বহু বছরের মধ্যে কুণ্টা এত আনন্দ পায়নি।

বাহান্ন

ফিডলার আর বুড়ো মালীর কুণ্টার মতো বাইরে যাবার বা ঘুরে বেড়াবার সুযোগ হতো না। তা সত্ত্বেও ক্রীতদাসেদের সম্পর্কে এত খবর রাখতো কী করে—কুণ্টার বিস্ময় জাগতো।

'আফ্রিকা থেকে জাহাজভর্তি নিগ্রো এদেশে নিয়ে আসবার পথে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নামায়। পথে আসতে আসতে অত্যাচারে আর অনাহারে নিগ্রোগুলোর মরার মতো চেহারা হয়। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খাইয়ে দাইয়ে একটু মোটা করে আনে। নইলে বাজারে দাম উঠবে কী করে?'—ফিডলারের সংবাদ।

কিন্তু কুণ্টা যতই কম খবর রাখুক, তার সবচেয়ে দুঃখ হতো এই ভেবে যে সাধারণ গড়পড়তা ক্রীতদাসেরা তার থেকেও কম খবর রাখে—এবং খবর রাখবার আগ্রহ পর্যন্ত তাদের নেই। তাদের পরিচয় কী বা তারা কোথায় আছে—সেটুকুও জানে না। বেলের সাথে আলোচনা হতে সে বললো—'মালিকেরা তো তাই চান। এরা বেশী কিছু জানলেই দল পাকাবে বা বিদ্রোহ করবে—এই ভয়েই এদেরকে অজ্ঞমূর্খ রাখা হয়।'

কুণ্টা বিস্মিত হয়ে ভাবলো—বেল এতও ভেবে দেখেছে! তাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বেল সহসা প্রশ্ন করলো—'সুযোগ পেলে তুমি আবার পালাবে?'

হতবুদ্ধি কুণ্টা দীর্ঘকাল উত্তর দিতে পারলো না। অবশেষে বিভ্রান্ত মনে বললো—'বহুদিন সে কথা ভেবে দেখিনি।'

'লোকে জানে না, আমি কিন্তু সে কথা বহুদিন, বহুভাবে ভেবেছি। উত্তরের দেশে গিয়ে যারা মুক্তি পেয়েছে, সে ভাবে মুক্তি পেতে আমারও ইচ্ছা করে। মালিক যতই ভালো লোক হ'ন, স্বাধীনতা আলাদা জিনিস। যদি আমাদের বয়স আরো কম হতো তবে আজ রাতেই পালাতাম। বোধ হয় বুড়ো হয়ে গিয়েছি। তাই সাহস পাই না।'

বেলের মুখের এ কথা কুণ্টাকে শারীরিক প্রহারের মতো আঘাত করলো। সেও তো ঠিক এ কথাই ভাবছিলো। বুড়ো হয়ে গিয়েছে। তাই আবার সেই

অত্যাচারের কথা চিন্তা করলে ভয় হয়। পলায়নের সেই ভয়ঙ্কর দিনরাত্রিগুলি, ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণাবিদ্ধ পা, রক্তাক্ত হাত, কাঁটা গাছের জ্বালা, অপরিসীম ক্লান্তি, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, অনুসরণকারীদের ক্রুদ্ধ শাসানি, বন্দুকের গুলি, নির্মম কশাঘাত আর উদ্যত কুঠার······ ! সহসা কুণ্টা গভীর বিষাদে মুহ্যমান হলো। বেল জানে—তার কথাতেই সেই মর্মভেদী সহনাতীত কষ্টের স্মৃতি জেগে উঠেছে। কিন্তু সে এও জানে কোন সান্ত্বনাবাক্যেই তার উপশম হবে না। বিনা বাক্যব্যয়ে সে উঠে গেলো।

বেল চলে যেতে কুণ্টার সম্বিত ফিরে এলো। বেলকে এবং অন্যান্য কালোদের সে অত্যন্ত ভুল বুঝেছে। তারা মুখে প্রকাশ করে না। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে দাসত্বের যন্ত্রণা তাদের অতি তীব্র। অত্যাচারী সাদা মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রচণ্ড। বেলের কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করলো। বেলের হৃদয়ের ক্রীতদাসীত্বের গ্লানি সে বুঝতে পেরেছে। কুণ্টাকে যে সে ভালোবেসেছে সেজন্য কুণ্টা কৃতজ্ঞ। দুঃখের ভিতর দিয়ে তাদের প্রাণের বন্ধন যত দৃঢ়, পরস্পরের বোঝাপড়া যত প্রগাঢ় হয়ে উঠছে, ততই কুণ্টার কৃতজ্ঞতা গভীরতর হচ্ছে। নিঃশব্দে সে শোবার ঘরে উঠে গেলো। হতাশার আকুলতায় তাদের মিলনের তাড়না উগ্র হয়ে উঠলো।

তিপ্পান্ন

কিছুদিন যাবৎ বেলের আচরণ কেমন রহস্যজনক হয়ে উঠেছিলো। মেজাজ ভালোই অথচ মুখে কথা ছিলো না। দোলনা চেয়ারে দুলতে দুলতে নিজের মনেই হাসতো। গুনগুন করে গানও করতো। কুণ্টার দিকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত কটাক্ষ-পাত করছিলো। অবশেষে এক রাতে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে বেল কুণ্টার হাত টেনে এনে নিজের পেটের ওপর রাখলো। হাতের নিচে একটা নড়াচড়া অনুভব করে কুণ্টা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

পরের কয়েক সপ্তাহ কুণ্টা আর নিজের মধ্যে ছিলো না। কার্যতঃ সে সাহেবের গাড়ী চালাচ্ছিলো বটে, কিন্তু মনে মনে বহুদূরে জুফরেতে চলে গিয়েছিলো। সে যেন দেখছিলো পিঠে ছোট বাচ্চা বেঁধে বেল নদী পার হয়ে ধানের ক্ষেতে যাচ্ছে। প্রথম সন্তানের জন্মকালে যে হাজারো রকমের নিয়মকানুন থাকে, যা বিণ্টা ও অমোরো তার জন্মকালে পালন করেছিলো তার গুরুত্ব যেন সে দিবারাত্র অনুভব

করছিলো। সে শপথ করলো—পুত্রসন্তান হলে তাকে সে প্রকৃত মানুষ হতে শেখাবে—জুফরেতে থাকলে যে ভাবে করা হতো। এই সাদা মানুষের দেশে যদি তা নিয়ে বিপদেও পড়তে হয়, সে গ্রাহ্য করবে না। পুত্রসন্তানের কাছে পিতাকে বিরাট মহীরুহ হয়ে দাঁড়াতে হয়। কন্যাসন্তানকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করে যথাসময়ে বিবাহ দিতে পারলেই কর্তব্য সমাপন হয়। তাকে গৃহকর্ম ও নানা কর্তব্য শেখাবার দায়িত্ব মায়ের। পুত্রসন্তান বংশের সুনাম ও সুখ্যাতি বহন করে। পিতামাতা অথর্ব হয়ে পড়লে তাদের দেখাশোনার ভার সুপুত্রের উপর বর্তায়।

বেলের সন্তান সম্ভাবনা ঘানাবাসীর সাথে সাক্ষাৎকার থেকেও বেশী করে কুণ্টার মনকে আফ্রিকার জন্য ব্যাকুল করে তুলেছিলো। একদিন ধৈর্যসহকারে বসে বসে তার জমানো প্রস্তরখণ্ডগুলো গুনে দেখলো। সাড়ে বাইশে বর্ষা সে স্বদেশ দেখেনি! সে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। আজকাল সন্ধ্যাবেলা বেল যখন কথা বলতে থাকে—কুণ্টা কোন শূন্যলোকে তাকিয়ে কী যে চিন্তা করতে থাকে বুঝে ওঠা ভার। 'আবার তার আফ্রিকায়ানা শুরু হয়েছে!' মনে মনে গজর গজর করে বেল একাই শুতে চলে যেতো। এমনি এক রাতে শোবার ঘর থেকে বেলের কাতরোক্তি শুনে কুণ্টা দৌড়ে গেলো। কী হলো? সময় হয়ে গেলো কি? কিন্তু বেল ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই আর্তনাদ করছিলো। কুণ্টা নীচু হয়ে তাকে স্পর্শ করতে বেল ঘুম ভেঙে তীরবেগে উঠে বসলো। সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। যেন সাদা মানুষদের এক ফুর্তির খেলায় তার মালিকের আবাদে জন্মানো পরবর্তী কালো শিশুটিকে বাজীতে প্রথম পুরস্কার বলে ধরা হয়েছে। বেল ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেছিলো—কিছুতেই সে প্রবোধ মানবে না। অবশেষে কুণ্টা কখনো যা করেনি তাই করলো। ওয়ালার সাহেবের প্রশংসা করে বললো—তাঁর মতো ভালো লোক কখনো অমন কাজ করবেন না। ক্রমে বেল শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু কুণ্টার চোখে আর ঘুম এলো না। হ্যাঁ, ওরকম ঘটনার কথা সে শুনেছে। অজাত শিশু উপহার হিসাবে দিয়ে দেওয়া হয়। তাস খেলায় বা মোরগের লড়াইয়ে বাজী হিসাবে ধরা হয়। বেহালাবাদক তাকে বলেছে—মেরী নামে একটি পনেরো বছরের সন্তানসম্ভবা ক্রীতদাসীর মালিক মৃত্যুকালে উইল করে গিয়েছিলেন, মেরীর প্রথম পাঁচটি সন্তান সাহেবের পাঁচ মেয়ে পাবে। কুণ্টা শুনেছে ধারের বন্ধক হিসাবে সন্তানসম্ভবা ক্রীতদাসীর অজাত শিশুকে ধরা হয়। অজাত শিশুকে বিক্রী করে ধার শোধ করা যায়। স্পটসিলভেনিয়াতে নীলামের বাজারে ছ'মাসের স্বাস্থ্যবান শিশুর দাম দু'শ ডলার।

মাস তিনেক পরে একদিন বেল হাসতে হাসতে গল্প করছিলো—'মিসি অ্যান জিজ্ঞেস করেছিলো আমার পেটটা এত বড় হয়েছে কেন। আমি বলেছি—সোনা-মণি, পেটের ভেতরের আভেনে আমি যে একটা ছোট্ট বিস্কিট বানাচ্ছি।'

শুনে কুণ্টার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিলো। বেল যে এই আহ্লাদী মেয়েটাকে নিয়ে এত আধিক্যেতা করে কেন কুণ্টা বুঝে উঠতে পারে না। কুণ্টা আর বেলের সন্তান সাদা মানুষের বাচ্চাগুলোর সাথে খেলে বেড়াবে, তারাই আবার এদের মালিক হবে,—হয়তো বা এদের সন্তানের পিতাও হবে—এসব চিন্তা কুণ্টার কাছে অসহ্য! অনেক আবাদেই কুণ্টা দেখেছে কালো মায়েদের সন্তান সাহেবদের বাচ্চার মতোই ফর্সা। কারণ তাদের পিতা একই। বেলের এ ধরণের কিছু হ'বার আগে সে মালিককে খুন করে ফেলবে। অনেক কালোরাই নিজের স্ত্রীর ফর্সা বাচ্চাকে নির্বি-কার চিত্তে কোলে নেয়, কারণ তারা জানে এ বিষয়ে টু শব্দটি করলেই ঘোরতর বিপদ ঘটবে।

নীলামে কালোদের গর্ভজাত ফর্সা মেয়েদের দাম ওঠে বেশী। তাদের কীভাবে ব্যবহার করা হয়, কেন দাম বেশী—তার কারণও কুণ্টা শুনেছে। আর ফর্সা ছেলে-দের রহস্যজনক ভাবে সরিয়ে ফেলা হয়। সম্ভবতঃ মেরেই ফেলা হয়। সাহেবদের ভয়—কালো মায়ের ফর্সা ছেলেদের বড় হলে হয়তো কালো বলে চেনা যাবে না। তারা অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে মিথ্যা পরিচয়ে যদি সাদা মেয়ের সাথে মিলিত হয় তবে সাদা মানুষের রক্ত দূষিত হয়ে যাবে। আল্লাহকে ধন্যবাদ—তাঁর আর যা অভি-প্রায়ই থাকুক—কুণ্টা অন্ততঃ একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে তাদের সন্তানটি অবিমিশ্র কালো।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বেলের প্রসবযন্ত্রণা শুরু হলো। কুণ্টার হাত চেপে ধরে নিঃশব্দে সে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগলো।

এরই মাঝে এক ফাঁকে বেল কুণ্টাকে বললো—'আগেই বলা উচিত ছিলো তোমাকে। এর আগে আমার দু'টি সন্তান জন্মেছিলো। এখানে আসবার আগে। তখন আমার ষোলো বছরও পূর্ণ হয়নি।' স্তম্ভিত কুণ্টা বেলের বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এ কী অচিন্তনীয় সংবাদ। আগে জানলে—না, তা নয়। আগে জানলেও সে বেলকেই বিয়ে করতো। কিন্তু তা বলে তাকে আগে না জানানোটা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা। বেল কাঁদতে কাঁদতে বললো—'দু'টিই মেয়ে। শিশুকালেই তাদের বিক্রী করে দিয়েছে। একটি মাত্র হাঁটতে শিখছিলো।

ছোটটির এক বৎসরও হয়নি।' বেল কথা বলতে পারছিলো না। আবার যন্ত্রণার ঢেউ এলে সজোরে কুণ্টার হাত চেপে ধরলো।

ব্যথা কমলে চোখের জলে ভেসে কুণ্টাকে বললো—'না। সে বাচ্চাদের বাবা কোনও সাদা মানুষ নয় গো। আমারই বয়সী আর একটি নিগ্রো।'

এবার ব্যথার ঢেউ আগের চেয়ে ঘন ঘন। বেলের নখ কুণ্টার হাতে প্রায় বিঁধে যাচ্ছিলো। বিস্ফারিত মুখগহ্বরে শব্দহীন চিৎকার। সিস্টার ম্যানডিকে বলা ছিলো। কুণ্টা ছুটে গিয়ে তাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এলো। ওয়ালার সাহেবের বাড়ীতে গিয়েও করাঘাত করলো। সাহেব এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন—'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।'

সিস্টার ম্যানডির নির্দেশে কুণ্টা বাইরে বসে রইলো। দূরে বহুদূরে তার স্বদেশ জুফরেতে বিণ্টা ও অমোরো ঠাকুরমা ঠাকুরদা হতে চলেছে। কিন্তু তারা সে খবর জানতে পারবে না, কোনদিন দেখতেও পাবে না। এ চিন্তা কুণ্টাকে বেদনায় বিহ্বল করে তুললো।

একটা নতুন কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো। কুণ্টা সচকিত হয়ে লাফিয়ে উঠলো। একটু পরেই ওয়ালার সাহেব বেরিয়ে এলেন। ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন—'বেলের খুব কষ্টকর সময় গিয়েছে। তেতাল্লিশ বছর বয়সে বাচ্চা হওয়া তো সহজ নয়। যাই হোক কয়েকদিনে সুস্থ হয়ে উঠবে। সিস্টার ম্যানডির কাজ হয়ে গেলে ভেতরে গিয়ে মেয়ে দেখে এসো।'

মেয়ে! হতাশ কুণ্টা বহুকষ্টে নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছিলো, এমন সময় সিস্টার ম্যানডি হাসিমুখে এসে তাকে ডাকলো। বেল তাকে দেখে অবসন্ন ভাবে হাসলো। কুণ্টা অন্যমনস্ক ভাবে তার হাতে আলতো ভাবে চাপ দিলো। তার দৃষ্টি পাশে রাখা শিশুটির দিকে। হ্যাঁ। মুখের গঠনে অবিসংবাদী ভাবে মানডিনকা গোষ্ঠীর ছাপ। আল্লাহের ইচ্ছায় শিশুটি মেয়ে। কিন্তু তবুও সে তো তারই সন্তান। কুণ্টার মন শান্তি ও গর্বে ভরে গেলো। কিণ্টে বংশের রক্তধারা অমিতশক্তি নদীস্রোতের ন্যায় শতাব্দী পার হয়ে আরো এক প্রজন্ম এগিয়ে গেলো।

শিশুটির একটি উপযুক্ত নামকরণ দরকার। আফ্রিকাতে এই উপলক্ষ্যে সন্তানের পিতা আটদিনের ছুটি পেতে পারতো। এখানে সে রকম আশা করাই বাতুলতা। তবুও তাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। সে জানে, শিশুটি ভবিষ্যতে কেমন মানুষ হবে তা এই নামকরণের ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

অকস্মাৎ বিদ্যুতচমকের মতো মনে পড়ে গেলো, সে শিশুটির যে নামই দিক, তার পদবী হবে ওয়ালার সাহেবের নামে। চিন্তাটা তার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিলো। সে প্রতিজ্ঞা করলো, শিশুটি বড় হয়ে তার যথার্থ বংশপরিচয় যাতে পায়, সে ব্যবস্থা কুণ্টা করবে।

বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলা। প্রত্যূষের প্রথম আলোর আভাস আকাশে ফুটে উঠেছিলো। কুণ্টা প্রার্থনা সেরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। বেলের জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ দুটি শিশুসন্তানকে হারানো। মানডিনকা ভাষায় এমন একটি শব্দ বার করতে হবে যেটি নাম হয়ে এই শিশুটিকে মাতৃঅঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা থেকে রক্ষা করবে। সহসা উপযুক্ত শব্দটি তার মনে উদয় হলো। হ্যাঁ পেয়েছে, সে পেয়েছে। কিন্তু এখনই সেটি মুখে উচ্চারণ করাও অন্যায়। কুণ্টা ঘরে ফিরে এলো।

বেল কিন্তু এই নামকরণের প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানালো। 'এত তাড়াটা কীসের? নামের কথা তো আমাদের মাঝে কিছু হয়নি!' বেলের জিদ কত কঠিন কুণ্টা জানতো। রাগে দুঃখে তার অন্তর ভরে উঠলো। সে বেলকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। বংশের ঐতিহ্যকে সম্মান দিতে হবে। নামকরণের কতকগুলো রীতিনীতি আছে—সেগুলো মানা দরকার। সন্তানের নাম নির্বাচন করবার অধিকার একমাত্র পিতার-ই থাকে। কিন্তু নামটি সর্বাগ্রে শুনবার অধিকার স্বয়ং শিশুর। অপর কারোর সেটি আগে শুনতে নেই। হ্যাঁ, নামকরণের তাড়া নিশ্চয়ই আছে। মালিক যদি তার আগে নাম ঠিক করে ফেলেন, শিশু সেটি শুনে ফেললে বড় বিপদ হবে।

'দেখ, তোমার এসব আফ্রিকায়ানাতে সবচেয়ে বেশী বিপদ হবে, বলে দিচ্ছি। না, না। এ শিশুর ওসব ম্লেচ্ছ নাম রাখা চলবে না।'

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কুণ্টা আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তখন প্রভাতের প্রথম ঘণ্টা বাজানো হচ্ছিলো। এইবার ক্রীতদাসেরা হাতমুখ ধুয়ে প্রাতঃরাশ খাবে। কুণ্টার এদের মুখ দর্শন করতে ইচ্ছা করে না। সাদা মানুষেরা এদের শিখিয়েছে কেবল আফ্রিকা নামের যে কোন বস্তু থেকে দূরে সরে থাকতে।

ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিয়ে কুণ্টা সাহেবের কখন গাড়ী লাগবে জানতে বড় বাড়ীর রান্নাঘরে গেলো। বেলের অনুপস্থিতিতে সেখানে আণ্ট সুকে কাজ করছিলো। সে কুণ্টার দিকে ফিরেও তাকালো না। শুধু মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বেল নিশ্চয়ই আণ্ট সুকে ও সিস্টার ম্যানডিকে কুণ্টার নামে কিছু বলেছে! যা খুশী বলুক। কুণ্টার তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু এখন সে

করবে কী ? গাড়ীটাকেই মাজাঘষা করতে শুরু করলো। ঘরে গিয়ে বাচ্চাটাকে দেখতে ইচ্ছা করছিলো, বেলকেও। কিন্তু যতবার মনে পড়ছিলো—কিণ্টে বংশের কোন স্ত্রীলোক বিধর্মী সাদা মানুষের নামে নিজ সন্তানের নাম রাখতে চাইছে, ক্রোধে সর্বাঙ্গ জলে যাচ্ছিলো। সারাজীবন হীনমন্যতা আর আত্মগ্লানি বহন করে বেড়াবার সেটাই তো প্রথম সোপান।

দুপুরে আণ্ট স্কে বেলের জন্য একপাত্র খাবার নিয়ে যাচ্ছিলো। দেখে মনে হলো স্যুপ। তাতে কুন্টার পেটের ক্ষিদেও জানান দিয়ে উঠলো। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। গোলাবাড়ীর পেছন দিকে কিছু মিষ্টি আলু রাখা ছিলো। কুন্টা মনের দুঃখে তারই গোটা চারেক খেলো।

সন্ধ্যাবেলা সে বাড়ী ফিরে এলো। শোবার ঘরে সাড়াশব্দ ছিলো না। বেল ঘুমিয়ে রয়েছে বোধ হয়। কুন্টা টেবিলের ওপর মোমবাতিটি জ্বালাতে যাবে, এমন সময় আওয়াজ এলো—

'কে ? তুমি ?'

কুন্টা মোমবাতি হাতে ভেতরের ঘরে ঢুকলো।

'দেখ কুন্টা, আমাদের মালিককে আমি তোমার চেয়ে বেশী চিনি। তোমার ওসব আফ্রিকায়ানা দেখাতে গেলে এর পরের নীলামে আমাদের তিনজনকেই বিক্রী করে দেবেন। এ তুমি স্থির জেনো।'

ক্রোধ যথাসাধ্য সংবরণ করে কুন্টা জানালো—'যত বিপদই থাক্, তার সন্তানের নাম সে কখনো সাদা মানুষের নামে হতে দেবে না। দ্বিতীয়তঃ তার সন্তানের নামকরণ বংশের প্রথা অনুযায়ীই হবে।'

'কী করবে তুমি, শুনি ?'

বেল যখন শুনলো কুন্টা শুধু অল্প সময়ের জন্য শিশুটিকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইছে, সে তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললো। আগে শিশুর ঘুম ভাঙুক, তারপর বেল তাকে দুধ খাইয়ে দেবে, যাতে বাইরে গিয়ে সে না কাঁদে। বেল মনে মনে ভাবছিলো—দু'ঘণ্টার আগে তো মেয়ের ঘুম ভাঙবে না। ততক্ষণে ক্রীতদাস বসতির সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। কুন্টার ওসব পাগলামো দেখতে পাবে না। কুন্টার ওপর তার খুব রাগও হচ্ছিলো। কত কষ্ট সহ্য করে সে মেয়ের জন্ম দিয়েছে। আর নাম দেবার বেলায় নাকি তার কোন অধিকার থাকবে না। কে জানে অদ্ভুত শুনতে কী আফ্রিকাদেশের নাম দেবে ! যাক্ গে, বেল পরে সেটা শুধরে নেবে।

প্রায় মধ্যরাত্রে কুন্টা তার প্রথম সন্তানটিকে ভালোভাবে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে

বাইরে বেরিয়ে এলো। ক্রীতদাস বসতি ছাড়িয়ে আরো দূরে চলে গেলো। তারপর চন্দ্র তারকা খচিত মুক্ত আকাশের দিকে শিশুটিকে দু'হাতে তুলে ধরলো। তার দক্ষিণ কর্ণটি কুন্টার ওষ্ঠ সংলগ্ন। তারপর মানডিনকা ভাষায় তিনবার ধীর এবং স্পষ্টস্বরে ক্ষুদ্র কর্ণটিতে উচ্চারণ করলো—'তোমার নাম কিসি। তোমার নাম কিসি: তোমার নাম কিসি।' যাক্, কিণ্টে বংশের প্রত্যেকের বেলা যেমন করা হয়ে থাকে, তেমনি ভাবেই কাজটি করা হলো। পিতৃপুরুষের বাসভূমিতে থাকলে এ ভাবেই নামকরণ হতো। পিতার কাছ থেকে শিশুই সর্বপ্রথম নিজের নাম শুনতে পেলো।

কুন্টা তার ধমনীতে সজোরে ধাবমান আফ্রিকাবাসীর রক্ত স্পষ্ট অনুভব করলো। এবার আর একটি কাজ বাকী। কম্বলের একটি কোণা তুলে ধরে সে শিশুটির মুখ নিরাবরণ করলো। তাকে আকাশের মুখোমুখি তুলে ধরে আবার মানডিনকা ভাষায় উচ্চস্বরে বললো—'বিশ্ব চরাচরে তোমার চেয়ে মহত্তর একমাত্র বস্তু তাকিয়ে দেখ।'

ঘরে ফিরে এসে বেল তার হাত থেকে মেয়েকে প্রায় ছিনিয়ে নিলো। কম্বল খুলে শিশুর আপাদমস্তক ভালোভাবে দেখেও ক্ষতির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেলো না।

মেয়েকে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসে বেল বাইরের ঘরে কুন্টার মুখোমুখি বসলো।

'এবার বল।'

'কী বলবো?'

'কী নাম দিলে, শুনি?'

'কিসি।'

'কিসি? এমন অদ্ভুত নাম কখনো শুনিনি।'

কুন্টা তাকে মানডিনকা ভাষায় কিসি শব্দের অর্থ বোঝালো। কিসি মানে তিষ্ঠ। অর্থাৎ বেলের প্রথম দু'টি সন্তানের মতো সে যাতে বিক্রী না হয়ে যায়—এই নাম দিয়ে সে চেষ্টাই করা হয়েছে।

পরদিন সাহেব বেলকে দেখতে এলে সে নিজের ভয় গোপন করে মুখে অনেক কষ্টে একটু হাসির ভাব আনলো। হাসি হাসি মুখে মালিককে বাচ্চার নামটি বললো। সাহেব মন্তব্য করলেন—নামটি খুব অদ্ভুত। কিন্তু নাম সম্পর্কে কোন আপত্তি করলেন না। তিনি বেরিয়ে যেতে বেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কুন্টার

সাথে রোগী দেখতে বেরোবার আগে ওয়ালার সাহেব তাঁর বড় কালো বাইবেলটি বার করলেন। যে পৃষ্ঠাটিতে আবাদের নথিপত্র রাখেন, কলমটি কালিতে ডুবিয়ে পরিষ্কার অক্ষরে তাতে লিখলেন—'কিসি ওয়ালার। জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯০।'

চুয়ান্ন

তিন দিন পর বেলের রান্নাঘরে কিসিকে দেখে মিসি অ্যান লাফাতে শুরু করলো।

'ঠিক একটা ছোট্ট নিগ্রো পুতুলের মতো!'

বেল এক গাল হেসে বললো—'এখন তো ও খুব ছোট্ট। এখন মা বাবার কাছে থাকুক। একটু বড় হলে তোমার সাথে খেলা করবে।'

এর পর থেকে কুণ্টা—গাড়ী কখন দরকার হবে জানতে বা বেলের সাথে দেখা করতে বড় বাড়ীর রান্নাঘরে গেলেই দেখতে পেতো—মালিকের চার বছরের কটা চুলের ভাইঝিটি কিসির বাস্কেটের ওপর উবু হয়ে আছে। 'কী সুন্দর দেখতে! তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠ। তারপর আমরা দু'জনে মিলে কত মজা করবো!' কুণ্টার কিছু বলবার উপায় ছিলো না। কিন্তু এই সাদা মানুষের মেয়েটার সাথে খেলবার জন্যই কি কিসির জন্ম? ভেবে তার গা জ্বলে যেতো। বেলের ব্যবহারও তার মন তিক্ততায় ভরে দিতো। যে লোকটা কুণ্টাকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে তারই মেয়ের সাথে অবলীলাক্রমে কিসিকে খেলতে দিচ্ছে। কুণ্টার মনুষ্যত্ব বা পিতৃত্বকে সে বিন্দুমাত্র সম্মান দেয় না।

এ ভাবেই মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছিলো। মিসি অ্যান সপ্তাহে দু'বার বেড়াতে আসতো। এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিসির সাথে খেলা করতো। কুণ্টার অসহ্য মনে হতো। সামনের থেকে সরে যেতে চাইতো। কিন্তু কোথায় যাবে? সর্বত্র ঐ একই দৃশ্য। সাহেবের ভাইঝি তার ছোট্ট মেয়েটির সাথে খেলা করছে। তাকে আদর করছে, চুমু খাচ্ছে। কুণ্টা সর্বসত্বা বিদ্রোহ করে উঠতো। তার স্বদেশে প্রচলিত প্রবাদটি মনে পড়ে যেতো—যতই একসাথে খেলা করুক, বেড়াল শেষ পর্যন্ত ইঁদুরছানা খাবেই।

আগস্ট মাসের গরম দুপুরে আণ্ট সুকে একদিন ফিডলারের কাছে ছুটে এলো। বুড়ো মালী সকালে খেতে আসেনি। দুপুরেও এলো না দেখে আণ্ট সুকে তার ঘরের বাইরে থেকে অনেক ডাকাডাকি করেছে। কোনও সাড়া পায়নি।

বেহালাবাদক কি তাকে দেখেছে ? না, সে দেখেনি। সে যখন বুড়ো মালীর ঘরে গিয়ে বিছানায় তাকে দেখতে পেলো, তখন বৃদ্ধের চেহারায় অপার শান্তি! ঠোঁটের কোণায় একটুখানি হাসির আভাস। দেখে মনে হচ্ছিলো বুঝি ঘুমিয়ে আছে। বুড়ো মালীর ঘামে ভেজা পাতার টুপিটি তারা দরজার বাইরে ঝুলিয়ে রাখলো। সেটাই প্রচলিত রীতি। মাঠে যারা কাজ করছিলো ফিরে এসে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলো। দু'জন সমাধিস্থল খুঁড়ে রাখতে গেলো।

বুড়ো মালীর মৃত্যুতে কুণ্টা মনে অত্যন্ত আঘাত পেলো। মৃত্যুর শোক তো ছিলোই। তাছাড়া শেষের দিকে কুণ্টা তাকে বড় অবহেলা করেছে। কিসি হবার পর সে তো তার কাছে যাবার সময়ই পেতো না। আর দেখা হবে না। বেলও চোখের জলে ভাসছিলো। 'আমি নিজের বাবাকে চোখে দেখিনি। তাকেই আমার বাবা বলে মনে করেছি। কিন্তু কখনো তাকে মুখ ফুটে সে কথা বলা হলো না।' নিঃশব্দে খাওয়া সেরে ছোট্ট কিসিকে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে তারা প্রার্থনা সভায় গেলো।

চঞ্চল কিসিকে কোলে নিয়ে কুণ্টা সবার চেয়ে একটু আলাদা হয়ে বসে ছিলো। একটু গান, একটু প্রার্থনার পর সিস্টার ম্যানডি জিজ্ঞেস করলো—'কেউ কি বুড়ো মালার আত্মীয় স্বজন কাউকে জানো?' বেহালাবাদকের সাথেই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিলো। সে বললো—'বহুদিন আগে একদিন বলেছিলো—নিজের মা যে কে, তাই কোনদিন জানলাম না।' কাজেই পরিচিত কাউকেই এ মৃত্যুসংবাদ পাঠাবার ছিলো না। আবার একটা গান, একটু প্রার্থনার পর আণ্ট স্থকে বললো—'তার জীবনটা চিরকাল এই ওয়ালার সাহেবদের সাথেই কেটেছে মনে হয়। শুনেছি—আমাদের মালিক ছোটবেলায় তার কাঁধে চড়েছেন। বড় হয়ে নিজের বাড়ীঘর হ'বার পর নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন।' বেল মন্তব্য করলো—'মালিকের খুব দুঃখ হয়েছে। কাল আধবেলা সবার ছুটি দিয়েছেন। ওঁর মতো ভালো লোক কমই হয়।'

সবাই তখন বলাবলি করতে লাগলো কোথায় কোন মালিকের কতটা সহৃদয়তার কাহিনী শোনা গিয়েছে। অনেক ধনী লোকের আবাদে নাকি বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের দুধ খাইয়ে বড় করেছে এমন ক্রীতদাসী বা বহুদিনের পুরোনো রাঁধুনী মৃত্যুর পর সাদা মানুষের সমাধিস্থলেই স্থান পেয়েছে।

কুণ্টা তিক্ত হৃদয়ে ভাবছিলো—আজীবন ক্রীতদাসত্বের কী চমৎকার পুরস্কার! কুণ্টা জানতো বুড়ো মালী অল্পবয়সে আস্তাবলে কাজ করতো। একটা ঘোড়ার

পায়ের চাট খেয়েই সে অকালে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলো। ক্রমশঃই অশক্ত হয়ে পড়াতে মালিক তাকে তার ইচ্ছামত কাজ বেছে নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তার যত-টুকু সাধ্য ততটুকু কাজেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই থেকে সে মালীর কাজ করে আসছিলো। তার সত্যি ভাগ্য ভালো যে এমন সদাশয় মালিক পেয়েছিলো। অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধবয়সে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে আর মার খেয়ে ক্রীত-দাসেদের জীবনান্ত হতো।

পরদিন সকালে বেহালাবাদক বুড়ো মালীকে তার একমাত্র কালো স্যুটটি পরিয়ে দিলো। সেটি কোন কালে মালিকই তাকে দিয়েছিলেন। ওয়ালার সাহেব তাঁর কালো মোটা বাইবেলটি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মৃতদেহটি খচ্চরে টানা গাড়ী করে ক্রীতদাসদের কবরস্থলে নিয়ে যাওয়া হলো। কুণ্টা লক্ষ্য করেছে—অন্য সময়ে কেউ ভূতের ভয়ে কবরস্থলে যেতে চায় না। ভূত জিনিসটা কী? আফ্রিকাতে যাকে অশুভ আত্মা বলে—তাই কি?

কবরের একপাশে ওয়ালার সাহেব দাঁড়ালেন। অপর দিকে ক্রীতদাসেরা। আন্ট সুকে প্রার্থনা শুরু করলো। পরে পার্ল নামে একটি অল্পবয়সী ক্রীতদাসী গান গাইলো। 'হে ক্লান্ত প্রাণ, এবার গৃহে ফিরে চল। এসেছে স্বর্গের বাণী—যত পাপ, যত ত্রুটি তিনি ক্ষমা করেছেন। চিরমুক্ত এ আত্মা আজি। চল, গৃহে ফিরে চল শীঘ্র। হে ক্লান্ত প্রাণ।'

ওয়ালার সাহেব মাথা নীচু করে বললেন—'জোসেফাস, তুমি বিশ্বাসী ও সৎ মানুষ ছিলে। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। আমেন।'

এত দুঃখেও জোসেফাস নামটা কুণ্টাকে বিস্মিত করলো। এ নাম সে কখনো শোনেনি। তার সত্যিকারের নাম, পিতৃপুরুষের নাম বা গোষ্ঠীর নাম কী ছিলো কে জানে! যে মাটিতে বৃদ্ধ নিজের হাতে ফসল ফলিয়েছিলো, সেই মাটির নীচে তার দেহ ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হলো। ক্রমশঃ শাবল ভর্তি মাটি পড়তে লাগলো। কুণ্টা বহুকষ্টে অশ্রু সংবরণ করলো। মেয়েরা প্রকাশ্যে কাঁদছিলো।

ঘরে ফেরার পথে কুণ্টার জুফরের কথা মনে পড়লো। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যখন ঘরের ভেতর আর্তনাদ করে ছাই ও ধুলোয় গড়াগড়ি যায়, অন্যান্য গ্রামবাসীরা বাইরে নৃত্য করে। আফ্রিকাবাসীদের বিশ্বাস—আনন্দ ছাড়া দুঃখ হয় না। এ দু'টি জিনিস পরস্পরের হাত ধরে চলে। মৃত্যু মানেই নতুন জীবন। কুণ্টার ঠাকুরমা ইয়াইসার মৃত্যু হলে অমোরো তাকে বলেছিলো—'কেঁদো না কুণ্টা। প্রত্যেক গ্রামেই তিন লোকের মানুষ আছে। যারা আল্লাহের কাছে চলে

গিয়েছে, যারা জীবিত এবং যারা ভবিষ্যতে জন্মাবে'। তোমার ঠাকুরমা এক লোক থেকে অন্য লোকে গিয়েছেন।' কুণ্টার ইচ্ছা হয়েছিলো বেলকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু বেল তো এ সবের কিছুই বুঝবে না। বরঞ্চ কুণ্টা কিসিকে একদিন বুঝিয়ে বলবে। যে স্বদেশ কিসি কোনদিন চোখে দেখবে না, তার সম্পর্কে অনেক কথাই সে কিসিকে বলবে।

কিসির দু'বছরের জন্মদিনের আর বাকী নেই। কুণ্টা এক টুকরো পাইন কাঠ দিয়ে ভারী সুন্দর একটা মানডিনকা পুতুল তৈরী করেছে। তেল আর কালি দিয়ে ঘষে সেটা এমন চকচকে হয়েছে যেন তাদের দেশের তৈরী আবলুশ কাঠের পুতুল। বেল মেয়ের জন্য নতুন পোশাক তৈরী করেছে। রবিবার সন্ধ্যাবেলা জন্মদিন উপ-লক্ষ্যে আণ্ট সুকে আর সিস্টার ম্যানডির নিমন্ত্রণ। তার আগের বৃহস্পতিবার বিকেলে জন্মদিনের কেকের ওপর বসাবার জন্য বেল ছোট্ট দুটি গোলাপী মোমবাতি তৈরী করছিলো। এমন সময় জন ওয়ালার সাহেবের গাড়ীর চালক রুজবী এসে হাজির।

একটু পরেই ওয়ালার সাহেব বেলকে ডেকে পাঠালেন। ভারী খুশী হয়ে জানালেন—মিসি অ্যান আগামী শনি রবিবার তার জ্যাঠার কাছে থাকবে। পর-দিনই সে আসবে। তার জন্য বেল যেন ঘর তৈরী করে রাখে। সে জানিয়েছে—কিসির নাকি জন্মদিন। তাহলে বেল রবিবারের জন্য একটা কেক তৈরী করুক না। অ্যানের ঘরে ওদের দু'জনের পার্টি হবে। তাছাড়া অ্যানের ইচ্ছা কিসি তার কাছে শোবে। খাটের পায়ের দিকে মাটিতে বেল যেন কিসির জন্য একটা গদির ব্যবস্থাও করে দেয়।

কুণ্টাকে খবরটা দিতেই হলো। জন্মদিনের কেক তাদের ঘরে না হয়ে বড় বাড়ীতে তৈরী হবে। কিসির জন্মদিনের পার্টি মিসি অ্যানের সাথে ওখানেই হবে। কাজেই নিজেদের জন্য ঘরে আর কোনও উৎসব সম্ভব নয়। কুণ্টা ক্রোধে বাক্যহারা হয়ে গেলো। গোলাবাড়ীতে খড়ের ভেতর যেখানে পুতুলটা লুকিয়ে রেখেছিলো—বড় বড় পা ফেলে সেখানে চলে গেলো।

আল্লাহের নামে সে শপথ করেছিলো—তার কিসির জীবনে এসব সে ঘটতে দেবে না। কিন্তু তার সাধ্য কি? হতাশায় অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে গেলো। কালোরা সাদা মানুষের কোন কাজেই প্রতিবাদ জানায় না কেন—এখন সে বুঝতে পার-ছিলো। প্রচণ্ড তুষারপাতের মাঝখানে একটি দুর্বল ফুলের মাথা উঁচু করে থাকবার চেষ্টা যেমন অর্থহীন—এও তেমনি। কালো পুতুলটির দিকে তাকিয়ে থাকতে

থাকতে তার সেই কালো মা-টির কথাই মনে পড়লো। নীলামের বাজারে সে তার শিশুকন্যার মাথা পাথরে আছাড় মেরে চূর্ণ করে দিয়েছিলো। চিৎকার করে বলছিলো—'তোমরা আমার যা সর্বনাশ করেছো, এর বেলায় তা হতে দেবো না।' কুণ্টাও পুতুলটিকে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য হাত তুলেছিলো। কিন্তু না। তাতে কিছু লাভ নেই। তবে কী করবে? পালাবে? এই বয়সে, এই অর্ধেক পা আর নতুন হাঁটতে শেখা শিশুকে নিয়ে?

ঘরে ফিরে আসতে বেল বললো—'কুণ্টা, আমারও তোমার মতই খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় কী? দেখেছো তো, এখানে তিন চার বছর বয়স হতে না হতেই বাচ্চাদের ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দেয়। তার চেয়ে কিসি যদি একটু বেশী সময় বড় বাড়ীতেই থাকে, সেটাই ভালো নয় কি?' কুণ্টা উত্তর দিলো না। কিন্তু এই একচতুর্থাংশ শতাব্দীর ক্রীতদাসের জীবনে সে ভালো করেই বুঝেছিল—বেল অন্যায় কিছু বলেনি। জীবন থাকতে সে নিজেই কি স্বেচ্ছায় তার দুধের শিশুকে ক্ষেতের কাজে লাগাতে দিতে পারে?

কয়েকটা দিন পর সন্ধ্যাবেলা গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফেরার পর দেখতে পেলো বেল তার অপেক্ষাতেই দুধের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে। সারাদিন খাটুনীর পর এককাপ ঠাণ্ডা দুধ কুণ্টার খুব পছন্দ। দোলনা চেয়ারে বিশ্রাম করবাব সময়ে, একটানা গাড়ীতে বসে থেকে তার পিঠের যে জায়গাটা ব্যথা করে বেল সেখানটা পরম যত্নে ডলে দিতে লাগলো। আবার খাবার বেলাতেও যখন তার প্রিয় আফ্রিকার রান্নাগুলো এগিয়ে দেওয়া হলো তখনই সে বুঝলো বেলের এত যত্নের পেছনে কিছু একটা বক্তব্য আছে। খেতে বসে সেদিন বেল অকারণে বেশী কথা বলছিলো। কথা থামলো খাবার ঘণ্টাখানেক পরে, বিছানায় শুতে যাবার আগে। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সে কুণ্টার বাহুতে হাত রাখলো।

'কুণ্টা, কী ভাবে কথাটা বলবো জানি না। মালিক বলেছেন কাল রোগী দেখতে যাবার পথে কিসিকে সারাদিনের মতো জন সাহেবের বাড়ীতে মিসি অ্যানের কাছে ছেড়ে দিয়ে যাবেন।'

এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। কিসিকে পোষা কুকুরে পরিণত করা হচ্ছে। আর চোখের সামনে সেটা অসহায়ের মতো দেখতে হচ্ছে। পোষা কুকুরটিকে এবার তার নতুন মালিকের বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে। কুণ্টা চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করবার চেষ্টা করলো। অবশেষে চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে ঘর থেকে

পালালো। বেল তার বিছানায় আর কুণ্টা আস্তাবলে—সারারাত দুজনে চোখের জল ফেলে বিনিদ্র কাটালো।

পরদিন জন সাহেবের বাড়ীর সামনে গাড়ী থামতে না থামতে মিসি অ্যান ছুটে এলো। ফুর্তির চোটে কিসির যাবার বেলা বাবাকে কিছু বলে যেতেও খেয়াল হলো না। তিক্ত হৃদয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার সময় পেছন থেকে ছোট্ট দু'টি মেয়ের কলহাসি কুণ্টার কান বিষিয়ে দিলো।

সন্ধ্যাবেলা রোগী-বাড়ীর ক্রীতদাস বাইরে এসে কুণ্টাকে জানালো—ওয়ালার সাহেবকে সারারাত রোগীর পাশে থাকতে হবে। কুণ্টা যেন পরদিন এসে তাঁকে নিয়ে যায়। কুণ্টা বিরস মনে জন সাহেবের বাড়ী ফিরে এলো। মিসি অ্যানের সে রাত্রি কিসিকে আটকে রাখবার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু কুণ্টার ভাগ্য ভালো—বাচ্চাদের হট্টগোলে তার মায়ের মাথা ধরে গিয়েছিলো। বাচ্চাদের দৌরাত্ম্য তাঁর একেবারে সহ্য হতো না। তিনি কিসিকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কুণ্টা মেয়েকে সযত্নে গাড়ীর ওপরে চালকের সরু আসনে নিজের পাশে বসালো।

সহসা তার খেয়াল হলো—যে রাত্রে মেয়েকে নাম শুনিয়েছিলো তারপর আর কখনো কিসিকে সে এমন একান্ত করে পায়নি। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে একটা অভূতপূর্ব আনন্দে তার মন ভরে উঠলো। আবার একটু যেন কুণ্ঠাবোধও হলো। নিজেকে অপ্রস্তুত মনে হচ্ছিলো। প্রথম সন্তানের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে নিজের মনে সে অনেক ভেবেছে। কিন্তু আজ ঠিক কী ভাবে শুরু করবে—বুঝে উঠতে পারছিলো না। সহসা সে কিসিকে কোলে তুলে নিলো। আনাড়ীর মতো তার হাত, পা, মাথা সব হাত বুলিয়ে, টিপে টিপে দেখে নিলো। কিসি অবাক নয়নে বাবার কাণ্ডকারখানা দেখছিলো। কুণ্টা তাকে তুলে ধরে একবার ওজনটা আন্দাজ করে নিলো। তারপর খুব গম্ভীর ভাবে কিসির উষ্ণ, ক্ষুদ্র দু'টি করতলে ঘোড়ার রাস তুলে দিলো। সেদিন শিশুকণ্ঠের যে মধুর হাস্যধ্বনিতে নির্জন সন্ধ্যা-আকাশ ভরে উঠলো—তার চেয়ে মধুরতর আওয়াজ কুণ্টা জীবনে কখনো শোনেনি।

'খুব মিষ্টি দেখতে তোমাকে!' কিসির বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কুণ্টা বললো—'ঠিক আমার ছোট ভাই ম্যাডির মতো দেখতে।' কুণ্টা এবার নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো—'বাবা।' কিন্তু ততক্ষণে কিসির মনোযোগ ঘোড়ার দিকে চলে গিয়েছে।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে আবার মিসি অ্যানের কাছে যাবার পথে কিসি কুণ্টার দিকে ঝুঁকে ছোট্ট সুগোল আঙুলটি তার বুকে ঠেকিয়ে উচ্চারণ করলো—'বাবা!' কুণ্টা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কিসির আঙুলটি ধরে সেটি তারই দিকে ঘুরিয়ে বললো—'তোমার নাম কিসি।' কিসি বুঝতে পেরে হাসলো। কুণ্টা এবার নিজের দিকে দেখিয়ে বললো, 'কুণ্টা কিণ্টে।' কিসি বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। কুণ্টার দিকে দেখিয়ে অনিশ্চিত কণ্ঠে বললো—'বাবা!' পিতা ও কন্যার সম্মিলিত হাস্যে চারিদিক মুখরিত হলো।

কুণ্টা খুব খুশী হয়ে লক্ষ্য করলো কিসি খুব তাড়াতাড়ি তার শেখানো কথা বলতে পারছে—কয়েক মাসের মাঝেই সে অনেক শিখেছে। তাছাড়া বাবার সাথে বেড়ানো তার খুব পছন্দ। কিন্তু বেলের কাছে সে কিছু মানডিনকা শব্দ উচ্চারণ করে ফেলতেই বিপদ হলো। কিসিকে সেদিন আণ্ট সুকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বেল কুণ্টাকে ভয়ানক বকাবকি করলো—'তোমার কি কোনদিনই বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না? আমার কথায় কান না দিলে একদিন আমরা তিনজনেই মহা বিপদে পড়ে যাবো। এ মেয়ে আফ্রিকা থেকে আসেনি।—সে এখানকার মানুষ, এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না।'

কুণ্টা বেলকে প্রায় প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলো। একে তো স্বামীর সাথে চিৎকার করে কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ। তার ওপর সে রক্তের ঋণ অস্বীকার করছে। সাদা মানুষের ভয়ে নিজের বংশপরিচয় ভুলে যেতে হবে? কী করে যে সে এই বিধর্মীদের দেশে জন্মানো নারী বিয়ে করেছিলো কে জানে!

পরদিন পাশের আবাদে সাহেবকে রোগী দেখতে নিয়ে গিয়ে আর একজন ড্রাইভারের কাছে শুনতে পেলো—হাইটিতে টোসাণ্ট নামে এক ক্রীতদাস কালোদের বিরাট বিদ্রোহী দল তৈরী করেছে। শুধু ফরাসীদের বিরুদ্ধে নয়—এরা স্প্যানিশ এমন কি ইংরেজদের সাথেও লড়াই করে জিতেছে। টোসাণ্টের পূর্বতন মালিক তাকে আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার ইত্যাদি বড় বড় বীরের কাহিনী পড়তে দিয়েছিলেন। সে সব পড়েই সে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। তবে বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তার সেই মালিককে সে নিজেই ইউনাইটেড স্টেটে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। টোসাণ্ট কুণ্টার মনে কিংবদন্তীর নায়ক বনে গেলো। মানডিনকা বীর সুনডিয়াটার পরেই তার স্থান।

কিছুদিন পর কিসির জ্বর হলো। ডাক্তার সাহেব দেখে বললেন 'মাম্পস' হয়েছে। দু'সপ্তাহ মিসি অ্যানকে তার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। কুণ্টা মনে

ভাবলো—যাক্, এ তবু মন্দের ভালো হলো । ঐ কটা চুলের মেয়েটা যত দূরে থাকে ততই ভালো। কিন্তু ক'দিন পরেই মিস অ্যানের কাছ থেকে এক বিরাট পুতুল উপহার এসে হাজির। জামাকাপড় পড়া একটা সাদা মানুষের বাচ্চা। কিসি মুগ্ধ! বিছানায় বসে পুতুলটাকে আদর করছে আর কেবল বলছে—'কী সুন্দর!' কুণ্টা রাগে অস্থির হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। গোলাবাড়ীতে খড়ের নীচে কাঠের পুতুলটি রেখেছিলো। সেইটি নিয়ে এসে কিসিকে দিলো । কিসি খুশীতে আটখানা। বেলও তার হাতের কাজের খুব তারিফ করলো । কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই বোঝা গেলো সাদা মানুষের পুতুলটিই কিসির বেশী পছন্দ । জীবনে এই প্রথম কুণ্টার তার মেয়ের ওপর ভয়ানক রাগ হলো। তাছাড়া রোগমুক্তির নির্দিষ্ট সময়ের পর দু'টি মেয়ের মিলনের অধীর আগ্রহও মোটেই তার সুখবৃদ্ধি করেনি। কুণ্টা মাঝে মাঝে কিসিকে মিস অ্যানের বাড়ী নিয়ে যেতো । কিন্তু তার মায়ের বাচ্চাদের হট্টগোল মোটেই বরদাস্ত হতো না বলে মিসি অ্যানের তার জ্যাঠার বাড়ীতে আসাই বেশী পছন্দ ছিলো।

একদিন কিসি মিসি অ্যানকে তাদের ঘরে নিয়ে এলো । পাথরের নুড়ি রাখা লাউয়ের খোলাটি দেখে টানাটানি শুরু করতেই বেল ছুটে এলো। দ্রুত হস্তে সেটি সে সরিয়ে নিলো। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি খানিকটা হয়ে গিয়েছে । পরদিনই জন সাহেবের চিঠি নিয়ে তার গাড়ীর চালক রুজবী হাজির। পাঁচ মিনিট পর ওয়ালার সাহেব বেলকে ডেকে এনে ভয়ানক ধমক লাগালেন । প্রতি অমাবস্যায় লাউয়ের খোলায় পাথর ফেলে আফ্রিকা দেশের কী তুকতাক হচ্ছে?

বেল বহু কষ্টে তাঁকে বোঝালো—তুকতাক কিছুই নয় । কুণ্টা আফ্রিকার নিগ্রো। গুনতে জানে না। তাই প্রতি অমাবস্যায় পাথর ফেলে সে নিজের বয়সের হিসাব রাখে।

ঘরে ফিরে বেল কিসিকে সজোরে চড় কষিয়ে দিলো। 'খবরদার! ও মেয়েকে কখনো ঘরে নিয়ে আসবে না।' কুণ্টা সব কিছু শুনে অক্ষম ক্রোধে জ্বলতে থাকলো। সে রাত্রে তার খাওয়াই হলো না । কুড়ি বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন সে সাহেবের গাড়ী চালাচ্ছে। অথচ সাহেব তাকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পারেন না!

দু'টি অবোধ বালিকার ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলেছিলো। সারাদিন বাগানে ঘুরে, আর মাটি দিয়ে রান্নাবাড়ার খেলা সেরে ধুলো মাখা দেহে ঘরে ফিরে এলে বেল তাদের ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিতো । দুপুরে বেলের তৈরী খাবার খেয়ে

উঠোনের খাটিয়ায় দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে পড়তো। রাত্রে বেলের বলা গল্প না শুনলে ওদের ঘুম আসতো না।

কুণ্টার এই ভাব ভালোবাসায় মহা আপত্তি ছিলো। তবে কিসি যে তার শৈশব ও বাল্যকাল আনন্দে কাটাতে পারছিলো, এত শীঘ্র তাকে ক্ষেতে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছিলো না—এটা অবশ্য কুণ্টাব পক্ষে সুখেরই হচ্ছিলো। তার নিজের মনের উদ্বেগের ছায়া সে বেলের মাঝেও দেখতে পেতো। বেল মুখে যাই বলুক, কুণ্টা অসতর্ক মুহূর্তে তার মাঝে অস্বস্তির ভাবও দেখেছে। মনে হতো—তার নিজের মনে যে আশঙ্কা দিবারাত্র উঁকি মারে, বেলও তার আভাস পায়। কিসিকে কোলে করে যীশুর গান শুনিয়ে যখন ঘুম পাড়ায়, ঐ নিদ্রালু মুখখানার দিকে তাকিয়ে বেল যেন কী অজানা শঙ্কায় শিউরে ওঠে। পরস্পরের প্রতি যত ভালোবাসাই থাকুক সাদা মানুষকে বেশী বিশ্বাস করতে নেই—এ কথাই যেন সে তার সন্তানকে বলতে চাইতো। কিসির অত সব বোঝার বয়স হয়নি। কিন্তু সাদা মানুষের ওপর বিশ্বাস করে বেল অতি মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছে। তার প্রথম দু'টি সন্তানকে তারা বিক্রী করে দিয়েছে। কিসির ভবিষ্যত কী কুণ্টা জানে না। তার নিজের এবং বেলের জন্যই বা কী ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে! কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের কিসির যে ক্ষতি করবে আল্লাহ তাকে নিদারুণ শাস্তি দেবেন।

ছাপ্পান্ন

সাত বছর বয়স থেকে কিসি মায়ের সাথে বড় বাড়ীতে কাজ শুরু করলো। কুণ্টা আপত্তি করেনি। ক্ষেতের কাজ থেকে সেটাই ভালো। সাহেব দেখুন, সে শুধু মিসি অ্যানের খেলার সাথী নয়। কাজকর্মও কিছু করছে। কুণ্টা ভেবে দেখেছে জুফরেতেও মেয়েরা এ বয়স থেকেই মায়ের সাথে কাজকর্ম শেখে।

মিসি অ্যান এলে অবশ্য কিসির ছুটি মেলে। আর কিসিকে জন সাহেবের বাড়ী পৌঁছে দেওয়া কুণ্টার সবচেয়ে সুখের কাজ। ঐ সময় সে কিসিকে একা কাছে পায়। কিসি জানে তখন তাদের মাঝে .. কথাবার্তা হয়—তা একান্তই দুজনের নিজস্ব ব্যাপার। সে প্রসঙ্গ মায়ের কাছেও গোপন রাখে। কুণ্টা তখন প্রাণভরে তাকে স্বদেশের কথা বলে। স্পটসিলভেনিয়ার ধূলিময় পথে ঘোড়া ছুটিয়ে সে কন্যাকে মানডিনকা ভাষার কথাগুলো শেখায়। গাছের দিকে দেখিয়ে বলে

'তোমার মা বাবাকে জিজ্ঞেস করেনি ?'

অপরিমেয় ক্ষোভে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কুণ্টা বললো—'তাদের পেলে তো তাদেরও ধরে আনতো। আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে, তারা আজও জানে না।'

কুণ্টা তাকে নিজের ভাইবোনের কথা, স্বদেশের আরো কত কথাই বললো।

'আমরা তাদের দেখতে যাবো না ?'

'না। আমাদের এরা যেতে দেবে না।'

'কেন দেবে না ?'

'আমরা তো আমাদের মালিকের। নিজের ইচ্ছামত কোথায়ও যেতে পারি না। যেমন এ ঘোড়াগুলোও মালিকের।'

'যেমন আমি তোমার ও মায়ের ?'

'না, না। এটা সেরকম নয়।'

'মিসি অ্যান বলে সে চায় আমি তার কাছে থাকি। সে আমার বন্ধু।'

'ক্রীতদাস কখনো বন্ধু হতে পারে না।'

'কেন বাবা ? আমি তো তাকে ভালোবাসি। তুমি আর মা দু'জনকে ভালোবাস, তাই তো একসাথে থাক।'

'আমরা নিজেদের ইচ্ছায় ভালোবেসে একসাথে থাকি। কেউ জোর করে কাছে আনেনি। তাই আমরা পরস্পরের। তুমিও আমাদের।'

কিসি খানিকক্ষণ ভেবে বললো—'আমি কখনো তোমাদের ছেড়ে যাবো না।'

'না, সোনা। আমরাও তো তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।'

ক্রীতদাস বসতিতে অন্য সবার আগে, সূর্য উঠবারও আগে কুণ্টা শয্যাত্যাগ করতো। সবাই বলতো—ও ব্যাটা আফ্রিকার লোক কিনা, তাই বেড়ালের মতো অন্ধকারে দেখতে পায়। যে যাই বলুক, কুণ্টা গ্রাহ্য করতো না। পূর্ব দিগন্তে দিনের প্রথম আলো ফুটে উঠতেই প্রত্যহ সে আল্লাহের কাছে প্রভাতের প্রার্থনা জানাতো।

তারপর ঘোড়াদের দানাপানি দিতো। ততক্ষণে বেল ও কিসি বড় বাড়ীতে কাজ করতে যাবার জন্য প্রস্তুত। ক্ষেতের মজুরদের সর্দার কাটোও তৈরী। আডার ছেলে নোয়া ঘুম ভাঙাবার ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

নোয়া খুব গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে। তাকে দেখে কুণ্টার আফ্রিকার জালোফ উপজাতির লোকেদের কথা মনে পড়তো। তারাও অত্যন্ত স্বল্পভাষী। নোয়াকে কুণ্টার খুব পছন্দ। তাকে দেখে নিজের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে যেতো। কাজ-কর্মের ব্যাপারে ছেলেটি বড় খাঁটি। কথা কম বললেও অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি। কিসি

আর মিসি অ্যানের খেলার ছুটোপুটিতে তার নজর সর্বদাই সেদিকে থাকতো। এক-দিন ওদের খেলাচ্ছলে চিৎকার, কলহাসির দৃশ্য কুণ্টা ও নোয়া দু'জনেই দেখ-ছিলো। পরে এক দীর্ঘ মুহূর্ত দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইলো। কেন? দুজনের মনে কি একই উদ্বেগ ও ভাবনা জেগেছিলো? নোয়া কিসি থেকে মাত্র দু'বৎসরের বড়। তবু দু'জনের মাঝে বন্ধুত্বের চিহ্ন দেখা যায় না কেন কুণ্টার বোধের অগম্য।

ওয়ালার সাহেব, বেল, মিসি অ্যান এদের সবার কবল ছাড়িয়ে কিসিকে একা পাওয়া দুঃসাধ্য। শুধু রবিবার বিকালে মিসি অ্যান বাড়ী ফিরে গেলে মালিক খানিকক্ষণ বিশ্রাম করেন আর বেল আণ্ট সুকে ও সিস্টার ম্যানডিকে নিয়ে যীশুর সভায় যায়। সেই সময়টুকুতে ঘণ্টা দুই কুণ্টা তার কন্যাকে একা কাছে পেতো। আবহাওয়া ভালো থাকলে দু'জনে হাঁটতে বেরোতো। কিসি রান্নাঘর থেকে দুজনের জন্য কুণ্টার পছন্দমত কিছু একটা খাবার সঙ্গে নিয়ে নিতো।

কুণ্টাই কথা বলতো। কিসি শুধু কেন—কেন করে প্রশ্ন করতে থাকতো। এক-দিন কিসি কথা শুরু করলো। 'মিসি অ্যান একটা কবিতা বলেছে, শুনবে?' কবিতাটা শুনে কুণ্টার মনে হলো—অতি বাজে, বোকার মতো কবিতা। সব সময় হেসে গড়িয়ে পড়া, আদুরে, ন্যাকা, সাদা চামড়ার মেয়েটার আর কত বুদ্ধি হবে! সহসা ইচ্ছা হলো—কিসিকে কোরানের কয়েকটা স্তবক আবৃত্তি করে শোনাবে। কিন্তু না, থাক্। সে তো তার কিছুই বুঝবে না। অবশেষে কুণ্টা তাকে ছোটবেলায় নিয়ো বটোর কাছে শোনা অলস কচ্ছপ আর বোকা চিতাবাঘের গল্পটা শোনালো। নিয়ো বটোর দুঃখময় জীবনের কথা মনে পড়লো। দুই গ্রামের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যুদ্ধের সময় নিয়ো বটোর দুই শিশুসন্তানকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়লো—বেলের জীবনেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে-ছিলো। অল্পবয়সে তারও দুই শিশুসন্তানকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আর তার নিজের জীবনে? তার মতো হাজার হাজার সন্তানকে মাতৃক্রোড় বিচ্যুত করে শিকলে বেঁধে এরা নিয়ে আসেনি? উত্তেজনায় অজানিতে তার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে এলো।—আমাদের নগ্ন করে শিকলে বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছে। আমাদের নাম পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। তোমার মতো যারা এদেশে জন্মেছে, তারা নিজেদের পরিচয় পর্যন্ত জানে না। কিন্তু আমার মতো তোমারও শিরা উপশিরায় কিণ্টে বংশের রক্ত। এ কথা কখনো ভুলো না। শতবর্ষ প্রাচীন এই বংশ। মালী দেশে

তার উৎপত্তি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক এবং পুরোহিত শ্রেণীর। আমি কী বলছি, বুঝতে পারছো ?

কিসি পরম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বাধ্য মেয়ের মতো না বুঝেই বললো—'হ্যাঁ, বাবা।'

কুন্টা একটা কাঠি নিয়ে ধুলোর ওপর দাগ কেটে লিখলো কু ন টা কি ন টে। এটা আমার নাম।

'বাবা, আমার নাম লেখো।'

লেখা দেখে কিসি সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলো।

তারপর বললো—'আমাকে শিখিয়ে দেবে ?'

কুন্টা কঠিন স্বরে বললো—'সেটা ঠিক হবে না। তোমার মাও লিখতে পড়তে জানে বটে, কিন্তু সাহেবরা জানতে পারলে মহা বিপদ হবে। এ লেখার কথা কাউকে বলো না কিন্তু।'

কিসি ঠোঁট ফুলিয়ে বললো—'কাউকে বলবো না।'

কুন্টা এবার মেয়েকে আদর করে বললো—'ঠিক আছে। রাগ করো না। এর পরের অমাবস্যায় তোমাকে আমার লাউয়ের খোলায় পাথর ফেলতে দেবো।'

এতক্ষণে মেয়ের মুখে হাসি ফুটলো।

ছাপ্পান্ন

১৮০০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। কুন্টার লাউয়ের ভেতর আর একটি পাথর ফেলবার সময় হ'বার আগেই কুন্টাকে এক সপ্তাহের জন্য বাইরে চলে যেতে হলো। সাহেব বেলকে ডেকে বললেন তাঁর ফ্রেডারিকসবার্গে কাজ আছে। সপ্তাহ খানেক লাগবে। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ছোট ভাই এসে এখানকার কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন। কুন্টাকে বাইরে যেতে হচ্ছিলো। কিন্তু ক'দিনের বিচ্ছেদের কষ্ট থেকেও তার বেশী ভাবনা হচ্ছিলো বেল ও কিসিকে জনসাহেবের খিদমতে রেখে যেতে। জন সাহেব তো ভালো লোক নন! এ বিষয়ে খোলাখুলি কাউকে কিছু বলাও সম্ভব ছিলো না। তবু যাবার দিন সকালে ঘর থেকে বেরোবার আগে বেলের কথায় বুঝতে পারলো তার মনের ভয়-ভাবনা বেলের অজানা নেই। সে বলেছিলো—'জন সাহেব তাঁর দাদার মতো ভালো লোক নন, আমি জানি। কিন্তু এক সপ্তাহের তো ব্যাপার। কিছু ভেবো না। আমি ঠিক চালিয়ে নেবো।'

কুণ্টা কিসির পাশে নীচু হয়ে তার কানে কানে বললো—'অমাবস্যায় পাথর ফেলতে ভুলো না কিন্তু।' কিসি ষড়যন্ত্রকারীর মতো মুখ করে চোখ টিপলো। বেল কিছুই না শোনার ভান করে থাকলো। ন'মাস যাবৎ বাবা আর মেয়েতে কী চলছিলো কিছুই কিন্তু তার জানতে বাকী ছিলো না।

দু'দিন সব নির্বিঘ্নে চললো। অবশ্য জন সাহেবের অনেক রাত্রি অবধি দাদার দামী মদগুলো শেষ করা, ভালো সিগারগুলো খেয়ে কার্পেট নোংরা করা বা আরো অনেক আচরণই বেলের পছন্দ হচ্ছিলো না। তৃতীয় দিন দুপুরে ঝামেলা শুরু হলো। একজন সাদা মানুষ ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির। সাহেবের সাথে দেখা করে চলে যেতেই জন সাহেব হাঁকাহাঁকি শুরু করলেন। চিৎকার করে বেলকে ডাকলেন। তাঁর উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে বেলের প্রথমেই ভাবনা হলো—ওয়ালার সাহেব আর কুণ্টার কোন বড় রকমের বিপদ ঘটেনি তো! কিন্তু তা নয়। সাহেব আবাদের সমস্ত ক্রীতদাসকে পেছনের উঠোনে একত্র হবার আদেশ দিলেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখের ভাব লক্ষ্য করে তিনি বললেন—'খবর পেলাম রিচমণ্ডের নিগ্রোরা গভর্ণরকে হরণ করবার আর রিচমণ্ডের সাদা মানুষদের খুন করে শহর জালিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিলো। কিছু বুদ্ধিমান নিগ্রো ব্যাপারটা জানতে পেরে মালিকদের ঠিক সময়ে জানিয়ে দেওয়াতেই শয়তানদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়েছে। সশস্ত্র প্রহরী রাস্তায় ঘুরছে। তোমাদের মাথায় যাতে কোন কুবুদ্ধি না ঢোকে দেখবার জন্য আমি নিজে এখানে দিবারাত্র বন্দুক হাতে পাহারা দেবো। খবরদার কেউ এলাকার বাইরে পা বাড়াবে না। রাত্রে ঘরের বাইরে যাবে না। একাধিক লোক একত্র জড়ো হবে না।' নিজের রিভলভারে হাত দিয়ে বললেন—'আমি আমার দাদার মতো ভালোমানুষ নই। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগলেই বেপরোয়া গুলি করবো। যাও!'

জন সাহেবের কথায় আর কাজে তফাৎ ছিলো না। এর পরের দু'দিন চোখের সামনে কিসিকে দিয়ে খাবার চাখিয়ে তবে মুখে তুললেন। দিনের বেলা ঘোড়ায় চেপে মাঠে ঘুরে বেড়ালেন। রাতে বন্দুক কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে থাকলেন। ষড়যন্ত্র তো দূরের কথা, বিদ্রোহ সম্পর্কে কারো পক্ষে কোন আলোচনা করাই সম্ভব ছিলো না। রিচমণ্ডে একটা বড় পার্টিতে ফিডলার বাজাতে গিয়েছিলো। তার কী হলো কে জানে! সাদা মানুষেরা ভয় পেয়ে গেলে যা খুশী করতে পারে। একটা অচেনা কালোকে দেখলে কী করে বসবে কিছুই বলা যায় না।

ফিডলারের আগেই ওয়ালার সাহেব ও কুণ্টা ফিরে এলো। জন সাহেব নিজের বাড়ী চলে গেলেন। কিন্তু সকলের সাথে মালিকের ব্যবহার বড়ই শীতল হয়ে রইলো। কুণ্টার কাছে সব খবর পাওয়া গেলো। গ্যাব্রিয়ল প্রসার নামে এক মুক্ত ক্রীতদাস কামারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছিলো। এ বিদ্রোহ তারই পরিকল্পনা। বাছাই করা সব লোকেদের শিখিয়ে তৈরী করে গত এক বৎসর ধরে এই বিদ্রোহীর দল গড়ে তোলা হচ্ছিলো। জানাজানি হয়ে যাবার পর প্রসার পালিয়েছে। তাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। কারণে অকারণে কালোদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলেছে।

ক্ষতবিক্ষত বেহালাবাদক ফিরলো তারও পরদিন। বহু কষ্টে লুকিয়ে পথ চলে কোনক্রমে এসে পৌঁচেছে।

আটান্ন

ক্রীতদাস নীলামের বাজারে কুণ্টা পারতপক্ষে যেতো না। কিন্তু শীঘ্রই একদিন মালিকের আদেশে যেতে হলো। সাহেবের হঠাৎ সেখানে যাবার ইচ্ছা হলো কেন কে জানে!

একটি বৃদ্ধা ক্রীতদাসীকে নীলামে চড়ানো হয়েছিলো। 'স্পটসিলভেনিয়ার ভদ্রব্যক্তিগণ! আপনাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগ। এত ভালো মাল আর পাবেন না। চমৎকার রাঁধুনী।'

বৃদ্ধা ভীড়ের মাঝে একজন সাদা মানুষকে উদ্দেশ্য করে করুণ স্বরে আর্তনাদ করছিলো—'ফিলিপ সাহেব! ফিলিপ! তোমার শিশুকাল থেকে তোমার ভাইদের বাবার ও তোমার সেবা করেছি। সব কি ভুলে গিয়েছো? আমাকে তোমার কাছে রাখ। তোমার জন্য আমি আপ্রাণ পরিশ্রম করবো। দয়া কর। দক্ষিণে কোথায় আমাকে নিয়ে গিয়ে চাবুকের আঘাতে মেরে ফেলবে!' যাকে উদ্দেশ করে বলা, সে বিদ্রূপ করে কিছু একটা বললো। জনতা হেসে উঠলো। একজন ব্যবসায়ী বৃদ্ধাকে সাতশো ডলার দিয়ে কিনে নিলো।

'হে ঈশ্বর! হে যীশু! দয়া কর!'—অসহায় ক্রন্দনের মাঝে রূঢ় ভাবে তাকে ক্রীতদাসের খোঁয়াড়ে ঠেলে দেওয়া হলো।

এবার একটি কালো যুবক। চোখে তার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি। সর্বাঙ্গে কশাঘাতের

রক্তাক্ত চিহ্ন। 'এ একা একটা খচ্চরের কাজ করবার শক্তি রাখে। চারশো পাউণ্ড তুলো একদিনে তোলা এর পক্ষে কিছুই নয়।' চোখ টিপে অশ্লীল ইঙ্গিত করে দাসব্যবসায়ী বললো—'আপনাদের ছুকরী দাসীদের দিয়ে যদি বছর বছর বাচ্চা করাতে চান, একে দিয়ে করিয়ে নেবেন।' শৃঙ্খলবদ্ধ যুবকটি চোদ্দশো ডলারে বিক্রী হলো।

এরপরে আনা হ'লো দোআঁশলা রোরুদ্যমানা গর্ভবতী মেয়ে। তার করুণ অবস্থা দেখে কুণ্টার চোখে জল এসে গেলো। 'একটার দামে দু'টো পাচ্ছেন। অথবা একখানা বিনি পয়সায় পাচ্ছেন। যে ভাবে খুশী দেখুন। আজকাল সদ্যোজাত বাচ্চার দামও একশো ডলার করে।' হাজার ডলারে মেয়েটি বিক্রী হয়ে গেলো।

আর সহ্য করা যাচ্ছিলো না। এমন সময় শেকলে বেঁধে যাকে টানতে টানতে নিয়ে আসা হলো তাকে দেখে কুণ্টা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলো।

একটি কিশোরী কৃষ্ণকায়া—ভয়ে কাঁপছিলো। গায়ের রঙ, মুখের গঠনে যেন কিসির একটি বড় সংস্করণ। স্তম্ভিত কুণ্টার চোখের সামনে নীলাম ব্যবসায়ীর বুকনি শুরু হলো। 'ঘরের কাজে অত্যন্ত পটু।' কুৎসিত কটাক্ষ করে বললো—'বাচ্চা করাতে চান, যত খুশী করান।' ফস্ করে তার বুকের কাপড় টেনে তাকে নগ্ন করে ফেললো। পায়ের কাছে বসন পড়ে যেতেই মেয়েটি আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। চারিদিকের লোকজন তাকে স্পর্শ করবার জন্যই হৈ হৈ লাগিয়ে দিলো।

কী ভাগ্য! সাহেব এইবার গাড়ী চালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

কুণ্টা কীভাবে বাড়ী ফিরে এলো জানে না। সে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছিলো না, চিন্তা করতে পারছিলো না। এই মেয়েটি যদি কিসি হতো? ঐ রাঁধুনী যদি বেল হতো? যদি তাদের দু'জনকেই বিক্রী করে দেয়? অথবা তাকে? পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কীভাবে থাকবে? একি ভয়ঙ্কর ব্যাপার?

বাড়ী ফিরে চারদিকের আবহাওয়ায় যেন কী একটা ত্রাসের আভাস পেলো। কী হয়েছে? তাড়াতাড়ি ঘোড়া তুলে দিয়ে বড় বাড়ীর রান্নাঘরে বেলের সন্ধানে গেলো।—'তুমি ঠিক আছো তো?'

বেল মুহূর্তে ঘুরে তাকালো। বিস্ফারিত নয়নে উদভ্রান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—'ও, কুণ্টা! দাস ব্যবসায়ী এসেছিলো। সাহেবকে একটা কার্ড দিয়ে গিয়েছে। টেবিলে রেখে দিয়েছি।'

'বেল।' বসার ঘর থেকে গম্ভীর গলার ডাক এলো।

বেলের হাত থেকে জিনিস পড়ে যাচ্ছিলো। কোন রকমে সামনে কুণ্টাকে বললো—'দাঁড়াও, আসছি।'

কিন্তু ফিরে এলো মুখে স্বস্তির ভাব নিয়ে। 'তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলেছেন। কার্ডটা টেবিলে নেই। কিন্তু ওটা নিয়ে কিছু বলেননি।'

রাত্রে খাবার পর সবাই একত্র হলো। আণ্ট্ সুকে কাঁদতে শুরু করলো। 'যদি আমাদের কাউকে বিক্রী করে দেন, কী হবে?'

এ বিষয়ে ফিডলারকে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে হলো—'মালিকের তো নিগ্রোর সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাঁর অবস্থাও এত খারাপ নয় যে ধার শোধ করবার জন্য নিগ্রো বিক্রী করতে হবে। আমার মনে হয় না উনি কাউকে বিক্রী করবেন।'

বেল মন্তব্য করলো—'আমি সাহেবকে ভালো করেই জানি। তাঁর গাড়ীর চালক লুথার ছাড়া কখনো তো কাউকে বিক্রী করেননি। লুথার সেই মেয়েটিকে ম্যাপ এঁকে দিয়ে পালাতে সাহায্য করেছিলো বলেই তার ঐ অবস্থা হয়েছিলো। না, না। অকারণে সাহেব আমাদের কাউকে বিক্রী করবেন না।'

গাড়ী চালাতে চালাতে কুণ্টা ওয়ালার সাহেব এবং তাঁর এক ভাইয়ের কথা-বার্তা শুনছিলো। মালিক বললেন—'সেদিন নীলামের বাজারে গিয়েছিলাম আজ-কালকার বাজারদর জানতে। গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ক্রীতদাসের দাম দ্বিগুণ, তিনগুণ হয়ে গিয়েছে। কাগজে পড়ছিলাম—ছুতোর, কামার, রাজমিস্ত্রী, মুচি, বাজনাদার—যারা একটা বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষ—তাদের দাম পঁচিশ শো ডলার করে।'

'ক্রীতদাসের দাম তো বাড়বেই। তুলোর ব্যবসায়ে আজকাল খুব লাভ। দেশে প্রায় দশ লাখ ক্রীতদাস আছে। তা সত্ত্বেও জাহাজভর্তি লোক আনা হচ্ছে। তাতেও চাহিদা মিটছে না। উত্তরের মিলগুলোতে দক্ষিণ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মাল পাঠানো যাচ্ছে না।'

'আমার ভাবনা হচ্ছে—টাকার মোহে ভার্জিনিয়া স্টেটের আবাদীরা ভালো জাতের ক্রীতদাসেদের হারাচ্ছে। লাভের আশায় বেশী টাকা পেলেই নিজেদের ক্রীতদাসেদের দক্ষিণ অঞ্চলে বিক্রী করে দিচ্ছে।'

'তা দিক্। ভার্জিনিয়াতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রীতদাস আছে। সেটা লাভ-জনক নয়।'

'না, না। ভুল কথা। আজ না হোক, দশ বছর পরে ক্রীতদাস রাখা খুবই লাভ-জনক হবে। ওদের জন্য খরচটা কী? ওরা যা খায় বা পরে তা নিজেরাই উৎপাদন

করে। আর কত তাড়াতাড়ি ওদের বংশবৃদ্ধি হয় ? প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য বিনা খরচে তুমি দাম পাচ্ছো। এদের যে কোন বিশেষ বৃত্তি শিখিয়ে নাও—আরো অনেক দামী সম্পত্তি হয়ে যাবে। আজকের দিনে জমি আর ক্রীতদাস এ দুটোতে টাকা লাগানোই সবচেয়ে লাভজনক বলে মনে করি। আমার কোন ক্রীতদাস তো আমি বিক্রী করবো না। ওদের ওপরই আমাদের সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে।'

'কিন্তু সে কাঠামোর চেহারাও পালটাচ্ছে। মুক্তি পাওয়া নিগ্রোরা শহরে দিবারাত্র খেটে উপার্জনের পয়সায় নিজেদের জাতভাইদের মুক্তির ব্যবস্থা করছে। আমাদের মজুরের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আর এই মুক্তি পাওয়া নিগ্রোরাই তো বিদ্রোহের মূলে। রিচমণ্ডের সেই কামারের কথা ভুলো না।'

'সে সত্যি। কিন্তু আমার ধারণা—কড়া হাতে রাশ টানলে, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারলে সে ভয় থাকবে না। তখন এদের দিয়ে সমাজের উপকারই হবে। 'আজকাল দাস-ব্যবসায়ীদের বড় বাড় বেড়েছে। আমার কাছেই তিন চারজন এসেছিলো। আমার দাসেদের জন্য অভাবনীয় দাম দিতে চাইছে। কত বড় আস্পর্ধা!'

সেদিন ওয়ালার সাহেবের ক্রীতদাস বসতিতে সবাই জেনে গেলো—তাদের বিক্রী হয়ে যাবার ভয় নেই। সিস্টার ম্যানডি বললো—'মুক্তি পাওয়া নিগ্রোরা জাতভাইদের মুক্তির জন্য টাকা জমায় বুঝলাম। কিন্তু তারা নিজেরা প্রথমে মুক্তি পায় কী করে?'

ফিডলার বললো—'শহরে অনেক মালিক দাসেদের একটা বিশেষ বৃত্তি শেখান। তারপর তাদের ভাড়া খাটান। তাতে মালিকদের অনেক উপার্জন হয়। তার সামান্য অংশ তারা দাসেদেরও দিয়ে থাকেন। এই যেমন আমার মালিক আমাকে অন্য সাদা মানুষের পার্টিতে বাজাতে পাঠান। দশ পনেরো বৎসর খাটলে দাসেদের নিজস্ব রোজগার থেকে নিজের স্বাধীনতা কিনে নেবার টাকাটা অনেক সময় জমিয়ে ফেলা যায়। ভালো মালিক হলে দাসটিকে তিনি সেই টাকার বিনিময়ে মুক্তি দিয়ে দেন।'

সবাই উৎসুক হয়ে উঠলো।

কুণ্টা বললো—'তাই তুমি এত বাজাতে যাও?'

ফিডলার উত্তর দিলো—'সাদা মানুষের নাচ দেখতে ভালো লাগে বলে যাই।'

'নিজেকে কিনবার মতো টাকা জমেছে ?'

'জমলে কি আর আমাকে এখানে দেখতে পেতে ?'

হাস্য পরিহাসের ভেতর সেদিনকার সভা ভঙ্গ হলো।

কিছুদিন পর ফিডলার অতি দুঃসংবাদ নিয়ে এলো। ফরাসী যোদ্ধা নেপোলিয়ন নাকি এক জাহাজ সৈন্য পাঠিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কালোদের মুক্তিদাতা জেনারেল টোসাণ্টকে হারিয়ে দিয়ে হাইটি পুনর্দখল করেছেন। তারপর টোসাণ্টকে আহারের নিমন্ত্রণ জানিয়ে জাহাজে ডেকেছিলেন। সেখান থেকে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফরাসী দেশে নিয়ে গিয়েছেন। এই হীন ষড়যন্ত্রের সবটাই দুষ্টবুদ্ধি নেপো-লিয়নের মস্তিষ্ক উদ্ভূত। কুণ্টা খবর শুনে শোকে মুহ্যমান হয়ে ফিডলারের ঘরেই বসে ছিলো। অন্যরা চলে যাবার পর বেহালাবাদক বললো—'তোমার মনের অবস্থা বুঝছি। তবুও একটা কথা না বলে পারছি না।' তার মুখে উল্লাসের চিহ্ন দেখে কুণ্টা অত্যন্ত বিরক্ত হলো। এই কি আনন্দের সময় ?

কিন্তু ততক্ষণে অদম্য পুলক ও উত্তেজনায় ফিডলার বলে উঠেছে—'এতদিনে পেরেছি। আমার মুক্তিপণ এতদিনে পুরো হয়েছে। সেদিন সবার সামনে বলিনি। তখনো পুরো টাকাটা জমেনি। ন'শো বার সাদা মানুষের নাচের সাথে বাজিয়ে তবে টাকাটা জমাতে পেরেছি। পারবো বলে ভরসা করিনি। তাই কখনো কারো সাথে এ নিয়ে আলোচনাও করিনি, তোমার সাথেও নয়। অনেকদিন আগে মালিক বলেছিলেন—সাতশো ডলার পেলে তিনি আমাকে মুক্তি দেবেন। সে টাকাটা হয়েছে।'

কুণ্টা বজ্রাহতর মতো বসে রইলো।

ফিডলার তার তোষক ছিঁড়ে ভেতরের জিনিস মেঝেতে উপুড় করে দিলো। শত শত নোট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিছানার তলা থেকে একটা চটের বস্তা টেনে এনে ঢেলে দিলো। ঝনঝন করে নানা মূল্যের মুদ্রা বেরিয়ে এলো।

'কী আফ্রিকাবাসী, কিছু একটা বলবে, না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ?'

'কী বলবো বুঝতে পারছি না।'

'অন্ততঃ অভিনন্দন তো জানাও।'

'এতো ভালো খবর যে, বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ঠিক বলেছো। আমারই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। কিন্তু হাজার বার গুনেছি। একটু বেশীই আছে। একটা স্যুটকেশও কেনা যাবে।'

তবুও কুণ্টার প্রত্যয় হচ্ছিলো না। ফিডলার মুক্ত মানুষ হয়ে যাবে ? এ স্বপ্ন নয় তো ? সে উল্লাসে হাসবে কি কাঁদবে ঠিক করতে পারছিলো না।

ফিডলার নতজানু হয়ে দু'হাতের অঞ্জলিতে বার বার টাকাগুলো তুলে ধরছিলো। 'জান, তেত্রিশ বছর লেগেছে এটা জমাতে।'

পরদিন সকালে ঘোড়াকে দানাপানি দিয়ে কুণ্টা ফিডলারের ঘরে গেলো। ঘর শূন্য। সে কি মালিকের কাছে গেলো? বেলের কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলো—'সে এখান থেকে আধঘণ্টা আগেই চলে গিয়েছে। মালিকের সাথে তার কী দরকার ছিলো বলো তো ? কী হয়েছে তার ? মুখখানা ফ্যাকাশে, চোখের দৃষ্টি লক্ষ্যহীন। আমাকে তো দেখতেই পেলো না।'

কুণ্টা ক্রীতদাস বসতির সর্বত্র তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজলো। কোথায়ও নেই। অবশেষে পেছন দিকের শেষ সীমানায় বেহালাতে একটা করুণ স্বর শুনতে পেলো। ফিডলারের বাজনা সর্বদাই উচ্ছল স্বরের উল্লাসভরা নৃত্যের ছন্দ। এ তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

কুণ্টা দ্রুতপদে এগিয়ে গেলো। ওয়ালার সাহেবের জমির শেষপ্রান্তে একটা ওক গাছের অর্ধেকখানা ছোট্ট নদীর ওপর ডাল মেলে দেওয়া। গাছের নীচে বেহালাবাদকের জুতোসুদ্ধো পা ছড়ানো। বাজনা থেমে গেলো। কুণ্টার মনে হলো যেন সে অনধিকার প্রবেশ করেছে। অতি সন্তর্পণে গাছের পাশ দিয়ে গিয়ে সসঙ্কোচে বেহালাবাদকের মুখোমুখি হলো। তার বন্ধুর মুখ থেকে আলো নিভে গিয়েছে। সেই ঝিকিমিকি দ্যুতিময় চোখ দুটি মেঘে ঢাকা। কুণ্টাকে দেখেই দু'গালে ধারা নামলো।

'তাঁকে বললাম মুক্তিপণের পুরো টাকাটা জোগাড় করেছি। আমতা আমতা করতে লাগলেন। ঘরের ছাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষটায় বললেন ইদানীং ক্রীতদাসের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমার মতো ভালো বেহালা-বাদককে নাকি কম করে পনেরোশো ডলারের কমে ছাড়া যায় না—বাজারদর যেখানে পঁচিশ শো ডলার। বললেন—তিনি খুবই দুঃখিত। কিন্তু ব্যবসা তো ব্যবসার মতোই চালাতে হবে। যে মূলধন তিনি লাগিয়েছেন তার উচিত প্রতি-মূল্য পাওয়া চাই।' ফিডলার এবার অবাধে কাঁদতে লাগলো।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—'বেজন্মা! ছোটলোক!' হাতের বেহালাটা ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিলো। কুণ্টা ধরে ফেলবার আগেই সেটি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো।

আটান্ন

মিসি অ্যানের স্কুলের ছুটি শুরু হয়েছিলো। আজকাল সপ্তাহে দু'তিন দিন সে জ্যাঠার কাছে আসে। তার মানেই কিসির সাথে খেলা। কুণ্টা লক্ষ্য করছিলো ইদানীং ওদের স্কুল স্কুল খেলাটাই বেশী চলছিলো। মিসি অ্যান মাস্টারমশায়, কিসি ছাত্রী। সাদা মানুষের ভাষা শেখাটা কুণ্টার অসহ্য মনে হলেও কিসির দ্রুত শিখে নেবার ক্ষমতা দেখে কুণ্টার গর্ব হতো। ওকে আরবী শেখালে কেমন হয়? না, না। ধরা পড়ে গেলে মহাবিপদ হবে। মিসি অ্যানের মাস্টারী, ওদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সব কিছুর সমাপ্তি হবে। সেটা অবশ্য ভালোই। কিন্তু সেখানেই শেষ হবে কি? মালিক আরো কী শাস্তি দেবেন কে জানে।

ছুটি ফুরিয়ে যেতে মিসি অ্যানের আসাযাওয়া কমে গেলো। কিন্তু কিসির পড়া বন্ধ হলো না। রাতে কুণ্টা যখন ফায়ার প্লেসের পাশে দোলনা চেয়ারে বসে থাকতো, বেল যখন কিছু বুনতো বা সেলাই করতো, কিসি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একমনে ছেঁড়া খবরের কাগজ বা মিসি অ্যানের দেওয়া একটা বই দেখে লেখা মকশ করতো। মাকেও শেখাতে চেষ্টা করতো। 'এই যে, দেখ মা—এটা 'এ'। আর এটা হলো 'ও'—একটা ছোট্ট গোল। এটা ডগ। এটা ক্যাট। এটা কিসি। আর এটা হলো তোমার নাম বি ই এল এল।'

ঘুমন্ত কিসির মুখের দিকে তাকিয়ে বেল একদিন গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখে বললো—'এটা তামাসার কথা নয়। ও যে আমার চেয়েও বেশী লিখতে পড়তে শিখে গিয়েছে।—জানি না এতে কোন বিপদ ঘটবে কিনা। ভগবান রক্ষা করুন।'

ক্রমশঃ মিসি অ্যানের আসাযাওয়া কমে এলো। কুণ্টা লক্ষ্য করছিলো—দু'টি মেয়ের অন্তরঙ্গতায়ও যেন একটু চিড় খেয়েছে। মিসি অ্যান কিসির থেকে চার বছরের বড়। সে আর বালিকা নেই। নারীত্বে উপনীত হয়েছে।

তার ষোলো বছরের জন্মদিনের তিন দিন আগে জেদী, বদমেজাজী মিসি অ্যান রাগে টগবগ করতে করতে জ্যাঠার বাড়ী এসে হাজির। ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখের পাতা কাঁপিয়ে, অশ্রুর বন্যা বইয়ে, জ্যাঠার জামার হাত ধরে টানাটানি করে তার নালিশ জানালো। মা তার সেই সপ্তাহব্যাপী মাথার যন্ত্রণার বাহানা ধরেছেন। আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয় মিসি অ্যানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা! এবার জ্যাঠার বাড়ীতেই তার জন্মদিন করা হোক্। ওয়ালার সাহেব ভাইঝির কোন আবদারই না রেখে পারতেন না। কাজেই রুজবীর কাজ হলো নিমন্ত্রিত যত কিশোর

কিশোরীকে অনুষ্ঠানের ঠিকানা বদলের খবর দেওয়া। বেল এবং কিসিরও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হরেক রকম প্রস্তুতির ব্যস্ততায় কাটলো। অতিথিরা এসে পৌঁছোবার পূর্বমুহূর্তে নতুন পোষাক পরিয়ে দিতেও সেই কিসি।

অথচ নিমন্ত্রিতদের প্রথম গাড়ীটি এসে পৌঁছোনো মাত্রই মিসি অ্যানের ভাবান্তর দেখা গেলো। শক্ত মাড় দেওয়া ইউনিফর্ম পরা কিসি অতিথিদের মাঝে সরবৎ বিলি করছিলো। মিসি অ্যান যেন তাকে চিনতেই পারছিলো না। কাজ শেষ করে ঘরে এসে কিসি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো। মিসি অ্যান যেদিন থেকে শিশু কিসিকে নিয়ে খেলা করছে, সেদিন থেকেই কুণ্টার রাগ। বারো বর্ষাকাল সে আল্লাহের কাছে এ দুজনের নিবিড় সম্পর্ক শেষ করে দেবার প্রার্থনাই জানিয়েছে। কিন্তু আজ কিসির হৃদয়ের গভীর আঘাতে সে নিজেও আহত, অপমানিত বোধ করছিলো। তবুও সম্ভবত এর প্রয়োজন ছিলো। এর থেকে যদি মেয়ের শিক্ষা হয়। বেলের মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো বিশ্বাসঘাতক মিসি অ্যানের প্রতি তার সেই গাত্র-দাহকারী অন্ধ অনুরাগ এবার সত্যি ঘা খেয়েছে।

মিসি অ্যানের জ্যাঠার কাছে আসা কমে গিয়েছিলো। রুজবীর কাছে জানা গেলো তার অসংখ্য অনুরাগী জুটেছে।

এখানকার আকর্ষণ তাই স্বভাবতই কমে গিয়েছে। জ্যাঠার কাছে এলে অবশ্য কিসির সাথেও দেখা করতো। কখনো বা হাতে করে নিজের একটা পুরোনো পোষাক কিসির জন্য নিয়ে আসতো। কিসি বয়সে ছোট হলেও গড়নে বাড়ন্ত। কিন্তু সেই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আর ছিলো না। ওদের মাঝে কথাবার্তা কোন অলিখিত নিয়মেই যেন আধঘণ্টার বেশী আর চলতো না।

কিসি তার ঘরে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। এতে তার এতটা পারদর্শিতা কুণ্টার পছন্দ নয়। কিন্তু এতদিনের বন্ধু সে সদ্য হারিয়েছে। সে দুঃখ যদি এই নিয়ে কিছু-দিন ভুলে থাকে তবে থাক্ না। তার কিসিও অবশ্য বড় হচ্ছে। ভবিষ্যতে পিতা পুত্রীর মাঝে সম্পর্কের স্বচ্ছন্দতা থাকবে তো, না সেখানেও সমস্যার সৃষ্টি হবে?

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের পর প্রচুর বরফ পড়েছিলো। পথে গাড়ী কমই চল-ছিলো। নিতান্ত জরুরী ডাক ছাড়া ওয়ালার সাহেবও বেরোচ্ছিলেন না। কোথায়ও যেতে হলে ঘোড়ার পিঠে ছাড়া যাবার উপায় ছিলো না। কুণ্টা, কাটো, নোয়া, বেহালাবাদক—সবাই বাড়ীর সামনে থেকে বরফ সরাতে আর কাঠ কাটতে ব্যস্ত। সমস্ত ফায়ার প্লেস দিবারাত্র জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছিলো।

বরফের জন্য খবরের কাগজও আসছিলো না। সর্বশেষ খবর—সাহেবরা প্রেসি-

ডেণ্ট জেফারসনের কাজকর্মে খুব খুশী। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর খরচ কমানো হয়েছে। বাজারে সরকারের ঋণের পরিমাণ কমেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ট্যাক্স তুলে দেওয়া হয়েছে। এই শেষের সিদ্ধান্তটিতেই আবাদের মালিকশ্রেণীর লোকেদের সবচেয়ে উল্লাস। অবশ্য সর্বশ্রেণীর শ্বেতকায়দের সবচেয়ে উত্তেজনা ছিলো লুইজিয়ানা রাষ্ট্র কেনা নিয়ে। প্রেসিডেণ্ট জেফারসন একর প্রতি মাত্র তিন সেণ্ট দামে এই বিশাল ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন। এটি ফরাসীদেশের সম্পত্তি ছিলো। নেপোলিয়ন অত্যন্ত সস্তাদরে এটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। হাইটিতে টোসাণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে পঞ্চাশ হাজার ফরাসী সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিলো। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। দেশের গুরুতর আর্থিক সমস্যা মেটাবার জন্যই নেপোলিয়নকে লুইজিয়ানা বিক্রী করতে হয়েছিলো।

এই শেষের খবরটিতে ক্রীতদাসেরাও পুলকিত। কিন্তু তাদের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। খবর পাওয়া গেলো—জেনারেল টোসাণ্ট ফরাসীদেশের কোন পার্বত্য অঞ্চলে একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বন্দীশালায় ঠাণ্ডায় ও অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে।

কয়েকদিন পর কুণ্টা বাইরে থেকে জুতোর বরফ ঝেড়ে এক কাপ গরম স্যুপ খাবে বলে ঘরে ঢুকেছিলো। হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে লক্ষ্য করলো কিসি সামনের ঘরের গদিতে শুয়ে আছে। মুখখানা শুকনো।

কিসি ঋতুমতী হয়েছে। দীর্ঘ তেরো বৎসর ধরে সে কুণ্টার চোখের সামনে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছিলো। তার দেহ ক্রমে পরিপূর্ণ ও নিটোল হয়ে উঠ-ছিলো। শীঘ্রই তার বালিকা বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এ কথা বুঝেও যেন সে এ পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলো না। এত দিনে সে লক্ষ্য করলো কবে তার ক্ষুদ্র কন্যাটির শীর্ণ দেহলতা অলক্ষিতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তার চলনভঙ্গীতে আর বালিকাসুলভ চপলতা নেই, তার পরিবর্তে ব্রীড়ানম্র লালিত্য এসেছে। পিতা ও কন্যার মাঝে কোথা হতে কুণ্ঠা এসে উপস্থিত হলো।

নোয়া, কাটো এবং ফিডলারের সাথে বরফ সরাতে সরাতে কুণ্টা এই নতুন পরিস্থিতির কথাই ভাবছিলো। আফ্রিকাতে কন্যা বড় হলে মা তাকে প্রসাধন করতে শেখায়। শিয়া গাছের তেল মালিস করে ত্বক উজ্জ্বল করা হয়। ঠোঁট, হাত ও পায়ের পাতা পোড়া বাসনের কালি দিয়ে ঘষে কৃষ্ণতর করা হয়। কিসির এই বয়স থেকেই সেখানে মেয়েরা সম্ভাব্য পাত্রদের আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। কুণ্টা আফ্রিকায় থাকলে পিতা হিসাবে তারও কিছু কর্তব্য ছিলো। উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করা এবং কন্যাপণ স্থির করা পিতারই কর্তব্য। কিন্তু এই সাদা মানুষের

দেশে ওসব কথা চিন্তাও করা যায় না। সেখানে ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের ভেতর। আর এ দেশে বর ও কনে প্রায় সমবয়স্ক। কিসির উপযুক্ত পাত্রই বা এখানে কোথায়? এক নোয়া আছে। নোয়াকে তার ভালোই লাগে। কিসির থেকে দু'বৎসরের বড়। এই পনেরো বৎসর বয়সেই সে সবল, স্বাস্থ্যবান, পরিণত বুদ্ধি ও দায়িত্বশীল। কিন্তু এদের দু'জনের পরস্পর সম্পর্কে কোন আগ্রহ সে কখনো দেখেনি। অবশ্য সে বিষয়ে তার কিছু করবার নেই। আল্লাহ যাতে ওদের উচিত পরিণতির দিকে নিয়ে যান, সে তাই প্রার্থনা করবে।

উনষাট

ঘরে ফিরবার পথে কুণ্টা শুনতে পেলো বেল কিসিকে বকাবকি করছে—'এখনো ষোলো বছর পূর্ণ হয়নি, এর মাঝেই খুব লেজ গজিয়েছে, না? নোয়ার সাথে এত মাখামাখি কীসের? বাবা শুনলে কী ভাববেন?'

সত্যি কি তাহলে তাদের মাঝে কিছু বোঝাপড়া হয়েছে? এতদিন কি তারা নিজের মনের ভাব সকলের কাছে গোপন রেখেছিলো? বেলের মতে পনেরো বছরের মেয়ে বিয়ের পক্ষে বেশী ছোট। এ বিষয়ে কুণ্টাও অবশ্য আর আফ্রিকা-বাসীর মতো চিন্তা করছিলো না। কিসির বিয়ে হয়ে যাবে বা সে আফ্রিকার মেয়েদের মতো অল্পবয়সেই গর্ভবতী হয়ে ঘুরে বেড়াবে কোন কল্পনাটাই তার কাছে বিশেষ সুখের ছিলো না।

তবে নোয়াকে বিয়ে করলে কিসির সন্তান অবিমিশ্র কৃষ্ণকায় হবে, সেটা খুবই সন্তোষজনক ব্যাপার। তার চোখের সামনে কিসি বা ক্রীতদাস বসতির অন্য কোন মেয়ের সাদা মানুষ দ্বারা অত্যাচারিত হ'বার দুর্ঘটনা ঘটেনি—এ আল্লাহের অসীম কৃপা। তার চেয়ে ভয়াবহ ও ঘৃণ্য অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারতো? অবশ্য ওয়ালার সাহেবেরও সাদা ও কালোদের রক্তের সংমিশ্রণে ঘোরতর আপত্তি। এ কথা তিনি তাঁর বন্ধুদের বহুবার বলেছেন।

পরের কয়েক সপ্তাহ কুণ্টা কিসি ও নোয়াকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে রাখলো। উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়লো না। তবে কিসি একা থাকলেই আজকাল গুনগুন করে গান গাইছে। আর ওদের দুজনের দেখা হলে মৃদু হেসে মাথা নাড়ছে। নিজেদের প্রেম ওরা সুকৌশলে গোপন রেখেছে—এটা খুবই সম্ভব। কুণ্টা অনুভব

করছিলো—কিছুদিন যাবৎ নোয়াও তাকে নজরে রাখছে—যেন কী একটা কথা বলবার সুযোগ খুঁজছে।

এপ্রিল মাসের এক রবিবার বিকালে কুণ্টা গোলাবাড়ীর সামনে গাড়ী পালিশ করছিলো—এমন সময় মুখ তুলে দেখলো কৃষ্ণকায় ছিপছিপে দেহ নোয়া বড় বড় নির্ভীক পা ফেলে তারই দিকে আসছে।

সে দ্বিধাহীন কণ্ঠে কুণ্টার দিকে তাকিয়ে বললো—'আপনাকে ছাড়া কাউকেই বিশ্বাস করে আমার কথা বলতে পারছি না, অথচ কাউকে তো আমার জানাতেই হবে। এ ভাবে আর আমি থাকতে পারছি না। আমি পালাতে চাই।'

স্তম্ভিত কুণ্টা বাকশক্তি হারিয়ে ফেললো। এ কঠিন সঙ্কল্পের কী ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে পারে নোয়ার কি ধারণা আছে? কোনক্রমে উচ্চারণ করলো—'কিসিকে সাথে নিয়ে যেয়ো না।'

'না, ওকে আমি কোন বিপদে ফেলবো না।'

কুণ্টা অপ্রতিভ হয়ে এবার সহজ কণ্ঠে বললো—'পালাবার ইচ্ছা কোন এক সময় সকলেরই হয়। সেটা স্বাভাবিক।'

নোয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো—'কিসির কাছে শুনেছি, আপনি চারবার পালাবার চেষ্টা করেছিলেন?'

কুণ্টা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লো। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিলো না মন কোন সুদূরে উধাও হয়েছে। নোয়ার বয়সে সদ্য এ দেশে এসে সে তো দিবারাত্র পালাবার কথাই চিন্তা করতো। প্রতিমুহূর্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। আর সেই প্রতীক্ষা কী অসহ্য যন্ত্রণাময় ছিলো! নোয়ার কথা শুনে মনে হয়, কিসি তার পালাবার পরিকল্পনা জানে না। সাদা মানুষের মেয়েটার সাথে বিচ্ছেদে কিসি সদ্য কষ্ট পেয়েছে। নোয়া চলে গেলে আবার তাকে দুঃখ পেতে হবে—এ খেয়ালটাও একঝলক মনে খেলে গেলো। কিন্তু উপায় নেই। যাই হোক, নোয়ার সাথে একটু ভেবে চিন্তে কথা বলা দরকার।

'তোমার পালানো উচিত হবে কিনা, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এর সম্ভাব্য পরিণামগুলো জেনে রাখা দরকার। ধরা পড়লে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছো?'

'ধরা যাতে না পড়তে হয়, সে চেষ্টাই তো করছি। শুনেছি রাতে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে উত্তরের পথে চলতে হয়। দিনে স্বাধীন নিগ্রো বা কোয়কার সাদা মানুষেরা আশ্রয় দেবে। একবার ওহাইয়োতে পৌঁছোতে পারলেই তো মুক্তি।'

কুণ্টা চরম বিস্ময়ে হতবাক হলো। এত অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ! পালানো কি এতই সহজ? তবে নোয়া তো একেবারেই ছেলেমানুষ। তার নিজেরও ঐ বয়সে এরকম অপরিণতবুদ্ধি ছিলো। যেসব ক্রীতদাসেরা ক্ষেতের কাজ করে তাদের নিজেদের আবাদের বাইরে পা দেবার সুযোগ হয় না। তাই অজানা পথে পা বাড়িয়ে অচিরেই তারা ধরা পড়ে। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, অর্ধভুক্ত অবস্থায় সর্পসঙ্কুল জলা-ভূমিতে বা কাঁটা ঝোপের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে। চকিতে কুণ্টার নিজের অভিজ্ঞতা মনে পড়লো। সেই পালাবার চেষ্টায় ছুটে বেড়ানো, কুকুর, বন্দুক, চাবুক আর কুঠারাঘাত—এক লহমায় চলচ্চিত্রের মতো মনে ভেসে উঠলো।

'তুমি কী বলছো, জান না। অত সহজ নয়। তারা ব্লাড হাউণ্ড কুকুর লেলিয়ে দেয়। তা জান?'

নোয়া ঝটিতি পকেট থেকে ছুরি বার করলো। 'কুকুর আমার হাতে খুন হয়ে যাবে। না, ওসব বাধা আমি মানবো না।'

'ঠিক আছে। যদি সে বিশ্বাস থাকে তবে পালাও।' আবার একটু সঙ্কোচের সাথে বললো—'কিসিকে এর মাঝে জড়িয়ো না কিন্তু।'

নোয়া কিছু মনে করলো না। স্থির দৃষ্টিতে কুণ্টার দিকে তাকিয়ে বললো—'না, জড়াবো না। কিন্তু উত্তরে গিয়ে স্বাধীন হয়ে উপার্জন করবো। কিসির মুক্তিপণ আমিই সংগ্রহ করবো।' একটু থেমে আবার বললো—'কিসিকে আপনি কিছু বলবেন না। আমিই তাকে ঠিক সময়ে জানাবো।'

কুণ্টা সাগ্রহে এই নবীন যুবকের হাতটি নিজের দুই হাতে টেনে নিলো। 'তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক্।'

সে রাত্রে আগুনের সামনে বসে কুণ্টার মন আবার কোন শূন্যে নিরুদ্দেশ হলো। তার লক্ষ্যহীন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বেল ও কিসি নিজেদের কাজে মগ্ন হলো। তারা বুঝেছিলো সেদিন কুণ্টার সাথে কথা বলা নিষ্ফল। কুণ্টা স্থির করলো পরদিন প্রভাতে আল্লাহের কাছে নোয়ার সৌভাগ্য প্রার্থনা করবে। চোখ দুটি একবার তার অতি আদরিণী কন্যার মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো। সাদা মানুষের দেশে প্রতিটি কালোর জীবন বেদনার ইতিহাস। কিসিকে যদি সে এ বেদনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারতো!

ষাট

কিসির ষোলো বৎসরের জন্মদিনের এক সপ্তাহ পরে অক্টোবরের প্রথম সোমবার ভোরবেলা ক্ষেতে কাজ করবার ক্রীতদাসেরা দিনের শুরুতে একত্র হচ্ছিলো। কাটোর ওপর ক্ষেতের কাজ দেখাশোনার ভার। সে জিজ্ঞেস করলো, 'নোয়া কোথায়?' কুণ্টা কাছেই ছিলো। সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো—নোয়া পালিয়েছে। কিসির ওপর দৃষ্টি ফেলতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

নোয়ার মা আডা বললো—'আমি ভেবেছি সে সকালেই তোমার সাথে বেরিয়েছে।'

'না, আমি ভাবছিলাম ঘুম ভাঙেনি! দেরী করে উঠবার জন্য বকবো।'

নোয়া তার আঠারো বৎসরের জন্মদিনের সময় থেকে বুড়ো মালীর খালি ঘরটিতে থাকছিলো। কাটো সেখানে গিয়ে দরজায় সজোরে আঘাত করলো—'নোয়া!' কেউ নেই। ক্রীতদাস বসতির প্রতিটি ঘর, স্নানের জায়গা, ভাঁড়ার ঘর, ক্ষেতে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো।

চারদিকে লোক ছুটলো। কুণ্টা গোলাবাড়ীর দিকে গিয়ে সবাইকে শুনিয়ে 'নোয়া। নোয়া।' বলে কয়েকবার চিৎকার করলো। পশুগুলো সেই আকস্মিক হাঁকডাকে খাবার থেকে মুখ তুলে অবোধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো। কুণ্টা চকিত দৃষ্টিতে একবার চারদিক দেখে নিয়ে নির্জনে আর একবার আল্লাহের কাছে নোয়ার সাফল্য কামনা করলো।

কাটো উদ্বিগ্ন মনে বাকী কর্মীদের ক্ষেতে পাঠিয়ে দিলো।

বেহালাবাদক কুণ্টাকে বললো—'মনে হচ্ছে, পালিয়েছে।'

বেল মন্তব্য করলো—'তার তো কখনোই কাজে গাফিলতি দেখিনি।'

গত্যন্তর না দেখে কাটো বললো—'এবার যে মালিককে জানানো দরকার। ঈশ্বর জানেন কী হবে!'

বেল আর একটু অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিলো—'দেখি, ছেলেটা যদি ভয় পেয়ে ফিরে আসে। আমি ততক্ষণে সাহেবকে সকালবেলার খাবারটা দিই।'

বেল সেদিন বিশেষ যত্ন সহকারে সাহেবের প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করলো। তিনি যা কিছু খেতে ভালোবাসেন—পরিপাটি করে তৈরী করে দিলো। তাঁর দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। তারপর আর উপায় কী?

অনেক ঢোক গিলে কোন ক্রমে কথাগুলো বার করলো। 'মালিক, কাটো আপনাকে জানাতে বলেছে, নোয়াকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

সাহেব কাপ নামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললো—'কোথায় সে ? মদ খেয়ে কোথায়ও গড়াচ্ছে, নাকি অন্য আবাদের ছুকরির পেছনে ছোটাছুটি করছে ? ফিরে আসবে তো ? সত্যি পালাবার ফন্দী করেনি, আশা করি।'

বেল কাঁপতে কাঁপতে বললো—'জানি না মালিক। সব জায়গায় খোঁজা হয়েছে। কোথায়ও পাওয়া যায়নি।'

ওয়ালার সাহেব সমনোযোগে কাপের কারুকার্যটুকু দেখতে দেখতে বললেন—'কাল সকাল পর্যন্ত তাকে সময় দিচ্ছি। তারপর দেখবো।'

'সাহেব সে খুব ভালো ছেলে। এখানেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। কখনো তো কোন ঝামেলা করেনি।'

ওয়ালার সাহেব স্থির দৃষ্টিতে বেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'পালাতে চেষ্টা করলে কপালে দুঃখ আছে।'

বেল ঘর ছেড়ে পালালো।

কাটো ও বেহালাবাদক ক্ষেতের কাজে চলে যেতে সাহেবও রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলেন। সারাদিন গাড়ী চালাতে চালাতে কুণ্টার মিশ্র মনোভাব হচ্ছিলো। কখনো সে নোয়ার মুক্তির আশায় উল্লাস বোধ করছিলো। কখনো বা কাঁটা ঝোপ আর কুকুরের কথা ভেবে ভয়ে শিহরিত হচ্ছিলো। কিসি নীরবে যে আশা-নিরাশার উৎকণ্ঠা ও গভীর বেদনা বহন করছিলো তাও তার মনে কাঁটার মতো বিঁধছিলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ক্রীতদাস বসতির সকলেই উদ্বেগ ও শঙ্কায় মুহ্যমান। নোয়ার মা আডা সারাদিন চোখের জলে ভেসেছে—'বাছা আমার, পালাবার কথা কখনো তো আমায় বলেনি। না জানি সে কোথায়! ঈশ্বর, আমার কী উপায় করবেন! তোমাদের কী মনে হয়? সাহেব কি ওকে বিক্রী করে দেবেন?'

মায়ের প্রাণের সে আশঙ্কার কোন উত্তর ছিলো না।

কিসি ঘরে ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়লো। বেল তাকে জড়িয়ে ধরলো। কুণ্টা অসহায় বেদনায় তাকিয়ে রইলো।

মঙ্গলবার সকালেও নোয়ার খবর নেই। সাহেব কুণ্টাকে স্পটসিলভেনিয়ার শেরিফের দপ্তরে গাড়ী চালাতে আদেশ দিলেন। সেখানে কথা হয়ে গেলে শেরিফ তাঁর গাড়ীতেই উঠলো। পথে কোথায় তাকে নামিয়ে দিতে হবে। গাড়ীতে উঠেই শেরিফ কথা শুরু করলো—'আজকাল এত নিগ্রো পালাচ্ছে, হদিস রাখা দায়! দক্ষিণে বিক্রী হয়ে যাবার থেকে তারা বরঞ্চ পালাবার ঝুঁকি নিতে রাজী।'

'আমার আবাদে নিয়মকানুন না ভাঙলে আমি কখনো কাউকে বিক্রী করি না। আমার ক্রীতদাসেরা তা ভালো করেই জানে।'

'ডাক্তার সাহেব, নিগ্রোরা ভালো মনিবের কদর বোঝে না। এ ছেলেটার মাত্র আঠারো বছর বয়স বললেন। ওর মাও আপনার ওখানেই আছে বলছেন। কাছাকাছি ওর চেনাশোনা আর কেউ থাকে বলে জানেন ? কোন বান্ধবী জুটে যায়নি তো ?'

'আমি ঠিক জানি না। আমার রাঁধুনীর একটি অল্পবয়সী মেয়ে আছে। জানি না তাদের মাঝে কিছু আছে কিনা।'

কুণ্টার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। ওয়ালার সাহেব বলে চললেন—'অন্য আবাদে কারো কাছে গিয়েছে, বা মারামারি করে কোথায়ও পড়ে আছে কিনা জানি না। গরীব সাদা মানুষেরা আজকাল ক্রীতদাস চুরি করছে। তাদের হাতেও পড়ে থাকতে পারে। আজকাল তাও হয় শুনেছি।'

'আপনি বলছেন ছেলেটি আপনার ওখানে জন্মেছে। আগে কখনো বাইরে যায়নি। তাহলে কয়েক রাত জঙ্গলে ঘুরে ক্ষিধের জ্বালায় নিজেই ঘরে ফিরে আসতে পারে। নিগ্রোরা ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। ক্রীতদাস ধরে আনবার জন্য কুকুর নিয়ে লোক প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় না—আপনার তাদের সাহায্য নিতে হবে।'

'তাই আশা করছি। তবে এ ছেলেটি যখন অনুমতি না নিয়ে বাইরে গিয়ে নিয়ম ভেঙেছে, তখন একে আমি আর নিজের কাছে রাখবো না। এখনই দক্ষিণে বিক্রী করে দেবো।'

ঘোড়ার লাগামে কুণ্টার মুঠি উদ্বেগে দৃঢ় হয়ে উঠেছিলো। নখ যেন হাতের তালুতে বিঁধে যাচ্ছিলো।

'তার মানেই বারোশো থেকে তেরোশো ডলার। ঠিক আছে। আমার কাছে তো তার চেহারার বর্ণনা রইলো। কোন খবর পেলেই আপনাকে জানাবো।'

শনিবার সকালে প্রাতঃরাশের পর কুণ্টা ঘোড়ার পরিচর্যা করছে, এমন সময় মনে হলো ক্ষেত থেকে কাটোর সঙ্কেতমূলক শিস্ শোনা গেলো। কুণ্টা উৎকর্ণ হয়ে আবারও সেটা শুনতে পেলো। কী ব্যাপার! ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে তাড়াতাড়ি ঘরে এলো। বড় বাড়ীর রান্নাঘর থেকে বেল এবং কিসিও নিশ্চয় সঙ্কেতধ্বনি শুনতে পেয়েছে। একটু পরে দেখা গেলো পেছনে দরজাওয়ালা একটা বড় গাড়ী বাড়ীর চৌহদ্দিতে ঢুকছে। ঘোড়া চালাচ্ছে স্বয়ং শেরিফ। সর্বনাশ! হে দয়াময়,

নোয়া কি ধরা পড়েছে ? শেরিফ নেমে এসে একসাথে দু'সিঁড়ি লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে গেলো। কুণ্টার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পেছনের দরজা দিয়ে বেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর ছুটতে শুরু করলো। ঘরের দরজা সজোরে খুলে সে ভেতরে ঢুকবার আগেই ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কায় কুণ্টার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গিয়েছিলো।

বেল অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—'শেরিফ আর মালিক যে কিসিকে ডেকে নিয়ে তার সাথে কথা বলছেন!'

খবরটা কুণ্টাকে অবশ করে ফেললো। মুহূর্তকাল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে দু'হাতে বেলকে চেপে ধরে ঝাঁকুনি লাগালো—'কেন, কী চান তাঁরা ?'

কথা বলতে বলতে রুদ্ধ আবেগে বেলের কণ্ঠস্বর কখনো ভেঙে পড়ছিলো, কখনো বা ত্রাসে তীক্ষ্ণ উচ্চ হয়ে উঠছিলো। বেল পাশের ঘর থেকে তাঁদের কথা-বার্তা শুনতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। শুধু বোঝা যাচ্ছিলো মালিক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। একটু পরেই মালিক ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে ডেকেছেন। এমন ভয়ানক কঠিন দৃষ্টি তাঁর চোখে বেল আগে কখনো দেখেনি। তিনি বেলকে বড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন—প্রয়োজন হলে তিনি তাকে ডেকে পাঠাবেন।

বেলের চোখে উন্মাদের দৃষ্টি—'ঈশ্বর! শেরিফ কেন আমার মেয়েকে ডেকে পাঠালো ?'

কুণ্টা কী করবে স্থির করতে পারছিলো না। ক্ষেতে গিয়ে সবাইকে জানাবে ? না, সে কোথায়ও যেতে পারবে না। তার অনুপস্থিতিতে কী ঘটে যাবে কে জানে!

সহসা বেল চিৎকার করে উঠলো—'না! আমি যাবো সেখানে!' ছুটে বেরিয়ে গেলো। কুণ্টাও তার পেছন পেছন গিয়ে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়ালো। রান্নাঘর খালি—ভেতরে ঢুকে অন্যদিকের দরজায় কান পাতলো। নিজের বুকের উন্মত্ত দাপাদাপি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিলো না। একটু পরে বেলের ভীরু, মৃদু কণ্ঠ শোনা গেলো 'মালিক!' পরে, আরো জোরে, তীক্ষ্ণ উদ্বেগের স্বরে—'মালিক!' বসবার ঘরের দরজা খুলবার শব্দ হলো। 'আমার কিসি কোথায়, মালিক ?'

মালিক কঠিন স্বরে বললেন—'সে আমার হেফাজতে আছে। আর কেউ যাতে পালাতে না পারে, সেটাই দেখছি।

বেল অতি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেছিলো—'মালিক, আমি কিছুতেই বুঝতে

পারছি না। কিসি তো শিশুমাত্র। সে কখনো আপনার প্রাঙ্গণের বাইরে পা দেয়নি।' কুণ্টাকে বহুকষ্টে কান পেতে তার কথা শুনতে হচ্ছিলো।

ওয়ালার সাহেব কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর বললেন—'হয়তো তুমি সত্যি কিছু জান না। নোয়া ধরা পড়েছে। তার কাছে বাইরে যাবার জাল অনুমতি পত্র ছিলো। দু'টি পাহারাদার ওটা মিথ্যা বলে ধরে ফেলেছিলো বলে নোয়া তাদের ছুরি মেরেছে। মারের চোটে স্বীকার করেছে সে অনুমতি পত্র আমার দেওয়া নয়। সেটা তোমার মেয়ের হাতের লেখা। তোমার মেয়েও শেরিফের কাছে তা স্বীকার করেছে।'

এক দীর্ঘ মুহূর্তের যন্ত্রণাগর্ভ নিস্তব্ধতা। তারপরই সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ ও দ্রুত পদধ্বনি। কুণ্টা দরজা খুলতেই বেল অমানুষিক শক্তিতে তার হাত টেনে ধরে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

'মালিক, কিসিকে বিক্রী করে দেবেন! আমি জানি।'—বেল উন্মত্তের মতো চিৎকার করতে লাগলো। কুণ্টার হৃদয়ের ভেতরে কী একটা যেন অকস্মাৎ ভেঙে দু'খণ্ড হয়ে গেলো। 'আমি তাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি'—বলে সে ছুটতে ছুটতে ফিরে গেলো। পেছনে বেল। প্রচণ্ড ক্রোধে হুতাশনের মতো জ্বলতে জ্বলতে কুণ্টা বড় বাড়ীর পেছন দিকের দরজা খুলে তার অধিকার-বহির্ভূত এলাকার নিষেধ অগ্রাহ্য করে হলঘরের ভেতর দিয়ে ছুটলো। বসার ঘরের দরজা সশব্দে খুলে ফেলতে মালিক ও শেরিফ চরম বিস্ময়ের সাথে ফিরে তাকালেন। জিঘাংসার আগুনে প্রজ্বলন্ত চোখে কুণ্টার গতিও রুদ্ধ হলো। তার পেছন থেকে বেল চেঁচিয়ে উঠলো—'আমাদের মেয়ে কোথায়? আমরা তাকে নিতে এসেছি।'

শেরিফের হাত তার পিস্তলের দিকে এগিয়ে গেলো। ওয়ালার সাহেব গর্জে উঠলেন—'বেরিয়ে যাও!' শেরিফ এর পর পিস্তল ছুঁড়তে উদ্যত হলো—'শুনতে পাচ্ছো না নিগ্রোর দল?'

কুণ্টা পিস্তলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমন সময় বেলের কম্পিত কণ্ঠ শুনতে পেলো—'হ্যাঁ, স্যর!' সে মরিয়া হয়ে কুণ্টার হাত ধরে টানছিলো। পিছোতে পিছোতে দরজা পার হতেই তাদের দু'জনের মুখের ওপর দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো, ভেতরে চাবি দিয়ে বন্ধ করে দেবার শব্দ হলো।

কুণ্টা নিজের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা ও অসীম লজ্জায় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রুদ্ধ দ্বারের ওপারে উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ পাচ্ছিলো! তারপরেই পায়ের শব্দ, কিসির কান্না ও সদর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ। বেল হাহাকার করে

উঠলো—'কিসি! কিসিসোনা। হায় ঈশ্বর, কিসিকে যেন মালিক বিক্রী না করে দেন।'

বেল ও কুণ্টা পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোলো। বেলের তীব্র আর্তনাদে ক্ষেতের মজুররাও ছুটে এসেছিলো। কাটো এসে দেখলো বেল মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে পাগলের মতো আচরণ করছে। কুণ্টা বহু চেষ্টাতেও তাকে সামলাতে পারছে না। এমন সময় ওয়ালার সাহেব সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। পেছনে শেরিফ। তার পেছনে শেকল দিয়ে বাঁধা কিসি। কিসি কাঁদতে কাঁদতে পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে শেকল টেনে ছিঁড়তে চেষ্টা করছিলো। মাকে দেখে সে চিৎকার করে উঠলো—'মা! মা-আ-আ!' বেল এবং কুণ্টা মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে আক্রমণোদ্যত সিংহের মতো সবেগে সেদিকে ছুটে গেলো। শেরিফ তার পিস্তল সোজা বেলের দিকে তাক করলো। বেল থেমে গিয়ে কিসির দিকে তাকালো। বহুকষ্টে প্রশ্ন করলো—'ওঁরা যা বলছেন, তুমি তাই করেছো?' নিমেষে সকলের দৃষ্টি কিসির অপরিসীম যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখের ওপর নিবদ্ধ হলো। রোদনাকুল রক্তাক্ত চক্ষু দু'টি অকথিত ভাষায় সে প্রশ্নের উত্তর দিলো। তার আর্ত, ভীত দৃষ্টি বেল ও কুণ্টার থেকে শেরিফ ও মালিকের মুখের ওপর অসহায় ব্যাকুল আবেদনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

বেলের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো—'হায় ঈশ্বর! মালিক, দয়া করুন মালিক। সে না বুঝে এ কাজ করেছে। কী করেছে নিজেই জানে না। মিসি অ্যান ওকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলো।'

ওয়ালার সাহেব তুষারশীতল কণ্ঠে উত্তর দিলেন—'আইন অনড়। সে আমার নিয়ম ভেঙে গুরুতর অপরাধ করেছে। তাছাড়া হয়তো হত্যার সহায়তাও করেছে। শুনছি একজন পাহারাদারের মৃত্যু হতে পারে। সাদা মানুষকে মারা অমার্জনীয় অপরাধ।'

'আমার মেয়ে তো তাকে মারেনি। মালিক! মালিক! এতটুকু বয়স থেকে এ মেয়ে আপনার সেবা করছে। আমি চল্লিশ বছর যাবৎ সর্বান্তঃকরণে আপনার সেবা করছি।' কুণ্টাকে দেখিয়ে বললো—'আপনার দিনে রাত্রে যখন যেখানে দরকার, এ সর্বদাই খুশী মনে নিয়ে ` 'চ্ছে। আমাদের সকলের আপ্রাণ সেবার কি কোন দাম নেই?'

ওয়ালার সাহেব বেলের দিকে সরাসরি তাকালেন না—'তোমরা তোমাদের কর্তব্য করছো। একে বিক্রী করে দেবো। এ কথার আর নড়চড় হবে না।'

বেল চিৎকার করে উঠলো—'মালিক, নীচু সমাজের সাদা মানুষেরা পরিবার ভেঙে দেয়। আপনি তো তেমন নন। আপনাকে চিরদিন মহৎ বলে জেনেছি।'

ক্রুদ্ধ ওয়ালার সাহেব নীরবে শেরিফের দিকে ইঙ্গিত করলেন। শেরিফ এক হেঁচকা টানে কিসিকে নিয়ে গাড়ীর দিকে এগোলো। বেল তাদের সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। 'তবে আমাদের দু'জনকেও একই সাথে বিক্রী করে দিন। আমাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না, সাহেব।'

শেরিফ রূঢ়ভাবে তাকে ঠেলে দিয়ে বললো—'পথ ছাড়!'

কুণ্টা গর্জন করে চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র বেগে লাফিয়ে এসে শেরিফকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। কিসি আর্তনাদ করে উঠলো—'বাবা বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!' কুণ্টা কিসির কোমর জড়িয়ে ধরে সর্বশক্তি দিয়ে শিকল ছিঁড়তে চেষ্টা করলো।

শেরিফের পিস্তলের বাঁট তার কানের ঠিক ওপরে প্রচণ্ড আঘাত করলো। কুণ্টার মাথা যেন শতধা হয়ে ফেটে গেলো। সে হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে যেতে এবার বেল শেরিফের দিকে ছুটে গেলো। কিন্তু শেরিফ এক ঘায়ে তাকে ফেলে দিয়ে কিসিকে টানতে টানতে নিয়ে এসে গাড়ীর পেছন দিকে দরজা খুলে তাকে ভেতরে ছুড়ে দিলো। সশব্দে তার শেকলের তালায় চাবি আটকানো হলো। শেরিফ এবার এক লাফে গাড়ীতে উঠে ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়ায় চাবুক কষিয়ে দিলো। গাড়ী চলতে শুরু করতে হতবুদ্ধি কুণ্টা মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়েও উঠে দাঁড়ালো। তারপর পিস্তল অগ্রাহ্য করে পেছন পেছন ছুটতে লাগলো।

কিসি প্রাণপণে চিৎকার করছিলো—'মিসি অ্যান, মিসি অ্যান্‌ন্‌ন্‌! মিসি অ্যান্‌ন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ন্‌! সে আর্ত ধ্বনি বাতাসে ভারী হয়ে ঝুলে থাকলো। গাড়ী দ্রুতবেগে এগিয়ে গেলো।

কুণ্টা হোঁচট খেতে খেতে হাঁফাচ্ছিলো—গাড়ী ততক্ষণে আধমাইল দূরে চলে গিয়েছে। এবার সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিসির গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটা অসম্ভব—এ বোধ ক্রমশঃ তাকে অবসন্ন করে ফেলছিলো। ক্রমে চাকার তাড়নায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিও অদৃশ্য হলো। যতদূর দৃষ্টি যায় দীর্ঘপথ জনহীন।

মালিক ফিরলেন। মাথা নীচু করে দ্রুতপদে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলেন। বেল পথপ্রান্তে সিঁড়ির গোড়ায় লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছিলো। কুণ্টা যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘরে ফিরছিলো। হঠাৎ তার আফ্রিকার একটা রীতি মনে পড়ে গেলো।

বাড়ীর সামনে নীচু হয়ে সে কিসির পদচিহ্ন খুঁজতে লাগলো। যেখানে চিহ্ন সবচেয়ে স্পষ্ট, দুই অঞ্জলি ভরে সেখানকার মাটি তুলে ঘরে ছুটলো। পূর্বপুরুষেরা বলতেন এই মহামূল্য মাটি সাবধানে রেখে দিলে কিসি আবার সেই পদচিহ্নের জায়গায় ফিরে আসবে। ঘরের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে সবেগে ভেতরে ঢুকে কুণ্টা দু'চোখ দিয়ে হাতের মাটি রাখবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলো। তাকের ওপর পাথরভরা লাউয়ের খোলাটায় দৃষ্টি পড়লো। এক লাফে সেখানে গিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাত খুলে ধরবার পূর্ব মুহূর্তে কুণ্টার সত্যদর্শন হলো। কিসি চলে গিয়েছে। সে আর ফিরবে না— চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছে। এ জীবনে কুণ্টা তার পরম আদরের কন্যাকে আর দেখতে পাবে না।

কান্নায় তার মুখ বিকৃত হয়ে গেলো। ধূলিভরা মুঠি ঘরের ছাদের দিকে ছুঁড়ে দিলো। দুই চোখের ধারায় ভেসে শব্দহীন চিৎকারে ভারী লাউটাকে মাথার উপর তুলে ধরে সর্বশক্তিতে সেটাকে মাটিতে আছাড় মারলো। তার পঞ্চান্ন বর্ষার প্রতিটি মাসের প্রতীক ছ'শো বাষট্টিটি প্রস্তরখণ্ড সজোরে চারিদিকে আছড়ে পড়ে ঠিকরে উঠলো।

একষট্টি

হতবুদ্ধি, শক্তিহীন কিসি অন্ধকারে কতগুলো মোটা ক্যানভাসের বস্তার ওপর পড়েছিলো। সন্ধ্যার পর একটা খচ্চরের গাড়িতে করে এনে তাকে এ ঘরটাতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো রাত বুঝি আর শেষ হবে না। এ-পাশ ও-পাশ করে সময় আর কাটছিলো না। ভয় যাতে একটু কাটে, তাই কিছু একটা ভালো জিনিস ভাবতে চেষ্টা করছিলো। অন্ততঃ শতবার যে কথাটা ভেবেছে, সেই উত্তরের দেশের কথাই আবার ভাবতে লাগলো। কী করে সেখানে যাওয়া যায়! শুনেছে একবার সেখানে পৌঁছোতে পারলেই কালোদের মুক্তি। ভুল পথে চললে অবশ্য দক্ষিণেও পৌঁছে যেতে পারে। সেখানকার মালিক আর ওভারসীয়াররা নাকি ওয়ালার সাহেবের থেকেও খারাপ। কোন দিকটা উত্তর? কিসি জানে না। কিন্তু তাকে জানতেই হবে। তিক্ত হৃদয়ে শততমবার সে শপথ করলো—সে নিশ্চয়ই পালাবে।

ঘরের দরজা খুলবার শব্দ হতে যেন তার গায়ে কাঁটা ফুটলো। অন্ধকারে

লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেলো। একটা লোক চোরের ভঙ্গীতে ঢুকলো। এক হাতে মোমবাতির আলো ধরা। অন্য হাতে উদ্যত একটা চাবুক। কিসি চিনতে পারলো —এই সাদা মানুষটাই তাকে কিনেছে। কিন্তু লোকটার মুখের লালসাপূর্ণ শয়তানের হাসি তার শরীরের রক্ত জল করে দিলো।

'মারতে না হলেই ভালো'—তার মুখের ভকভকে মদের গন্ধে কিসির শ্বাস রুদ্ধ হয়ে উঠলো। সে লোকটার মতলব বুঝতে পেরেছে। রাত্রে মা বাবা যখন মনে করতো সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তাদের পরদা ঢাকা ঘরে অদ্ভুত শব্দ শোনা যেতো। সে সময় বাবা মায়ের সাথে যা করতো, নোয়া তার সাথে যা করতে চেয়েছিলো, বিশেষতঃ তার চলে যাবার আগের রাত্রে—এই লোকটা তার সাথে তাই করতে চায়। লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? যে জিনিস সে নোয়াকে দেয়নি, তা এই লোকটাকে দেবে?

'এদিকে এসো। তোমাকে আমার ছেলের মা করবো।' লোকটার কথাগুলো জড়ানো। কিসি তার পাশ কাটিয়ে বাইরে অন্ধকারে পালাবার সুযোগ খুঁজছিলো। কিন্তু লোকটা বুঝতে পেরে ধারে সরে গেলো। কিসির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে একটা ভাঙা চেয়ারে একটু গলানো মোম ঢেলে মোমবাতিটা সোজা করে বসিয়ে দিলো। পেছোতে পেছোতে কিসির পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিলো।

'তোমার সাথে খেলা করবার সময় নেই। জান না, আমি তোমার নতুন মালিক?'—লোকটা কিসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে চিৎকার করে উঠলো। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে একটা গালি দিয়ে লোকটা কিসির ঘাড়ে চাবুক কষিয়ে দিলো— 'হারমজাদী, তোমার গায়ের চামড়া খুলে নেবো।' কিসি এবার উন্মত্তের মতো তার মুখ খামচাতে লাগলো। কিন্তু শক্তিতে সে তার সাথে পারছিলো না। লোকটা ক্রমশঃ তাকে মেঝেতে শুইয়ে ফেলে চেপে ধরলো। 'দয়া কর, দয়া কর, মালিক!' কিসির আর্তকণ্ঠ সে মুখে বস্তা ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিলো। কিসি হাত ছুড়ে, গা ঝাড়া দিয়ে লোকটাকে তার গায়ের ওপর থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু সে কিসির চুল ধরে তার মাথাটা সজোরে মেঝেতে ঠুকতে লাগলো। উত্তেজনার ঘোরে পাগলের মতো কিসির সর্বাঙ্গে মারতে লাগলো। অবশেষে কিসির পোষাক টেনে তুলে অন্তর্বাস ছিঁড়ে তাকে উলঙ্গ করে ফেললো। তারপর দুই জানুর মাঝে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কিসির গোপনাঙ্গ নির্মম হাতে দলে মুচড়ে প্রবল উত্তেজনায় তাকে প্রচণ্ড চড় কষালো। কিসির প্রতিরোধের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে লোকটা এবার নিজের কটিদেশ থেকে প্যাণ্টটি নামিয়ে দিলো। অর্ধমূর্ছিত কিসির দেহের

অভ্যন্তরে সে নিজেকে নিষ্ঠুর উগ্রবেগে প্রোথিত করে দিলো। কিসিকে কে যেন শাণিত অস্ত্রে আমর্ম বিদ্ধ করেছে। সহনাতীত যন্ত্রণায় তার সর্ব ইন্দ্রিয় বিদীর্ণ হয়ে গেলো। তাতেও শেষ নয়। আবার—আবার—দেহভেদকারী তীক্ষ্ণ সে যাতনা অনন্তকাল ধরে যেন চলতেই থাকলো। মর্মান্তিক যন্ত্রণার আক্ষেপে অবশেষে তার চেতনা লোপ পেলো।

ভোরবেলা কিসির চোখ খুলে গেলো। একটি অল্পবয়সী কালো মেয়ে গরম সাবানজল দিয়ে তার গোপনাঙ্গ অতি সাবধানে পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো। লজ্জায় কিসির মাথা কাটা গেলো। দুর্গন্ধে বোধ হলো নিজের অজানিতে সে মল ত্যাগ করে ফেলেছে। মেয়েটি পরম মমতায় তাও পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো। কিসির সঙ্কোচের সীমা ছিলো না। কিন্তু মেয়েটির মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। কাপড় ধোওয়াই বা কী আর এ কাজই বা কী! যেন সারাজীবন ধরে সে এ কাজই করেছে। কাজ শেষ হলে কিসির নিম্নাঙ্গ একটি পরিষ্কার তোয়ালে চাপা দিয়ে সে তার মুখের দিকে তাকালো। 'এখন নিশ্চয় তোমার কথা বলতে ভালো লাগবে না'—শান্তভাবে এ কথা বলে সে তার জলের পাত্র, নোংরা কাপড় ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। যাবার আগে আর একবার নীচু হয়ে সে কিসির গায়ে একটি ক্যানভাসের বস্তা টেনে দিলো। 'তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি'—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিসি যেন এ পৃথিবীতে নেই। এ অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য, অনুচ্চারণীয় ঘটনা নিশ্চয়ই তার জীবনে ঘটেনি। কিন্তু তার ক্ষতবিক্ষত ছিন্ন যোনির তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাই বা সে অস্বীকার করবে কী করে? নিজেকে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, হৃতমর্যাদা বোধ হলো। এ লজ্জা ও কলঙ্ক জীবনেও ঘুচবে না। একটু পাশ ফিরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। গায়ের ওপর ক্যানভাসের বস্তাটা আরো বেশী করে টেনে দিয়ে যেন নিজেকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য একটা মিথ্যা খোলসের সৃষ্টি করলো। যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছিলো।

গত চারদিনের ঘটনা মনে পড়ছিলো। তাকে জোর করে নিয়ে আসবার সময় তার মা ও বাবার মুখে যে অকল্পনীয় বিভীষিকা দেখেছিলো, তাদের যে অসহায় মর্মভেদী আর্তনাদ শুনেছিলো,—তা কিসির জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে। স্পটসিলভেনিয়ার শেরিফ তাকে যখন সেখানকার শ্বেতকায় ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়, তখন কিসি প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলো। পরেও সে পালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাকে জোর করে একটা ছোট শহরে নিয়ে

আসা হয়েছিলো। সেখানে ক্রুদ্ধ ও তিক্ত দাম কষাকষির পর সে বর্তমান মালিকের ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়েছে। মনে হচ্ছে রাত্রিবেলায় কতক্ষণে তাকে ধর্ষণ করবে মালিক সে অপেক্ষাতেই ছিলো। মা! বাবা! শুধু আকুল ক্রন্দনে যদি তাদের কাছে পৌঁছোনো যেতো! কিন্তু তারা তো জানেও না কিসি কোথায় আছে। তারা কেমন আছে তাই বা কে জানে! নিয়ম না ভাঙলে ওয়ালার সাহেব বিক্রী করেন না ঠিকই। কিন্তু কিসিকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা তো অনেক নিয়মই ভেঙে-ছিলো!

আর নোয়া? তার কী হয়েছে? তাকে কি পিটিয়ে মেরে ফেলেছে? কিসি প্রথমে নোয়াকে অনুমতি পত্র জাল করে দিতে রাজী হয়নি। নোয়ার তখনকার ক্রুদ্ধ মুখখানাও মনে পড়লো। সে বলেছিলো তাহলে কিসির ভালোবাসা মিথ্যা। নোয়ার মুখে সে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ দেখেছিলো। সে শপথ করেছিলো উত্তরে পৌঁছে রোজগার করে পয়সা জমাবে। তারপর ফিরে এসে কিসিকে নিয়ে যাবে। বাকী জীবন তারা একসাথে কাটাবে। কিসি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। নোয়ার সাথে জীবনে আর কখনো দেখা হবে না। মা বাবার সাথেও না। যদি না…

হঠাৎ আশার আলো দেখা দিলো। মিসি অ্যান বলেছিলো সে বড় হয়ে খুব সুন্দর আর ধনী কোন ছেলেকে বিয়ে করবে। নিজের বাড়ী হলে কিসিকেই সে নিজস্ব পরিচারিকা হিসাবে রাখবে। কিসি চলে গিয়েছে জানলে সে কি একটুও দুঃখ পাবে না? তাই নিয়ে রাগারাগি করবে না? ওয়ালার সাহেবকে অনুনয় করবে না কিসিকে এনে দেবার জন্য? পৃথিবীতে একমাত্র মিসি অ্যানই পারে তার জ্যাঠাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে। এমন কি হতে পারে না ওয়ালার সাহেব কিসিকে খুঁজে বার করতে লোক লাগিয়েছেন? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? শেরিফ ভালো ভাবেই জানে কোন দাস ব্যবসায়ী কার কাছে তাকে বিক্রী করেছে। প্রয়োজন হলে তাকে খুঁজে বার করা কিছুই কঠিন কাজ নয়। না, তার আর কোন আশা নেই। সবাই তাকে ত্যাগ করেছে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার কান্নাও শুকিয়ে গিয়েছিলো। নোয়াকে ভালোবেসেছে এই যদি তার একমাত্র অপরাধ হয়ে থাকে, তবে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করে ফেলুন। তার বেঁচে থাকবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই।

অনুভবে বুঝলো তার ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। যন্ত্রণাটা অবশ্য একটু কম।

ঘরের দরজায় আবার শব্দ হতে কিসি লাফিয়ে উঠে দেয়ালের দিকে পিছিয়ে গেলো। কিন্তু সকালের সেই মেয়েটিই এসেছে। হাতে ধূমায়িত একটি বাটি ও

চামচ। সে সামনের টেবিলে খাবারটা রাখলো। কিসি খাবার বা মেয়েটি কোন দিকে না তাকিয়ে মাটিতে বসে পড়লো। মেয়েটি কিন্তু খুব স্বাভাবিক স্বরে তার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। যেন তারা কতদিনের পরিচিত। 'আমি বড় বাড়ীতে রাঁধি। আমার নাম মিস ম্যালিসি। তোমার নাম কী?'

কিসির উত্তর দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না।

'আমার নাম কিসি, মিস ম্যালিসি।'

সন্তোষের স্বরে সে বললো—'শিক্ষা দীক্ষা তো বেশ ভালোই।' অস্পৃষ্ট স্টুয়ের বাটির দিকে তাকিয়ে বললো—'জানো তো, ঠাণ্ডা স্টুয়ে কোন উপকার নেই। ওটা খেয়ে ফেলো।'

কথাগুলো যেন সিস্টার ম্যানডি বা আণ্ট স্কুকেরই মতো। কিসি দ্বিধা ভরে খাবারটা চামচ দিয়ে একটু একটু করে খেতে লাগলো।

'তোমার বয়স কত?'

'ষোলো বছর।'

'আমাদের মালিকের নিগ্রো মেয়েদের সাথে এসব নষ্টামি করা খুব পছন্দ—সেটা তোমাকে জানিয়ে রাখাই ভালো। বিশেষত অল্পবয়সী মেয়েদের সাথে। আমি তোমার চাইতে বছর নয়েক বড় হবো। প্রথম প্রথম আমাকেও এসব অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সাহেবের স্ত্রী এসে আমাকে বড় বাড়ীর রান্নার কাজে লাগাবার পর থেকে সেটা বন্ধ হয়েছে। মেম সাহেবের চোখের সামনেই আমাকে থাকতে হয় কিনা।' মুখভঙ্গিমা করে বললো—'তোমাকে কিন্তু এটা প্রায়ই সহ্য করতে হবে।'

কিসির আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে মিস ম্যালিসি বললো—'সোনা, তোমার ভুললে চলবে কেন, তুমি নিগ্রো মেয়ে। মালিককে তুমি চেনো না। তুমি নিজের ইচ্ছায় রাজী না হলে, তোমাকে জোর করে রাজী করাবে। একটা কথা মনে রেখো। এ সাহেব রেগে গেলে অতি ভয়ঙ্কর লোক। কেউ যে রাগের মাথায় এমন পাগলের মতো হয়ে যেতে পারে আগে কখনো দেখিনি।'

কিসি মনে ভাবছিলো—আজ রাতে আবার সে আসবার আগে পালাতেই হবে। মিস ম্যালিসি যেন তার মনের কথা বুঝতে পারলো। 'পালাবার কথা মনেও এনো না। কুকুর লেলিয়ে ধরে আনবে। তাতে আরো বিপদ বাড়বে। নিজেকে শান্ত কর। সাহেব এখন চার পাঁচদিন এদিকে আসবেন না। তাঁর লড়াইয়ে মোরগগুলোকে শেখাবার জন্য আলাদা ক্রীতদাস আছে। তাকে নিয়ে অনেক দূরের এক প্রতিযোগিতায় গিয়েছেন। মোরগের লড়াই মালিকের ধ্যান জ্ঞান!'

মালিক সম্পর্কে মিস ম্যালিসির গল্প আর শেষ হয় না। মালিক আগে খুব গরীব ছিলেন। পঁচিশ সেণ্ট দামের লটারীর টিকিট কিনে তাতে জিতেছিলেন। সে টাকায় একটা লড়াইয়ে মোরগ কেনেন। সেই শুরু। এখন তাঁর এ এলাকার লড়াইয়ে মোরগের মালিকদের মধ্যে যথেষ্ট নাম ডাক।

কিসির মালিক সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিলো না। সে কোনক্রমে মিস ম্যালিসি-র গল্পের স্রোত থামালো। জিজ্ঞেস করলো—'মালিক তাঁর স্ত্রীর সাথে শোন না?'

'তা শোন। কিন্তু স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাঁর লিপ্সার শেষ নেই। তাঁর স্ত্রীকে বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। ভারী চুপচাপ মানুষ। সাহেবকে খুব ভয় পান। তিনিও সাহেবের মতো গরীব ঘরের মেয়ে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো। তিনি ভালো করেই জানেন, স্ত্রী থেকে মোরগে তাঁর বেশী মন।'

কিসির তার কথাতে কান দিলো না। সর্বক্ষণ পালাবার কথাই চিন্তা করছিলো। মিস ম্যালিসি তার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে বললো—'কী ভাবছো? তোমার ভালোর জন্যই বলছি। সব কথা তোমার জেনে রাখা ভালো। মালিকের নাম জান?'

কিসির মুখের ভাবে অজ্ঞতা প্রকাশ পেলো। 'টম লী। অর্থাৎ তোমার নাম এখন কিসি লী।'

কিসি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠলো—'না, না। আমার নাম কিসি ওয়ালার।' কিন্তু বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেলো ওয়ালার সাহেবের হাতে তার কী দুর্গতি হয়েছে! দু'চোখ উপচে অশ্রুজলে মুখ ভেসে গেলো।

'কেঁদো না, সোনা। জানো তো মালিকের নামেই নিগ্রোদের নাম হয়। নিগ্রোদের নামের আর কী দাম আছে বল? যাহোক্ একটা নামে ডাকলেই হলো।'

'আমার বাবার সত্যিকারের নাম কুণ্টা কিণ্টে। বাবা আফ্রিকা থেকে এসেছেন।'

'সত্যি? শুনেছি আমার ঠাকুরদার বাবাও আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম কী ছিলো তা জানি না। তোমার মা কে তুমি জান?'

'নিশ্চয়। আমার মায়ের নাম বেল। তোমার মতো মাও বড় বাড়ীতে রান্না করেন। বাবা মালিকের গাড়ী চালান। মানে আমি সেখানে থাকতে চালাতেন।'

মিস ম্যালিসি বিশ্বাস করতে পারছিলো না—'তুমি মা ও বাবা দু'জনকেই

কাছে পেয়েছিলে ? আমরা অনেকেই নিজেদের মা বা বাবাকে চিনি না। সন্তান বড় হবার আগেই হয়তো একজন অন্য কোথায়ও বিক্রী হয়ে গিয়েছে। মা বাবা আর ছেলেমেয়ে একসাথে থাকবার সুযোগ কম জায়গাতেই পায়।'

কিসি মিস্ ম্যালিসিকে ছাড়তে চাইছিলো না। একা থাকতে তার বড় ভয়। তাকে আটকে রাখবার চেষ্টায় সে বললো—'তুমি ঠিক আমার মায়ের মতো কথা বল।'

মিস ম্যালিসি চমকে উঠলো, তার মন পুলকে ভরে গেলো। এমন কথা তার নিঃসঙ্গ জীবনে কেউ কখনো বলেনি।

কিসি দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করলো—'আমাকে এখানে কী কাজ করতে দেবে ?'

'ওখানে কী করতে ?'

'বড় বাড়ী ঝাড়পোঁছ করতাম আর রান্নাঘরে মায়ের সাহায্য করতাম।'

মিস ম্যালিসি ভ্রু কুঁচকে বললো—'সে আমি তোমার ঐ নরম হাত দেখেই বুঝেছি। এখানে ওসব বাবুগিরি চলবে না। তোমাকে নিয়ে মোট পাঁচজন তো মাত্র কাজের লোক হলো। তার মাঝে মিঙো মোরগ নিয়েই থাকে। আমি রান্নাবাড়া, কাপড় কাচা, ঝাড়পোঁছ, সংসারের যাবতীয় কাজ একাই করি। ক্ষেতের কাজের জন্য সিস্টার স্যারা আর পম্পেকাকা। কাজেই তোমাকে নিশ্চয় ক্ষেতের কাজেই লাগানো হবে।' কিসির জন্য তার দুঃখ হলো—'বেচারা! তুমি বড়লোকের বাড়ীতেই জীবন কাটিয়েছো। গরীব বাড়ী দেখা অভ্যাস নেই। গরীব সাদা মানুষেরা বহুকষ্টে একটু জমি, একটা বাড়ীর সংস্থান করে। এ বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখতেই মস্ত বড়। ভেতরে কিছু নেই। এরকম গরীব সাদা মানুষ এদিকে অনেক। এদিকে একটা চলতি কথাই আছে—একশো একর জমি চারজন নিগ্রো দিয়ে চাষ করাও। আমাদের মালিকের অবস্থা আরো খারাপ। চাষের জন্য আশি একর জমিও নেই। চাষ করবার জন্য দু'টি মাত্র লোক। তার মাঝে একজন বৃদ্ধ। আর আছে শ'খানেক লড়াইয়ে মোরগ। নিগ্রো মিঙো ওগুলোর দেখাশোনা করে আর তাদের লড়াই শেখায়। মালিক যা কিছু খরচ ঐ মোরগের ওপরেই করেন। মেমসাহেবের কাছে মদের ঘোরে সদাসর্বদা তাঁর মোরগ নিয়ে বড়াই করেন। বলেন ঐ মোরগের দৌলতেই তিনি একদিন ধনী হবেন। বিরাট দোতালা বাড়ী তৈরী করবেন—তার সামনের দিকে ছ'খানা বিরাট পিলার থাকবে। সে বাড়ী সব বড়লোকের বাড়ীকে টেক্কা দেবে। বড় বড় সব কথা! এদিকে আস্তাবল দেখাশোনা করবার একটা ছেলে রাখতে পারছেন না। ঘোড়ার

পরিচর্যা নিজেকেই করতে হয়। নিজের গাড়ী নিজে চালান। আমাকেও ক্ষেতের কাজেই লাগাতেন। নেহাৎ মেমসাহেব যে একেবারেই রাঁধতে জানেন না। এদিকে সাহেব খেতে বড় ভালোবাসেন। তাই রান্নার লোক রাখতেই হয়েছে। যখন মোরগের লড়াইয়ে জেতেন, বাড়ীতে লোকজন নেমন্তন্ন করে খাওয়ান। বাড়ীর কাজ করবার জন্য নিগ্রো দাসদাসী আছে—এটাও নিমন্ত্রিতদের দেখাতে হবে। তবে কেবল সিস্টার স্যারা আর পম্পেকাকাকে দিয়ে ক্ষেতের কাজ হয়ে উঠছে না। তাই তোমাকে কিনেছেন। তোমার দাম কত হয়েছে জান?'

কিসি নিস্তেজ স্বরে বললো—'না।'

'আজকাল যা বাজারদর শুনেছি, তাতে ছ' সাতশো ডলার তো হবেই। তোমার বয়স কম, স্বাস্থ্য ভালো। দেখে তো মনে হয় বাচ্চা কাচ্চা অনেক ক'টাই হবে। সেগুলো মালিক বিনা পয়সায় পাবেন। ও কাজের জন্য বড়লোক সাহেবরা তাঁদের অল্পবয়স্ক নিগ্রোদের ভাড়া খাটান। মালিক তাদের কাউকে আনাবেন কিনা জানি না। তোমার বেলা হয়তো কাজটা তিনি নিজেই করবেন।' কিসিকে সন্ত্রস্ত, হতবাক করে রেখে মিস ম্যালিসি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বাষট্টি

'মালিক, আমার পেটে বাচ্চা এসেছে।'

'তা, আমার কী করতে হবে? দেখো, শরীর খারাপের বাহানায় আবার কাজে ফাঁকি দিয়ো না।'

লী সাহেবের কিসির ঘরে আসা যাওয়া চলতেই থাকলো।

ক্ষেতের কাজে কিসি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। তা সত্ত্বেও মাথা ঘোরা, সকালে বমি বমি ভাব সব কিছু অগ্রাহ্য করে প্রখর রৌদ্রে কাজে যেতে হতো। কঠিন, ভারী ক্ষেত নিড়ানির ঘষায় তার হাতের চামড়া উঠে গিয়েছিলো। কর্কশ ভূমিতে চলা-ফেরা করে পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলো। অতি কষ্টে দিন কাটছিলো। কঠোর পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে তার মায়ের কথা মনে পড়তো। জীবনে প্রথম সন্তান-সম্ভাবনার কষ্টকর দিনগুলোতে মাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করতো। বাচ্চা হওয়া সম্পর্কে মা কথাপ্রসঙ্গে কখন কী বলেছে মনে করতে চেষ্টা করতো। যথাসর্বস্ব দিয়েও যদি মাকে এখানে আনতে পারতো! অবশ্য পেটে বাচ্চা নিয়ে মায়ের সামনে

বেরোতে লজ্জায় মাথা কাটা যেতো। কিন্তু মা তার অসহায় অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো। তার নিজের দোষে তো এরকম হয়নি। এসময় কী করতে হয়, মা তাকে সব বলে দিতো। একবার মিসি অ্যান এবং কিসি একটা গরুর বাচ্চা হতে দেখেছিলো। মানুষেরও কী ঐরকম সাংঘাতিক উপায়ে বাচ্চা বার করতে হয় ?

মিস ম্যালিসি ও সিস্টার স্যারার তার উদর ও স্তনের ক্রমবর্ধমান স্ফীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা দেখা যায় না। লী সাহেব অথবা এদের দু'জনের কাউকেই তার মনের ভয় ভাবনার কথা বলে লাভ নেই। লী সাহেব ক্ষেতের কাজ চলার সময় ঘোড়ায় চেপে তদারকী করেন। কারো বিন্দুমাত্র শ্লথগতি দেখলে চিৎকার করে গালাগালি দেন—সে যে কেউ হোক্।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। সিস্টার স্যারা ধাত্রীর কাজ করেছিলো। কিসির দেহ যেন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো। দীর্ঘকাল অসহ্য যন্ত্রণার পর ক্ষুদ্র শিশুটি পৃথিবীতে এলো। ঘর্মাক্ত, শ্রান্ত কিসিকে সিস্টার স্যারা হাসিমুখে নবজাতকটি তুলে ধরে দেখালো। পুরুষ সন্তান—রঙ প্রায় ফর্সা। কিসির শঙ্কিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে সিস্টার স্যারা তাকে আশ্বস্ত করলো—সদ্যোজাত শিশুদের সত্যি-কারের রঙ ধরতে মাস খানেক লাগে। কিন্তু পুরো একমাস চলে গেলো—বাচ্চার রঙ কালো হলো না। বাদামী-ই থেকে গেলো। মায়ের সদন্ত উক্তি কিসির মনে পড়লো—'আমাদের মালিকের আবাদে কালো ছাড়া নিগ্রো নেই।' নিজের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বাবার কথা চিন্তাই করা যায় না। মিশ্র বর্ণের প্রসঙ্গে তার ঠোঁট ঘৃণায় কুঁচকে যেতো। কিসির চরম লজ্জার মুহূর্তে তারা উপস্থিত নেই—সে একরকম ভালোই। কিন্তু তারা না-ই বা সামনে থাকলো। সে তো আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কোন লোক তার গায়ের রঙের সাথে এই শিশুর গায়ের রঙ মিলিয়ে দেখলে মুহূর্তে শিশুটির জন্ম ইতিহাস বুঝে নেবে। নোয়ার কথা মনে করে তার লজ্জা বেড়ে গেলো। নোয়ার সেই নিভৃত মিনতি মনে পড়লো—'আমি চলে যাবার আগে এই শেষ সুযোগ। কী করে তুমি পারছো, আমাকে ফিরিয়ে দিতে ?' সত্যিই তো, কেন সে তখন রাজী হয়নি ? এটি যদি নোয়ার সন্তান হতো, তবে তার গায়ের রঙটি অন্ততঃ কালো হতো। গভীর লজ্জা থেকে সে রক্ষা পেতো।

ছেলে সম্পর্কে কিসির হতশ্রদ্ধা দেখে মিস ম্যালিসি ব্যাপারটা বুঝতে পারলো—'সোনা, তুমি এই নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছো কেন ? আজকাল এসব নিয়ে কেউ ভাবে না। যত কালো বাচ্চা জন্মাচ্ছে, দোআঁশলাও ততই জন্মাচ্ছে। কেউ ফিরেও

তাকায় না। মালিক তোমার কাছ থেকে এ ছেলে কেড়ে নেবেন না। বিনি পয়সায় তার আর একটি কাজের লোক হলো—এই পর্যন্ত। এই সুন্দর মোটাসোটা বাচ্চাটা সম্পূর্ণ তোমার। একে কোলে তুলে নাও।'

'মেমসাহেব দেখলে কী ভাববেন ?'

'কিচ্ছু ভাববেন না। তাঁর সাহেবকে তিনি বেশ ভালোই চেনেন। সব সাদা মেয়েমানুষই জানে তাদের স্বামীরা নিগ্রো মেয়ের কাছে যায়। তবে আমাদের মেমসাহেবের কখনো বাচ্চা হবে না—তাই একে দেখে একটু হিংসা হতে পারে।'

শিশুটি জন্মাবার মাস খানেক পরে লী সাহেব কিসির ঘরে এলেন। মোমবাতির আলোতে বাচ্চাটি দেখে বললেন—'মন্দ দেখতে হয়নি। বেশ বড়সড় আছে।' আঙুল দিয়ে ক্ষুদ্র মুষ্ঠিবদ্ধ হাত দুটি একটু নেড়ে দিলেন। 'ঠিক আছে। সোমবার থেকে তবে কাজে লেগে যাবে।'

কিসি হতভম্ব হয়ে বোকার মতো বললো—'মালিক, আমার যে ওকে দুধ খাওয়াতে হবে।'

সাহেব রেগে ফেটে পড়লেন—'চুপ কর! যা বলছি তাই করবে। আহ্লাদীপনা দেখিয়ো না। বাচ্চা নিয়ে মাঠে যাবে। নইলে বাচ্চাটাকে রেখে দিয়ে তোমাকে বিক্রী করে দেবো।'

ছেলে হারাবার আশঙ্কায় কিসি কাঁদতে কাঁদতে বললো—'হ্যাঁ, স্যর।'

কিন্তু সেদিন সাহেবের তার ঘরে আসবার আসল উদ্দেশ্য ছিলো অন্য! কিসি বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ত্রাসে শিউরে উঠে করুণ স্বরে বললো—'মালিক, মালিক, এত তাড়াতাড়ি নয়। আমি এখনো ভালোভাবে সেরে উঠিনি।'

কিন্তু কিসিকে সে অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতেই হলো। ফিরে যাবার আগে সাহেব আর একবার বাচ্চার দিকে তাকালেন—'এর একটা নাম দিতে হয়।' কিসি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিলো। কি জানি কী নাম দেবেন। সাহেব একটু ভেবে বললেন—'ঠিক আছে, একে জর্জ বলে ডেকো। আমার জানা সবচেয়ে পরিশ্রমী নিগ্রোর নাম জর্জ। হ্যাঁ, কালই আমার বাইবেলে নামটা লিখে নিতে হবে।'

কিসি নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে শুয়ে পড়লো। ভাবতে লাগলো কোনটা বেশী অত্যাচার? সে ভেবেছিলো ছেলের নাম রাখবে কুণ্টা কিংবা কিণ্টে। কিন্তু সাহেবের বিরোধিতা করবার সাহস তার ছিল না। তার আফ্রিকাবাসী বাবা উপযুক্ত নামকরণের উপর কতটা গুরুত্ব দিতেন কিসির জানা ছিলো। এ নাম শুনলে তার বাবার কী প্রতিক্রিয়া হতো ভাবতেও কিসির ভয় হচ্ছিলো। বাবার কথা মনে

পড়লো। তিনি বলতেন—আফ্রিকাতে পুত্রের নামকরণ বিশেষ বিচার বিবেচনার সাথে করা হয়। পুত্রই বংশ ও পরিবারের সুনাম বহন করে। তাছাড়া শিশুটি ভবিষ্যতে কেমন মানুষ হবে তাও নামটির উপর নির্ভর করে।

সাদা মানুষ সম্পর্কে তার বাবার মনোভাব এত তিক্ত ছিলো কেন, এখন সে বুঝতে পারছে। বেল তাকে বলেছিলো—'তোমার ভাগ্য ভালো যে নিগ্রো হয়ে জন্মাবার দুঃখ ভোগ করতে হয়নি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সে কষ্ট যেন কখনো তোমাকে জানতেও না হয়।' মায়ের প্রার্থনা ঈশ্বর পূর্ণ করেননি। সে দুঃখ, যন্ত্রণা সবই কিসিকে ভোগ করতে হয়েছে। সাদা মানুষেরা কালোদের ওপর কী নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে পারে তার সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু কুণ্টার মতে সাদা মানুষের সবচেয়ে বড় নিপীড়ন ছিলো কালোদের সত্তা মুছে দেওয়া—নিজেদেরকে জানতে না দেওয়া। কালোদের মনুষ্যত্ব বিকশিত হতে না দিলেই সাদা মানুষের স্বার্থ রক্ষা হয়।

কিসির মা তাকে বলতো—'তোমার বাবার মতো আত্মমর্যাদাবোধ আমি আর কোন কালোর মাঝে দেখিনি। এ দেখেই আমি প্রথম তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।' ঘুমিয়ে পড়ার আগে কিসি সঙ্কল্প করলো—যত হীন সূত্রেই তার সন্তানের জন্ম হয়ে থাক্, তার গায়ের রঙ যত শ্বেতাভই হোক্, মালিক জোর করে যে নামই তার ওপর চাপান—একজন মর্যাদাবোধসম্পন্ন আফ্রিকাবাসীর দৌহিত্র ছাড়া তার অন্য কোন পরিচয়ই কিসি গ্রাহ্য করবে না।

তেষট্টি

সকালবেলা 'সুপ্রভাত' বলা ছাড়া পম্পেকাকার সাথে কিসির আগে কখনোই বাক্যবিনিময় হয়নি। ছুটির পর প্রথম কাজে আসার দিন যখন সে এগিয়ে এসে সলজ্জভাবে মাথার ঘামে ভেজা টুপিটি ছুঁয়ে দাঁড়ালো—কিসি বিস্মিত হলো। পম্পেকাকা ইঙ্গিতে দূরে গাছের নীচে দেখালো। কাছে গিয়ে দেখে কিসির দুই চক্ষু জলে ভরে গেলো। নতুন কাটা লম্বা ঘাস, বুনো লতা আর সবুজ পাতা দিয়ে অতি যত্নে একটি ছোট্ট চালাঘর তৈরী করা হয়েছে। সকৃতজ্ঞ চিত্তে নরম পাতার গদির ওপর পরিষ্কার বস্তুটি পেতে কিসি শিশুটিকে শুইয়ে দিলো। প্রথমে একটু কেঁদে সে আপনমনে নিজের মুখে আঙুল দিয়ে খেলতে লাগলো।

পম্পেকাকাকে ধন্যবাদ জানাতে গেলে তাঁকে বড়ই লজ্জিত ও বিড়ম্বিত দেখালো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিসির বাচ্চাকে দেখাশোনা করবার বা সময়মত দুধ খাওয়াবার আর অসুবিধা থাকলো না।

সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষে কিসি সামান্য কিছু রান্না করে নিতো। প্রতি শনিবার সকালে ক্রীতদাসেরা সাপ্তাহিক রেশন পেতো। তার থেকেই রান্না। তারপর তাড়াতাড়ি খাবার পাট চুকিয়ে শুয়ে শুয়ে জর্জকে নিয়ে খেলা করতো। ক্ষিধেতে না কাঁদা পর্যন্ত মা আর ছেলেতে খেলা চলতো। সময় হলে পেট ভরে খাইয়ে দিয়ে ছেলেকে কাঁধের ওপর চেপে ঢেকুর তুলিয়ে নিতো। এই সময়টাতে সপ্তাহে দু'তিন দিন মালিক আসতেন তাকে জোর করে ভোগ করতে। তাঁর মুখে সবসময়ই মদের গন্ধ থাকতো। কিসি জানতো বাধা দিয়ে লাভ নেই। তাতে বাচ্চা ও তার—দুজনেরই অযথা উৎপীড়ন। অত্যন্ত বিরূপ মনে, শীতল কঠিন দেহে সে পা ফাঁক করে শুয়ে থাকতো—যতক্ষণ না মালিকের লালসা মেটে। মালিক উঠে গেলেও ঘর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতো। শুনতে পেতো—কখনো দশ পয়সাটা, কখনো সিকিটা টেবিলের ওপর ঠন করে পড়ছে। কিসি অবাক হয়ে ভাবতো বড় বাড়ীতে মেমসাহেব কি জেগেই আছেন? সে তো খুবই সন্নিকটে! সাহেব অন্য নারীর গন্ধ দেহে মেখে বিছানায় গেলে মেমসাহেবের কেমন লাগে?

রাত শেষ হবার আগে জর্জকে আরো দু'বার খাইয়ে কিসির প্রগাঢ় ঘুম ভাঙতো সকালবেলায় পম্পেকাকার দরজা ধাক্কায়। প্রাতঃরাশ খেয়ে, ছেলেকে খাইয়ে তৈরী হলে সিস্টার স্যারা এসে জর্জকে কোলে করে ক্ষেতে নিয়ে যেতো। ভুট্টা, তামাক আর তুলোর জন্য আলাদা ক্ষেত ছিলো। পম্পেকাকা সব ক'টার পাশেই বাচ্চার জন্য চালাঘর তৈরী করে রেখেছিলো। বিকালে কাজের শেষে সিস্টার স্যারাই তাকে কোলে করে ঘরে পৌঁছে দিতো। পম্পেকাকার মনও সারাদিন শিশুটির চারিপাশে ঘুরে বেড়াতো।

রবিবার দুপুরে লী সাহেবেরা সাধারণতঃ গাড়ী নিয়ে বেরোতেন। সে সময়টা ছিলো ক্রীতদাসেদের গল্পগুজবের সময়। মিস ম্যালিসি ও সিস্টার স্যারার মাঝে তখন দুরন্ত জর্জকে কোলে নেবার প্রতিযোগিতা চলতো। পম্পেকাকার কিসির সাথে গল্প করাতেই আনন্দ ছিলো—'এ জায়গাটা পুরো জঙ্গল ছিলো। একর প্রতি পঞ্চাশ সেণ্টে বিক্রী হয়েছে। আমাদের মালিক প্রথমে ত্রিশ একর কিনেছিলেন। তাঁর প্রথম ক্রীতদাস ছিলো—জর্জ। লোকটাকে স্রেফ খাটিয়ে মেরে ফেললেন।'

কিসির চোখে মুখে ত্রাসের আভাস দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'কী হলো তোমার ?' একটু থেমে আবার বলে চললো—'আমি যখন এসেছি, তখন জর্জের এখানে একবছর পুরো হয়েছে। ততদিন জঙ্গল কেটে চাষের যোগ্য জমি তৈরী হয়েছে। সে বছরেই প্রথম ফসল হলো। আমার চোখের সামনে জর্জ মারা গেলো। করাত দিয়ে কাঠ চিরে তক্তা বানাতে বানাতে সে চোখ উল্টে পড়ে গেলো। আর উঠলো না।'

কিসি প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য বললো—'মোরগ লড়াই জিনিসটা কী ?

'সে একরকম বিশেষ জাতের মোরগ। তাদের পরস্পরের সাথে লড়াই করতে শেখানো হয়। এ লড়াইয়ে হারজিতের ওপর প্রচুর বাজি ধরা হয়।'

সিস্টার স্যারা বললো—'মিঙো মোরগ লড়াইয়ের বিষয়ে ভালো বলতে পারবে। কিন্তু তাকে আর তুমি কোথায় পাচ্ছো ? আমি নিজে এই চোদ্দ বছরে তাকে আট দশ বার দেখেছি। সে মানুষ থেকে মোরগের সঙ্গে থাকতেই বেশী পছন্দ করে। মিঙো বোধহয় মানুষ মায়ের পেটে জন্মায়নি, ডিম ফুটে বেরিয়েছিলো।'

সম্মিলিত হাসি থামতে সিস্টার স্যারা মিস ম্যালিসির কোল থেকে জর্জকে জোর করে নিয়ে নিলো। মিস ম্যালিসি বললো—'এই মোরগ থেকেই তো সাহেবের ধনসম্পত্তি। ধনী সাহেবদের গাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় সাহেবের চালিয়াতি অনেক বেড়ে যায়। সে যদি দেখতে ! আর মেমসাহেবের রুমাল ঘোরানোও তখন দেখবার মতো !'

অট্টহাসির শেষে মিস ম্যালিসি জর্জের দিকে হাত বাড়াতেই ধমক খেলো।

'অত তাড়া কীসের ? এইমাত্র তো নিলাম কোলে !'

জর্জকে নিয়ে এই কাড়াকাড়িতে কিসির আনন্দ হতো। পম্পেকাকার জর্জকে কোলে নেবার জন্য ব্যস্ততা ছিলো না, কিন্তু জর্জ তার দিকে তাকালেই খুশীতে তার মন ভরে উঠতো। তার কুঞ্চিত মুখটি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। মজার মতো মুখ করে আর নানা ভঙ্গীতে হাত নেড়ে শিশুটিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করতো। কয়েক মাস পর জর্জ হামাগুড়ি দিতে শুরু করলে মিস ম্যালিসি বললো, এবার তার শক্ত জিনিস খাবার সময় এসেছে। সব থেকে রুটি এনে একটু ডলে মুখে দিতেই জর্জ মহা খুশী। আগ্রহের সাথে পুরোটা খেয়ে নিয়ে আবার মুখ বাড়ালো। তার কাণ্ড দেখে উৎসুক দর্শকদেরও সুখের সীমা থাকে না।

ক্রমশঃ জর্জকে ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া মুস্কিল হলো। কোমরে দড়ি বেঁধে রাখলেও

সে নাগালের মধ্যে মাটি, পোকা-মাকড় যা কিছু পেতো, মুখে পুরে দিতো। মিস ম্যালিসি বললো—'তোমরা যখন ক্ষেতে কাজ করতে যাবে, জর্জ রান্নাঘরে আমার কাছে থাকবে।' ক্ষেতের কর্মীরা বিমর্ষ বোধ করলেও এ ছাড়া উপায় ছিলো না। শীঘ্রই জর্জের মুখে কথা ফুটলো। তার প্রথম 'মা' ডাকে কিসির অন্তস্থল পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো।

এক বছর বয়সে জর্জ কারো সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারলো। পনেরো মাসে ছুটতে শিখলো। কারো কোল আর তার পছন্দ হতো না। বড় বাড়ীর রান্নাঘরের ভালো খাবারের ভাগ মিস ম্যালিসির কৃপায় সবই তার জুটতো। ফলে জর্জের দেহটিও নিটোল হয়ে উঠেছিলো। রবিবারের বিকালবেলা কিসি ও তিনটি বয়স্ক লোকের বৈচিত্র্যহীন দুঃখের জীবন একটি শিশুর দৌরাত্ম্যে সুখে ভরে উঠতো। জর্জের তখন গাছের ডাল, গুবরে পোকা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ করতে সমান আগ্রহ। বড়দের সস্নেহ, সতর্ক দৃষ্টি সর্বদাই তার ওপর থাকতো। পম্পেকাকার জর্জকে নিয়ে ঘুড়ি ওড়াবার হাস্যকর চেষ্টায় সবাই হেসে গড়াতো। সিস্টার স্যারা, মিস ম্যালিসি বলাবলি করতো—পম্পেকাকাকে আগে কাজ ছাড়া ঘরের বাইরে দেখা যায়নি। তার ভেতর এতও রস ছিলো! এ ছেলে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে।

জর্জের দু'বছর বয়স হ'তে পম্পেকাকা তাকে গল্প শোনাতে শুরু করলো। তার এত গল্পের রসদ ছিলো—তাই বা কে জানতো!

একদিন মিস ম্যালিসি কিসিকে বললো—'সোনা, আমরা তো বুড়ো হয়ে গিয়েছি। তোমার একজন সমবয়স্ক সাথী থাকলে বেশ হতো।' সেদিন কিসি তাকে নোয়ার কাহিনী শোনালো।—'আমি এখনো ভাবি, বুঝি সে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো একদিন দেখা হয়ে যাবে।' কিসির মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো—সে প্রার্থনা জানাচ্ছে।—'সেদিন আর ফিরে তাকাবো না। আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় জিজ্ঞেসও করবো না। তোমাদের কাছে বিদায় চেয়ে জর্জকে নিয়ে চলে যাবো।'—কিসি কান্নায় ভেঙে পড়লো।

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। রবিবার সকালে জর্জ বড় বাড়ীর রান্নাঘরে মিস ম্যালিসিকে রান্নায় 'সাহায্য' করছিলো। সিস্টার স্যারা কিসিকে তার ঘরে নিয়ে গেলো। কিসি আগে তার ঘরে যায়নি। দেয়ালগুলো শুকনো শেকড় আর লতা-পাতায় ভর্তি। সিস্টার স্যারা নাকি সব রকম অসুখেই প্রাকৃতিক চিকিৎসামতে ওষুধ দিতে পারতো। কিসিকে বসতে দিয়ে বললো—'তোমাকে একটা কথা বলবো। কথাটা আর কেউ জানে না। আমি অদৃষ্ট গুণতে পারি। তোমার কিছু

জানবার থাকলে আমাকে বল।' কিসি চমকে উঠলো। তার দু'টি জিজ্ঞাস্য ছিলো।

সিস্টার স্যারা মাটিতে বসে বিছানার তলা থেকে একটা বড় বাক্স টেনে বার করলো। তার ভেতরে আর একটা ছোট বাক্স। তার থেকে দু'মুঠো অদ্ভুত দেখতে শুকনো জিনিস কিসির দিকে বাড়িয়ে দিলো। কিসি স্পর্শ করলে জিনিসগুলো বিচিত্র নকশার আকারে মেঝেতে সাজিয়ে স্যারা নিজের পোষাকের ভেতর থেকে জাদুকাঠি বার করলো। সেটা নকশার ওপর দ্রুতগতিতে ঘুরোতে ঘুরোতে নীচু হয়ে মেঝেতে মাথা ঠেকালো। সহসা ঋজু হয়ে উঠে বসে অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে বললো, 'কখনো না। তোমার মা বাবার সাথে আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ এ জগতে তো নয়।'

কিসি উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো। সিস্টার স্যারা এবার জিনিসগুলো নতুন ভাবে সাজিয়ে আবার তার জাদুদণ্ড নাড়তে লাগলো। ভীত, সন্ত্রস্ত কিসি জলভরা চোখ মেলে সকৌতূহলে সিস্টার স্যারার প্রক্রিয়া দেখছিলো। খানিকক্ষণ পর সে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। যেন মৃদুস্বরে নিজের মনে কথা বলছিলো। 'না, ভাগ্য শুভ নয়। পৃথিবীতে একটি পুরুষকেই সে ভালো বেসেছিলো। সে পুরুষটিও এ মেয়েকে ভালো বাসতো, কিন্তু তার যে বড় ভয়ঙ্কর পরিণতি! না, মিথ্যা আশা— সে বড় ভয়ঙ্কর পরিণতি!'

কিসি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো। সিস্টার স্যারার প্রাণান্তকর চেষ্টায় কাজ হলো না। তার উত্তেজিত নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে কিসি উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেলো। নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো। পম্পেকাকা উদ্বিগ্ন হয়ে দরজা খুলে মুখ বাড়ালো। বড় বাড়ীর জানালায় সাহেব মেমসাহেবের সচকিত মুখ। রান্নাঘরের জানালায় বিস্মিত মিস ম্যালিসি ও জর্জকে দেখা গেলো। জর্জ ছুটে এসে দেখে কিসি তার বিছানার ওপর আছাড় খেয়ে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার মুখে শুধু হাহাকার রব!

চৌষট্টি

'মা, আমি কেন তোমার মতো কালো নই?'

'সবাই যে যার নিজের মতো গায়ের রঙ নিয়ে জন্মায়, বাবা!' কিন্তু এ উত্তরে

জর্জের কৌতূহল মিটলো না কয়েকদিন পর আরার প্রশ্ন করলো—'মা, আমার বাবা কোথায় ? কখনো তাকে দেখিনি কেন ?'

'চুপ কর।' কিসি তখনকার মতো তাকে ধমক দিয়ে থামালেও মনে মনে ভেবে দেখলো ওভাবে চলবে না। তার অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান, কৌতূহলী ছেলেকে এমন কিছু বলতে হবে যা সে বুঝতে পারে এবং তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

অবশেষে এক রাত্রে তার তিন বছরের পুত্রটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কিসি তার নিজের বাবার কথা বলতে শুরু করলো।

'খুব লম্বা। তাঁর গায়ের রঙ রাতের অন্ধকারের মতো ঘোর কালো। মুখে তাঁর হাসি খুব কম। তিনি তোমার ও আমার দু'জনেরই পরম আত্মীয়। শুধু তুমি তাঁকে বাবা না বলে দাদামশায় বলবে।'

জর্জ খুব কৌতূহলী হয়ে তার দাদামশায় সম্বন্ধে আরো শুনতে চাইলো। কিসি আফ্রিকা থেকে তাঁকে এদেশে বন্দী করে নিয়ে আসবার কাহিনী, স্পটসিলভেনিয়ার আবাদে জনসাহেবের কাছে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয়, তাঁর পলায়নের চেষ্টা, কুঠারাঘাতে পদচ্ছেদ সব বললো।

শিশুর ক্ষুদ্র আননখানি বেদনায় বিকৃত হয়ে গেলো।

'মা, তারা কী করে কেটে ফেলতে পারলো ?' 'মা, কেন নিগ্রোরা পালিয়ে যেতো ?'

'সাদা মানুষেরা কী কষ্ট দিতো ?'—তার অবিরাম প্রশ্নবাণে কিসি অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। ধমকেও কাজ হতো না। জর্জকে বেশী সময় থামিয়ে রাখা যেতো না।

'আফ্রিকা কোথায় মা ?' 'আফ্রিকাতে ছোট ছেলে আছে ?' 'দাদামশায়ের নাম কী মা ?'

জর্জের মনে কিসির আশার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। কল্পনার রঙ চড়িয়ে শিশু নিজের মনে তার দাদামশায়ের একটি ছবি এঁকেছিলো। কিসি তার স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত অমূল্য রত্নকণিকা আহরণ করে সে ছবিটি আরো উজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করছিলো। জন সাহেবের বাড়ী যাওয়ার পথে গাড়ীর ওপরে সরু আসনটুকুতে বাবার পাশে বসে স্পটসিলভেনিয়ার সেই গরম ধূলিধূসর পথ অতিক্রম, ওয়ালার সাহেবের আবাদের শেষ সীমানায় নদীর ধারে বাবার হাত ধরে বেড়ানো—যেখানে পরে নোয়ার হাত ধরেও সে বেড়িয়েছে—একে একে ছবির মতো তার চোখের সামনে ভাসতো।

'আমার তখন তোমার মতো বয়স। বাবা আমাকে পাশে বসিয়ে গাড়ী চালাবার সময় আফ্রিকাদেশের গান শোনাতেন। সে-দেশের অনেক কথাও শিখিয়েছেন। যেমন বেহালাকে বলতেন 'কো'। নদীকে 'কাম্বি বলোঙো'। কিসি ভাবছিলো—আজ কোথায় তার বাবা! ছেলেকে আফ্রিকার ভাষা শেখাচ্ছে জানলে তাঁর মত সুখী কে হতো!

'বল দেখি—'কো'!'

'কো।'

'কাম্বি বলোঙো' কথাটিও জর্জ একবারেই নির্ভুল উচ্চারণ করলো। 'আরো বল, আরো বল মা!' পুত্রস্নেহে কিসির হৃদয় উচ্ছলিত হয়ে উঠলো।

পঁয়ষট্টি

ক্রীতদাসেদের ছ'বছর বয়সে ক্ষেতের কাজ শুরু করতে হয়। জর্জের ছ'বছর হলো। রান্নাঘরে তাকে আর কাছে পাওয়া যাবে না ভেবে মিস ম্যালিসির মন বিষণ্ণ হয়ে গেলো। তেমনি তাকে কাছে পাওয়ার সম্ভাবনায় ক্ষেতের কাজের লোকেরা উৎফুল্ল। জর্জ আনন্দের প্রতিমূর্তি, সে যেখানে, সেখানেই আনন্দের সৃষ্টি হতো। জর্জ অবশ্য নতুন সাম্রাজ্য অভিযানের সম্ভাবনায় খুশী। পম্পেকাকার লাঙ্গল চালাবার সুবিধার জন্য তার পথের সামনে থেকে পাথরের টুকরো সরিয়ে নিতো। ক্ষেতের ধারের ঝরণা থেকে সবার জন্য ঠাণ্ডা জল এনে দিতো। জর্জের মুখের সহজাত হাসিটি তার স্বচ্ছ, বিমল হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি ছিলো। তার উপস্থিতিটুকুই যেন সকলকে কাজের প্রেরণা যোগাতো। ক্ষেত নিড়াবার যন্ত্রটির হাতল তার ছোট্ট দেহের থেকে লম্বা। লাঙল তার মাথার থেকে উঁচু। বড়দের অনুকরণে ওগুলো চালাবার চেষ্টা সবার হাসির খোরাক জোটাতো।

কাজের শেষে ঘরে ফিরে কিসি রান্নার জন্য ব্যস্ত হতো। ভাবতো আহা জর্জের নিশ্চয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু জর্জ শীঘ্রই মায়ের অভিভাবক হয়ে উঠলো। 'মা, সারাদিনের কাজের পর আগে একটু বিশ্রাম করে নেবে। পরে রান্না করবে।' সে সব ব্যাপারেই মাকে নির্দেশ দিতো। ঘরে পুরুষ অভিভাবকের অভাব সে-ই যেন মেটাতো। বয়স আন্দাজে জর্জ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। চঞ্চল ছ'বছরের বালক—ঘরের ভেতর তার সময় কাটবে কী করে? কখনো বা একটা কাঠির আগা

স্ঁচোলো করে মাটিতে ছবি আঁকবার চেষ্টা করতো। কিসির তা দেখে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতো। এর পরে বুঝি লিখতে পড়তে চাইবে! ভয়ে সে ছেলের সামনে লেখাপড়ার নামও উচ্চারণ করতো না। তার নিজের জীবনের চরম সর্বনাশের জন্য দায়ী—ঐ লেখাপড়া। লী সাহেবের আবাদে আসার পর একদিনও সে কলম বা পেন্সিল হাতে নেয়নি। বই বা খবরের কাগজ পড়েনি। সে যে কোন-দিন লিখতে পড়তে জানতো ভুলেও কারো কাছে প্রকাশ করেনি। মাঝে মাঝে মনে কৌতূহল হতো—লেখাপড়া সম্পূর্ণ ভুলে গেলো কিনা। একটা বিশেষ শব্দ লিখতে পারবে কিনা ভাবতে চেষ্টা করতো। লিখতে লোভও হতো। কিন্তু নিজের কাছে সে যে শপথ করেছিলো তা সে কখনো ভাঙেনি। তবুও বাইরের খবরের অভাবটা তাকে বড় পীড়ন করতো। ওয়ালার সাহেবের ওখানে বাবা বাইরে থেকে ঘুরে এসেই কোথায় কী দেখেছেন বা শুনেছেন সবাইকে বলতেন। এখানে লী সাহেব নিজেই গাড়ী চালান। খবর বলবে কে? বহুদিনে একবার বাইরের লোকেদের কখনো হয়তো মালিকের বাড়ী নেমন্তন্ন থাকতো। তখন যা দু'টো একটা খবর সংগ্রহ হতো।

জর্জের অপরের কথা ও ভাবভঙ্গী অনুকরণ করবার অসাধারণ প্রতিভা ছিলো। মালিকের মোরগ পরিচর্যা করবার লোক সেই মিঙো সকলের কাছেই রহস্যজনক। কদাচিৎ তাকে দেখা যেতো। তাকে একদিন দেখেই জর্জ তার শরীর ঝাঁকি দিয়ে চলবার নিজস্ব ভঙ্গী অবিকল নকল করে দেখালো। মালিক একজন শ্বেতকায় যাজককে ক্রীতদাস বসতিতে ধর্মোপদেশ দেবার জন্য অল্প সময়ের জন্য নিয়ে এসে-ছিলেন। জর্জ তাঁর ভাবভঙ্গী কথাবার্তা শিখে নিলো। পরের শনিবার সকালে লী সাহেব চিরাচরিত নিয়মে ক্রীতদাস বসতিতে রেশন দিতে এসেছেন। জর্জ একটা ইঁদুর তাড়া করে ছুটতে ছুটতে এসে প্রায় তাঁর গায়ের ওপর পড়ছিলো। লী সাহেব কৌতুকভরে খুব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন—'এ ছেলেটি রেশন পাবার উপযুক্ত কী পরিশ্রম করে?' চারজন বয়স্ক ব্যক্তিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ন'বছরে জর্জ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লী সাহেবের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললো—'স্যর, আমি ক্ষেতে কাজ করি আর ধর্মোপদেশ দিই।'

লী সাহেব পরম বিস্ময়ে বললেন—'আমরা একটু ধর্মোপদেশ শুনি তা'হলে।'

পাঁচ জোড়া দৃষ্টির সামনে জর্জ অবিচলিত চিত্তে মালিকের আনা সেই ধর্ম-যাজকের অনুকরণে তারস্বরে চেঁচিয়ে হাত ছুড়ে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে দিলো। মালিককে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। সেই তিনি বক্তৃতা শেষ হ'বার আগেই

হেসে খুন। তাঁর হাসি দেখে জর্জও তার ধবধবে সাদা দাঁতের এক গাল হেসে মিস ম্যালিসির কাছে শোনা একখানা গানও শুনিয়ে দিলো। লী সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বললেন—'বাঃ চমৎকার ধর্মোপদেশ! তোমার যখন খুশী দিতে পার, আমার আপত্তি নেই।' ফিরে যাবার সময় বারবার তিনি পেছন ফিরে জর্জকে দেখছিলেন। হাসির ধমকে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছিলো। জর্জও হাসিমুখে তাকিয়ে ছিলো।

কিছুদিন পর লী সাহেব বাইরে থেকে দু'গোছা ময়ূরের পালক নিয়ে এলেন। পরের রবিবার তাঁর বাড়ীতে অতিথি আসবেন। জর্জকে ডেকে খাবার সময় অতিথিদের পেছনে দাঁড়িয়ে কেমন করে পালকের হাওয়া করতে হবে দেখিয়ে দিলেন।

মিস ম্যালিসি মন্তব্য করলো—'যত সব চালিয়াতি।' যাই হোক মালিকের নির্দেশমতো কিসিকে জানাতেই হলো—নির্দিষ্ট দিনে যেন জর্জকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে পরিষ্কার ইস্ত্রী করা জামাকাপড় পরিয়ে সময়মতো বড় বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জর্জ তার নতুন ভূমিকার কল্পনায় পুলকিত। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত—সাহেব পর্যন্ত, এতে তার আনন্দ আর ধরছিলো না।

অতিথিরা খেতে বসেছেন। মিস ম্যালিসি পরিবেশন শেষ করে এসে এক ফাঁকে ছুটে এলো উদ্বিগ্ন শ্রোতাদের খবর শোনাতে। 'এ মহা চালু ছেলে! সাহেব মেম-সাহেবকে ছাড়িয়ে যায়। কবজি ঘুরিয়ে কোমর বাঁকিয়ে তার হাওয়া করবার কায়দা যদি দেখতে। সাহেব মিষ্টি খাবার শেষে সুরা ঢালতে ঢালতে জর্জকে ধর্মোপদেশ শোনাতেও বলেছিলেন। জর্জ অমনি সাহেবের কাছে বাইবেলের বদলে একটা বই চেয়ে নিলো। তারপর মেমসাহেবের সবচেয়ে সুন্দর নীচু টুলটা টেনে নিয়ে তড়াক্ করে তার ওপর লাফিয়ে উঠলো। সে কী ধর্মোপদেশের ঘটা! সেটা শেষ হতে কারো বলার অপেক্ষা না রেখে গানও শুরু করেছে। সেই ফাঁকেই তো পালিয়ে এলাম।'

কিসি, পম্পেকাকা আর সিস্টার স্যারার তো সব কথা শুনে দেমাকে ফাটো ফাটো অবস্থা! মিস ম্যালিসি এক ছুটে বড় বাড়ীতে ফিরে গেলো।

স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতির মিসেস লীও এরপর জর্জের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাকে নানা কাজের অছিলায় ডেকে পাঠাতেন। এরপর থেকে এগারো বছরের জর্জের ক্ষেতে কাজ করবার অবকাশই মিলছিলো না।

নৈশভোজে আমন্ত্রিতদের হাওয়া করবার ভার পাকাপাকি ভাবে জর্জের ওপর

পড়ায় সে তাঁদের কথাবার্তা শুনবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলো। এবার থেকে জর্জের মারফৎ বাইরের খবর পাওয়া যেতো। কোন এক সাহেব বলেছেন—প্রায় তিন হাজার স্বাধীন নিগ্রো নানান জায়গা থেকে এসে ফিলাডেলফিয়াতে বিরাট সভা করেছে। প্রেসিডেণ্ট ম্যাডিসনের কাছে সভার সিদ্ধান্ত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—'এ দেশ গড়ে তুলতে এবং এ দেশের পক্ষ হয়ে লড়াই করতে ক্রীতদাস এবং স্বাধীন নিগ্রোদের যথেষ্ট অবদান আছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সকল সুখ-সুবিধায় তাদের সমান অধিকার থাকা উচিত।' এ কথা শুনে লী সাহেব বলেছেন সব ক'টা স্বাধীন নিগ্রোকে দেশ থেকে বার করে দেওয়া উচিত।

অন্য এক ভোজসভার সংবাদ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বিরাট ক্রীতদাস বিদ্রোহ হয়েছে। বিদ্রোহীরা শস্য জালিয়ে দিয়েছে, বাড়ীঘর পুড়িয়েছে, এমন কি নিজেদের মালিকদের হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আর একবারের খবর—বস্টন থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে 'কনকর্ড কোচ' চালু হয়েছে। রবার্ট ফুলটন নামে সাহেব একটি বাষ্পপোত তৈরী করেছে। সেটি বারো ঘণ্টায় আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হতে পারবে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এক রবিবার জর্জ খবর আনলো আফ্রিকার লাইবেরিয়া নামে এক জায়গায় স্বাধীন নিগ্রোদের জাহাজে করে পাঠানো হচ্ছে। খাবার টেবিলে সাহেবেরা ঠাট্টা করে বলছিলেন—নিগ্রোদের বলা হয়েছে, সেখানে গাছে গাছে খাবার ঝুলে থাকে আর ডাল কাটলেই পানীয়। তাই শুনে নিগ্রোদের মাঝে সেখানে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে।

সিস্টার স্যারা তাই শুনে মন্তব্য করলো—'আমি কখনো আফ্রিকা যাবো না। ওখানে নিগ্রোরা বাঁদরের মতো গাছে চড়ে থাকে।'

কিসি তীব্রস্বরে বলে উঠলো—'সে আবার কী কথা? আমার বাবা আফ্রিকা থেকে এসেছেন। তাঁকে কখনো গাছে চড়তে শুনিনি।'

সিস্টার স্যারা এই অতর্কিত আক্রমণে রুষ্ট হলো। পম্পেকাকা শান্তিবারি সিঞ্চনের চেষ্টায় বললো—'ঠিক আছে। আমাদের নেবার জন্য তো জাহাজ আসছে না। অত চিন্তায় দরকার কী?'

ক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় সেদিনকার সভা ভঙ্গ হলো।

তার আত্মাভিমানী, বিচক্ষণ পিতা এবং তাঁর প্রিয় স্বদেশ সম্পর্কে এই কটাক্ষে কিসি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলো। আফ্রিকাবাসী দাদামশায়ের প্রতি কাল্পনিক বিদ্রূপে জর্জেরও একই প্রতিক্রিয়ায় কিসি বিস্মিত ও হৃষ্ট হলো।

'মা, সিস্টার স্যারা ঠিক বলেননি, না?' একটুক্ষণ নীরব থেকে জর্জ দ্বিধার স্বরে বললো—'মা, তাঁর সম্বন্ধে আরো কথা বল না! তুমি বলেছিলে দাদামশায় সবসময় তোমাকে আফ্রিকার কথা বলতেন। তুমি যেমন সেসব কথা আমাকে বলেছো, আমিও তেমনি দাদামশায়ের গল্প আমার ছেলেমেয়েদের বলবো।'

কিসি মনে মনে হাসলো। তার এই অসাধারণ ছেলেটা বারো বৎসর বয়সেই ভবিষ্যৎ সন্তানের কথা ভাবছে।

জর্জ সাহেব মেমসাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠাতে ক্রমশঃ তার স্বাধীনতার পরিধি বেড়ে যাচ্ছিলো। রবিবার বিকালে তাঁরা দু'জনে গাড়ী করে বেরিয়ে গেলে জর্জ আপনমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লী সাহেবের এলাকার চৌহদ্দির ভেতর ঘুরে বেড়াতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে কিসিকে বললো, সে লড়াইয়ে মোরগের পরিচারক ও শিক্ষক সেই বৃদ্ধের কাছে গিয়েছিলো।

'তোমরা যতটা বল, তত কিছু অদ্ভুত লোক নয় সে। আমার সাথে কত গল্প হলো! এমন মোরগ কখনো দেখিনি। এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই পরস্পরের সাথে লড়াই করছে। বুড়ো আমাকে ওদের খাওয়াতে দিয়েছিলো। সে বলে—সে যেমন করে মোরগগুলোর যত্ন করে, কোন মানুষের মাও তার বাচ্চার জন্য তেমন করতে পারবে না। কেমন করে ওদের পিঠ, ঘাড় ঘষে দিতে হয়—সব আমাকে দেখিয়েছে মা!'

মোরগ সম্পর্কে তার ছেলের ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা দেখে কিসির খুব কৌতুক বোধ হলো।

'ওখানে যেয়ো না সোনা। জান না ঐ বুড়ো ছাড়া আর কারোর সেখানে যাওয়া মালিকের পছন্দ নয়।'

'মিঙোকাকা বলেছে—সাহেবকে বলবে যাতে আমাকে তিনি ওখানে যেতে দেন। তাহলে মোরগগুলোকে খাবার খাওয়াতে আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো।'

পরদিন ক্ষেতে যাবার পথে কিসি সিস্টার স্যারাকে জর্জের এই নতুন অভিযানের কথা বললো। খানিকক্ষণ নীরব থেকে স্যারা বললো—'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমি তো আর শুনতে চাও না। তবু তোমার জর্জ সম্বন্ধে একটুখানি বলছি। সে অসাধারণ ছেলে। তার জীবন আর পাঁচজন নিগ্রোর মতো সাদামাটা হবে না।'

মিঙোকাকা সত্যি মালিকের কাছে জর্জের কথা বলেছিলো। মালিক তখনই রাজী হয়ে গেলেন। কয়েক বৎসর যাবৎই মিঙো একা পেরে উঠছিলো না। একটি সাহায্যকারী চাইছিলো। তার বয়স হয়েছিলো। স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছিলো না। কিছুদিন ধরে কাশির প্রকোপ বেড়েই যাচ্ছিলো। লী সাহেবও মোরগগুলোর ভবিষ্যত তদাবকী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। শীঘ্রই ক্যাসওয়েল জেলার বাৎসরিক মোরগ লড়াই শুরু হবে। জর্জ ওগুলোকে খাওয়াবার ভার নিলে মিঙো লড়াই শেখাবার ব্যাপারে আরো সময় দিতে পারবে।

শিক্ষানবিশীর প্রথমদিনে মিঙো জর্জকে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবার ভার দিলো। জর্জ সে কাজটা ভালোভাবে করতে পারলে তাকে আর একটু বড়—প্রায় এক বছরের বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে দেওয়া হলো। দিনে তিনবার ঝরণা থেকে জল এনে তাদের খাবার জল বদলে দিতে হতো। সবচেয়ে বড় মোরগগুলোকে মিঙো নিজেই খেতে দিতো।

লী সাহেব প্রত্যহ ঘোড়ায় চেপে একবার আসতেন। সে সময়টা জর্জ যতদূর সম্ভব আড়ালে থাকতো। সে লক্ষ্য করেছিলো—তার প্রতি সাহেবের ব্যবহারে আগের উষ্ণতা আর নেই। এখন সাহেবের মনপ্রাণ মোরগ নিয়ে একান্ত ব্যস্ত। মিঙোর সাথে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি খাঁচা দেখতেন। মিঙো সবসময় মালিকের ঠিক এক কদম পিছনে থেকে তাঁর প্রতিটি প্রশ্ন মন দিয়ে শুনতো এবং উত্তর দিতো। জর্জ দেখেছে—মিঙোকাকার সাথে সাহেবের ব্যবহার খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ, পম্পেকাকা, সিস্টার স্যারা বা তার মায়ের সাথে যেমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ, তেমন নয়। তারা যে ক্ষেতে কাজ করে, তাই তারা অন্ত্যজ!

'এবার ত্রিশটা মোরগ লড়াইয়ে দেবো মিঙো। তার মানে অন্ততঃ গোটা ষাটেক তৈরী করতে হবে।'

'হ্যাঁ স্যর। অন্ততঃ গোটা চল্লিশ ভালো মোরগ পাওয়া যাবেই।'

জর্জের মনে অনেক প্রশ্ন জাগতো। কিন্তু তাই নিয়ে মিঙোকাকাকে বেশী বিরক্ত করতো না! মিঙোকাকা কম কথা বলা পছন্দ করতো। জর্জ জানতো সে কম কথা বলে, তাই মিঙোকাকা তার উপর এতটা সন্তুষ্ট। তার একটা কারণ—ভালো মোরগ লড়াইয়েদের মিষ্টভাষী হতে হয়। কারণ বাইরের লোকের কাছে অনেক খবর গোপন রাখতে হবে। মিঙোকাকা নিজেও বেশী কথা বলতো না। নীরবে, শুধু চোখে দেখে জর্জ কেমন কাজ করছে বুঝে নিতো। ইচ্ছা করেই তাকে

খুব সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়ে অন্যদিকে সরে যেতো। জর্জ কত তাড়াতাড়ি নির্দেশ বুঝতে পারে আর শেখানো জিনিস মনে রাখতে পারে—যেন তারই পরীক্ষা করতো। এ পরীক্ষায় জর্জ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলো—তাকে একেবারে কিছু বললেই সে মনে রাখতে পারতো।

তা সত্ত্বেও মালিকের প্রস্তাবের জন্য মিঙো প্রস্তুত ছিলো না। জর্জের কাজ সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করতেই তিনি বলেছিলেন—'আমি ভাবছিলাম ছেলেটি দিবারাত্রি এখানে থাকলেই তোমার সুবিধা হবে। কিন্তু তোমার ঘরটা তো বেশী বড় নয়। তোমার ও জর্জের জন্য একটা ঝুপড়ি করে নাও।'

কুড়ি বৎসর একা লড়াইয়ে মোরগের সাথে কাটাবার পর জর্জকে তার সাথে রাখবার পরিকল্পনা মিঙোর একান্ত অন্যায় ও অনধিকার-প্রবেশের মতো মনে হলো। কিন্তু তার আপত্তি বা অনিচ্ছা জানাবার উপায় ছিলো না।

খবরটা শুনে জর্জেরও অবিমিশ্র সুখ হলো না। মিঙোকাকা ও তার মোরগের দল সম্পর্কে জর্জের যথেষ্ট উৎসাহ। কিন্তু ওখানে থাকলে বড় বাড়ীতে পাখা দোলানো ও আরো হরেক রকম মজার দিন শেষ হবে। মিসেস লী তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁর সাথে সম্পর্কও শেষ হবে। মিস ম্যালিসি তাকে বড় বাড়ীর রান্নাঘর থেকে কত ভালো জিনিস খেতে দিতো—তাও আর হবে না। সবচেয়ে মুস্কিলে পড়লো মাকে খবরটা জানাতে গিয়ে।

সন্ধ্যাবেলা খুব গম্ভীর মুখে এসে বললো—'মা, একটা কথা বলবো।'

'সারাদিনের খাটুনীর পর আর মোরগের গল্প শুনতে পারবো না।'

'না, মা, তা নয়। মালিক মিঙোকাকাকে বলেছেন—আমি এখন থেকে ওখানে থাকবো।'

কিসি উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলো—'কেন, ওখানে থাকলে বেশী সুবিধাটা কী হবে? এখান থেকে কোন কাজটা করা যাচ্ছে না?'—তার কথাগুলো যেন মর্ম-ছেঁড়া আর্তনাদ!

কিসির ক্রোধান্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে জর্জ কাতরভাবে বললো—'মা, আমি তো থাকতে চাইনি। আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না। মালিক বলেছেন।'

'তোমার এখনো একা থাকার বয়স হয়নি। এটা নিশ্চয় ঐ মিঙো নিগ্রোর ফন্দী।'

'না মা। তা নয়। মিঙোকাকা একা থাকতেই চায়। মালিকের আমাদের ভালোর জন্য……।' কথাটা শেষ করতে পারলো না।

'কী বললে ? তোমার ভালোর জন্য। তিনি তোমার বাবা হতে পারেন। কিন্তু মোরগ ছাড়া কারো জন্যই তিনি কিছুমাত্র চিন্তা করেন না।'

কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র কিসি ও জর্জ দু'জনেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। কিন্তু পলকের জন্য মাত্র। কিসির রাগ ও বিদ্বেষ বাধা মানলো না।

'হ্যাঁ, সত্যি কথা। তোমার জানা-ই ভালো। কিন্তু তা বলে তোমার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র ভাববেন—আশা করো না। কী করে মোরগের লড়াইয়ে জিতে বড়লোক হবেন সেই তাঁর একমাত্র চিন্তা।'

জর্জের কথা বলার শক্তি ছিলো না। কিসি এবার তাকে মারতে এগিয়ে এলো। 'দাঁড়িয়ে আছো কেন ? বেরিয়ে যাও ঘর থেকে !'

কিন্তু জর্জের নড়বার সাধ্যও ছিলো না। কিসির দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকলো। সে ছুটে মিস ম্যালিসির ঘরের দিকে পালিয়ে গেলো।

এতক্ষণে জর্জের চোখ উপচে জল গড়ালো। কী করবে বুঝতে পারছিলো না। খানিক পরে অন্যমনে তার অল্প দু'চারখানা জামাকাপড় যা ছিলো একটা থলিতে ভরে নিলো। তারপর অনিশ্চিত পদক্ষেপে লড়াইয়ে মোরগের এলাকার দিকে পা বাড়ালো। সে রাত্রে জর্জ একটা মোরগের খাঁচার বাইরে পথের ধূলোয় থলিতে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলো।

ভোরবেলা মিঙো তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলো। সারাদিন বিষণ্ন, নিস্তব্ধ বালকটির সাথে সে যতদূর সম্ভব সহৃদয় ব্যবহার করেছিলো।

তাদের ছোট্ট ঝুপড়িটি তৈরি করতে দু'দিন লাগলো। 'এই মোরগদের নিয়েই তোমার জীবন। এরাই তোমার পরিবারের মতো।'—এই কথাটিই মিঙো জর্জের মনে গেঁথে দিতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু জর্জের দিক থেকে যেন কোন সাড়া ছিলো না। অবশ্য কিছুদিনের মাঝেই মোরগগুলো সম্পর্কে বালক হৃদয়ের কৌতূহল জয়ী হলো। জর্জ ক্রমশঃ মিঙোকে নানাবিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

'এ মোরগগুলো সাধারণ থেকে এমন আলাদা-রকমের কেন ?'

'এগুলোর জাত-ই আলাদা। এরা বুনো মোরগ। বংশানুক্রমে এদের রক্তের ভেতর লড়াইয়ের জিদ এসেছে। মালিক বলেন কুকুরের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক,

অনেক আগে এ জাতের মোরগের সাথেও মানুষের সে সম্পর্ক ছিলো। প্রাচীন-কালে রাজাদের মাঝে মোরগের লড়াই সবচেয়ে বড় খেলা ছিলো।'

আবার কখনো বা দীর্ঘকাল ধরে মিঙোকাকা নিশ্চুপ। বছরের পর বছর শুধু মালিক ও মোরগ ছাড়া তার কথা বলার সঙ্গী ছিলো না। তার ফলেই ওরকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ক্রমশঃ দিবারাত্র কাজেকর্মে জর্জের সাহায্য পেয়ে মিঙো তার সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত হলো। মোরগগুলোকে লড়াইয়ে জিতবার জন্য কেমন ভাবে অতি যত্নে, অতি সতর্কভাবে তৈরী করতে হবে, লড়াইয়ে জিতলে মালিক বাজী জিতে কত টাকা পাবেন—ইত্যাদি ছিলো তার বক্তব্য বিষয়।

'আসল ধনী সাহেবদের প্রচুর মোরগ থাকে। হাজার খানেক মোরগ থেকে তারা শ' খানেক মোরগ লড়াইয়ের জন্য বেছে নিতে পারেন। আমাদের অত নেই। তবুও মালিক ঐ ধনীদের সাথে লড়াইতেও অনেক জিতেছেন। ধনীদের সেটা কখনোই পছন্দ হয়নি। কারণ আমাদের মালিক জাত ধনী নন। অনেক গরীব অবস্থা থেকে ওপরে উঠে এসেছেন। কিন্তু, আমরা যদি মোরগগুলোকে ভালো করে শেখাতে পারি আর যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে হয়তো আমাদের সাহেবও একদিন ওঁদের মতই ধনী হতে পারবেন। বুঝতে পেরেছো? মোরগ লড়াইয়ে কী বিপুল টাকা বাজিতে জেতা যায় লোকের ধারণা নেই। আমাকে যদি কেউ একশো একর আবাদের জমি আর একটা সত্যিকারের ভালো জাতের লড়াইয়ে মোরগের মধ্যে বেছে নিতে বলে তবে অতি অবশ্যই আমি লড়াইয়ে মোরগ নেবো। মালিকেরও তাই মত। তাই তিনি জমি বা ক্রীতদাসের পেছনে টাকা ঢালতে চান না।'

চোদ্দ বছর বয়সে জর্জ প্রতি রবিবার ছুটি নিয়ে ক্রীতদাস বসতির সবার সাথে দেখা করতে আসতো। মায়ের মতো মিস ম্যালিসি, সিস্টার স্যারা ও পম্পে-কাকাকেও সে নিজের পরিবারের লোক বলেই মনে করতো। তাদের সকলেরই সেই নিষিদ্ধ এলাকার রহস্যময় কাজকর্ম সম্পর্কে জানবার ভয়ানক আগ্রহ। কিন্তু সত্যি তো তাদের বেশীকিছু বলা সম্ভব ছিলো না। তাই জর্জ তাদের সামান্য কিছুই বলতো—খবর হিসাবে যার বিশেষ গুরুত্ব ছিলো না। জর্জ মোরগগুলোকে ইঁদুর মারতে দেখেছে। বেড়াল বা শেয়ালকে পর্যন্ত লড়াইয়ে মোরগ তাড়া করে যায়। এ জাতের মোরগ বা তার ডিমের প্রচণ্ড দাম। চুরির ভয়েই মালিক এত সাবধান। কাউকে সেদিকে যেতে দেন না। মিঙোকাকা বলেছে দারুণ ধনী জুয়েট সাহেব তিন হাজার ডলার দিয়ে একখানা মোরগ কিনেছেন। ইত্যাদি

ইত্যাদি। মিস ম্যালিসি বলে উঠলো—'কী সর্বনেশে কথা ! ওর চেয়ে কম টাকায় যে তিন চারখানা নিগ্রো কেনা যায় !'

কোনরকমে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেল হয়ে এলেই জর্জের মন মোরগ এলাকায় ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতো। কত কাজ ! দ্রুতপদে ফিরে যাবার পথে নতুন কচি ঘাস দেখলেই মোরগদের জন্য তুলে নিতো। প্রতিটি খাঁচায় খানিকটা করে দিয়ে দিতো। গম, ওট, মাখন, ডিম, নানারকম গুল্ম এক বোতল বীয়ার ঢেলে ভালো করে মাখা হতো। তারপর ছোট ছোট গোল বিস্কিটের মতো করে সেঁকে নেওয়া হতো। মিঙোকাকা বলতো—এ জিনিস পাখীগুলোর পক্ষে অত্যন্ত বলকারক।

মালিক চাইতেন—মোরগগুলোর গায়ে বিন্দুমাত্র চর্বি জমবে না। গায়ে শুধু পেশী ও হাড় থাকবে। জর্জের কাজ ছিলো একটার পেছনে আর একটাকে লেলিয়ে দিয়ে মোরগগুলোকে যতদূর সম্ভব ছুটোছুটি করানো। খুব হাঁফিয়ে গেলে বিনা নুনের মাখন গুল্মে মিশিয়ে খানিকটা করে খাইয়ে দিয়ে একটা গভীর বাস্কেটে ওদের নরম খড়ের ওপর শুইয়ে গায়ের ওপর আরো খানিকটা খড় চাপিয়ে দিতে হতো। মিঙোকাকা বলতো তাতে ওদের ঘাম হবে, শরীরের চর্বি কমবে। সেসব হয়ে গেলে নিজেদের খাঁচায় পাঠাবার আগে মিঙোকাকা প্রতিটি মোরগের মাথা ও চোখ চেটে দিতো। বলতো—'লড়াইয়ের সময় এভাবে রক্ত চেটে পরিষ্কার করে দিতে হবে। সেটাই এদের অভ্যাস করাচ্ছি।'

জর্জ ভাবতো—মা, মিস ম্যালিসি, সিস্টার স্যারা, পম্পেকাকা সবাই দুঃখ করে—আমি ওদের কাছে থাকতে পারি না বলে। এখানকার জীবনে যে কতবেশী উত্তেজনা তা ওরা কল্পনাই করতে পারবে না।

নতুন বছরের দুদিন পর বাছাইকরা মোরগগুলোর মাথা, ঘাড়, ডানা আর পেছনদিকের পালক ছাঁটাই করা হলো। এতে তাদের চেহারা অনেক হালকা ও দৃঢ় দেখতে হলো। সাপের মতো লম্বা গলা। শক্ত বড় ঠোঁটওয়ালা মাথা। আর তীব্র, হিংস্র চাহনি। পায়ের পেছনের নখগুলোও পরিষ্কার করে দেওয়া হলো।

প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে মিঙো ও জর্জ বাছাইকরা বারোটি মোরগকে গুড়-মেশানো মাখনের গুলি খাইয়ে সঙ্গে যাবার খাঁচায় ভরে নিচ্ছিলো। লী সাহেব বড় গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে এক ঝুড়ি লাল রঙের আপেল। জর্জ ও মিঙো গাড়ীতে খাঁচাগুলো তুলে দিলো। মিঙো সাহেবের পাশে চড়ে

বসলো। গাড়ী চলতে শুরু করলে শেষ মুহূর্তে মিঙোকাকা কর্কশ কণ্ঠে হাঁকলেন—'হলো কী? যাবে, কি, না?'

জর্জ একলাফে গাড়ীতে চড়ে বসলো। কেউ তো তাকে যাবার কথা আগে বলেনি। একটু পরে দম ফেলে জুত করে বসলো। গাড়ীর ক্যাঁচক্যাচানি, মোরগের ডাক আর অনবরত ঠোকরাবার শব্দ—সবকিছুর একটা মিশ্র আওয়াজ তার কানে আসছিলো। লী সাহেব ও মিঙোকাকার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছিলো। মায়ের সে কথাটা আবার মনে পড়ে গিয়ে নতুন করে বিস্ময় ও বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। মালিক তার বাবা? অথবা তার বাবাই মালিক?—যে ভাবেই ধরা যাক না!

যত এগোচ্ছিলো—সামনে পাশে অন্য বহুরকমের গাড়ী, ঠেলা বা ঘোড়ায় চেপে মানুষ দেখা যাচ্ছিলো। পায়ে হেঁটেও মানুষ আসছিলো—তাদের হাতে বস্তা। জর্জ জানে সেই বস্তার ভেতরে আছে লড়াইয়ে মোরগ। জর্জ ভাবছিলো—লী সাহেব লটারীর টিকিট জিতে এমনি পায়ে হেঁটে কি তার প্রথম মোরগটি নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন? কে জানে! আজ যারা পায়ে হেঁটে খেলায় যাচ্ছে, তারাও হয়তো একদিন লী সাহেবের মতো জমি, বাড়ী, গাড়ী করবে।

দু'ঘণ্টা পরে যেন বহুদূর থেকে অগণিত মোরগের সম্মিলিত কণ্ঠের ডাক শোনা গেলো। সেই অবিশ্বাস্য, অশ্রুতপূর্ব ঐক্যতান ক্রমশঃই বাড়ছিলো। ক্রমে গাড়ী লম্বা পাইন গাছের একটা ঘন জঙ্গলের কাছে পৌঁছালো। মাংস রান্নার গন্ধ আসছিলো। চারিদিকে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়া আর খচ্চর। তারা পা ঠুকছে, লেজ ঝাড়ছে, হ্রেষাধ্বনি করছে। সবকিছুর পটভূমিকায় আছে অসংখ্য লোকের কলরব।

মালিক গাড়ীতে উঠে দাঁড়িয়ে পা টান করে নিচ্ছিলেন। চারিদিকের গরীব সাদা মানুষেরা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—'টম লী!'

এত লোক তার মালিককে চেনে! জর্জ রোমাঞ্চিত হলো। লী সাহেব লাফিয়ে নেমে জনারণ্যে মিশে গেলেন। ছেলে থেকে বুড়ো—চারিদিকে শত শত লোক ভিড় করে ছিলো। জর্জ চারদিকে তাকিয়ে দেখলো—ক্রীতদাসেরা গাড়ী থেকে নামেনি। তারা মোরগের পরিচর্যা করছে। শত শত মোরগ। তাদের ডাকের যেন প্রতিযোগিতা চলছিলো। অনেকগুলো গাড়ীর নীচে বিছানাপত্র। অর্থাৎ গাড়ীর মালিক বহুদূর থেকে রাত কাটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। সস্তা মদের কড়া গন্ধ ভেসে আসছিলো।

'হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না। মোরগগুলোকে দেখ। ক'টা আপেল ছোট ছোট

করে কেটে দাও। লড়াইয়ের আগে এই তাদের শেষ খাওয়া।' মিঙোকাকা মোরগ-গুলোর পা আর ডানা ঘষে দিচ্ছিলো। বালকের উত্তেজিত উজ্জ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মিঙোর বহু বৎসর আগের কথা মনে পড়ে গেলো—যখন সে নিজে বালক মাত্র—প্রথমদিন লড়াইয়ের মাঠে এসেছিলো।

'আচ্ছা যাও! একটু ঘুরে দেখে এসো। শুরু হবার আগে চলে আসবে কিন্তু। শুনেছো?'

কে উত্তর দেবে? জর্জ মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। তুষার শুভ্র থেকে শুরু করে কয়লা কৃষ্ণ তার মাঝে আরো যত বিচিত্র বর্ণ হতে পারে—সব রকম রঙের মোরগই বিভিন্ন খাঁচায় ছিলো। জর্জ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। অবশেষে আসল জায়গাটি দেখতে পেলো। মস্তবড় একটা বৃত্ত। দু'ফুট গভীর করে কেটে তৈরী হয়েছে। বালি মাখানো মাটি দিয়ে মেঝেটা শক্ত করে পেটানো। মাঝখানে আর একটি ছোট বৃত্ত। তার দু'পাশে সমান দূরে দুটি সরল রেখা। সেখানেই খেলা হবে। পাশে একটা ঢালু জায়গায় লোকেরা বসে প্রচণ্ড হৈ হৈ করছে আর মদ খাচ্ছে।

অকস্মাৎ একজন লালমুখো অফিসারের উচ্চকণ্ঠের ঘোষণায় জর্জ চমকে উঠলো—

'ভদ্রমহোদয়গণ, এবার লড়াই শুরু হবে।'

জর্জ ছুটতে ছুটতে কোনক্রমে মালিকের একমুহূর্ত আগে নিজেদের মোরগের কাছে পোঁছে গেলো। মালিক ও মিঙোকাকা খাঁচার মোরগগুলোর দিকে তাকিয়ে নীচু স্বরে কথা বলতে শুরু করলো। জর্জ গাড়ীর সামনের সীটে দাঁড়িয়ে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে ককপিটের দিকে তাকালো। চারজন লোক ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। তাদের মধ্যে দু'জন ককপিটের দিকে এলো। বগলে একটা করে মোরগ। বাজির ডাক চলছিলো—'লালের ওপর দশ।' 'নীলের ওপর কুড়ি!'

মোরগ দুটোকে ওজন করা হলো। তারপর মালিকেরা নিজেদের মোরগের পায়ে তীক্ষ্ণাগ্র লোহার কাঁটা পরিয়ে দিলো। জর্জের মনে পড়লে মিঙোকাকা বলেছিলো দু'আউন্সের বেশী ওজনে তফাৎ হলে দু'টো মোরগের মধ্যে লড়াই চলে না।

রেফারীর সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে মোরগ দুটো পরস্পরের ওপর বিদ্যুতবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে সংঘাত এত সজোরে, যে দু'টো মোরগই উল্টে পড়লো। কিন্তু সামলে নিয়ে আকাশে উড়ে তারা আবার রঙ্গভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দ্রুত-

গতির জন্য তাদের মোরগ বলে চেনা যাচ্ছিলো না। মনে হচ্ছিলো শুধু দু'তাল পালকের বিক্ষোভ।

একজন চেঁচিয়ে উঠলো—'লালটা কেটে গিয়েছে!' মালিকেরা নিজের নিজের মোরগ তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে রঙ্গভূমিতে ছেড়ে দিলো। লাল মোরগটি সত্যি আহত হয়েছিলো। সে মরিয়া হয়ে সহসা তার পায়ের কাঁটা নীলটির মাথায় বিঁধিয়ে দিলো। মরণাহত মোরগটি তৎক্ষণাৎ নীচে পড়ে গেলো। শুধু তার ডানা দুটি খানিকক্ষণ শেষ আক্ষেপে ঝাপটাচ্ছিলো। চারিদিকে উত্তেজিত জয়োল্লাস, স্থূল অভিসম্পাত বাণী ছাড়িয়ে রেফারীর ঘোষণা শোনা গেলো—'জয়ী মিঃ গ্রেসনের মোরগ—সময় এক মিনিট দশ সেকেণ্ড।' উত্তেজনায় জর্জের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। আরো পাঁচ ছ'খানা খেলার পর সরকারী ঘোষণা শোনা গেলো—'এবার মিঃ লী!'

মালিক তাড়াতাড়ি একটি মোরগ বগলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। মোরগটাকে জর্জ নিজের হাতে খাবার খাইয়েছে মনে করে আত্মপ্রসাদে তার বুক ফুলে উঠলো। মালিক ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মোরগ দু'টি ওজন করা হলো, তাদের পায়ে কাঁটা লাগিয়ে দেওয়া হলো। চারিদিকে নতুন করে বাজির ডাক চলছিলো। তারপর আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, প্রচণ্ড আক্রোশে প্রতিপক্ষর মাথায় তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাত, সাপের মতো গলা বাঁকিয়ে সুযোগের সন্ধান, আকাশে উড়ে পরস্পরকে ডানার ঝাপট ইত্যাদি। লী সাহেবের মোরগটাই প্রথম আহত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সামলে উঠলো। অবশেষে তার মারণাস্ত্রেই বিপক্ষ ঘায়েল হলো।

লী সাহেব নিজের মোরগটি আঁকড়ে ধরে গাড়ীর দিকে ছুট লাগলেন। মিঙো-কাকা তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত মোরগটির শুশ্রূষা শুরু করলো। জর্জ দূর থেকে অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো—'বিজয়ী মিঃ লীর মোরগ⋯ ।'

মালিক তাঁর পরবর্তী খেলার জন্য মোরগ বেছে রাখলেন। ইতিমধ্যে আর একটি খেলার ফলাফল ঘোষিত হলো। চারিদিকে শতশত মোরগের কর্কশ ডাক, প্রতি খেলার শুরুতে নতুন বাজির হাঁকাহাঁকি, পাশে রাখা আহত মোরগটির দুর্বল কণ্ঠ—এই বিচিত্র পটভূমিকায় একটি বিষণ্ণ, ভীত, মহা উল্লসিত কিশোর অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। এত উত্তেজনা জীবনে কখনো সে অনুভব করেনি। সেদিনকার সেই নির্মল স্নিগ্ধ প্রভাতের অভিনব পরিবেশে একটি নবীন লড়াইয়ে মোরগ খেলোয়াড়ের জন্ম হলো।

সাতষট্টি

আজকাল জর্জের দিবারাত্রির ভাবনা মোরগ নিয়ে। যে সব মোরগ মিঙো ও লী সাহেব বাতিল করে দিয়েছেন, জর্জ তারই একটাকে অসীম যত্নে শিখিয়ে নিচ্ছিলো। মিঙো সকৌতুক স্নেহে তাকে ডেকে বলেছিলো—যে মোরগ প্রত্যেকটি বিষয়েই শতকরা একশো ভাগ নির্ভরযোগ্য নয়, তাকে দিয়ে খেলাবার ঝুঁকি নিতে নেই। একটা ভালো মোরগ তৈরি করতে জীবনভর সাধনা লাগে। এ ব্যাপারে ভাবপ্রবণতা বা মানসিক দুর্বলতা থাকলে চলে না। লড়াইয়ে মোরগের প্রত্যেকটি ত্রুটির স্থায়ী সংশোধন করতে হবে। তা না করা গেলে সে মোরগ রেখে লাভ নেই। মিঙোকাকার কথা শুনে জর্জের চৈতন্য হলো। তারপর থেকে অক্লেশে সে বাতিল করা মোরগ গলা মুচড়ে মেরে ফেলতো।

জর্জের নিজের হাতে বড করা মোরগ লডাইয়ে জিতলে তার আনন্দ আর ধরতো না। সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন কয়েকটা বুড়ো মোরগ সম্পর্কে মিঙোকাকার কেন পক্ষপাতিত্ব তা সে শুনেছিলো। 'ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিলো। এমন কখনো দেখিনি। এত রক্তপাতও আর কখনো দেখিনি। তবু এরা জিতেছিলো। বহুকষ্টে এদের বাঁচিয়েছি।' জর্জের দিকে ফিরে মিঙোকাকা বলেছিলো—'চোট খাওয়া মোরগ বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। যে মোরগ জিতে গিয়ে বিজয়গর্বে ডাকতে থাকে তাকেও ভালো করে পরীক্ষা করতে হয়। ছোটখাটো ক্ষত অনেক সময় পরে বিষিয়ে ওঠে। লড়াইয়ে মোরগ হলো ঘোডদৌড়ের ঘোড়ার মতো। অদম্য শক্তি। অথচ সামান্যতেই ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।' জর্জের যত্ন করা মোরগ লড়াইয়ে মারা গেলে সে ভয়ানক আঘাত পেতো। তার সেই ছোট ছেলের মতো কান্না সামলাতে মিঙোকাকার হিমশিম খেতে হতো।

কিছুদিন যাবৎ জর্জের মাথায় একটা চিন্তা খেলছিলো। মালিকের কাছে বলবার সুযোগ খুঁজছিলো, তারই মধ্যে অন্য এক বিপদ বাধলো। সাউথ ক্যারলিনার এক স্বাধীন নিগ্রো দল পাকিয়ে সাদা মানুষদের হত্যা করবার চক্রান্ত করেছিলো। কিন্তু বিদ্রোহ সফল হয়নি। অকালে জানাজানি হয়ে যাওয়াতে নিগ্রোদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার শুরু হলো। জর্জ মিঙোকাকার সাথে বসে বেতের খাঁচা বুনছিলো, এমন সময় লী সাহেব ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে হাজির। এক হাতে ঘোড়ার রাশ, অন্য হাতে বন্দুক। তাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বিষাক্ত স্বরে বললেন—'সব শুনেছো নিশ্চয়। একজন নিগ্রো ঠিকসময়ে তার মালিককে না জানালে আজ প্রচুর শ্বেতকায় প্রাণ হারাতো। নিগ্রোদের কখনো বিশ্বাস

করতে নেই। মনে রেখো বিন্দুমাত্র বেচাল যদি দেখি, তোমাদের সব খরগোশের মতো বিনা দ্বিধায় গুলি করে মারবো'—অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি ফিরে গেলেন।

মিঙোকাকা তিক্তমুখে একদলা থুতু ফেলে খাঁচাটাকে এক লাথিতে সরিয়ে দিলো—'হাজার বছর ধরে এদের সেবা কর—তোমার নিগ্রোত্ব আর ঘুচবে না।'

লী সাহেবের লাগোয়া আবাদে জর্জের এক বান্ধবী জুটেছিলো। রাতের অন্ধকারে প্রায়ই সে সেখানে পালাতো। বৃদ্ধ মিঙোকে কিন্তু সে ফাঁকি দিতে পারেনি। তার এই অভিসার মিঙোর অজানা ছিলো না—'দেখ ছোকরা. ভেবো না মালিকের পেয়ারের লোক বলে তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে। ভয় পেলে এই সাদা মানুষেরা পাগলের মতো কাজকর্ম করে। এই ঝামেলা না মিটলে খবরদার রাত্রে বেরোবে না। বুঝতে পেরেছো? একেবারেই নয়। মনে থাকে যেন।'

জর্জ খাঁচাটা তুলে একপাশে বসে নীরবে বুনতে থাকলো। ভাবছিলো—মিঙোকাকা তার মনের কথা এমন নির্ভুল বোঝে কী করে? লী সাহেব তার সাথে ব্যবহারে বিশেষরকম পার্থক্য বা সহৃদয়তা দেখাবেন—এ দুরাশা কি তার আর ঘুচবে না? কত ব্যর্থ. বেদনাদগ্ধ দিবারাত্রি আশার ছলনায় কেটেছে। তবু তার শিক্ষা হয়নি। মালিক তার পিতা—এ ভাবনা তার মনে এখন শুধু গভীর দুঃখই জাগায়। তবু কেন জানি অপর কারো সাথে এ নিয়ে তার কথা বলতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কী করে বলবে? মালিককে সে যে তার পিতা বলে জানে এ কথা তো মিঙোকাকার কাছে স্বীকার করা যায় না। একই কারণে মিস ম্যালিসি, সিস্টার স্যারা বা পম্পেকাকা কারো সাথেই এ বিষয়ে কথা বলা যায় না।

তার মা তাকে ব্যাপারটা জানিয়ে ফেলে অত্যন্ত সঙ্কাচত হয়েছিলো। পরে তার কাছে কাতরভাবে অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছে। মায়ের কাছে এই নিদারুণ যন্ত্রণাময় প্রসঙ্গ তোলা অসম্ভব। এই গভীর গ্লানি তার মায়ের মনে কী প্রতিক্রিয়া এনেছে জর্জের খুব জানতে ইচ্ছা করতো। মালিক এবং মায়ের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখলে মনে হয় না তাদের এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে। একজন অপরজনের অস্তিত্বটুকুও স্বীকার করতে চায় না যেন। জর্জ রাত্রে পালিয়ে গিয়ে তার বান্ধবী চ্যারিটি বা বীউলার সাথে দেখা করলে তাদের মধ্যে যে দেহের ঘনিষ্ঠতা ঘটে, তার মা ও মালিকের মাঝেও তেমন ঘটেছে ভাবলে লজ্জায় মন বিকল হয়ে যায়। অথচ অস্বীকারই বা করবে কী করে? তার তিন চার বছর বয়স থেকে দশ

বছর বয়সের স্মৃতি ভুলবার নয়। মাঝে মাঝেই বিছানার নড়াচড়ায় তার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ত্রাসে বিস্ফারিত নয়নে দেখেছে তার পাশে তার মায়ের ওপর অন্ধকারে কে একজন দাপাদাপি করছে। যতক্ষণ লোকটা চলে না যায় ভয়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। টেবিলের ওপর পয়সা পড়বার শব্দ শুনেছে। ঘরের দরজা ঠাস করে বন্ধ করে দেবার শব্দ শুনেছে। যেন অনন্তকাল ধরে সে নিজের উদ্যত ক্রন্দন রুদ্ধ করে রেখেছে। জোর করে চোখ বন্ধ করে যা দেখেছে, যা শুনেছে সব কিছু অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মায়ের ঘরের তাকের ওপরে কাঁচের বোয়ামে জমানো পয়সাগুলোর দিকে চোখ পড়লেই দুঃস্বপ্নের মতো সব মন পড়ে যেতো। যেন তার পাক দিয়ে বমি উঠে আসতো। সে যে কখনো এসব বুঝতে পেরেছে তার মা জানে না। জর্জ প্রাণ থাকতে জানতে দেবে না।

মাস দুয়েকের মাঝে অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। লী সাহেবের আচরণও ক্রমে আগের মতো সহজ হলো। জর্জ দু'বৎসর যাবৎ চিন্তা করে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলো সেটা সাহেবকে বলবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলো। শুধু মিঙোকাকাকে বলে লাভ নেই। মালিক সেটা গ্রহণযোগ্য মনে করলে তবেই বলা সার্থক। এবার বলার অনুকূল সময় এসেছে—মনে করে জর্জ প্রথমে মিঙোকাকাকে কথাটা বললো—'একটা কাজ করলে সাহেবের আরো অনেক বেশী মোরগ জিতবে বলে মনে হয়। পাঁচ বছর যাবৎ মোরগ লড়াই দেখছি। লক্ষ্য করছি—ভিন্ন ভিন্ন সাহেবের মোরগের লড়াইয়ের ধরনটা ভিন্ন। আমরা মোরগের দেহের শক্তির ওপর জোর দিই। নিছক দেহের শক্তিতেই এরা অনেক লড়াইয়ে জিতেও গিয়েছে বটে। কিন্তু দেখেছি অন্য মোরগ যদি এদের চেয়ে উঁচুতে উড়ে ওপর থেকে মাথায় কাঁটা ফুটিয়ে দেয়, তবে এদের কিছু করবার থাকে না। আমার মনে হয়—যদি আমরা পাখার ব্যায়াম করিয়ে এদের অনেক উঁচুতে উড়তে শেখাতে পারি, তবে ওরা আরো অনেক বেশী লড়াইয়ে জিতবে।'

মিঙোর কুঞ্চিত ভ্রুর নীচে কোটরাগত চক্ষু দুটি কিছুক্ষণ মাটিতে নিবদ্ধ রইলো।

'বুঝতে পেরেছি—কী বলতে চাইছো। মালিককে কথাটা বল।'

অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে জর্জ মালিককে তার বক্তব্য জানালো। মিঙো-কাকাকে যতটুকু বলেছিলো তার চেয়ে বেশীই বললো। গ্র্যাহাম, ম্যাকগ্রেগর, হাওয়ার্ড, জুয়েট—প্রত্যেক সাহেবের মোরগের লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য, যা সে এতদিন ধরে লক্ষ্য করছে—বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করলো। ভয় পায়নি। দৃঢ় প্রত্যয়ের

সাথে বলেছে। তবুও তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারেনি। তাই জর্জের বক্তব্যে লী সাহেবের একাগ্র অভিনিবেশ সে জানতে পারলো না। 'যদি আপনি রাজী হন, মোরগগুলোকে যদি ডানায় জোর বাড়াবার ব্যায়াম করানো যায় তবে এরা অন্য মোরগের চেয়ে উপরে উঠে তাদের মাথায় কাঁটা ফোটাতে পারবে।'

লী সাহেবকে দেখে মনে হলো এতদিন যাকে তিনি ধর্তব্যের মাঝে মনে করেননি আজ প্রথম তাকে চিনলেন।

পরের লড়াইয়ের মরশুমের আগে শেষ ক'মাস লী সাহেব মোরগদের লড়াই শেখাবার এলাকায় অনেক বেশী সময় কাটালেন। মিঙোকাকা ও জর্জ মোরগ-গুলোকে যতদূর সম্ভব উঁচুতে উড়িয়ে দিচ্ছিলো। প্রাণপণে ডানা চালিয়ে নীচে নামবার চেষ্টায় তাদের ডানার জোর বাড়ছিলো। এ কাজে লী সাহেবও মাঝে মাঝে হাত লাগাচ্ছিলো।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মরশুমে বড় বড় খেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় লী সাহেবের মোরগগুলো অনেক বেশী লড়াইয়ে জিতেছিলো। তার কারণ কী তা অবশ্য কেউ অতটা ভেবে দেখেনি।

কিছুদিন যাবৎ লী সাহেবের মেজাজ বড়ই দিলদরিয়া। আহত মোরগগুলো কেমন সেরে উঠছে দেখতে এসেছিলেন। যাবার সময় সহসা জর্জের দিকে ফিরে বললেন—'তোমার বান্ধবীর ওপর আর একজন মহা দুর্দান্ত নিগ্রোর নজর আছে। রাত্রে খুব সাবধানে চলাফেরা করো হে!'

জর্জ স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

'ক্লাবে মিসেস টীগ আমার স্ত্রীকে বলছিলেন—তাঁর পরিচারিকা নাকি কাজই করতে পারছে না। তুমি আর সেই নামকরা গুণ্ডা নিগ্রো—দুজনে মিলে নাকি প্রতি রাতে দু'বার তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছো!' মালিক মুচকি হাসলেন। অবিশ্বাস্য রকম অন্তরঙ্গতার সুরে বললেন—'নিজের কাজ বজায় রেখে যতখুশী হুলোমী কর—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কোথায়ও পিটুনী খেয়ে মরো না। আর রাত্রে রাস্তার পাহারাদারের গুলি থেকেও সাবধান।'

চ্যারিটির বিশ্বাসঘাতকতার খবরে জর্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলো। তার কাছে সে আর যাবে না। বরঞ্চ বীউলা নামে আর একটি মেয়ে আছে। তার অবশ্য তেমন চটক নেই। ধনী জুয়েট সাহেবের ওফেলিয়া নামে একটি ক্রীতদাসী আছে। জর্জ একবার তাকে দেখেছে। লম্বা। দারুচিনির মতো গায়ের রঙ। জুয়েট সাহেবের দাসদাসীর গোনাগুনতি নেই। ক্ষেতের মজুরনী ঐ ওফেলিয়াকে হয়তো তিনি

চেনেন-ই না। তাঁর আবাদে যেতে হলে অবশ্য অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। তবুও জর্জ একবার ঐ চটকদার মেয়েটির সাথে আলাপ করে দেখবে।

আটষট্টি

টম লী সামান্য অবস্থা থেকে খ্যাতির চূড়ায় উঠেছিলেন। ক্যাসওয়েল জেলায় বড় মোরগ লড়াইয়ে হিসাবে তখন তাঁর খুব নামডাক। বড় বড় খেলাগুলোতে কেবল-মাত্র ধনী লোকেরাই যোগ দিতে পারতো। কারণ বাজিতে টাকার পরিমাণ ছিলো অনেক। প্রতিযোগীদের প্রত্যেকের মোরগের সংখ্যা বহু, জাতেও সেগুলো হতো অতি উৎকৃষ্ট। একটি মাত্র বড় খেলায় লোকের ভাগ্য বিপর্যয় হয়ে যেতে পারতো।

আবার দরিদ্র সাদা মানুষ, স্বাধীন নিগ্রো বা যাদের সামান্য হাত খরচের টাকা আছে তেমন ক্রীতদাসেরা সামান্য পয়সার বাজি ধরে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের মোরগ নিয়ে লড়াই খেলতো। পঁচিশ সেণ্ট থেকে এক ডলার পর্যন্ত বাজি থাকতো। লী সাহেব একদিন একটিমাত্র মোরগ সম্বল করে তেমনি করেই জীবন শুরু করে-ছিলেন। তাঁর যা কিছু ধনসম্পত্তি সবই মোরগ লড়াইয়ের দৌলতে।

একদিন জর্জের অনুপস্থিতিতে মিঙো মালিকের কাছে একটি অভিনব প্রস্তাব দিলো। যেসব মোরগ লড়াই শেখাবার সময় বাতিল করে দেওয়া হয়, জর্জ সেগুলো নিয়ে সস্তা বাজির খেলা খেলুক। তাতেও যা হোক কিছু পয়সা আসবে। মালিক রাজী হলেন। সে বৎসর সারা গ্রীষ্মকালের অবসর সময়ে জর্জ ও মিঙোকাকা নকল রঙ্গক্ষেত্র তৈরী করে বাতিল মোরগদের খেলা অভ্যাস করালো।

'সাহেবদের খেলা দেখে যেমন সাদা মানুষেরা হল্লা করে, এইসব গরীবদের খেলা দেখে তেমনি নিগ্রোরা চ্যাঁচায়। কখনো একটা লড়াইয়ে দশ ডলার পর্যন্ত রোজগার হয়।'

'মিঙোকাকা, আমি পুরো একটা ডলারই কখনো চোখে দেখিনি!'

'আমিই কি কখনো দেখেছি আগে? এখন আমার আর দরকারও নেই। তবে মালিকের বোধহয় তোমাকে দিয়ে খেলাবার ইচ্ছা। যদি জেতো, তোমাকেও বাজির টাকার ভাগ দেবেন হয়তো।'

'সত্যি দেবেন?'

'মনে হয়। তোমার সেই মোরগের ডানায় জোর করাবার পরামর্শে তাঁর নিজের অনেক উপকার হয়েছিলো। কিন্তু, পয়সা জমাতে পারবে তো?'

'নিশ্চয় পারবো।'

'শুনেছি অনেক নিগ্রো পয়সা জমিয়ে নিজের স্বাধীনতা কিনে নিয়েছে।'

'আমিও আমার আর মায়ের স্বাধীনতা কিনে নেবো।'

ঈর্ষা সুতীক্ষ্ণ শলাকার মতো বৃদ্ধের হৃদয় বিদ্ধ করলো। বেদনায় তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ প্রাণ উজাড় করে এই বালকের উপর স্নেহ বর্ষণ করে-ছিলো। এটুকু প্রতিদান কি তার প্রাপ্য ছিলো না? বিমূঢ় জর্জের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে থেকে সে দ্রুতপদে সরে গেলো।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের একটি বড় লড়াইয়ের মাঠে মিঙো খবর পেলো—তার পরের শনিবার কাছাকাছি এক আবাদের গোলাবাড়ীর পেছনে ছোট খেলা হবে। মালিককে জানানো হলো। লড়াইয়ের দিন সকালবেলা তিনি মিঙোর হাতে বিশ ডলারের খুচরো গুনে দিলেন। 'উপযুক্ত প্রতিপক্ষ পেলে তবেই লড়াইয়ে নেমো। মনে রেখো বাজি তোমাকে ধরতেই হবে। নইলে বাজি জিতবে কী করে? বাজিতে হারতেও পার। কিন্তু যদি জেতো, তবে অর্ধেক টাকা আমার। মনে থাকবে তো? আমার টাকা এদিক ওদিক করলে মহা বিপদ হবে কিন্তু।'

জর্জ অতি কষ্টে উত্তেজনা চেপে রাখবার চেষ্টা করছিলো। গোটা কুড়ি কালো আর কিছু দরিদ্র সাদা মানুষ খেলবার জায়গায় জড়ো হয়েছিলো। এদের সবাইকে জর্জ বড় খেলার মাঠেও দেখেছে। কালোরা সেখানে তাদের মালিকের সাথে এসেছিলো।

তিন চারখানা খেলা দেখে জর্জের ভয় অনেকটা কাটলো। মোরগগুলো কোনটাই উঁচু জাতের নয়। পঞ্চমবারে জর্জের ডাক পড়লো। বিপক্ষে একটি মোটা কালো লোক। জর্জ তাকে বড় খেলার মাঠে দেখেছে, কথাও বলেছে। জর্জ সর্বক্ষণ তার ওপর মিঙোকাকার সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টি অনুভব করছিলো। নিজের মোরগ ওজন করিয়ে সে পকেট থেকে কাঁটা বার করে পরিয়ে দিলো। মিঙোকাকা বলে দিয়েছে কাঁটা বেশী ঢিলে করে বাঁধলে খুলে যাবে। আবার বেশী আঁট হলে পাখীর পা আড়ষ্ট হয়ে যাবে। পঞ্চাশ সেণ্ট, এক ডলার বাজির ডাক চলছিলো। জর্জের মোরগের ওপর মিঙোকাকা চার ডলার ডেকে আসর গরম করে দিলো। চারিদিকে বাজির ডাক চড়তে লাগলো।

রেফারীর ঠোঁটের দিকে লক্ষ্য রাখতে ভুল হয়ে যাওয়াতে জর্জের মোরগ ছাড়তে

সামান্য দেরী হয়ে গিয়েছিলো। ফলে প্রথম আক্রমণ প্রতিপক্ষ থেকে এলো। জর্জের মোরগ কাঁটার ঘা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। সামলে নিয়ে লড়াই শুরু করলো। কিন্তু ক্ষত থেকে দ্রুত রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ছিলো। বেশীক্ষণ পারলো না। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলো। মৃত্যুর আক্ষেপে পাখা ঝাপটাতে লাগলো। জর্জ মৃত মোরগটি হাতে নিয়ে অদম্য কান্নায় ঝুঁকে পড়ে কোনক্রমে বেরিয়ে এলো। মিঙো-কাকা তাকে ঝাঁকুনি লাগালো—'হচ্ছে কি? বোকার মতো করে না। পরের লড়াইয়ের জন্য দ্বিতীয় মোরগটা তৈরী রাখ।'

'না, মিঙোকাকা। আমি পারবো না। মালিকের মোরগ আমি মেরে ফেলেছি।'

মিঙোকাকার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। চারদিকের লোকেরাও অবাক নয়নে তাকিয়ে ছিলো।

'খেলাতে একজন তো হারবেই। মালিককে কখনো হারতে দেখনি? চোখ মুছে তৈরী হও শীগ্‌গির!'—কিন্তু তার শাসন, অনুরোধ কিছুতেই কাজ হলো না। জর্জকে আর খেলাতে রাজী করানো গেলো না।

জর্জ দু'খানা মোরগ নিয়ে এসেছিলো। মহাক্রোধে মিঙোকাকা নিজেই দ্বিতীয় মোরগটি নিয়ে লড়াইয়ে নামলো। দশ ডলার বাজি রাখলো এবং দু'মিনিটের ভেতর বিপক্ষের মোরগটিকে নিহত করলো।

বাড়ী ফেরার পথে জর্জকে প্রবোধ মানানো যাচ্ছিলো না। 'দু'ডলার পেলাম তো আমরা। এমন করছো যেন মরে যাচ্ছো!'

'আমার ভয়ানক লজ্জা করছে। মালিক নিশ্চয় আর কখনো আমাকে তাঁর মোরগ নিয়ে খেলতে দেবেন না।'

এর পর কিছুদিন জর্জ ভয়ানক মুষড়ে থাকলো। যেন ধরণী দ্বিধা হয়ে তাকে গ্রাস করলেই সে বেঁচে যায়। তাকে দিয়ে খেলাবার প্রস্তাবটা মালিককে মিঙোই দিয়েছিলো। তাই এ ব্যাপারে সেও খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছিলো। অবশেষে সে একদিন সাহস করে মালিককে অনুরোধ জানালো—জর্জকে বুঝিয়ে বলতে। লী সাহেব পরদিন জর্জকে বললেন—'কী হে ছোকরা, খেলায় হেরে যাওয়া নাকি সহ্য করতে পার না, শুনছি?'

'মালিক, আপনার মোরগ লোকসান করিয়ে দিয়ে আমার নিজেকে ভয়ানক দোষী মনে হচ্ছে।'

'আমার ওরকম আরো গোটা কুড়ি আছে। ওগুলো নিয়েও তোমাকে খেলতে হবে যে!'

এর পরের খেলাতে জর্জের দুটো মোরগই জিতে যাওয়াতে তার অহংকারের সীমা থাকলো না। মিঙোকাকা তাকে সাবধান করে দিলো—'অত মাথা গরম করো না হে! তাহলে আবার হারবে!'

জর্জ অঞ্জলিবদ্ধ দু'হাত বাড়িয়ে দিলো—'মিঙোকাকা, আমার হাতে টাকাগুলো দাও।' কুঁচকানো এক ডলারের নোটগুলি এবং স্তূপীকৃত মুদ্রারাশির দিকে জর্জ বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে ছিলো। মিঙো হেসে বললো—'ঠিক আছে। তুমিই মালিকের কাছে নিয়ে যাও।' জর্জ ক্রীতদাস বসতিতে এলে কিসি, সিস্টার স্যারা ও পম্পেকাকা এত টাকা দেখে অবাক। জর্জ গর্বিত ভাবে বললো—'যাচ্ছি মালিককে দিতে। এর অর্ধেক টাকা আমার।'

লী সাহেব তাঁর প্রাপ্য ন'ডলার নিয়ে একগাল হেসে ঠাট্টা করলেন—'মনে হচ্ছে মিঙো তোমাকে ভালো মোরগগুলো দিয়ে আমার জন্যই ঝড়তিপড়তিগুলো রাখছে!'

তার পরের লড়াইয়েও জর্জের দু'খানা মোরগই জেতে। সেবার জর্জ বাইশ ডলার পেয়েছিলো। দর্শকেরা জর্জের নাম দিয়েছিলো 'চিকেন জর্জ'। নামটি জর্জের বড়ই পছন্দ হয়। বাড়ী এসে বড় গলায় সবাইকে এই নতুন নাম শুনিয়েছিলো। লী সাহেবও শুনে খুব কৌতুক বোধ করেন। মিঙোকাকা কিন্তু মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলো—'চিকেন জর্জ' নাম না হয়ে নাম হওয়া উচিত 'কাঁদুনে জর্জ'। 'এখনো লড়াইয়ে তার কোন মোরগ মরে গেলে ওটাকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদে। যেন সত্যি তার ছেলে মরেছে। এমন কখনো শুনেছেন মালিক?'

লী সাহেব হেসেছিলেন—'ও রকম অবস্থায় আমারও যে মাঝে মাঝে কাঁদতে ইচ্ছা করে না, তা নয়। তবে মোরগের জন্য জর্জের দরদ বড় বেশী।'

এমনি এক বড় লড়াই থেকে ফিরবার পথে অভিজাত লড়াইয়ে মোরগের মালিক মিঃ জুয়েট লী সাহেবকে ডাকলেন, 'আমরা দু'জনেই ভদ্রলোক। দু'জনেই লড়াইয়ে মোরগের মালিক। আমাদের মধ্যে কথাটা স্পষ্ট করে হওয়াই ভালো। আমার মোরগ দেখাশোনার লোকটি নেই। রাত্রিবেলায় রাস্তায় বেরিয়েছিলো। পাহারাদার ভুল করে গুলি মেরে দিয়েছে। লক্ষ্য করেছি—আপনার মোরগ দেখাশোনার লোক দুটি। অভিজ্ঞ বৃদ্ধটিকে আমি চাই না। অপরটিকে পেলে আমি কিনে নিতে চাই। সে তো আমার একটি ক্রীতদাসীর পেছনে ঘুরছে, শুনেছি।'

শেষের কথাটিতে লী সাহেবকে একটু খোঁচা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিলো। উদ্দেশ্য সফল হলো। জর্জের বিশ্বাসঘাতকতায় লী সাহেব প্রথমে বিস্ময় বোধ করলেন, পরে ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো।

'দরাদরি করতে চাই না। তিন হাজারে হবে?' এবার লী সাহেব হতবুদ্ধি হলেন। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এত দাম!—এতদিনে একজন ধনী অভিজাতকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরে তাঁর চরম আনন্দ হলো, 'সম্ভব নয়, মিঃ জুয়েট। আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, আমার শেষ দর চার হাজার।'

'আমার লোকটিকে আমি বিক্রী করবো না, মিঃ জুয়েট।'

মিঃ জুয়েটের মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেলো।

বাড়ী গিয়ে লী সাহেব জর্জকে দেখেই রোষে ফেটে পড়লেন—'মাথা ভেঙে দেবো। এত বড় আস্পর্ধা! জুয়েটের ওখানে কী করতে যাওয়া হয়? লড়াই শেখাবার ফন্দীগুলো ফাঁস করে দেবার জন্য বুঝি?'

জর্জ পাংশুবর্ণ হয়ে গেলো। কোনক্রমে উচ্চারণ করলো—'জুয়েট সাহেবকে আমি কিছুই বলিনি। তাঁর সাথে আমার কখনো কথা হয় না।'

সে রাত্রে ত্রাসে, দুর্ভাবনায় জর্জের ঘুম এলো না। তার কপালে আরো কী দুর্গতি আছে কে জানে!

কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু হয়নি। কিছুদিন পর মালিক মিঙোকাকাকে বললেন—'ভার্জিনিয়াতে মোরগ লড়াইয়ে যেতে হবে। এতদূর পথ গাড়ীতে গেলে তোমার কাশি বেড়ে যেতে পারে। আমি শুধু ছোকরাটিকে নিয়ে যাবো।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

কিছুকাল যাবৎ মিঙোকাকার এই ভয়টিই হচ্ছিলো। কিন্তু সেই আশঙ্কিত দিনটি এত শীঘ্র আসবে—সে কল্পনাও করেনি। মালিকের তাকে আর প্রয়োজন নেই!

উনসত্তর

ধুলিময় দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গাড়ী ভার্জিনিয়ার দিকে চলছে। জর্জ অলস নয়নে ফেব্রুয়ারীর আকাশে পালকের মতো হালকা মেঘের আনাগোনা দেখছিলো। লী সাহেবের প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠলো।

'কী ভাবছো ?'

'কিছু না, স্যর।'

'তোমাদের নিগ্রোদের কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। ভালো করে কথা বলেও লাভ নেই। এমনিতে তো মুখে খুব কথা। একটু বুদ্ধির পরিচয় দিলে সাদা মানুষেরা অনেক বেশী খুশী হয়, সেটা বুঝতে পার না ?'—লী সাহেবের কণ্ঠস্বর শাণিত হয়ে উঠলো।

চিকেন জর্জ সতর্ক হয়ে গেলো।

'কেউ খুশী হন। কেউ হন না। নির্ভর করে।'

'সোজা উত্তর দিতে পার না। নিগ্রোকে খাইয়ে পরিয়ে, মাথার উপর আচ্ছাদন দিয়ে মানুষ ক'রে কিছুই লাভ নেই।'

চিকেন জর্জ আন্দাজ করলো মালিকের হয়তো তার সাথে একটু গল্প করবার ইচ্ছা হয়েছে।

'সত্যি কথা বলবো স্যর ? বেশীর ভাগ নিগ্রোই সাদা মানুষদের ভয় পায়। তাই কথা বলে না।'

'ভয় পায় ? নিগ্রোরা মহা শয়তান। সর্বদাই ষড়যন্ত্র আঁটছে—কী করে সাদা মানুষদের খুন করবে! তাদের খাবারে বিষ মেশাচ্ছে। শিশুদের পর্যন্ত হত্যা করছে। কিন্তু সাদা মানুষেরা নিজেদের রক্ষা করবার জন্য কোন ব্যবস্থা নিলেই নিগ্রোরা চ্যাঁচামেচি করবে—তাদের ওপর নাকি অত্যাচার হচ্ছে!'

চিকেন জর্জের মনে হলো—মালিকের এই আগুনের মতো মেজাজ নিয়ে খেলা করা উচিত হবে না। সে নিরীহ স্বরে বললো—'আপনার আবাদের কোন নিগ্রোই সে রকম নয় মালিক।'

সবাই জানে কিনা আমি বড় কড়া মানুষ, তাই।' একটু থেমে আবার বললেন—'বহুকষ্টে একটা মানুষ যখন কিছু একটা গড়ে তুলেছে তখন তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে নিগ্রোদের মতো শয়তান পাজী আর কে আছে ? তোমার আর কী ? চিরটা কাল আমার আবাদে পেট পুরে খেতে পেয়েছো। মা, বাবা আর দশজন ভাইবোনের সাথে আধ পেটা খেয়ে শতছিদ্র ঘরে গুঁতোগুঁতি করে বেঁচে থাকতে কেমন লাগে কখনো জানতে হয়নি।'

মালিকের মুখ থেকে এই অভাবনীয় স্মৃতিচারণ শুনে চিকেন জর্জ হতভম্ব হয়ে গেলো।

'জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এগারো বৎসর বয়সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

যে কোন কাজ, এমন কি নিগ্রোর কাজ পর্যন্ত পেলে তখন বর্তে যেতাম। কাজের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। পরনে শতচ্ছিন্ন পোষাক। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বেঁচে থেকেছি। বছরের পর বছর একটি একটি করে সেণ্ট বাঁচিয়ে প্রথম পঁচিশ একর জঙ্গলে জমি কিনেছি। আমার প্রথম ক্রীতদাস নিগ্রো জর্জ। তার নামেই তোমার নাম রেখেছিলাম। জর্জের পাশাপাশি নিজে অমানুষিক পরিশ্রম করেছি। জঙ্গল কেটে, পাথর সরিয়ে আবাদের জমি তৈরী করেছি: তাতেও বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। ভগবানের ইচ্ছায় পঁচিশ সেণ্ট দিয়ে একটা লটারীর টিকিট কিনেছিলাম। তারই দৌলতে আমার প্রথম লড়াইয়ে মোরগ হয়। এমন মোরগ আর দেখিনি। কতবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সেরে উঠে আবার জিতেছে। একই মোরগকে এত বার জিততে কেউ কখনো শোনেনি।'

খানিকক্ষণ নীরবে গাড়ী চালিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—'বসে বসে একটা নিগ্রোকে এত কথা বলছি কেন জানি না। কিন্তু সব মানুষই বোধহয় মন খুলে একসময় কাউকে সব বলতে চায়। স্ত্রীর কাছে বলবার উপায় নেই। সে মোরগ দু'চোখে দেখতে পারে না। একবার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা স্বামীর জন্য বিন্দুমাত্র ভাবে না। দিবারাত্র কেবল অসুখ, আর অজস্র অভিযোগ। সেবার জন্য ক্রীতদাসী দাও। তবুও সন্তুষ্ট করতে পারবে না। পারে কেবল মুখে একগাদা পাউডার মেখে ভূতের মতো সাজতে।'

চিকেন জর্জ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

'আমার ভাই বোনেরাও ঐরকম। আমি নিজের পরিশ্রমে যা করেছি, তারাও সেরকম করতে পারতো। তা নয়। তারা আজও ঐ নরককুণ্ডে জীবন কাটাচ্ছে। মাঝের থেকে প্রত্যেকের নিজের সংসার বেড়েছে। তারাও সর্বক্ষণ অভিযোগ জানাচ্ছে আর ভিক্ষা চাইছে। যাইহোক্, এখন আমার থাকবার মতো একটা ভদ্রস্থ বাড়ী হয়েছে। শ'খানেক লড়াইয়ে মোরগ আছে। পঁচাশি একর চাষের জমি, খচ্চর, গরু, ঘোড়া আর শুয়োর আছে। আর তোমাদের মতো কয়েকখানা অলস, ফাঁকিবাজ, নেমকহারাম নিগ্রোও রয়েছে।'

এতক্ষণে চিকেন জর্জ উত্তর দেবার মতো নিরাপদ প্রসঙ্গ পেলো। 'হ্যাঁ, স্যর। কিন্তু আমরা সবাই আপনার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করি। তবে আমার মা ছাড়া আর সবায়ের তো বয়স হয়েছে।'—ভয় পেয়ে থেমে গেলো। অল্পবয়সী নিগ্রো কিনবার পয়সা নেই এরকম ইঙ্গিত কল্পনা করে মালিক আবার চটে না যান!

'পরিশ্রম করবার কথা আমাকে শুনিয়ো না। আমার মতো পরিশ্রম কোন কালে কোন নিগ্রো করেনি।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'হ্যাঁ, স্যর—মানে?'

'সত্যি আপনি খুব পরিশ্রম করেন।'

'সেটা তোমরা বোঝো? সব কিছু দেখে-শুনে রাখা সোজা কথা?'

'না, স্যর। খুব কঠিন কাজ।' মিঙোকাকার ত্রিশ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, নিজের গত সাত বছরের অবিশ্রান্ত খাটুনী জর্জের মনে পড়ে গেলো। মিঙো-কাকার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন মনে করিয়ে দেবার জন্য নিরীহ কণ্ঠে বললো—'মিঙোকাকার কত বয়স হয়েছে মালিক?'

'ঠিক জানি না। আমার চেয়ে পনেরো বৎসরের বড়। ষাটের ওপর হবে। বড় অশক্ত হয়ে পড়েছে। অসুখ যেন বছরের পর বছর বাড়ছে। তুমি তো কাছাকাছি থাক। ওর শরীরের অবস্থা তোমার কেমন মনে হয়?'

মিস ম্যালিসি আর সিস্টার স্যারা বলেছিলো—সাদা মানুষের ধারণা নিগ্রোদের অসুখ মানেই ধাপ্পাবাজি। সে কথা মনে করে জর্জ সাবধানে বললো—'বেশীর ভাগ সময়েই ভালো থাকে। তবে মাঝে মাঝে কাশিটা বড় বাড়ে। তখন আমার খুব ভয় করে। হাজার হোক মিঙোকাকা তো আমার বাবার মতো।'

কথাটা বলে ফেলেই খেয়াল হলো। এবার আবার কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে! গাড়ীটা বড় রকমের ঝাঁকুনী খেলো। সাহেবকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ শোনালো—

'মিঙো তোমার জন্য কী করেছে শুনি? ক্ষেতের কাজ থেকে সরিয়ে এনে ওখানে তোমার নিজের ঘর করে দেওয়া হয়েছে ওর কথায়?'

'না, স্যর! আপনি দিয়েছেন।'

খানিকক্ষণ নীরবে কাটিয়ে লী সাহেব আবার কথা শুরু করলেন।

'ভেবে দেখছি, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার সব ক'টা নিগ্রোই বুড়ো। ক্ষেতে কাজের জন্য দু'একটা অল্পবয়সী নিগ্রো দরকার। আজকাল নিগ্রোর যা দাম হয়েছে!'—জর্জের দিকে ফিরে যেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'দেখেছো, কতরকম ভাবনা আমার?'

'হ্যাঁ স্যর, মালিক।'

'হ্যাঁ স্যর, মালিক! নিগ্রোদের সব কথাতেই একই উত্তর।'

'আপনি নিশ্চয় চান না, কারোর সাথে আপনার মতভেদ হোক্?'

'তা বলে 'হ্যাঁ স্যর, মালিক' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না?'

'না স্যর। মানে আপনার টাকা থাকলে অল্পবয়সী নিগ্রো কেনাই উচিত। এ মরশুমের মোরগ লড়াইয়ে আপনার হাতে তো ভালোই টাকা এসেছে।' আলোচনাটা আবার একটু নিরাপদ পথে নিয়ে যাবার জন্য সে বললো—'মালিক, মোরগ-লড়াই যাঁর একমাত্র উপার্জনের পথ, এমন কোন সাহেব আছেন কি যাঁর জমি বা ফসল নেই?'

'না, আমার জানা তো কেউ নেই। বরঞ্চ তার উল্টো। যাঁর যত বেশী মোরগ, তাঁর আবাদও ততই বড়। ঐ যে জুয়েট সাহেব—যাঁর আবাদে তুমি হুলোমি করতে যাও, তাঁর মতো।'

চিকেন জর্জের নিজের মূর্খামির জন্য গালে চড় মারতে ইচ্ছা করলো। ও প্রসঙ্গ বন্ধ করবার জন্য তাড়াতাড়ি বললো—'আর তো যাইনি মালিক!'

খানিক বাদে লী সাহেব বললেন—

'অন্য কোথায়ও আর পছন্দমত মেয়ে পেয়েছো?' পরিষ্কার উত্তর না পেয়ে বললেন—'ঠিক আছে। আমি তোমাকে আবাদের বাইরে যাবার অনুমতি পত্র লিখে দেবো। আমি চাই না, মিঃ জুয়েটের সেই লোকটার মতো তুমিও পাহারাদারের গুলি খাও।' নিজের এতটা বদান্যতার অস্বস্তি ঢাকবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে বললেন—'কিন্তু মনে রেখো, যদি সকাল হবার আগে ঘরে না ফেরো বা কাজের গাফিলতি কর, অথবা যদি মিঃ জুয়েটের আবাদে বা তেমনি কোনও আপত্তিজনক জায়গায় যাও, তবে সেই অনুমতি পত্র আর তুমি—দুটোকেই আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। বুঝতে পেরেছো?'

চিকেন জর্জ তার সেই অভাবিত সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছিলো না—'মালিক! বুঝতে পেরেছি মালিক! আপনার মতো লোক হয় না!'

'তোমরা নিগ্রোরা আমাকে যত খারাপ ভাব, আমি তত খারাপ নই।'

জর্জ অনেক ইতস্ততঃ করে একটা কথা বলে ফেললো। 'স্যর ম্যাকগ্রেগর সাহেবের আবাদে ম্যাটিলডা নামে একটি মেয়ে আছে। ওখানে ক্ষেতে কাজ করে। প্রয়োজনমত বড় বাড়ীতেও কাজ করে। তার কাছে গিয়েছিলাম। সে অদ্ভুত মেয়ে। কেউ তাকে ছুঁতেও পারে না। এমন কখনো দেখিনি। সাহেব যাজকের কাছে সে মানুষ হয়েছিলো মালিক। পরে সেই যাজক ধর্মের নির্দেশে তাঁর সবক'টি নিগ্রোকেই বিক্রী করে দেন। ম্যাটিলডার কাছে যখনই যাই সে বাইবেলের বাণী শোনাতে থাকে। মালিক, আগে আমি অনেক মেয়ের পেছনেই ঘুরে বেড়িয়েছি।

কিন্তু এর সাথে পরিচয় হবার পর থেকে আর কোথায়ও যাই না। বিয়ে করতে হলে একেই করবো।' একটু দুর্বল কণ্ঠে যোগ দিলো—'মানে সে যদি রাজী হয়, আর আপনি যদি অনুমতি দেন।'

'মিঃ ম্যাকগ্রেগর জানেন ? তুমি যে তাকে বিয়ে করতে চাও ?'

'সে তো ক্ষেতের মজুরণী। সাহেবের সাথে তার সরাসরি কথা হয় না। তবে বড় বাড়ীর অন্য নিগ্রোরা জানে। তারা হয়তো সাহেবকে জানিয়েছে।'

'মিঃ ম্যাকগ্রেগরের ক'জন নিগ্রো আছে ?'

'তাঁর তো বহু জমি। তাঁর ক্রীতদাস বসতি দেখে মনে হয় অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জন আছে।'

লী সাহেব খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন—'জন্মাবার পর থেকে তোমাকে নিয়ে আমার কখনো ঝামেলা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক কাজে তুমি আমার সাহায্যই করেছো। আমিও তোমার জন্য কিছু করবো। বলছিলাম না, আমার কিছু অল্পবয়সী নিগ্রো দরকার, তা আমি মিঃ ম্যাকগ্রেগরের সাথে কথা বলবো। সত্যি যদি তাঁর অনেক নিগ্রো থেকে থাকে, তবে একজন কমবেশীতে তাঁর বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। মেয়েটিকে আমি উচিত মূল্যে কিনে নেবো। কী যেন নাম বললে ?'

জর্জ কানে ঠিক শুনতে পাচ্ছিলো তো ? অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলো—'ম্যাটিলডা, স্যর।'

'তাহলে তুমি তাকে আমার আবাদে নিয়ে এসে নিজের জন্য একটা ঘর তৈরী করে নিয়ো।'

জর্জের কথা বলার সামর্থ্য ছিলো না। বহুকষ্টে অভিভূত কণ্ঠে বললো—'মালিক, আপনার অসীম দয়া।'

লী সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো—'বিয়ের পর কিন্তু তোমার ঘুরে বেড়াবার পাস আমি কেড়ে নেবো। ম্যাটিলডা যাতে তোমাকে ঘরে আটকে রাখতে পারে, সেটাও আমাকে দেখতে হবে।'

জর্জ অসীম বিস্ময়ে আর একবার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললো !

সত্তর

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ম্যাটিলডার সাথে চিকেন জর্জের বিবাহ হয়। সেদিন সূর্যোদয়ের পর ভাবী বরকে একান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখা গেলো। তার দু'কামরার অসমাপ্ত নতুন কুটিরটিতে দরজার ফ্রেমে কবজা লাগাতে সে প্রচণ্ড ব্যস্ত। পম্পেকাকা নতুন দরজা তৈরী করে রেখেছিলো। কিন্তু সেটি তখনও যথাস্থানে লাগানো হয়ে ওঠেনি। কব্জা লাগানো হলে গোঁলাবাড়ী থেকে দরজাটি নিয়ে এসে এঁটে দেওয়া হলো। আকাশে সূর্যের দিকে তাকিয়ে জর্জ একটু উদ্বিগ্ন বোধ করলো। তারপর মায়ের তৈরী স্যাণ্ডউইচ দু'টি কোনরকমে গলাধঃকরণ করে নিলো। তার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য মা তার উপর ভয়ানক চটে ছিলো। অত্যন্ত দেরীতে কাজ শুরু করে জর্জ যেভাবে শ্লথ গতিতে এগোচ্ছিলো তাতে তার মা ইতিমধ্যে বিরক্তির শেষ সীমানায় পৌঁছেছিলো। রাগ করে সবাইকে বারণ করে দিয়েছিলো—কেউ যেন জর্জকে আর কোন কাজে সাহায্য না করে।

কিন্তু চিকেন জর্জের তখনো কাজ অনেক বাকী। একটা মস্ত জালাতে সে চুন ও জল মিশিয়ে খুব ঘুঁটে নিলো। বড় একটা ব্রাশ নিয়ে দ্রুতগতিতে ঘর দুটোর কর্কশ কাঠের দেওয়ালের বাইরের দিকটাতে রঙ লাগাতে শুরু করলো। বেলা দশটা নাগাদ কাজটা শেষ হলো। ততক্ষণে তার কুটিরের বাইরের দিকটাও সে নিজে দুটোই সমান সাদা হয়ে গিয়েছে। এবার স্নান সেরে, পোষাক পরে ম্যাকগ্রেগরের আবাদে যেতে হবে। গাড়ীতে দু ঘণ্টার পথ। বেলা একটায় বিয়ে শুরু হবার কথা। জর্জ মনে ভেবে দেখলো—হাতে তার প্রচুর সময়!

কুয়ো থেকে জল তুলে নতুন টিনের টবটিতে তিন বালতি জল ঢালা হলো। মহানন্দে যতদূর সম্ভব উচ্চরবে গুনগুন করতে করতে সশব্দে নিজেকে মার্জনা করে ধুয়ে মুছে নিলো। এবার পোষাক পরবার পালা। শোবার ঘরে সব রাখা ছিলো। কড়া ইস্ত্রীর নীল শার্ট, লাল মোজা, হলুদ প্যাণ্ট কোট। সবশেষে কমলা রঙের জুতো। সবই সদ্য নতুন। গত কয়েকমাসে নর্থ ক্যারলিনার বিভিন্ন শহরে মোরগ লড়াই উপলক্ষ্যে গিয়ে একটি একটি করে পরম যত্নে বাছাই করে কেনা। নতুন জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে শোবার ঘরের টেবিলের সামনে পম্পেকাকার উপহার দেওয়া নতুন টুলটায় বসলো। লম্বা হাতলওয়ালা আয়নাটার দিকে তাকিয়ে জর্জ একটু হাসলো। এ উপহারটি ম্যাটিলডাকে চমকে দেবার জন্য! আয়নার দিকে লক্ষ্য রেখে জর্জ এবার ম্যাটিলডার বোনা সবুজ উলের স্কার্ফটি সযত্নে গলায় জড়িয়ে নিলো। চমৎকার দেখাচ্ছে—স্বীকার করতেই হলো। এই বার ওস্তাদের মার।

বিছানার তলা থেকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স টেনে বার করলো। অতি সাবধানে যেন পরম শ্রদ্ধাভরে ঢাকনাটি সরিয়ে কালো ডার্বি টুপিটি বার করলো। এটি তার বিয়েতে লী সাহেবের উপহার। আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টুপির কায়দার গড়নটি উপভোগ করলো। অবশেষে আয়নার কাছে ফিরে গিয়ে টুপিটি এক চোখের ওপর কোণা করে নামিয়ে দিয়ে তার বখাটে চরিত্রটি স্পষ্ট করে তুললো।

বাইরে থেকে কিসির ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে এলো। 'শীগ্‌গির বেরোও। এক ঘণ্টা ধরে আমরা সবাই গাড়ীতে বসে আছি।'

'যাচ্ছি মা!' এবার চট করে একটা ছোট্ট বোতল ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে জর্জ বেরিয়ে এলো। বড় আশা করে ছিলো তার সাজগোজ দেখে সবাই প্রশংসায় ফেটে পড়বে। কিন্তু তার মা, মিস ম্যালিসি, সিস্টার স্যারা ও পম্পে-কাকার পরনে বিশিষ্ট ভব্য ধরনের, তাদের রবিবারের জন্য তুলে রাখা সবচেয়ে ভালো পোষাক। জর্জের দিকে তাকিয়ে তাদের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠলো। তা দেখে তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেলো। কোনরকমে দৃষ্টি এড়িয়ে জর্জ গাড়ীর চালকের আসনে উঠে বসলো। পোষাকের ভাঁজের দিকে নজর রেখে অতি সন্তর্পণে বসে খচ্চর দুটোর পিঠে সে লাগামের চাপড় লাগিয়ে দিলো। নির্ধারিত সময়ের মাত্র এক ঘণ্টা দেরীতে তাদের শুভকর্মে যাত্রা শুরু হয়।

পথে চিকেন জর্জ মনে জোর আনবার জন্য বোতল থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে নেয়। মিঃ ম্যাকগ্রেগরের বাড়ী পৌঁছোতে তাদের বেলা দুটো পার হয়ে গিয়েছিলো। কিসি, মিস ম্যালিসি ও সিস্টার স্যারা দেরীর জন্য সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে নিলো। পম্পেকাকা গাড়ী থেকে খাবারের ঝুড়িটা নামালো। বরের উৎকট সাজসজ্জায় সমবেত দর্শকেরা হকচকিয়ে গিয়েছিলো। জর্জ কিন্তু ঘাবড়ায়নি। সে স্বভাবসিদ্ধ চালিয়াতির সাথে সকলের সাথে আলাপ করে বেড়াতে লাগলো। ম্যাটিলডার কর্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুটা খৃষ্টান প্রথায় কিছুটা নিগ্রো লোকাচারে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

বাড়ী ফিরবার পথে পম্পেকাকাই গাড়ী চালিয়েছিলো। পেছনদিকে অশ্রু-ভারাক্রান্তা ম্যাটিলডার কোলে মাথা রেখে সদ্যবিবাহিত বর নাক ডাকাচ্ছিলো। তার অত সাধের সবুজ স্কার্ফটি স্থানচ্যুত মুখখানা কালো ডার্বি টুপিতে ঢাকা। বিবাহসভায় জর্জের মুখে মদের গন্ধ এবং অশোভন কথাবার্তায় তার মা ও অন্যান্য সবাই বিরক্ত হয়েছিলো। বাড়ী পৌঁছে বিনা বাক্যব্যয়ে যে যার ঘরে ঢুকে গেলো।

জর্জ আচমকা ঘুম ভেঙে ম্যাটিলডাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে, সকালে রেখে যাওয়া জলভর্তি টবটা সামনেই ছিলো—হোঁচট খেয়ে সেটার ভেতর পড়ে গিয়ে জুতো মোজা ভিজিয়ে ফেললো। জীবনের বিশেষ দিনটিতে আর একবার তার চরম অপদার্থতা প্রকাশিত হয়ে পড়লো। ম্যাটিলডা কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু মনে করেনি। ঘরে ঢুকে তার জন্য রাখা বিশেষ উপহারটি দেখে সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। চকচকে পালিশ করা একটি গ্রাণ্ডফাদার ক্লক, তারই মাথা বরাবর উঁচু। জর্জ সেটি তার লড়াইয়ে জেতা বাজির পয়সায় গ্রীনসবরো থেকে কিনে গাড়ীর পেছনে করে নিয়ে এসেছিলো।

জলে ভেজা নতুন কমলারঙের জুতো পায়ে জর্জ ঝাপসা চোখে মাটিতে বসে ছিলো। ম্যাটিলডা কাছে গিয়ে তার হাতে ধরে টেনে ওঠালো—'এসো জর্জ, তোমাকে শুইয়ে দিই।'

একাত্তর

ম্যাটিলডা পরদিন থেকেই কিসিদের সাথে ক্ষেতের কাজে লেগে গেলো। সন্ধ্যাবেলা সে প্রস্তাব করলো—এবার থেকে প্রতি রবিবার বিকালে ক্রীতদাস-বসতিতে একটি প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা হোক্। পম্পেকাকার উৎসাহ ছিলো না। বলেছিলো—'প্রার্থনা করে কখনো সাদা মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করা যাবে না!' কিন্তু ম্যাটিলডার কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যয়—'বাইবেলে লেখা আছে যোসেফ নামে একজন ক্রীতদাস ঈশ্বরভক্ত ছিলো বলে ঈশ্বর কৃপা করে তার মালিকের গৃহ আশীর্বাদযুক্ত করেছিলেন।'

'তুমি যে যাজকের মতো কথা বলতে শুরু করলে'—সিস্টার স্যারার মন্তব্যের উত্তরে সে অবিচলিত স্বরে বলেছিলো—'আমি প্রভুর দাসী।'

পরের রবিবারের দু'দিন আগেই চিকেন জর্জকে সাথে করে বারোটা মোরগ নিয়ে লী সাহেব শহরে বেরিয়ে গেলেন। গোল্ডসবরোর কাছে খুব বিখ্যাত খেলা ছিলো। অষ্টাদশী নববধূকে সাতচল্লিশ বৎসরের সিস্টার স্যারা সহানুভূতি জানালো—'ঐ মোরগগুলোই তোমাদের বিবাহিত জীবনে বিভেদ না ঘটায়!'

ম্যাটিলডা পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো—'বিবাহের বনিয়াদ

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ায় গড়ে ওঠে। বিবাহিত জীবনের সাফল্য আমাদের নিজেদের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করছে।'

দু'মাস পর ম্যাটিলডার সন্তান-সম্ভাবনার কথা জেনে কিসির সুখের সীমা ছিলো না। তার ছেলে পিতা হচ্ছে—এই চিন্তার সাথে বহু বৎসর পর নিজের বাবার জন্য তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো। ম্যাটিলডাকে জিজ্ঞেস করে জানলো—জর্জ তার কাছে মাতামহের গল্প বলেনি।

তার বাবার কথা কিসির মতো করে কে জানে। কিসি স্থির করলো—ম্যাটিলডাকে সেই সব বলবে। ওয়ালার সাহেবের আবাদে জীবনের প্রথম ষোলো বৎসর, লী সাহেবের কাছে বিক্রী হয়ে যাওয়া—সবই সে বললো। বিশেষ করে তার আফ্রিকাদেশীয় পিতা এবং পিতার কাছে শোনা আফ্রিকার যাবতীয় কাহিনী কিসি হৃদয় উজার করে ম্যাটিলডাকে বললো।

'ম্যাটিলডা, কেন তোমাকে সব বললাম জান? তোমার গর্ভের সন্তান এবং ভবিষ্যতে যত সন্তান হবে প্রত্যেকে তাদের বাবার দাদামশায়ের কথা জানুক—এই আমার ইচ্ছা।'

'মা, আমি তোমার কথা বুঝেছি।' সেদিন সারা বেলা শাশুড়ী বধূর কাছে স্মৃতিচারণ করে কাটালো। তার বাবা সম্বন্ধে যত কথা মনে পড়লো—সব বললো। সেই বেদনাময় স্মৃতিকাহিনীর ভেতর দিয়ে দুজনের বন্ধন নিবিড়তর হয়ে উঠলো।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে চিকেন জর্জ ও ম্যাটিলডার প্রথম পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের পিতা ঠিক সেইসময়ে মালিকের সাথে ভিন্ন শহরে গিয়েছিলো। ক্রীতদাস বসতির অপর বাসিন্দারাই সে সন্ধ্যায় লী সাহেবের আবাদের দ্বিতীয় শিশুটির জন্মদিবস উদযাপন করে।

সকলে ঘরে চলে গেলে ম্যাটিলডা কিসিকে নিজের মনোবাসনা জানালো—'মা, তোমার বাবার সম্বন্ধে এত গল্প কাহিনী শুনে আমি নিজের বাবার কথা ভাবছি। তাঁকে চোখে দেখিনি। মায়ের কাছে শুনেছি তাঁর নাম ছিলো ভার্জিল। আমার ইচ্ছা এ ছেলের সে নাম রাখি। আশা করি জর্জের এতে কোন আপত্তি হবে না।'

চিকেন জর্জ ফিরে এসে ছেলে দেখে মহা খুশী। দুই হাতে ছেলেকে শূন্যে তুলে ধরে উল্লাসভরে বললো—'মা, মনে আছে কী বলেছিলাম? তুমি আমাকে যা যা বলেছিলে, সব আমার ছেলেকে বলবো।' উদ্ভাসিত মুখে অতিসমারোহে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে ভার্জিলকে সোজা করে কোলে ধরে মহাউৎসাহে

বললো—'শোনো ছেলে, তোমার বাবার দাদামশায়ের গল্প শোনো। তিনি আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন। নাম ছিলো কুণ্টা কিণ্টে। তিনি গীটারকে বলতেন 'কো'। নদীকে বলতেন 'কাম্বি বলোঙো'। আরো অনেক জিনিসের আফ্রিকার ভাষার নাম তিনি তাঁর মেয়েকে শিখিয়েছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সে ছোট-ভাইয়ের জন্য ঢাক তৈরী করবেন বলে কাঠ কাটতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। চারজন লোক তখন পেছন থেকে এসে তাকে বন্দী করে। একটা মস্তবড় জাহাজে করে সমুদ্র পার করে তাঁকে এদেশে আনা হয়েছিলো। চারবার তিনি পালাবার চেষ্টা করেন। তাঁকে ধরে আনবার জন্য যাদের লাগানো হয়েছিলো, তাদের তিনি মারবার চেষ্টা করেছিলেন বলে তারা দাদামশায়ের অর্ধেকখানা পা কেটে ফেলেছিলো।'

এবার সে বাচ্চাকে তুলে ধরে তার মুখ কিসির দিকে ফিরিয়ে দিলে।

'তিনি বড় বাড়ীর রাঁধুনী মিস বেলকে বিয়ে করেন। তাঁদের একটি মেয়ে হয়। ঐ দেখ সেই মেয়ে। তোমার ঠাকুরমা। তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।'—কিসির চক্ষু গর্ব ও স্নেহে সিক্ত হয়ে উঠলো।

স্বামী বাইরে থাকলে সন্ধ্যাবেলা ম্যাটিলডা বেশীর ভাগ সময় কিসির সাথে কাটাতো। তাদের রান্না খাওয়াও একসাথে হতো। বাচ্চার দুধ খাওয়া হয়ে গেলে কিসি তাকে কোলে করে দোল খাওয়াতো, গান শোনাতো। আর ম্যাটিলডা তার পুরোনো বাইবেলটি খুলে পড়তো। পড়া লেখা নিয়ে এ মালিকের কোন আপত্তি ছিলো না। কিন্তু কিসির বই পড়া সম্পর্কে আতঙ্ক কাটেনি। তবে কী জানি, ধর্মগ্রন্থ পড়াতে হয়তো দোষ হবে না—কিসির মনে সেটুকুই ভরসা ছিলো। ভার্জিলকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে কিসিও খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়তো। ঘুমের ঘোরে নিজের মনে কথা বলতো। ম্যাটিলডা রোজই প্রায় একই রকম কথা শুনতে পেতো—'মা···বাবা···আমাকে নিয়ে যেতে দিয়ো না। আমার কেউ নেই···সবাই হারিয়ে গিয়েছে···এ জীবনের তাদের সাথে আর দেখা হবে না···।' কথাগুলো যেন ম্যাটিলডার মনে কাঁটার মতো ফুটতো। চোখের জল মুছে কিসিকে নাড়া দিয়ে বলতো—'মা, কেউ নেই কেন? আমরাই তো তোমার আপন লোক মা।'

চিকেন জর্জ তার বিয়ের দিন যেমনই আচরণ করে থাকুক, এখন সে আদর্শ সংসারী। বাইরে মোরগ লড়াইয়ে গেলে কখনো খালি হাতে ফিরতো না।

প্রত্যেকের জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসতো, ম্যাটিলডার হাতে কিছু টাকা দিতো। নিজের জন্য বিশেষ কিছুই রাখতো না।

ম্যাটিলডা দুঃখ করে বলতো—'এত উপহার দিয়ে কী হবে? তোমাকে আর একটু বেশী সময় কাছে পেলে সুখী হতাম। সত্যি করে বল তো, মালিক বাইরে যাওয়া কখনো কমাবেন না?'

'কতটা ধন-সম্পত্তি জমাতে পারলে মালিকের পিপাসা মিটবে, কী করে বলবো? তবে ক্ষতিটা কী হচ্ছে? আমাদেরও তো খানিকটা টাকাপয়সা জমছে।'

'টাকা দিয়ে তোমাকে না পাওয়ার ক্ষতিপূরণ হয়? তাছাড়া টাকা জমছেই বা কোথায়? উপহার কেনা একটু কমাও। এত দামী সিল্কের পোষাক কিনেছো! এ পরে আমি কোথায় যাবো?'

'কোথায় আবার! এখানেই পরবে।'

স্বামী বাড়ী থাকলে ম্যাটিলডা আদর্শ স্ত্রীর মতো সেবাযত্ন করতো। তার ফিরবার সময় আগে থেকে জানা থাকলে ভালো ভালো খাবার তৈরী করে রাখতো। হঠাৎ এসে পড়লে যত অসময়ই হোক, তাড়াতাড়ি রান্না করে দিতো। স্নানের জল গরম করে দিতো। পা ব্যথা হলে সযত্নে মালিশ করে দিতো। জর্জও বাড়ী থাকলে ম্যাটিলডা ও ছেলেকে আদর দিয়ে ভরিয়ে রাখতো।

চিকেন জর্জের কিন্তু চরিত্র দোষের সংশোধন হয়নি। মেয়েদের সম্পর্কে তার লোলুপতা আগের মতোই ছিলো। লী সাহেব বাইরে না বেরোলেও মোরগ দেখাশোনার অছিলায় জর্জ বাইরে রাত কাটিয়ে আসতো। কিসি ও ম্যাটিলডা দুজনেরই তা জানা ছিলো।

একদিন ভোরের আগে বাড়ী ফিরে চিকেন জর্জ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে টলছিলো। ম্যাটিলডাকে দেখে হেসে বললো—'মোরগ খেতে শেয়াল এসেছিলো। আমি আর মিঙোকাকা সারারাত শেয়াল ধরছিলাম।'

ম্যাটিলডার আর সহ্য হলো না। হাত তুলে তাকে থামালো। শীতল কণ্ঠে বললো—'শেয়াল তোমাকে মদ গিলিয়েছে, আর গায়ে গোলাপজলের গন্ধ ছড়িয়েছে! শোনো জর্জ, যতক্ষণ আমি তোমার স্ত্রী, আমাদের সন্তানের জননী—ততক্ষণ আমাকে এখানে থাকতেই হবে। ক্ষতি তুমি নিজেরই করছো, আমাদের ততটা নয়। বাইবেলে লিখেছে—যেমন কাজ করবে, তেমনি প্রতিফল পাবে। আরো লেখা আছে—অপরের সাথে যেমন ব্যবহার করবে, নিজেও তেমনি ব্যবহার ফিরে পাবে।'

জর্জের আর কথা বলবার সাহস হয়নি। যে পথে এসেছিলো সে পথেই ফিরে গেলো। সেদিন মোরগদের এলাকাতেই তার ঘুমটি সারতে হয়েছিলো।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জর্জের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যথারীতি সেদিনও জর্জ অনুপস্থিত ছিলো। ম্যাটিলডা নিজের ভাইয়ের নামে তার নাম রেখেছিলো—অ্যাশফোর্ড। পরের বছরের জানুয়ারীতেই তার তৃতীয় পুত্র জন্মায়। সেবারই প্রথম জর্জ পুত্রের জন্ম উপলক্ষে উপস্থিত ছিলো। মহা আনন্দে সে বালকের মতো লাফাতে লাগলো। সামনে মিস্ ম্যালিসিকে পেয়ে তাকেই তুলে ধরে ঘোরাতে লাগলো। চিৎকার করে বললো—'এবার আমার নামে নাম রাখতে হবে!'

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা তৃতীয়বার সকলকে জড়ো করে পরিবারের নবীনতম সদস্যকে জর্জ তার কুণ্টা কিণ্টে নামে আফ্রিকাগত দাদামশায়ের কাহিনী শুনিয়েছিলো।

আগস্ট মাসের শেষে বাড়ী ফিরবার পথে লী সাহেবের সাথে আর একজন সাদা মানুষের দেখা হলো। সে মহা উত্তেজিত হয়ে ছিলো। ন্যাট টার্নার নামে এক নিগ্রোর অধীনে একটি বিদ্রোহী দলের উত্থানের কাহিনী সে শোনালো। ঘটনার বিবরণ শুনবার জন্য বেশ কিছু সাদা মানুষ সেখানো জড়ো হয়েছিলো। তাদের সঙ্গের ক্রীতদাসেদের খুবই আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো। হতভাগ্যদের ম্লান মুখ দেখে চার্লসটনের সেই সন্ত্রাসের দিনগুলো জর্জের মনে পড়ে গেলো। সাদা মানুষের গায়ে আঁচড়টি পডবার আগে বিদ্রোহ দমিত হয়েছিলো। তবু কালোদের ওপর অত্যাচারের সীমা ছিলো না।

বাড়ী ফিরে এসে লী সাহেব গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামলেন। একটু পরেই মিস ম্যালিসি রান্নাঘর থেকে দু'হাত মাথার ওপর তুলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো। পরমুহূর্তে সাহেব বন্দুক হাতে বাইরে এসে রূঢ়স্বরে সবাইকে যার যার ঘরে ঢুকতে আদেশ দিলেন। জর্জ তাঁকে শান্ত হবার মিনতি করতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেলো। তিনি জর্জের মাথার দিকে বন্দুক তাক করলেন—'যাও বলছি! নিগ্রোর দল! ঘর থেকে সব জিনিস বার কর!' কোন অস্ত্র বা সন্দেহজনক জিনিস আছে কি না দেখবার জন্য তাদের সামান্য যা কিছু সম্পত্তি ছিলো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। গদিগুলো কেটে ফালা ফালা করে ফেলা হলো। সিস্টার স্যারার শুকনো শিকড় আর লতাপাতা সাহেবের জুতোর আঘাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

ম্যাটিলডার এত সাধের গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের কাঁচ বন্দুকের বাঁটের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। মেয়েরা কাঁদতে লাগলো। শিশুরা ভীত জলভরা চোখে

ম্যাটিলডাকে আঁকড়ে ধরলো। এ দিকটা শেষ করে সাহেব গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন মোরগ খাঁচার এলাকায়। হাতে বন্দুক ধরাই রইলো। মিঙোকাকার আতঙ্কিত দৃষ্টির সামনে কুড়োল, কোদাল, গোঁজ, ধাতুর তৈরী যাবতীয় জিনিস, এমন কি তাদের পকেট ছুরি দুটো পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হলো।

বাহাত্তর

বিদ্রোহের আতঙ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পুরো এক বছর কেটে গেলো। লী সাহেব মাস দুই পরেই চিকেন জর্জকে নিয়ে মোরগ লড়াইয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রতি মালিকের ব্যবহার অত্যন্ত শীতল ছিলো। তবুও কী অজ্ঞাত কারণে যেন দু'জনের মধ্যে আকর্ষণ দিনে দিনে দৃঢ়তর হচ্ছিলো। মুখে উল্লেখ না করলেও দুজনেই মনে প্রাণে আশা করছিলো—সাদা মানুষের সাথে কালোদের সংঘাত আর হবে না।

ডিমের সাদা অংশ, বীয়ার, ওটমীল, গমভাঙা আর নানারকম লতাপাতা বাটা মিশিয়ে জর্জ মোরগদের খাবার তৈরী করছিলো। মিঙোকাকা অত্যন্ত অসুস্থ। চিকেন জর্জকে একাই কুড়ি পঁচিশটি উৎকৃষ্ট জাতের মোরগকে শিখিয়ে নিতে হচ্ছিলো।

মালিক ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললেন—'কী হে। তোমার নাকি পরপর চারটি ছেলে হলো!'

'হাঁ, স্যর! আজ ভোরবেলা একটি ছেলে হয়েছে। বেশ মোটাসোটা।'

ঘোড়াটাকে বেড়ার গায়ে বেঁধে লী সাহেব ঘাসে জুতো মুছতে মুছতে বললেন—'আশ্চর্য তো! চারটি ছেলে হলো। একটিরও আমার নামে নাম রাখলে না।'

বিস্মিত, পুলকিত জর্জ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললো—'ঠিক বলেছেন স্যর। এ ছেলেটির নাম টম রাখতে হবে। হ্যাঁ স্যর, এর নাম হবে টম!'

মালিককে বিশেষ হৃষ্ট দেখালো। তারপর ছোট্ট কুটিরটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—'বুড়ো আছে কেমন?'

জর্জের উত্তর শুনে বললেন—'মনে হচ্ছে ডাক্তার ডাকতে হবে। কাশিটা সারানো দরকার।'

চিকেন জর্জের তৈরী করা মোরগগুলো দেখে লী সাহেব সন্তুষ্ট হলেন। আগামী প্রতিযোগিতা ও ভ্রমণের ব্যবস্থা সম্পর্কে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন। নিউ অর্লিন্স যেতে হবে। ছ'সপ্তাহ পথেই লাগবে। গ্রীনসবরোতে মোরগদের নিয়ে যাবার জন্য বিশেষভাবে তৈরী, প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থাওয়ালা নতুন একটি বড় গাড়ী তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে। তাতে বারোটি খাঁচার জায়গা থাকবে। ভ্রমণ-কালে মোরগগুলোকে ব্যায়াম করাবার ব্যবস্থা থাকবে। লী সাহেবের ফরমাইস মতো নানাধরনের মাচা, তাক, খাবারের পাত্র ইত্যাদিও থাকবে। দূরপথে যাবার সময় যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে সব কিছুই ভেবে নিয়ে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গাড়ীটি তৈরী হতে দিন দশেক সময় লাগবে।

লী সাহেব চলে গেলে চিকেন জর্জ বাকী কাজ শেষ করায় মন দিলো। নিউ অর্লিন্সে যে ধরনের প্রতিযোগিতা হচ্ছে তাতে খুবই উচ্চমানের প্রস্তুতি চাই। জর্জকে এবার মোরগ বেছে নেবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কোন মোরগে সামান্যতম ত্রুটি ধরা পড়লেই সেটি বাদ দিতে হবে।

নিউ অর্লিন্সের হরেকরকম আকর্ষণের কথা জর্জ শুনেছে। সেখানে নাকি পিতলের বাদ্যযন্ত্র আছে। তাতেই ব্যাণ্ড বাজানো হবে। ক্রীতদাসেরা আফ্রিকা এবং আরো নানা দেশের নাচ দেখাবে। হাজার হাজার দর্শক জমবে। আর মেয়ে! তার পরিচিত চার্লসটনের কালো নাবিকটি বলেছে—নিউ অর্লিন্সে মেয়ে অত্যন্ত স্থলভ। তাছাড়া কত বৈচিত্র্য। যে কোন রঙের, যে কোন রকমের অঢেল মেয়ে!

বাড়ি গিয়ে দেখতে পেলো কিসি ম্যাটিলডার কাছে বসে আছে। মালিকের সাথে নাম নিয়ে যা কথা হয়েছে বলতে দুজনেরই মুখ বিরস হয়ে উঠলো। ম্যাটিলডাই আপত্তিটা প্রথম জানালো—'দুনিয়াতে টম নামের তো অভাব নেই।'

কিসি অল্পস্বরে বললো—'ম্যাটিলডা তোমার পেয়ারের মালিকের নামে নিন্দার কথা বলতে চায় না—তাই ওরকম বললো। নইলে দোষ তো টম নামটাতে নয়। দোষ টম সাহেবের নামে নামকরণে।'

ম্যাটিলডা আবার ফস করে বাইবেল বার করে বসলো—'সৎ লোকের নাম ধন্য হোক্। দুষ্ট লোকের নামে ধিক্। এ কথা তো বাইবেলেই লেখা আছে। প্রভুর বাণী স্মরণ রেখেই শিশুর নামকরণ হওয়া উচিত।'

চিকেন জর্জের সর্বাঙ্গ রাগে চিড়বিড় করে উঠলো। নিজের বাড়ীতে নিজের ইচ্ছামত সে কিছুই করতে পারবে না? ম্যাটিলডার বাইবেলের বাণীর নিকুচি

হোক্—আর সে শুনতে চায় না। 'ঠিক আছে। মালিককে বলে এসো যে তোমরা ও নাম রাখতে চাও না। না হয় ধর্মযাজক টম বলেই ডাক না!'

তার ক্রুদ্ধ চিৎকারে শোবার ঘরের দরজায় তিনটি শিশুর ভীত মুখ উঁকি দিলো। একদিনের বাচ্চাটা কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো। জর্জ সজোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সেই মুহূর্তে বড় বাড়ীর বসার ঘরের লেখার টেবিলে লী সাহেব তাঁর বাইবেলে চিকেন জর্জ ও তার তিন পুত্রের নামের পর পঞ্চম নামটি দোয়াতে কলম ডুবিয়ে সযত্নে লিখলেন—২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩—ম্যাটিলডার পুত্রসন্তানের জন্ম। নাম —টম লী।

জর্জ রুষ্ট, বিক্ষুব্ধ মনে ভাবছিলো—ম্যাটিলডাকে সে ভালোবাসে না, তা নয়। তার মতো পতিব্রতা স্ত্রী হয় না। কিন্তু স্বামীর চরিত্র সংশোধন ছাড়া যেন স্ত্রীর দ্বিতীয় কর্তব্য নেই। জর্জকে বুঝবার মতো মানসিকতা বা তার প্রয়োজনগুলির প্রতি সহানুভূতি ম্যাটিলডার কাছে কি সে আশা করতে পারে না? হাসি-ঠাট্টা, সুরাপান, দেহের ক্ষুধা এসবের মর্ম উপলব্ধি করবার মতো নারীর সঙ্গও মানুষের প্রয়োজন হয়, এ বোধ তার নেই। লী সাহেবের সাথে নানা জায়গায় ঘুরে সে সে বুঝতে পেরেছে তার ও মালিকের মনের গঠন অনেকটা এক। কোনও বড় শহরে মোরগের লড়াই থাকলে তারা সর্বদাই প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর সেখানে একদিন বেশী থেকে আসতো। খচ্চরগুলো আস্তাবলে জমা রেখে, কোন স্থানীয় লোকের ওপর মোরগগুলো দেখাশোনার ভার দিয়ে জর্জ ও তার মালিক নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যেতো। দু'জনেই জানতো কী কাজে তারা যাচ্ছে।

জর্জের রাগ পড়তে পাঁচদিন লাগলো। ঘরে ফিরে এলে ম্যাটিলডা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো—'ওমা! তুমি এসেছো। বাচ্চারা তো তোমার জন্য অস্থির। এই ছোট্টটা তো চোখ মেলে তোমাকে দেখেই নি।'

পাঁচ বছর, তিন বছর আর দু'বছরের তিনটি শিশু ত্রস্ত, উৎসুক চোখে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। জর্জের মন তাদের দেখে স্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠলো। ইচ্ছা করছিলো জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে। শীঘ্রই আবার তিন মাসের জন্য বাইরে যেতে হবে। তাদের জন্য নিশ্চয় সে ভালো ভালো খেলনা নিয়ে আসবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ম্যাটিলডার দেওয়া খাবার সামনে নিয়ে টেবিলে বসতে হলো।

ম্যাটিলডা ভাজিলকে বললো—'যাও তো, ঠাকুমাকে ডেকে নিয়ে এসো।' জর্জের চিবানো বন্ধ হলো। আবার কী মতলব এদের দু'জনের!

কিসি এসে বললো—'কতদিন তোমাকে দেখি না। কেমন আছো?' চেয়ারে বসে সবচেয়ে ছোট শিশুটিকে কোলে নিয়ে হাসিমুখে বললো—'বাচ্চারা তোমার কাছে একটা জিনিস শুনতে চায়, না ভার্জিল?'

অনেক কষ্টে লজ্জা কাটিয়ে উঠে মিষ্টি রিনরিনে স্বরে ভার্জিল বললো—'বাবা, আমাদের তোমার দাদামশায়ের গল্প শোনাবে?'

জর্জ নিজের ওপর ম্যাটিলডার মিনতি ভরা দৃষ্টি অনুভব করছিলো। কিসিও মৃদু কণ্ঠে বললো—'জর্জ, তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমাকে আমরা ভালোবাসি না, স্বপ্নেও এমন কথা ভেবো না। কিন্তু তুমি মাঝে মাঝে তোমার পরিচয় ভুলে যাও। আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি ভুলো না। এদের প্রপিতামহের রক্ত তোমার ভেতর দিয়ে তোমার সন্তানদের শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে—এটা আমাদের সকলেরই মনে রাখা দরকার।'

'বাইবেলে লিখেছে—' এটুকু বলে জর্জের শঙ্কিত দৃষ্টি দেখেই ম্যাটিলডা তাড়াতাড়ি যোগ দিলো—'ধর্মশাস্ত্রে শুধু কঠিন কথা লেখা থাকে না। ভালোবাসার কথাও লেখা থাকে।'

জর্জ বিহ্বল চিত্তে তার চেয়ারটি আগুনের কাছাকাছি নিয়ে গেলো। ছেলে তিনটি সামনে নীচে বসলো। তাদের চোখ প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। কিসি সর্বকনিষ্ঠটিকে তার বাবার কোলে তুলে দিলো।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে জর্জ স্পষ্ট উচ্চারণে ছেলেদের কাছে তাদের পিতামহীর কাছে শোনা আফ্রিকা দেশীয় প্রপিতামহের আখ্যানটি বলতে শুরু করলো।

খানিকটা শুনেই ভার্জিল চেঁচিয়ে উঠলো—'আমি জানি বাবা। আমি বলি?' ছোট ভাইদের দিকে একবার মুখভঙ্গী করে সে নিজেই পুরো কাহিনীটি বলে গেলো। আফ্রিকাদেশের ভাষায় শব্দগুলি পর্যন্ত।

ম্যাটিলডা হেসে বললো—'তোমার কাছে আগে তিনবার শুনেছে কিনা! তাছাড়া ঠাকুরমার কাছে তো হরদম শুনছে।' জর্জ পুলকিত মনে ভাবছিলো—আমার স্ত্রীকে কতদিন হাসতে দেখিনি! ভার্জিল আবার ঘোষণা করলো—'ঠাকুরমা বলেছেন—সেই আফ্রিকার মানুষটির কাছে আমরা নিজেদের বংশ পরিচয় পেয়েছি।'

তার ঠাকুরমা এক গাল হেসে বললো—'ঠিক কথা!'

বহুদিন পর চিকেন জর্জ তার ঘরে গৃহসুখ খুঁজে পেলো।

তিয়াত্তর

গ্রীনসবরোতে তৈরী করতে দেওয়া নতুন গাড়ীটি শেষ হতে আরো চার সপ্তাহ লাগলো। জর্জ গাড়ী দেখে মহা খুশী। এটি তৈরী করিয়ে মালিক উপযুক্ত কাজ করেছেন। নিউ অর্লিন্সের মতো জায়গায় পুরোনো ক্যাঁচকেচে গাড়ী নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হতো? তার সাহেবের মতো বিখ্যাত লড়াইয়ে মোরগের মালিক এবং তাঁর সহকারীর এরকম দামী গাড়ীই তো দরকার ছিলো। মালিকের কাছ থেকে দেড় ডলার ধার নিয়ে গ্রীনসবরোতে নতুন গাড়ীর উপযুক্ত একটি নতুন কালো ডার্বি টুপিও সে কিনলো। ম্যাটিলডার বোনা নতুন সবুজ স্কার্ফের সাথে ওটা খুব ভালো মানাবে। সবুজ স্কার্ফ, সবুজ ও হলুদ স্যুট, দুটি লাল বেল্ট, সঙ্গে অনেক শার্ট, মোজা, রুমাল তাকে গুছিয়ে নিতে হবে। শহরে সব সময়ই ফিটফাট থাকা দরকার।

উনিশটি মোরগের মাঝে আরো সাতখানা বেছে বাদ দিতে হবে। গাড়ীতে জায়গা আছে বারোটি মোরগের। মিঙো দিন দিন অশক্ত হয়ে পড়ছিলো। শীঘ্রই জর্জকে সাহায্য করবার জন্যও একটি লোক দরকার হবে। এটা যে ভার্জিলের পক্ষে কী অপূর্ব সুযোগ, সে কথা তার মা ও স্ত্রীকে কখনো বোঝানো যাবে না। বিশেষতঃ ভার্জিলের ছ'বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে এমনিতেও বাড়ীতে বসিয়ে রাখা যাবে না—ক্ষেতের কাজে পাঠাতেই হবে। এবার জর্জের অনুপস্থিতিতে ভার্জিলকে মিঙো-কাকার কাছে দিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো। জর্জ তাহলে ফিরে এসে তাকে সহজেই এ কাজে রেখে দিতে পারতো। কিন্তু কথাটা বাড়ীতে তুলতেই ম্যাটিলডা ও কিসি ক্ষেপে গেলো। ম্যাটিলডা বললো—'মালিকের যদি এ কাজের জন্য আরো লোক দরকার হয়ে থাকে তবে তিনি নতুন কাউকে কিনে নিন।' জর্জ মহা বিপদে পড়লো। তার ও মিঙোকাকার সাম্রাজ্যে জর্জ নতুন কাউকে ঢোকাতে চায় না—এ কথা সে বোঝাবে কাকে? অবশ্য মিঙোকাকার ভার্জিলের সাহায্য পছন্দ হবে কিনা সেটাও ভাববার বিষয়। জর্জের সাথে মালিকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেখে মিঙোকাকার মেজাজ দারুণ বিগড়ে গিয়েছে। নিউ অর্লিন্সে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে না শুনে সে বিরক্তি চরমে উঠেছিলো—'ভেবেছো, তোমরা গেলে আমি মোরগগুলোকে খাওয়াবার জন্য বসে থাকবো?' মিঙোকাকার তো বোঝা উচিত ছিলো—সঙ্গে কাকে নেবেন, না নেবেন, এসব সিদ্ধান্ত তার নয়, মালিকের। তাছাড়া সত্যিই তো ছ'সপ্তাহের পথ গাড়ীতে যাবার ধকল মিঙোকাকার কি সইতো? গ্রীনসবরো থেকে নতুন গাড়ীখানা নিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে জর্জ

এসব কথা ভাবছিলো। ভাড়া করা দুটো খচ্চর জুতে মালিক নিজে নতুন গাড়ীটা চালাচ্ছিলেন। জর্জ পেছনে পুরোনো গাড়ীটি চালিয়ে আসছিলো।

কিন্তু গাড়ী দুটো বড় রাস্তা ছেড়ে বড় বাড়ীর পথে অর্ধেকটা আসতেই জর্জ অবাক হয়ে দেখলো—মিসেস লী বড় বাড়ীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। সিস্টার স্যারা, মিস ম্যালিসি, পম্পেকাকা, ম্যাটিলডা, তার ছেলেরা—সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাপার কী ? এখন তো ক্ষেতে কাজ করবার সময়। নতুন গাড়ী দেখবার কৌতূহলে ক্ষেতের কাজ ছেড়ে সবাই চলে আসবে এতটা সাহস তো হতে পারে না ?

মিসেস লী সাহেবের গাড়ীর দিকে এগিয়ে এলেন। জর্জ হাতের রাশ টেনে উৎকর্ণ হলো। মালিকের বিবর্ণ মুখ দেখেই সহসা সে সব বুঝতে পারলো। মিঙোকাকা নেই ! লী সাহেব গাড়ী থেকে নেমে ভারী পায়ে ধীর গতিতে এগিয়ে এলেন। বহু দূর থেকে যেন সে শুনতে পেলো 'মিঙো মারা গিয়েছে।' জর্জ গাড়ীর পাশে মাটিতে বসে পড়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো।

আত্মস্থ হতে তার পুরো দু'দিন সময় লেগেছিলো। ইতিমধ্যে পম্পেকাকা ও ভার্জিলই মোরগগুলোর দেখাশোনা করছিলো। জর্জের কানে বৃদ্ধের তিক্ত অভিযোগ ভেসে আসছিলো—'ভেবেছো, তোমরা চলে গেলে মোরগগুলোকে খাওয়াবার জন্য আমি বসে থাকবো ?' মিঙোকাকার পরিচয় কী ? লী সাহেবের কাছে আসবার আগে সে কোথায় ছিলো ? তার পরিবারে আর কে ছিলো ? তার কি স্ত্রী বা কোন সন্তান ছিলো ? জর্জের ভাবনার অন্ত ছিলো না। জর্জই তার নিকট-তম ব্যক্তি ছিলো। অথচ তার এতদিনের সঙ্গীর কোন পরিচয়ই সে জানে না !

বৃহস্পতিবার তারা গ্রীনসবরো থেকে ফিরে এসেছিলো। শনিবার লী সাহেবকে আবার দেখা গেলো। বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ। মিঙোকাকার ঘরটি পুড়িয়ে দিতে আদেশ দিলেন। বৃদ্ধের চল্লিশ বছরের বাসা দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। তারপরে যা বললেন—জর্জের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ধীরে ধীরে যেন তিনি নিজের মনেই কথা বলছিলেন। 'ভেবে দেখলাম নিউ অর্লিন্স যাওয়া সম্ভব নয়। এখানকার মোরগগুলোকে দেখবার মতো কেউ তো নেই। উপযুক্ত লোক পেতে সময় লাগবে —হয়তো নতুন করে সব কিছুই শিখিয়ে নিতে হবে। তোমাকে রেখে গেলেও চলবে না। বারোটা মোরগ নিয়ে আমার একার পক্ষে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জেতবার উদ্দেশ্য ছাড়া প্রতিযোগিতায় যাবার অর্থ হয় না। না, এ অবস্থায় এতদূর পথ যাওয়া মূর্খামি হবে।'

চিকেন জর্জের গলার কাছে যেন কী একটা দলা পাকিয়ে এলো। এতদিনের প্রস্তুতি, এত অর্থব্যয়! মালিকের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা দক্ষিণের মোরগ লড়াইয়েদের মাঝে তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠবেন—মোরগগুলোকে এবার সে কী অসাধারণ অধ্যবসায়ে সকল দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট করে তুলেছে! বহু কষ্টে সে উচ্চারণ করলো—'হ্যাঁ স্যর।'

চুয়াত্তর

দিবারাত্র একা মোরগগুলোর পরিচর্যায় থাকা জর্জের পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিলো। চিকেন জর্জ আসবার আগে মিঙোকাকা কী করে একা পঁচিশ বছর ছিলো? বৃদ্ধ তাকে বলেছিলো—'প্রথমে ভেবেছিলাম, মালিক নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবার জন্য কাউকে দেবেন। কিন্তু দেননি। পরে মনে হতো এই ভালো। মানুষের চেয়ে মোরগের সঙ্গ অনেক শান্তির। কিন্তু জর্জ পেরে উঠছিলো না। সঙ্গী হিসাবে না হলেও তাকে সাহায্য করবার জন্য কাউকে চাই। ভার্জিল হলেই সবচেয়ে ভালো হতো। মিঙোকাকা তাকে যেমন ভাবে শিখিয়েছে তেমনি করে সেও শিখিয়ে নিতো। ম্যাটিলডা ও কিসির সাথে তার নতুন করে দ্বন্দ্বে নামবার ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু উপায় কী? অবশেষে আবার একদিন সাহস সঞ্চয় করে ম্যাটিলডার মুখোমুখি হলো—'দেখ সাহেব তো আমাকে নিয়ে বেরোবেনই। এর পরের বার বেরোবার আগে নিশ্চয়ই বলবেন—তোমার বড় ছেলে মোরগগুলোর দেখাশোনা করুক। তখন আমাদের কিছুই করবার থাকবে না। বরঞ্চ এখন থেকেই ভার্জিল আমার কাছে কাজকর্ম শিখে নিক। তাহলে আমি যতক্ষণ কাজ শেখাবো ততক্ষণ তার কাজ। বাকী সময় ছুটি। ছ'বছরের পরে তুমি তো তাকে ঘরে রাখতে পারবে না—ক্ষেতে পাঠাতেই হবে।'

'ওর তো এখনো ছ'বছর হয়নি। তুমি নিজে ও কাজ বারো বছর বয়সে আরম্ভ করেছিলে। যাই হোক্, তুমি যা বলছো, তাছাড়া তো উপায়ও দেখছি না। ঐ মোরগগুলো যেভাবে তোমার দিবারাত্র গ্রাস করছে, তাতেই আমার আপত্তি।'

'কী যে বল! মোরগগুলো যেন আমাকে কোথায়ও ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে!'

'প্রায় তাই তো অবস্থা। তোমাকে আবার কখন পাওয়া যায়!'

'পাওয়া যায় না ? কার সাথে এতক্ষণ কথা বলছো ? সারা মাস ধরে কে বাড়ীতে বসে আছে ?'

'সে তো এ মাসেই শুধু !'

কিন্তু এক সপ্তাহের ভেতরেই বোঝা গেলো চিকেন জর্জের বড় ছেলেটির মোরগ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তাকে যেটুকু কাজ করতে দেওয়া হয়, সে ভালোভাবেই করে। কিন্তু তারপরই বসে থাকে বা খেলা করে। জর্জের মনে পড়ে —সে তো সর্বক্ষণই মোরগের কাজে ব্যস্ত থাকতো। সময় পেলেই তাদের পেছনে ঘুরে বেড়াতো। নিজে থেকে তাদের ঘাস ছিঁড়ে বা ফড়িং ধরে খেতে দিতো। ভার্জিলকে নানাভাবে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করে সে নিরাশ হলো। কী জানি ! অ্যাশফোর্ড, জর্জ বা টম এ ব্যাপারে কেমন হবে !

ভার্জিলকে মোরগের পরিচর্যায় সর্বক্ষণ পাবার আশা ছেড়ে দিতে হলো। তার ওপর শুধু মোরগদের নিয়মের খাবার ও জল দেবার ভার থাকলো। বাকী সময় সে ক্ষেতের কাজ করতে শুরু করলো। ক্ষেতের কাজ সম্পর্কে জর্জের অপরিসীম অবজ্ঞা ! সে কথা অবশ্য সে ভুলেও কিসি, ম্যাটিলডা বা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেনি। একটা মোরগ লড়াই আসন্ন হলে যে কী উল্লাস ও উত্তেজনায় চিকেন জর্জের মন ভরে উঠতো—সেটা ওদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না।

গ্রীষ্মকাল খেলার মরশুম নয়। জর্জের এখন শুধু বাঁধা ধরা কাজ। বাকী সময় সে একা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেলো। বসে বসে মোরগদের সাথেই কথা বলতো। জর্জ যেমন ভাবে মিঙোকাকার অভাব অনুভব করে, মোরগগুলোও কি তেমনি ভাবে করে ? সে যে নেই, চিরদিনের মতো চলে গিয়েছে ওরা কি বোঝে ? আচ্ছা, মালিকের সর্বপ্রথম লড়াইয়ে মোরগটার কী হলো কে জানে ! মিঙো-কাকাকে কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি। সেটা কি বুড়ো হয়ে মরে গেলো, না লড়াইয়ে মরলো—কে জানে ! মালিককে জিজ্ঞেস করতে হবে। চল্লিশ বছর আগে-কার কথা ! মালিক বলেছিলেন তিনি সতেরো বৎসর বয়সে মোরগটি পেয়েছিলেন। তার মানে মালিকের এখন ছাপ্পান্ন-সাতান্ন বৎসর বয়স। এতদিন মালিকের অধীনে থেকে তার সেটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। সহসা মনে হলো স্বাধীন হলে কেমন লাগে কী জানি ! সেটা নিশ্চয় তেমন ভালো জিনিস নয়। নইলে লী সাহেব ও অন্যান্য সাহেবদের স্বাধীন নিগ্রোদের সম্পর্কে এমন তীব্র বিদ্বেষ কেন ? কিন্তু গ্রীনসবরোতে যার কাছ থেকে সে মদের বোতল কিনেছিলো, সেই নিগ্রো মেয়ে-মানুষটি ? সে বলেছিলো—'স্বাধীন হওয়া যে কী জিনিস তা তোমরা আবাদের

নিগ্রোরা বুঝতে পারবে না। যাতে না বুঝতে পার, তোমাদের মালিকেরা তো সর্বক্ষণ সে চেষ্টাই করেন। নিগ্রো হয়ে জন্মানো মানেই ক্রীতদাস হওয়া নয়। এ জ্ঞান তোমাদের কবে হবে জানি না।'

এতদিন পর্যন্ত স্বাধীন নিগ্রোদের জর্জ এড়িয়ে চলেছে। এবার শহরে গেলে তাদের সাথে কথা বলে দেখবে।

একদিন বিকালে সে নিয়মমাফিক ঘুরে ঘুরে মোরগগুলোকে দেখে নিচ্ছিলো। জর্জ মোরগের ডাকের অবিকল নকল করতে পারতো। তার ডাক শুনে বনের ভেতর থেকে বুনো মোরগ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে ছুটে আসতো। সেদিন জর্জের গলার ডাকে একটি চমৎকার তেজী মোরগ ছুটে বেরিয়ে এসে ডানা ঝাপটাতে লাগলো। তার উদ্দীপ্ত সুউচ্চ কণ্ঠের ডাকে শরতের আকাশ যেন দীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। বিচিত্র বর্ণের পালকগুলো উজ্জ্বল সূর্যালোকে ঝকমক করছিলো। চোখে তীব্র চাহনি। নির্ভীক হিংস্র গতিভঙ্গী। বলিষ্ঠ পায়ে সুতীক্ষ্ণ নখ। দেহের প্রতিটি পেশীতে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য ও বিক্রম উদগ্র ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিলো। চিকেন জর্জ মুগ্ধ হয়ে গেলো। সে শপথ করলো এ মোরগটিকে সে বন্দী করবে না বা নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য তৈরী করবে না। এ মোরগটি যাবৎ জীবন অস্পৃষ্ট ও স্বাধীন থাকবে।

পঁচাত্তর

খেলার নতুন মরশুম শুরু হয়েছে। নিউ অর্লিন্সে না গেলেও স্থানীয় খেলাগুলোতে লী সাহেব যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো। প্রতি পাঁচটি খেলায় প্রায় চারটিতে তিনি জিতছিলেন। চিকেন জর্জেরও ঝড়তি পড়তি মোরগ নিয়ে ছোট ছোট খেলায় যথেষ্ট উপার্জন হচ্ছিলো। সে বৎসরের শেষের দিকে চিকেন জর্জের পঞ্চমপুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয়েছিলো জেমস্।

লী সাহেবের সাথে বাইরে গিয়ে সামাজিক পরিস্থিতির কিছু কিছু পরিবর্তন চিকেন জর্জের চোখে পড়ছিলো। সাদা মানুষের প্রতি নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ানদের তিক্ততা ও আক্রোশ ক্রমেই বাড়ছিলো। আমেরিকার আদি বাসিন্দা ইণ্ডিয়ানদের ও মেক্সিকোবাসীদের সাথে সাদা মানুষের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধছিলো। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে জর্জ একটা অভাবনীয় সংবাদ নিয়ে এলো। আমেরিকার নতুন

প্রেসিডেণ্ট ভ্যান ব্যুরেন সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের মিসিসিপি নদীর পশ্চিম পাড়ে ভাগিয়ে দিতে সৈন্যদলকে আদেশ দিয়েছেন।

পম্পেকাকার মতে ইণ্ডিয়ানরা যেমন নির্ভাবনায় নিজেদের দেশে সাদা মানুষদের ঢুকতে দিয়েছিলো—এ তারই প্রতিফল! আগে এ দেশে কেবল ইণ্ডিয়ানরাই বাস করতো। মাছ ধরে আর শিকার করে আনন্দে দিন কাটাতো। পরের ব্যাপারে কখনো মাথা গলাতো না। এক সময় সাদা মানুষেরা দলে দলে জাহাজে করে আসতে শুরু করলো। তারা অতি ধূর্ত লোক। মুখভরা হাসি আর মিষ্টি কথাতে এ দেশের লোককে ভুলিয়ে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। ইণ্ডিয়ানদের উচিত ছিলো এদের গোড়া থেকেই হিংস্র পশুর মতো দূরে হটিয়ে রাখা। জর্জ তার পরের সফর থেকে ফিরে এসে খবর দিলো—সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইণ্ডিয়ানদের ওকলাহামা নামে একটা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পথে বহুলোক অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে। বহু লোককে অকারণে হত্যা করা হচ্ছে। কত লোক যে নানাভাবে প্রাণ হারাচ্ছে তার হিসাব নেই।

জর্জের ব্যক্তিগত জীবনের সুখবরও ছিলো। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তার ষষ্ঠ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। ম্যাটিলডা তার নাম রেখেছিলো লুইস। কিসির নাতনীর শখ মেটেনি বলে তার আক্ষেপ ছিলো। সিস্টার স্যারা মন্তব্য করেছিলো—সর্বক্ষণ মোরগের সাথে থাকে বলে জর্জের কেবল মোরগ হচ্ছে। যাই হোক্ অবশেষে কিসির মনোবাসনা পূর্ণ হলো। জর্জের সপ্তম সন্তানটি কন্যা হলো। ম্যাটিলডা তার শাশুড়ীকে জানালো —'আমরা অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছি, মেয়ে হলে তার নাম হবে কিসি!' ঠাকুরমার আনন্দের আর পরিসীমা রইলো না। পরদিন সন্ধ্যাবেলা চিকেন জর্জ দৈনন্দিন কাজের শেষে ছ'টি পুত্র ও কোলের শিশুকন্যাটিকে তাদের আফ্রিকা-দেশীয় প্রপিতামহ কুণ্টা কিণ্টের উপাখ্যান সবিস্তারে শোনালো।

এর দু'মাস পরে একরাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমোলে জর্জ জিজ্ঞেস করলো—'ম্যাটিলডা, আমাদের কত জমেছে বল তো?'

ম্যাটিলডা স্বামীর বৈষয়িক কৌতূহলে একটু বিস্মিত হলো—'একশো থেকে একটু বেশী হবে।'

'ব্যস?'

'ব্যস মানে? এতটা যে জমেছে তাই তো আশ্চর্য! কতদিন তোমাকে বলেছি —খরচ না কমালে কিছু জমবে না।'

জর্জ বিব্রত হয়ে বললো--'ঠিক আছে! ঠিক আছে!'

ম্যাটিলডা কিন্তু সেখানেই থামলো না—'তুমি কত জিতেছো আর কত নিজে খরচ করেছো তা আমি জানি না। তবে আমাকে কত দিয়েছো, আবার নিজেই ফিরে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছো, তার একটা হিসাব দিতে পারি।'

'কত?'

'তিন থেকে চার হাজার ডলার।'

'উরে ব্বাবা! এত?'

ম্যাটিলডা তার স্বামীর মুখ নিরীক্ষণ করছিলো। এই বারো বৎসরের বিবাহিত জীবনে সে জর্জকে এত গম্ভীর বা চিন্তামগ্ন কখনোই দেখেনি।

'ওখানে একা একা বসে কত কথাই যে ভাবি!' জর্জ একটু যেন ইতস্তত: করে আবার বললো—'যদি আরো কয়েক বৎসর রোজগার করে আমাদের মুক্তির টাকাটা জমাতে পারতাম!'

ম্যাটিলডা চমকে উঠলো।

জর্জ অধীর হয়ে বললো—'হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না। কাগজ পেন্সিল নিয়ে এসো তো।'

ম্যাটিলডা কাগজ পেন্সিল হাতে করে টেবিলে বসলে জর্জ বললো—'মুস্কিল হচ্ছে, মালিক আমাদের জন্য কত চাইবেন সঠিক জানি না। মনে কর—তুমি। শুনেছি আজকাল ক্ষেতের কাজ করবার লোকের দাম হয়েছে হাজার ডলার করে। মেয়েদের দাম একটু কম হবে। তোমার দাম আন্দাজ করছি আটশো ডলার। আটটা বাচ্চার দাম—প্রতিটি তিনশো করে—।'

'আট নয় সাত।'

'কেন, পেট ফুলিয়ে বসে আছ। সেটা বুঝি ধরতে হবে না?'

ম্যাটিলডা হেসে বললো—'ও! আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে—চব্বিশ শ' ডলার।'

'কেবল বাচ্চাদের জন্য?'—জর্জ চোখ কপালে তুললো।

'ওতেই ঘাবড়ে যাচ্ছো। আসল তো তুমি। তোমার কত দাম হবে বল তো?'

'কী মনে হয় তোমার?'

'আমি কি জানি?' জানলে তো নিজেই তোমাকে মালিকের কাছ থেকে কিনে রাখতাম!'

দু'জনের মিলিত হাসিতে আবহাওয়া স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো।

'জর্জ, শুধুই তুমি এসব হিসাব করছো। ভালো করেই জান, মালিক তোমাকে বিক্রী করবেন না।'

'তুমি তো মালিকের নাম শুনলেই জলে ওঠো। তাই কখনো বলিনি। মালিক বহুবার আমাকে বলেছেন—যখন ছ'থামওয়ালা চমৎকার একটি দোতলা বাড়ী তৈরী করবার পয়সা জমে যাবে তখন মালিক ছুটি নেবেন। শুধু ফসলের পয়সাতেই ওঁদের খরচ চলে যাবে। বলেছেন—তাঁর বয়স বাড়ছে। মোরগ লড়াইয়ের ঝামেলা আর তার পোযাচ্ছে না।'

'বিশ্বাস করি না। মালিকের বা তোমার মোরগের নেশা কখনো ছুটবে না।'

'যা বলছি শোনো। পম্পেকাকার মতে মালিকের বয়স এখন তেষট্টি। আর মনে কর পাঁচ ছ'বছর। তারপর ঐ বয়সে খেলার জন্য এখানে সেখানে ছুটে বেড়ানো কি সম্ভব? বরঞ্চ আমাদের কাছে কিছু টাকা পেয়ে গেলে তাঁর বাড়ী তৈরী করতে সুবিধা হবে।'

'ঠিক আছে। তোমার জন্য তিনি কত চাইবেন, মনে করছো?'

জর্জের কণ্ঠস্বরে অহংকার ও নৈরাশ্য দুটোই ফুটে উঠলো—'জুয়েট সাহেবের ড্রাইভার বলেছিলো, তিনি আমার জন্য মালিককে চার হাজার ডলার দিতে চেয়েছিলেন।'

এবার ম্যাটিলডার চোখ কপালে ওঠার পালা। জর্জ পরিহাস করে বললো—'কী রকম দামী লোকের সাথে শুচ্ছো ধারণা তো নেই!—চার না হলেও অন্ততঃ তিন হাজার ডলার তো তাঁকে দিতেই হবে আমার জন্য। আর মা বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। তার জন্য ছ'শো ডলার ধর। তাহলে কত হলো মোট?'

'ছ'হাজার আটশো ডলার।'

জর্জ ম্যাটিলডার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—'বুঝতে পেরেছি তুমি কি ভাবছো! মিস ম্যালিসি, সিস্টার স্যারা আর পম্পেকাকার কথা তো? তোমার থেকেও আগে ওদের নিজের লোক বলে জেনে এসেছি। তাদের ফেলে সত্যি চলে যাওয়া যায় না।'

অতি বিরাট সমস্যা। ম্যাটিলডা আভভূত হয়ে গিয়েছিলো। বিবাহিত জীবনে এই প্রথম তারা একসাথে একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বসেছিলো। বড় আনন্দে তার ইচ্ছা হচ্ছিলো জর্জকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সম্মোহিতের মতো বসে ছিলো—নড়বার ক্ষমতা ছিলো না। অবশেষে কথা খুঁজে পেলো—'জর্জ, তোমার মনে এ ভাবনা এলো কী করে?'

'মালিকের সাথে শহরে গেলে মুক্তি পাওয়া নিগ্রোদের সাথে কথাবার্তা বলে দেখেছি। ওরা বলে—উত্তরে নিগ্রোদের অবস্থা খুব ভালো। নিজেদের বাড়ী

আছে। ভালো কাজ করে। আমি জানি ওখানে গেলে আমারও কাজের অভাব হবে না। উত্তরে মোরগ লড়াইয়ের খুব চল। নিউইয়র্ক শহরে নামকরা সব নিগ্রো লড়াইয়ে মোরগের মালিক আছে।'

ম্যাটিলডা অবাক হয়ে শুনছিলো।

'আরো একটা জিনিস। আমার ইচ্ছা আমার ছেলেমেয়েরা তোমার মতো লিখতে পড়তে শিখবে।'

ম্যাটিলডার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জর্জের প্রতি ভালোবাসায় তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো। সজল নয়নে জর্জের হাত ধরে বলেছিলো—'আজ রাতে প্রভু আমার সকল বাসনা পূর্ণ করেছেন। কিন্তু জর্জ! আমাদের দিয়ে কি এ কাজ সম্ভব হবে?'

'বলছি কী তাহলে?' দেখ না কী হয়!'

ছিয়াত্তর

চিকেন জর্জের চতুর্থ পুত্র টমের হাতের কাজে বড উৎসাহ। তাকে কিছু একটা হাতের কাজ শেখানো দরকার। বহুকষ্টে লী সাহেবকে রাজী করানো গেলো। টমকে কামারের কাজ শিখাবার একটা ব্যবস্থা হলো। অ্যাসকিউ সাহেবের ইসাইয়া নামে একটি নিগ্রো কামার ছিলো; তার কাছে টম তিন বছর কাজ শিখবে। ভবিষ্যতে টম সাহেবের আবাদে একটি কামারশালা বসিয়ে আবাদের যাবতীয় কামারের কাজ বিনা পয়সায় করে নেওয়া যাবে। তাছাড়া খরিদ্দারের ফরমাইসি কাজও সেখানে করা হবে। তাতে লী সাহেবের কিছু অর্থ উপার্জন হবে।

লী সাহেব জর্জকে কড়া গলায় বললেন—'তোমার কথার ওপর ভরসা করে অ্যাসকিউ সাহেবের কাছে টমের নাম সুপারিশ করেছি। ঠিক ভাবে না চললে বা কাজ না শিখতে পারলে তাকে ফিরে আসতে হবে। সেটা তোমাদের পক্ষে ভালো হবে না। দু'জনেরই পিঠের চামড়া তুলে নেবো তাহলে।'

টমকে কামারের কাজ শেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে এ কথা তাকে আগে জানানো হয়নি। চেষ্টা সফল না হলে যাতে তার ..শাভঙ্গের দুঃখ না পেতে হয় সেজন্যই জর্জ, ম্যাটিলডা বা কিসি ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে সুখবরটা পেয়ে টম আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো। ভার্জিলের সদ্য বিয়ে হয়েছিলো। পাশের আবাদের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে নতুন বিয়ের ঘোর তখনো

কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অ্যাশফোর্ড কিন্তু টমের এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে ঈর্ষায় জ্বলে গেলো। লিটল জর্জের প্রতিক্রিয়াটা হলো অন্যরকম—'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে আমিও বেঁচে যেতাম। খাটতে খাটতে মরে গেলাম। বাবা নিজের নামে আমার নাম রেখে ভেবেছিলেন তাঁর মতো আমিও বুঝি মোরগ নিয়ে পাগল হবো। কিন্তু আমার হয়েছে উল্টো। ওগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।' দশ বছরের লিটল কিসি আর আট বছরের মেরী খবরটা শোনা অবধি টমের সঙ্গ আর ছাড়ছিলো না।

থ্যাঙ্কস গিভিঙের উৎসবে টম বাড়ী আসবে। অ্যাসকিউ সাহেবের আবাদ থেকে তাকে নিয়ে আসবার জন্য মালিক ভার্জিলকে বিশেষ অনুমতিপত্র লিখে দিয়েছিলেন। শীতল নভেম্বরের অপরাহ্ণ বেলায় ভার্জিল খচ্চরের গাড়ীটি চালিয়ে টমকে নিয়ে বাড়ী এসে পৌঁছালো। ক্রীতদাস বসতির ঘরগুলি, আর তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয়জনেরা দৃষ্টিপথে আসতেই টমের চোখ সজল হয়ে উঠলো। এদের অভাব সে প্রতিদিন অনুভব করেছে। প্রত্যেকের জন্য সে নিজের হাতে উপহার তৈরী করে এনেছিলো। উপহার সামগ্রীর থলিটি হাতে নিয়ে সে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লো। পম্পেকাকা অথর্ব হয়ে পড়েছিলো। প্রায়ই শয্যাগত থাকতো। আজ টমকে দেখবার জন্য বহুকষ্টে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। টম তার ষোলো বছরের জীবনে এত ভালোবাসা, এত সম্মান একসাথে কখনো পায়নি। সে অভিভূত হয়ে পড়লো। চিকেন জর্জ তার চিরাচরিত মুরুব্বীর ভঙ্গীতে ছেলের পিঠ চাপড়ে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলো—'রোজগারপাতি শুরু করেছো?'

'না বাবা, এখনো নয়।'

'কী রকম কর্মকার হয়েছো, এখনো উপার্জন শুরু হয়নি!'

টম চিরকাল তার বাবার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস আর গুরুত্বহীন লম্বা চওড়া কথাবার্তার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতো। অস্বস্তির সাথে বললো—'কর্মকার হতে দেরী আছে। সবে তো শিখতে শুরু করেছি।'

প্রচুর খাদ্যের আয়োজন হয়েছিলো। পম্পেকাকাকে ধরাধরি করে চেয়ারসুদ্ধ টেবিলের কাছে নিয়ে আসা হলো। খানিকক্ষণ সময় কারো কথা বলবার সুযোগ ছিলো না। চারদিকে সুখাদ্য আস্বাদনের শব্দ। টমের প্লেটে ম্যাটিলডা ও কিসি জোর করে খাবার চাপিয়ে দিচ্ছিলো।

'ওখানে খাওয়া দাওয়া কেমন? কে রাঁধে?'—ম্যাটিলডা শুধালো।

কোনক্রমে মুখের খাবার গলাধঃকরণ করে টম উত্তর দিলো—'মিঃ ইসাইয়ার স্ত্রী মিস এমা।'

'কেমন দেখতে?'

'কালো, মোটামত।'

চিকেন জর্জ অট্টহাস্য করে উঠলো—'তার সাথে রান্নার সম্পর্ক কী? রাঁধে কেমন?'

'ভালোই, বাবা।'

সিস্টার স্যারা তীক্ষ্ণ স্বরে মন্তব্য করলো—'তাই বলে মায়ের হাতের রান্নার সাথে কি তুলনা হয়?'

পম্পেকাকা এতক্ষণে কথা বললো—'ঘোড়া খচ্চরের নাল লাগাতে শুরু করেছো?'

'আমাকে শুধু পুরোনো নাল টেনে বার করতে দিচ্ছে। নতুন এখনো লাগাতে দেয়নি।'

চিকেন জর্জ বিদ্রূপ করে উঠলো—'শুনেছি এক কামার ঘোড়ার পায়ে উল্টো করে নাল লাগিয়েছিলো। ফলে ঘোড়াটা কেবলই পিছু হটতো! তা, নাল লাগাতে কত করে পয়সা দেয়?'

'অ্যাসকিউ সাহেব লোকেদের কাছ থেকে নাল লাগাবার জন্য চোদ্দ সেন্ট করে নেন শুনেছি।'

'হুঁ, মোরগ লড়াইয়ের মতো পয়সা কিছুতে নেই।'

কিসি তীব্রস্বরে বললো—'কিন্তু সংসারে মোরগ থেকে কামারের চাহিদা অনেক বেশী।' তারপর অত্যন্ত কোমল স্বরে টমকে বললো—'সেখানে তোমায় কী কী কাজ করতে হয়, বল তো সোনা!'

টমের খুশীতে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিলো। ওসব কথাই তো সে সবাইকে বলতে চাইছিলো। সকাল থেকে তার কাজগুলোর ফিরিস্তি দিলো। বহু সাদা মানুষ অ্যাসকিউ সাহেবের ওখানে কামারের কাজ করিয়ে নিতে আসে। মিঃ ইসাইয়া সারাদিন তাই নিয়ে ব্যস্ত—সঙ্গে সঙ্গে টমও। বাইরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো—মর্স সাহেব ওয়াশিংটন থেকে ..লফোরে কলে কথা বলেছেন। তাকে টেলিগ্রাফ না কী যেন বলে! যে সব স্বাধীন নিগ্রো মিঃ ইসাইয়ার কাছে কাজ নিয়ে আসে তারা খবর দিয়েছে—উত্তরে কিছু নামকরা কালো লোক ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে

আর বক্তৃতা দিচ্ছে। ক্রীতদাস থাকা কালে তাদের ওপর যে সব অত্যাচার হয়েছিলো—প্রকাশ্য সভায় তার বিবরণ শুনে শ্রোতারা চোখের জল রাখতে পারেনি। বক্তাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছে। ফ্রেডারিক ডগলাস নামে মেরীল্যাণ্ডের এক ক্রীতদাস বালক নিজে লেখাপড়া শিখে নিজের মুক্তিপণ উপার্জন করে স্বাধীন হয়েছে। এখন তার সভায় নাকি শত শত লোক হয়। সে একটি বই লিখেছে। একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছে। ম্যাটিলডা চিকেন জর্জের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত করলো।

টম দুজন বিখ্যাত ক্রীতদাস মহিলার নামও করলো। তারা পালিয়ে গিয়ে মুক্তি পেয়েছিলো। তারাও ভালো বক্তৃতা দিতে পারে। তাদের মাঝে একজন দক্ষিণে ফিরে এসে গোপনে বহু লোককে নিয়ে গিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে। সাদা মানুষেরা তাকে জীবিত বা মৃত ধরবার জন্য চল্লিশ হাজাব ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

সিস্টার স্যারা অত্যন্ত বিস্মিত হলো—'সাদা মানুষেরা নিগ্রো ধরবার জন্য এত টাকা খরচ করে!'

আরো খবর ছিলো। ক্যালিফরনিয়া নামে অনেক দূরের এক রাজ্যে মাটির নীচে অবিশ্বাস্য পরিমাণ সোনার সন্ধান মিলেছে। হাজার হাজার লোক গাড়ীতে, খচ্চরের পিঠে, পায়ে হেঁটে পর্যন্ত সোনার লোভে সেখানে ভিড় জমিয়েছে।

উত্তরে ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে স্টীফেন ডগলাস ও আব্রাহাম লিঙ্কনের মাঝে তুমুল বিতর্ক চলেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহারের পর চিকেন জর্জ প্রস্তাব করলো সে টমকে নিয়ে হাঁটতে বেরোবে। জর্জের কাছ থেকে এ ধরনের প্রস্তাব নিতান্ত অভাবনীয়। টম বিব্রত ও অপ্রস্তুত বোধ করছিলো। লিটল কিসি ও মেরী তাদের পেছনে লাফাতে লাফাতে আসছিলো। বাবার বকুনী খেয়ে ফিরে গেলো।

'খাবার টেবিলে তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম বলে রাগ করনি তো?'

এই অপ্রত্যাশিত মার্জনা চাইবার ভঙ্গীতে টম হতবাক হয়ে গেলো।

'চল দেখে আসি, লিটল জর্জ এখনো মোরগ দেখাশোনার কাজ শেষ করে উঠতে পারেনি কেন। ক্ষিধের চোটে দু'চারটা মোরগ খেয়েই ফেললো কিনা কে জানে!'

টম হেসে ফেললো—'না, বাবা। লিটল জর্জ কাজে একটু ঢিলা। তাই দেরী

হচ্ছে।' তারপর সাহস করে বলে ফেললো—'কেউ-ই অবশ্য মোরগগুলোকে তোমার মতো করে ভালোবাসে না।'

'না, কেউ নয়। তোমাকে ছাড়া প্রত্যেককে দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি। এরা কেবল চাষ করতে আর খচ্চর খাটাতে জানে। মোরগ লড়াই খুবই উঁচুদরের কাজ। অতটা না হলেও কামারের কাজও পুরুষ মানুষের উপযুক্ত।'

'চাষ করাও নীচু কাজ নয় বাবা। ফসল না ফলালে লোকে খেতো কী? তুমি মোরগ খেলাতে ভালোবাস। আমি কামারের কাজ পছন্দ করি। যার যেমন পছন্দ।'

'আমাদের দু'জনের কাজেই তো পয়সা।'

'তোমার কাজের জন্য তুমি এখনই পয়সা পাচ্ছো। আমার তো তা নয়। এখন কাজ শিখছি। ফিরে এসে মালিকের কাজ করতে হবে। তখন মালিক যদি পারি-শ্রমিক হিসাবে আমাকে কিছু দেন, তবেই আমার পয়সা হবে। মোরগের ছোট খেলাগুলোতে জিতলে মালিক যেমন তোমাকে বাজির টাকার ভাগ দেন—তেমনি যদি আমাকেও দেন।'

'নিশ্চয়ই দেবেন। তোমার মা ও ঠাকুরমা যতটা বলেন, মালিক তত খারাপ লোক নন। শুধু তাঁকে একটু ভালো কথায় তুষ্ট রাখতে হবে। অ্যাসকিউ সাহেব কামারের কাজ করবার জন্য ইসাইয়াকে কত দেন তুমি জানো?'

'বোধ হয় সপ্তাহে এক ডলার করে দেন। তার স্ত্রীর কাছে তো তাই শুনেছি।'

'মোরগ লড়াই থেকে ঢের কম। যাই হোক্, তুমি আগে ফিরে এসো। টাকা পয়সার কথা মালিকের সাথে আমি বলে নেবো।'

তার ছ'টি ছেলের মাঝে চিকেন জর্জের এই ছেলেটির উপর সবচেয়ে ভরসা। এটা ঠিকই—সবুজ স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে, পালক লাগানো কালো টুপি তেরচা করে মাথায় পরবার সম্ভাবনা এরই সবচেয়ে কম। তবুও এর অসাধারণ দায়িত্বজ্ঞান ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। বৈষয়িক ব্যাপারে কথা বলতে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতে টমের চেয়ে উপযুক্ত কেউ নেই। যে বিরাট সমস্যাটি নিয়ে জর্জ উদ্বিগ্ন তাতে টমের সহযোগিতা পেতে তার বড় আগ্রহ হলো।

খানিকক্ষণ নীরবে হেঁটে জর্জ সহসা জিজ্ঞাসা করলো—'নিজে ব্যবসা করবার কথা কখনো ভেবে দেখেছো?'

'তার মানে? সে কী করে সম্ভব, বাবা?'

'পয়সা জমিয়ে নিজের মুক্তিপণ সঞ্চয় করবার ইচ্ছা কখনো হয় না?'

টম হতবুদ্ধি হয়ে গেলো।

'কয়েক বৎসর আগে আমি আর তোমার মা হিসাব করে দেখেছিলাম—আমাদের পুরো পরিবারটার মুক্তিপণ ছ'হাজার আটশো ডলারের মতো হবে। ওভাবে মাথা নেড়ো না। অসম্ভব মনে হচ্ছে? প্রচুর টাকা ঠিকই। কিন্তু আমার খেলায় জেতার টাকা থেকে তোমার মা হাজার ডলার জমিয়েছেন। পেছনের উঠোনে পোঁতা আছে। কেউ জানে না। ভবিষ্যতেও যদি গত কয়েক মরশুমের মতো জিততে পারি তবে তোমার শেখা শেষ হ'বার আগে আরো তিন চারশো ডলার জমবে।'

ততক্ষণে টমের ভেতরেও সেই অকল্পনীয় সম্ভাবনার উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে।

'হ্যাঁ, বাবা। আমরা দু'জনে মিলে পারবো। আরো আগে কেন এ কথা আমাকে বলনি?'

জর্জের মুখে হাসি ফুটলো—'হ্যাঁ জানি। আমরা দু'জনে মিলে নিশ্চয় পারবো। তাহলে আমাদের পরিবারটার বলবার মতো একটা কিছু হবে। আমরা উত্তরে চলে যাবো। সেখানে স্বাধীন জীবন যাপন করবো। আমাদের সন্তান, আমাদের নাতি-নাতনী মানুষের মতো করে বাঁচবে। কী বল?'

সাতাত্তর

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নর্থ ক্যারলিনার মোরগ লড়াইয়েদের মাঝে বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। ধনী জুয়েট সাহেবের বাড়ীতে তাঁরই মতো ধনী ইংল্যাণ্ডের মোরগ লড়াইয়ে স্যর সি এরিক রাসেল অতিথি হয়ে আসছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট মোরগের সাথে ইংল্যাণ্ডের মোরগ লড়াই করাবার জন্য মিঃ জুয়েট তাঁকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পরের বহুদিনের বন্ধু। তাই ব্যক্তিগত ভাবে একে অপরের সাথে লড়বেন না। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকে কুড়িটা করে মোরগ দেবেন। যৌথভাবে এঁদের চল্লিশটি মোরগের সাথে অন্যদের চল্লিশটি মোরগের প্রতিযোগিতা হবে। বাজির পরিমাণ প্রচুর। স্থানীয় মোরগ মালিকদের মাঝে যথেষ্ট ধনী এক ব্যক্তি এ পক্ষের ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছিলেন। তিনি নিজে পাঁচটি মোরগ দেবেন। আরো সাতজনের কাছ থেকে পাঁচটি করে মোরগ নেবেন।

এঁদের প্রত্যেককে ১,৮৭৫ ডলারের বণ্ড কিনতে হবে। বাজির জন্য আটজনের সম্মিলিত ভাবে পনেরো হাজার ডলারের সংস্থান রাখতে হবে।

বলা বাহুল্য লী সাহেব এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চিকেন জর্জের তাই নিয়ে উত্তেজনা ও গর্বের শেষ ছিলো না। ক্রীতদাস বসতির সবার কাছে গল্প করে বেড়াচ্ছিলো--'মালিক বলেছেন এত বেশী টাকার খেলা তাঁর জীবনে এই দ্বিতীয়বার হচ্ছে। কুড়ি বছর আগে একবার টেনেসি রাজ্যের ন্যাশভিলের নিকোলাস হ্যারিংটন সাহেবের কথা শোনা গিয়েছিলো! তিনি এগারোখানা গাড়ী করে বাইশজন লোক আর তিনশো মোরগ নিয়ে বহু রাজ্য পার হয়ে—দস্যুর দল, ইণ্ডিয়ানেরা—সব কিছু ছাড়িয়ে সুদূর মেক্সিকো দেশে গিয়েছিলেন। সেখানকার প্রেসিডেণ্ট জেনারেল স্যাণ্টা আনার তিনশো মোরগের সাথে তাদের খেলা হয়। জেনারেল স্যাণ্টা আনার অতুলনীয় ধনসম্পত্তি ছিলো। দু'পক্ষের মোরগ লড়াই শেষ হতেই এক সপ্তাহ সময় লেগেছিলো। বাজির পরিমাণ ছিলো সিন্দুক বোঝাই টাকা। টেনেসি রাজ্যের সাহেব পাঁচ লক্ষ ডলার জিতেছিলেন। টোনি নামে তাঁর মোরগ দেখাশোনার নিগ্রোটি পঙ্গু ছিলো। তাই তাঁর মোরগগুলোর নামই হয়ে গিয়েছিলো 'পঙ্গু টোনির মোরগ'। সে মোরগের অসম্ভব দাম। মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট পঙ্গু টোনির একটি মোরগ কিনেছিলেন মোরগটির দেহের ওজনের সোনা দিয়ে।'

সেবারের মোরগ লড়াই নিয়ে লী সাহেব ও চিকেন জর্জ দু'জনেরই প্রচণ্ড গৃহবিবাদ বেধেছিলো। মিস ম্যালিসি খবর এনেছিলো—লী সাহেব ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ হাজার ডলার তুলে নিয়েছেন বলে মেমসাহেব ভয়ানক চ্যাঁচামেচি করছিলেন। বলেছিলেন—তাঁদের সারাজীবনের সঞ্চয়ের অর্ধেকই মালিক বাজিতে লাগাচ্ছেন তাঁর থেকে হাজার গুণ ধনীদের সাথে পাল্লা দিতে। ম্যাটিলডা এবং তার বাইশ বছরের ছেলে টম নীরবে শুনে যাচ্ছিলো। ম্যাটিলডা ইতিমধ্যেই টমকে গোপনে জানিয়েছিলো—জর্জ তাদের যথাসর্বস্ব সঞ্চয় দু'হাজার ডলার জোর করে নিয়ে গিয়েছে। লী সাহেবকে সে ঐ টাকা বাজি ধরবার জন্য ধার দেবে। টম চার বছর আগে তার শিক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরে এসেছিলো। লী সাহেবের জমজমাট কামারের ব্যবসা সে চালাচ্ছিলো। ম্যাটিলডা ও জর্জ কেবলমাত্র তার সাথেই যাবতীয় সমস্যার আলোচনা করতো। ম্যাটিলডা টাকাটার জন্য জর্জের উপর অনেক রাগ করেছে, কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু জর্জ সম্পূর্ণ বুদ্ধিভ্রংশের মতো ব্যবহার করছিলো। সেও চেঁচামেচি কম করেনি—'আমি ডিম ফোটা অবস্থা থেকে এই

মোরগগুলোকে নিজের হাতে বড় করেছি। আমার চেয়ে ভালো এদের কে জানে! এত সহজে টাকা উপার্জন করবার এমন সুযোগ আর পাবো না। দু'মিনিটে যা টাকা আসবে, সাধারণ অবস্থায় আট বছরেও তা আসবে না।'

ম্যাটিলডা অনেক বুঝিয়েছে—'আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে জুয়া খেলবার অধিকার তোমার নেই।'

কিন্তু জর্জের এক কথা—'এ টাকা মারা যেতে পারেই না।'

লড়াইয়ের আগের দিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতে জর্জ সেসব কথাই ভাবছিলো। ম্যাটিলডা সত্যি খুব ভালো স্ত্রী। তার সাথে রাগারাগি করতে জর্জের মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু জীবনে একটা সময় আসে যখন অতি গুরুত্বপূর্ণ কঠিন সিদ্ধান্তগুলি পরিবারের কর্তাকে একাই গ্রহণ করতে হয়। ম্যাটিলডা ভুলে গিয়েছে—টাকা জমিয়ে মুক্তিপণ সংগ্রহ করবার পরিকল্পনাটা জর্জেরই। স্বাধীনতার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা কারো চেয়ে কম নয়। লড়াইয়ে জিতে অসীম ধৈর্যে একটু একটু করে টাকা সঞ্চয় করতে তার ভূমিকাই তো প্রধান। আজকের এই সুযোগ দৈব প্রেরিত। কিছুদিন আগে মালিক বলেছিলেন—আরো টাকা থাকলে বাজি ধরবার সুবিধা হতো। লোকের চোখে লী সাহেবের কদরও বাড়তো। জর্জ দুহাজার ডলার ধার দিতে পারে শুনে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটু ধাতস্থ হয়ে জর্জের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—তার টাকা থেকে যে টাকাটা তিনি বাজিতে জিতবেন প্রতিটি সেণ্ট পর্যন্ত জর্জকেই দিয়ে দেবেন। 'এ টাকা ডবল হয়ে যাওয়া উচিত।' একটু দ্বিধার সুরে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'চার হাজার ডলার দিয়ে তুমি কী করবে, জর্জ?'

সেই মুহূর্তে জর্জ আরো বড় জুয়াখেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।—'মালিক, ভুল বুঝবেন না। আপনার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার সীমা নেই। তবুও আমি আর ম্যাটিলডা ভাবছিলাম টাকা জমিয়ে যদি আমাদের পরিবারের মুক্তিপণের ব্যবস্থা করতে পারতাম, তবে বাকী জীবনটা স্বাধীন ভাবে কাটাতাম।'

মালিকের হতচকিত ভাব দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে সে কুণ্ঠিত ভাবে আবার বলেছিলো—'মালিক, দয়া করে আমাদের ভুল বুঝবেন না।'

তারপরের ঘটনা জর্জের জীবনের একটি অতি মূল্যবান ও মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা। লী সাহেব বলেছিলেন—'কী ভেবে এবারের খেলাতে যোগ দিয়েছি জানো? তুমি বোধহয় ভাবতে পারবে না—আমার আটাত্তর বছর বয়স হয়েছে। এটা হয়তো আমার জীবনের শেষ খেলা। পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতি মরশুমে মোরগ তৈরী

করা, খেলা নিয়ে দুশ্চিন্তা, ছুটোছুটি আর ভালো লাগে না। আশা করছি এবারের জেতা টাকাতে নতুন একটা বাড়ী তৈরী করতে পারবো। একসময় যত বড় বাড়ীর কথা ভাবতাম—তত বড় হবে না। তা না হোক্। পাঁচ ছ'খানা ঘর হলেই যথেষ্ট। ব্যাঙ্কে যা টাকা বাকী থাকবে তার সুদে জীবন কেটে যাবে। এত নিগ্রো, জমি, ফসল কিছুই আমার চাই না। শুধু স্যারা ও ম্যালিসিই রান্না ও বাড়ীর যাবতীয় কাজ করে দিতে পারবে। জর্জ, তুমি এতকাল আমার যে সেবা করেছো তাতে আমি সন্তুষ্ট। তুমি কখনো কোন ব্যাপারে আমাকে জ্বালাতন করনি। এ খেলাটাতে আমরা দু'জনেই বাজি জিতে টাকা দ্বিগুণ করতে পারবো আশা করছি। তাহলে তোমার সেই দুই হাজার ডলার তুমি আমাকে দিয়ো। তাতেই যথেষ্ট হবে। আমি খুশী মনে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবো।'

সহসা চিকেন জর্জের দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরে গিয়েছিলো। সে ভাবের আতিশয্যে লী সাহেবকে জড়িয়ে ধরতে গেলে তিনি অপ্রস্তুত ভাবে সরে গিয়েছিলেন।

'মালিক, আপনি জানেন না, কী ভরসা দিলেন। স্বাধীনতার জন্য আমরা ব্যাকুল হয়ে আছি।'

এবার লী সাহেবের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠলো—'তোমরা নিগ্রোরা স্বাধীনতার জন্য এত ব্যস্ত কেন বুঝে উঠতে পারি না। দেখাশোনার জন্য মাথার ওপর কেউ না থাকলে তোমাদের চলবে কী করে তা জানি না। তাছাড়া তোমাদের সবাইকে একসাথে ছেড়ে দিলে আমার স্ত্রী ভয়ানক চটে যাবেন, সে এখনই বুঝতে পারছি। ঐ কামার ছোকরা টম থেকে আমার বেশ ভালোই আয় হচ্ছে। ওর একার দামই তো আড়াই হাজার হবে। যাই হোক, একবার বলে যখন ফেলেছি—কী আর করা যাবে।'

এটা বড় খেলার কয়েক সপ্তাহ আগেকার ঘটনা। জর্জ কাউকে এ সব কথা জানায়নি। ম্যাটিলডা বা কিসিকে তো নয়ই। তার একান্ত নির্ভরের পাত্র টমকেও নয়। এটা তাদের পক্ষে একটা চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হবে। এই পরম মূল্যবান তথ্যটি বুকের ভেতর গোপন রেখে চিকেন জর্জ তার দেহমনের সর্বাংশ দিয়ে অপরিসীম সতর্কতার সাথে শতভাগ ত্রুটিহীন আটটি মোরগ তৈরী করেছে।

অতি প্রত্যূষে রঙ্গভূমিতে পৌঁছোবার পথে দেখতে পেলো খেলার কেন্দ্রস্থল ছাপিয়ে আশেপাশের পশুচারণ ভূমিগুলি পর্যন্ত জনরাশিতে পরিপূর্ণ। তবুও অগণিত গাড়ী, ঘোড়া, খচ্চর আসবার বিরাম নেই। পরিচিত, অপরিচিত অগণিত কালো

ও সাদা মানুষ। সুদূর ফ্লোরিডা থেকে পর্যন্ত নাকি লোক বহুদিনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে।

তিন জন বিচারক এসে পৌঁছোতে দর্শকদের উত্তেজনা ও চিৎকার বেড়ে গেলো। বিচারকেরা রঙ্গমঞ্চের মাপজোখ শুরু করলেন। বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে একে এসে পৌঁছোলে দর্শকদের মাঝে হর্ষধ্বনি উঠছিলো। জুয়েট সাহেব ও তাঁর ইংরাজ বন্ধু একই গাড়ীতে এসে পৌঁছোলে সেই হর্ষধ্বনি তুমুল হয়ে উঠলো। তাঁদের গাড়ীর পেছনে ছ'খানা গাড়ী করে দু'জন সাদা পরিচারক মোরগগুলোকে নিয়ে এলো। এদের একজন সমুদ্রপারের দেশ থেকে ধনী ইংরাজ সাহেবের সাথে এসেছিলো। স্যর এরিক রাসেল দর্শকদের কৌতূহলের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালেন।

চিকেন জর্জ তার মোরগগুলোর পা ও ডানা দলাই মলাই করবার কাজে লেগে গিয়েছিলো। তার অভিজ্ঞ কান কেবলমাত্র আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছিলো চারিদিকে কখন কী ঘটছে। কয়েকটা খেলার পর টম লী সাহেবের নাম ঘোষিত হতেই জর্জের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। মালিকের দিকে তাকিয়ে সে নতুন করে বিস্ময় বোধ করলো। সাঁইত্রিশ বছর ধরে সে দেখে আসছে চরমমুহূর্তে লী সাহেবের মনে যেন কোথা থেকে একটা নির্লিপ্ত প্রশান্তি আসে। চারিদিকের উত্তেজনা বা ফলাফলের আশঙ্কা তাঁকে স্পর্শও করে না। মালিক প্রথম মোরগটি নিয়ে এগিয়ে গেলেন, জর্জ তাঁর পেছনে আহত মোরগের জরুরী ওষুধপত্রের বাস্কেট হাতে চললো। চারিদিকে 'টম লী!' রব। মাঝে মাঝে 'ঐ যে চিকেন জর্জ নিগ্রো!' শোনা যাচ্ছিলো। জনতার দৃষ্টি যেন করস্পর্শের মতো জর্জের গায়ে এসে ঠেকছিলো। কিন্তু সেও তার মালিকের মতই কোনদিকে না তাকিয়ে অবিচলিত চিত্তে চলবার চেষ্টা করছিলো। লী সাহেবের অনুরাগীবৃন্দ তাঁরই মতো গরীব সাদা সানুষ। তাদের ভেতর থেকেই লী সাহেব তাঁর মোরগ লড়াইয়ের দৌলতে এত উপরে উঠে এসেছিলেন। তারা প্রায় সবাই অতিরিক্তি মদ্যপান করে ভয়ানক হট্টগোল শুরু করে দিলো—'ট-অ-অ-ম লী! ঐ ইংরাজটাকে খতম কর।—ওঁর লাল কোট কোথায় গেলো? ওরা কি শেয়ালের লড়াইও করান? হাঁটছেন দেখ কোলা ব্যাঙের মতো।— না না। আমার তো বুল ডগের মতো মনে হচ্ছে।'

মোটা, বেঁটে লালচে মুখ ইংরাজ ভদ্রলোকের মুখ রাগে আরো লাল হয়ে গিয়েছিলো। রেফারী হাত তুলে হট্টগোল থামাবার চেষ্টা করলো। জুয়েট সাহেব মহারোষে রেফারীর সামনে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর 'ট-অ-অ-ম-লী' — —'ট-অ-অ-ম-লী-ই' চিৎকারে চাপা পড়ে গেলো। এবার বিচারকেরা এগিয়ে

এসে হাত তুলে, ঘুষি পাকিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন—'সবাই চুপ না করলে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে।' এতে কাজ হলো। ক্রমশঃ গোলমাল শান্ত হয়ে এলো। লী সাহেব নিজে এ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বিব্রত ও কুণ্ঠিত বোধ করছিলেন। ইংরাজ সাহেব ও মিঃ জুয়েট ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলছিলেন। এর প্রতিশোধ তাঁরা নেবেন! স্যর রাসেল তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—'মিঃ লী আপনার এত চমৎকার মোরগ। সাধারণ বাজির ওপর আমার সাথে আলাদা করে একটা বিশেষ বাজি ধরবেন কি?' প্রতিশোধের সঙ্কল্পেই যে তাঁর এই প্রস্তাব—বুঝতে কারো কষ্ট ছিলো না। এই বাজির হারা জেতায় আগাধ সম্পত্তির মালিক স্যর রাসেলের অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটবে না। কিন্তু লী সাহেবের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে লী সাহেব বললেন—'ঠিক আছে। আপনি কত বলছেন?'

'দশ হাজার পাউণ্ড হলে চলবে?' চারিদিকে শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতার মাঝে তিনি বিদ্রূপের স্বরে আবার বললেন—'মিঃ লী, নিজের মোরগের ওপর আপনার যথেষ্ট ভরসা আছে তো?' তাঁর ক্ষীণ হাসিতে প্রচণ্ড দ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছিলো।

উপস্থিত জনতার মাঝে মৃত্যুর নীরবতা। যারা বসেছিলো উৎকণ্ঠার বশে উঠে দাঁড়িয়েছে। চিকেন জর্জের হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বহু দূর থেকে মিস ম্যালিসির কথাগুলো তার কানে ভেসে আসছিলো—পাঁচ হাজার ডলার ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন বলে মেমসাহেব রাগ করে বলছিলেন—সারা জীবনের সঞ্চয়ের অর্ধেক চলে গেলো। আর দশ হাজারের বাজি তো সাহেবের পক্ষে ধরা সম্ভবই নয়। তাহলে চারিদিকে এত অনুরাগী, এত পরিচিত জনের মাঝে তিনি নিজের সম্মান রক্ষা করবেন কী ভাবে? মালিকের মর্মযাতনা নিজ অন্তরে অনুভব করে সে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলো না। যেন অনন্তকাল পরে উত্তর শোনা গেলো। কিন্তু জর্জ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

'স্যর, বাজিটা ডবল করে কুড়ি হাজার ধরবেন কি?'

সমগ্র জনরাশি অবিশ্বাস্য উদ্বেগে আন্দোলিত হয়ে উঠলো। জর্জ প্রচণ্ড আতঙ্কে হিম হয়ে গেলো। হিসাব কা দেখলো—বাড়ী, জমি, ক্রীতদাসেরা এমন কি জর্জের নিজস্ব টাকা সব মিলিয়েও লী সাহেবের কুড়ি হাজার হওয়া মুস্কিল। ইংরাজ ভদ্রলোকটির চোয়ালের রেখা কঠিন হয়ে উঠলো। তিনি হাত বাড়িয়ে মালিকের করমর্দন করে বললেন—'এই তো খেলোয়াড়ের মতো কথা!'

সহসা চিকেন জর্জের উপলব্ধি হলো—'লী সাহেব জানেন তাঁর এ মোরগ হারতেই পারে না। এই একটিমাত্র খেলাতে মালিক শুধু প্রভূত অর্থের অধিকারী হবেন না, চিরদিনের মতো গরীব সাদা মানুষদের মাঝে কিংবদন্তীর পুরুষ হয়ে উঠবেন। ধনী, নীলরক্তের অধিকারীদের পরাজিত করবার সুউচ্চ স্পর্ধার তিনি প্রতীক হয়ে থাকবেন। ভবিষ্যতে তাঁকে অবহেলার চোখে দেখবার সাধ্য কারো হবে না।

লী সাহেব ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খেলায় অবতীর্ণ হলেন। জর্জ একবার ম্যাটিলডার ক্রুদ্ধ আক্ষেপ শুনতে পেলো—'তুমি মালিক থেকেও বিবেচনাহীন। মালিক হেরে গেলে গরীব সাদা মানুষদের মাঝে তাঁর আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন। তুমি সারা পরিবারের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো।'

তিনজন বিচারক এগিয়ে এসে ক্রীড়াস্থল ঘিরে দাঁড়ালেন। প্রবল উৎকণ্ঠায় রেফারী স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলো না। মোরগ লড়াইয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনার সম্ভাবনায় পরিবেশ বিদ্যুতগর্ভ হয়ে উঠলো।

ইংরাজের রূপোলী মোরগ আর লী সাহেবের গাঢ় বাদামী মোরগ প্রচণ্ড বেগে পরস্পরকে আক্রমণ করছিলো। উভয়েই প্রতিপক্ষকে কয়েকবার কাঁটা ফুটিয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা অমিত তেজের সাথে লড়ে যাচ্ছিলো। এমন ক্ষিপ্র গতি, আক্রমণের প্রচণ্ডতা আর অদম্য বিক্রম জর্জ আগে কখনো দেখেনি। ইংরাজের মোরগটা মালিকের মোরগকে কাঁটা ফুটিয়ে, ডানার ঝাপট মেরে ক্রমশঃই ঘায়েল করে ফেলছিলো। কিন্তু সহসা অবিশ্বাস্য চতুরতায় গাঢ় বাদামী মোরগটি আকাশে উঠে ওপর থেকে তীরবেগে প্রতিপক্ষের হৃদয়ে কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে নীচে নেমে এলো। প্রাণহীন রূপোলী মোরগটি একটা জড় বস্তুর মতো সোজা মাটিতে পড়ে গেলো—যেন এক রাশি পালকের বোঝা। ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো।

ব্যাপারটা এমন বিদ্যুতগতিতে ঘটে গেলো যে লোকের বুঝে উঠতে এক লহমা দেরী হলো। তারপরেই বিরাট বিস্ফোরণ। দর্শকেরা উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হয়ে লাফাতে লাগলো। 'টম! টম! টম জিতেছে!' ধ্বনিতে গগন বিদারিত হচ্ছিলো। লোকেরা ছুটে এসে চারিদিক থেকে লী সাহেবকে ঘিরে ধরেছিলো। কেউ তাঁর পিঠ চাপড়াচ্ছিলো, কেউ বা হাত ঝাঁকাচ্ছিলো। চিকেন জর্জ তখন সকল অনুভূতির উর্ধ্বে। তার মনে কেবল একটি চিন্তাই আবর্তিত হচ্ছিলো—আমরা তাহলে স্বাধীন হচ্ছি। এই অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য সংবাদ সে তার পরিবারের লোকেদের জানাবে কী করে! একবার ইংরাজ ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে

দেখলো। চোয়ালের কঠিন ভঙ্গীতে এবার তাঁকে সত্যি বুলডগের মতো দেখাচ্ছিলো।

'মিঃ লী!' এক ডাকে চারিদিকের কোলাহল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো। ইংরাজ ভদ্রলোকটি মালিকের কাছে এগিয়ে এলেন।

'আপনার মোরগটি চমৎকার লড়াই করেছে। দুটোই সমান দক্ষ ছিলো। যে কোনটা জিততে পারতো। আসুন আমরা আর একবার দ্বিগুণ বাজিতে খেলি।'

লী সাহেবের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। এত বড় রঙ্গভূমিতে মোরগের ডাক ছাড়া দ্বিতীয় কোন শব্দ ছিলো না। সকলের দৃষ্টি লী সাহেবের ওপর। তাঁকে কিছুটা বিমূঢ় ও অনিশ্চিত দেখাচ্ছিলো। মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি চিকেন জর্জের ওপরে পড়লো। সে তখন আহত মোরগটির পরিচর্যায় ব্যস্ত। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সে বিস্মিত হলো। গভীর প্রত্যয়ের স্বরে সে বললো—'মালিক, আপনার মোরগকে হারায়, দুনিয়াতে কারো সাধ্য নেই।' অগণিত মানুষের দৃষ্টি অপার বিস্ময়ে তার দিকে ঘুরে গেলো।

'শুনেছি, মোরগগুলোকে লড়াই শেখানোতে আপনার এই নিগ্রোটির তুলনা নেই। তবে ওর কথায় বেশী নির্ভর করবেন না। আমারও বহু ভালো ভালো মোরগ আছে।'

স্যার এরিক রাসেলের কথায় মনে হচ্ছিলো আগের খেলাতে পরাজয় তাঁর কাছে মারবেল খেলায় হারজিতের মতই গুরুত্বহীন। লী সাহেবকে যেন তিনি বিদ্রূপ করছিলেন।

'হ্যাঁ স্যার। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী। বাজি দ্বিগুণ করা হোক্।'

কিন্তু খেলার শুরুতে প্রথম সংঘর্ষেই ইংল্যাণ্ডের মোরগের কাঁটাটি কী করে তার শত্রুর দেহে মারাত্মক ভাবে বিঁধে গেলো। মুহূর্তে সেটি অবসন্ন হয়ে হেলে পড়লো। উন্মুক্ত মুখ দিয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে এলো। চিকেন জর্জ চিৎকার করে মঞ্চে লাফিয়ে পড়ে মৃতপ্রায় মোরগটিকে বুকে তুলে নিলো। জর্জের কোলে দুর্বল ভাবে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মোরগটির মৃত্যু হলো। জর্জ শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

আবাদের মালিক ধনী সাদা মানুষের' সহর্ষে ইংরাজ সাহেব ও মিঃ জুয়েটকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। চরম দুর্ভাগ্যাহত লী সাহেব একাকী জলভরা চোখে ক্রীড়মঞ্চের রক্তচিহ্নটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

স্যর সি এরিক রাসেল এগিয়ে এলেন—'অত টাকা পকেটে নিয়ে তো কেউ

ঘোরে না। কাল বাড়ী বসে বরঞ্চ বাজির ব্যাপারটা ঠিক করে নেওয়া যাবে। বিকেলে চায়ের পর মিঃ জুয়েটের বাড়ীতে আসবেন।'

সেদিন বাড়ী ফিরতে দু'ঘণ্টা লেগেছিলো। দীর্ঘ সে পথ যেন আর ফুরোয় না। পথে মালিক বা চিকেন জর্জ একটি কথাও বলেনি।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা জুয়েট সাহেবের বাড়ী থেকে ফিরে মালিক জর্জের কাছে এলেন। জর্জ মোরগগুলোর জন্য খাবার তৈরী করছিলো। আগের দিন রাত্রে ম্যাটিলডার কান্না আর চিৎকারের জ্বালায় জর্জ ঘর ছেড়ে মোরগদের এলাকাতেই আশ্রয় নিয়েছিলো।

মালিক যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অনেক ইতস্ততঃ করে একটু কুণ্ঠার সাথে বললেন—'জর্জ, তোমাকে কী বলবো বুঝতে পারছি না। আমার তো সামান্য কয়েক হাজার টাকা, এই বাড়ী, জমি আর তোমরা ক'জন নিগ্রো ছাড়া কিছুই নেই।'

জর্জ মনে ভাবলো এ নিশ্চয়ই আমাদের বিক্রী করে দেবার ভূমিকা।

'মুস্কিল হচ্ছে তাতেও ঐ হতভাগার কাছে আমার দেনার অর্ধেকও শোধ হবে না। ও ব্যাটা আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছে।' আবার তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। 'তোমার সম্বন্ধে সেদিন কী বলেছিলো শুনেছিলে তো? আজও বলছিলো—মোরগ দু'টোকে তুমি বড় চমৎকার তৈরী করেছিলে।'

মালিক গভীর প্রশ্বাস নিয়ে স্তব্ধ হলেন। জর্জের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো।

'কিছুদিন আগে তার মোরগ পরিচর্যা করবার একটি লোককে সে হারিয়েছে। তার বড় শখ সে জায়গায় এখান থেকে একটি নিগ্রো পরিচারক নিয়ে যায়।'

জর্জের চোখে চরম অবিশ্বাসের দৃষ্টি লী সাহেব সহ্য করতে পারছিলেন না। দ্রুত কথা শেষ করলেন। আমার নগদ টাকা যা আছে—সব সে নেবে। বাড়ীটি তার কাছে বন্ধক রাখতে হবে। আর তৃতীয় শর্ত হচ্ছে তার মোরগগুলোকে শেখাবার জন্য তোমাকে তার সাথে ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে। বলেছে—তোমার বছর দুই থাকলেই চলবে।'

মালিক এবার জোর করে তার দিকে তাকালেন। 'জর্জ, আমার ভয়ানক খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। নইলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

জর্জের কথা বলার সাধ্য ছিলো না। তাছাড়া সে বলবেই বা কী? সে তো মালিকের ক্রীতদাস মাত্র। 'আমি জানি, তোমার সারা জীবনের সঞ্চয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই আজ তোমার সামনে শপথ করছি, তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের

আমি দেখবো। আর যেদিন তুমি বাড়ী ফিরে আসবে—' লী সাহেব এবার তার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। ভাঁজ খুলে জর্জের সামনে রাখলেন। 'এটা কী জান? কাল রাতে বসে এটা লিখেছি। এটা তোমাদের মুক্তিপত্র। এটা আমার সিন্দুকে তোলা থাকবে। যেদিন তুমি ফিরে আসবে, তোমাকে দিয়ে দেবো!'

কিন্তু ঐ চৌকো সাদা কাগজের দুর্বোধ্য লেখাগুলোর দিকে তাকিয়েও জর্জের প্রচণ্ড ক্রোধের উপশম হলো না। ধীর কণ্ঠে বললো—'মালিক, আমি সকলের মুক্তির জন্যই চেষ্টা করছিলাম। আজ আমার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আমাকে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বহু দূরদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ওদের আপনি দয়া করে এখনই মুক্তি দিন। আমার মুক্তি না হয় আমি ফিরে এলে হবে।'

এবার লী সাহেব রুষ্ট হয়ে ওঠেন। চোখ কুঁচকে বলেছিলেন—'আমাকে কাজ শেখাতে এসো না! তোমার টাকা নষ্ট হয়েছে, সে কি আমার দোষে? তোমার জন্য অতিরিক্ত ভাবছি বলে মাথায় চড়েছো। নিগ্রোদের নিয়ে এই মুস্কিল। যতই কর, কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবে।' মালিকের মুখ রোষে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

'সারাজীবন এখানেই মানুষ হয়েছো বলে তোমার জন্য এত করি। নইলে কবেই তোমাকে বিক্রী করে দিতাম।'

জর্জ তাঁর দিকে বিষণ্ন নয়নে তাকিয়ে মাথা নাড়লো—'আপনার কাছে আমার সারাজীবনের কী মূল্য আছে, মালিক? যদি তা থাকতো, আজ আমার জীবন ব্যর্থ করে দিতেন না।'

মালিকের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো—'যাও, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। শনিবার তোমাকে ইংল্যাণ্ডে রওয়ানা হতে হবে।'

আটাত্তর

চিকেন জর্জের সাথে সাথে সৌভাগ্যলক্ষ্মী লী সাহেবকে ছেড়ে গেলেন। সম্ভবত তাঁর আত্মবিশ্বাসও ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো। ক্রমেই তাঁর অবস্থা অবনতির পথে চললো। প্রথমে লিটল জর্জকে মোরগগুলো দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন।

তিনদিনের দিন দেখা গেলো মোরগগুলোর জলের পাত্র শুকনো পড়ে আছে। লিটল জর্জের কাজের ঢিলেমি আর সংশোধন হয়নি। মালিক তাকে ভয়ঙ্কর শাসন করলেন—কিন্তু মোরগের কাজে আর তাকে দেননি। সর্বকনিষ্ঠ লুইসের তখন উনিশ বছর বয়স। তাকে ক্ষেতের কাজ থেকে ছাড়িয়ে মোরগ দেখাশোনার কাজে পাঠানো হলো। তাকেই সাথে নিয়ে চিকেন জর্জের শিখিয়ে রাখা মোরগগুলোকে নিয়ে স্থানীয় প্রতিযোগতাগুলোতে যেতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ খেলাতেই তাঁর হার হতো। লুইস শুনেছিলো মালিকের বাজি ধরবার টাকাও ছিলো না। লোকের কাছে ধার নিতেন। শীঘ্রই সবাই তাঁর সঙ্গ পরিহার করতে লাগলো। মদ্যপান, স্ত্রীর সাথে বিবাদও ক্রমশঃই বাড়ছিলো। গৃহে শান্তি ছিলো না। ক্রীতদাস বসতির সকলের মনে একটা আসন্ন বিপদের ছায়া পড়েছিলো। গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় তাদের দিন কাটছিলো।

চিকেন জর্জের অনুপস্থিতিতে টমই ম্যাটিলডার ভরসাস্থল হয়ে উঠেছিলো। টম তার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পভাষী ছিলো। লী সাহেবের আবাদে একই সাথে মানুষ হ'বার সুযোগ পেয়েও ভাইবোনদের সাথে টমের কখনোই ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে কামারের কাজ শিখবার জন্য বহুদিন সে বাইরে কাটিয়েছিলো। আবার ফিরে এসেও সে কখনো ক্ষেতের কাজ করেনি। নতুন তৈরী কামারশালাতেই তাকে বেশী সময় কাটাতে হতো। তার অন্য সব ভাই-বোনেরাই ক্ষেতের কর্মী। ভার্জিলের বয়স ছাব্বিশ। সে পাশের আবাদের লিলি স্যুকে বিয়ে করেছিলো। অবসর সময়টা তার সেখানেই স্ত্রী ও নবজাত পুত্রটিকে নিয়ে কাটতো। শিশুটির নাম ইউরিয়া। পঁচিশ বছরের অ্যাশফোর্ডের সাথে টমের চিরকালের বিবাদ। তাছাড়া একটা বিশেষ কারণে ইদানীং অ্যাশফোর্ডের মেজাজ সপ্তমে চড়া ছিলো। তার পছন্দ করা মেয়েটির মালিক অ্যাশফোর্ডের সাথে তার বিয়ে দিতে রাজী নন। চব্বিশ বছরের লিটল জর্জ কাছাকাছি এক আবাদের পাচিকার সাথে প্রেম চালাচ্ছিলো।

টম কর্মকারের কাজে অতিশয় দক্ষ ছিলো। তার হাতের কাজের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়ছিলো। ফলে খরিদ্দারের সংখ্যাও বাড়ছিলো। এরা লী সাহেবকে তাদের ফরমাইশি কাজের দাম দিতো। মালিক প্রতি রবিবার টমকে দু'ডলার পারিশ্রমিক দিতেন। টম কারো সাথে বিশেষ কথাবার্তা বলতো না। কিন্তু নিজের মনে তার চিন্তার অন্ত ছিলো না। বাবার কাছে শোনা উত্তর দেশের কথা সে কখনো ভোলেনি। গত দুবৎসর যাবৎ তার রাতদিনের চিন্তাই ছিলো তাই।

স্বাধীনতার জন্য অনির্দিষ্টভাবে আর কতকাল অপেক্ষা করবে? ক্রীতদাস বসতির সকলের একসাথে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা সেটাও সে ভাবতো। কিন্তু ঠাকুরমা কিসির ষাটের ওপর বয়স। সিস্টার স্যারা ও মিস ম্যালিসির সত্তরের ওপর। যাদের সবার আগে মুক্তি পাওয়া উচিত তাদের পক্ষেই সেই বিপজ্জনক অনিশ্চিত যাত্রার কঠোরতা সহ্য করা সবচেয়ে কঠিন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে মালিকের কাছে একজন সাদা মানুষ এসেছিলো। মালিক কিছুদিন আগে অর্ধেক মোরগ বিক্রী করে দিয়েছিলেন। মিস ম্যালিসি প্রথমে ভেবেছিলো এও বোধহয় তেমনি কোন প্রয়োজনে এসেছে। কিন্তু লোকটির প্রতি সম্বর্ধনার আধিক্য দেখে তার সন্দেহ হলো। লিটল জর্জকে মালিক আদেশ দিলেন আগন্তুকের ঘোড়াটিকে দানাপানি দিয়ে রাতের মতো আস্তাবলে তুলে দিতে। নিজে সাদর অভ্যর্থনা করে লোকটিকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

ক্রীতদাস বসতির সদস্যরা শঙ্কিত হয়ে উঠলো। লোকটি কে? কেন এসেছে? মালিক তাকে এত খাতির করছেন কেন? মিস ম্যালিসির কাছে নতুন কিছু খবর পাওয়া গেলো না—'হয়তো মেমসাহেব সামনে ছিলেন বলে ওরা খাবার টেবিলে বিশেষ কোন আলোচনা করেননি। আমার কিন্তু লোকটার চেহারা, ভাবভঙ্গী একেবারেই ভালো লাগছে না। লোকটা সৎ নয়। কিছু একটা গোপন করতে চাইছে।'

ম্যাটিলডা সকালবেলা টমকে একান্তে ডেকে বললো—'টম, সবাই ভয় পেয়ে যাবে বলে একটা কথা কাল সকলের সামনে বলিনি। মিস ম্যালিসি বলছে সাহেবের বাড়ীর বন্ধকীর টাকা দু'কিস্তি বাকী পড়েছে, অথচ তাঁর হাতে এক পয়সাও নেই। ঐ সাদা মানুষটা মনে হচ্ছে নিগ্রো কিনতে এসেছে।'

টম সহজভাবে উত্তর দিলো—'আমারও তাই মনে হচ্ছে, মা। তবে আমি ভাবছি তাতে খারাপ নাও হতে পারে। অন্য মালিকের কাছে আমরা এর চেয়ে ভালো থাকতে পারি। শুধু সবাই একত্র থাকতে পারবো কিনা, সেটাই চিন্তা।'

সকালবেলা মিসেস লী ম্যালিসিকে বলে পাঠালেন—তিনি কিছু খাবেন না। মালিক ও তাঁর অতিথির অবশ্য তাতে খাবার কিছু ব্যাঘাত হলো না। তাঁরা বেশ ভালোভাবেই প্রাতঃরাশ সারলেন। তারপর বাইরের প্রাঙ্গণে ঘুরতে বেরোলেন। প্রথমে পেছনে কামারশালায় টমের কাজ দেখতে গেলেন। হাপরের ফুঁয়ে হলদে আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ছিলো। দরজার কবজা তৈরী হবে বলে দুটো লোহার পাত আগুনে গরম করতে দেওয়া হয়েছিলো। খানিকক্ষণ দু'জনে মন দিয়ে টমের কাজ

দেখলেন। টম লম্বা চিমটে দিয়ে টকটকে লাল লোহা তুটো এনে নেহাইয়ের ওপর ছাঁচে ফেললো। কবজাটি একটু বিশেষ ধরনের—খরিদ্দারের ব্যক্তিগত ফরমাইশের জিনিস।

লী সাহেব বললেন—'এ ছোকরাটি কামারের কাজ খুব ভালো জানে।'

আগন্তুক দেয়ালে টাঙানো টমের হাতের কাজের নমুনাগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলো। পরে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করলো—'তোমার বয়স কত হে?'

'তেইশ হবে, স্যর।'

'এর চেয়ে বড় জায়গায় গিয়ে তুমি কামারশালার কাজ চালাতে পারবে?'

তাকে বিক্রী করবার কথা ভাবা হচ্ছে বুঝতে পেরে রোষে টমের ভেতরটা ফেটে পড়ছিলো। কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে। পরিবারসুদ্ধ সবাইকে বিক্রী করা হবে কিনা তাকে জানতে হবে। তাই সে বললো—'হ্যাঁ, স্যর। তা ছাড়া আমার পরিবারের অন্যরা ফসল ফলায়। একটা জায়গায় যা কিছু কাজ দরকার সবাই তারা জানে।'

মালিক ও অন্য লোকটি ক্ষেতের দিকে চলে গেলে মিস ম্যালিসি রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো।

'ওরা কী বলছিলেন, টম? মেমসাহেব তো আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছেনই না।'

টম বহুকষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো—'কিছু লোককে বিক্রী করা হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু শুধু আমাকেই, না আমাদের সবাইকে সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মিস ম্যালিসি কেঁদে ফেললো। তার কাঁধে তু'হাত রেখে টম বললো—'কেঁদে কী হবে বল! মায়ের সাথেও কথা হয়েছে। মাকে বলছিলাম—যেখানে যেতে হবে সে জায়গাটা এখান থেকে ভালোও হতে পারে।'

দিনের শেষে সবাই ক্ষেত থেকে ফিরে এলো। ছেলেদের বিমর্ষ, কঠিন মুখ। মেয়েরা চোখের জল ফেলছে, বিলাপ করছে। মালিক সঙ্গের লোকটিকে নিয়ে ক্ষেতের ধারেও গিয়েছিলেন। সে লোকটি সেখানে প্রতিটি কর্মীর সাথে কথা বলে যাচাই করে নিয়েছে।

আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে হতভাগ্যদের ত্রাস ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়ছিলো। অবশ্যম্ভাবী দণ্ডাজ্ঞার অপেক্ষায় শুধু অসহায় প্রতীক্ষা! লী সাহেবের ক্রীতদাস বসতিতে সকালবেলাকার ঘণ্টা বাজাতো টম। পরের দিনের প্রাতঃকালীন ঘণ্টা তাদের কাছে নিষ্ঠুর নিয়তির আহ্বান বলে বোধ হলো।

মিস ম্যালিসি বড় বাড়ীতে প্রাতঃরাশ তৈরী করতে গিয়ে অসময়ে ফিরে এলো। প্রৌঢ়ার আতঙ্কিত মুখখানি নতুন করে চোখের জলে ভেজা—'মালিক বলে পাঠিয়েছেন তোমরা কেউ কাজে যেয়ো না। বাইরে অপেক্ষা কর। তিনি খাওয়া শেষ করে এখানে আসবেন।' শয্যাগত পম্পেকাকাকেও ধরাধরি করে বাইরে আনা হলো।

লী সাহেব অল্প পরে তাঁর অতিথিকে নিয়ে এলেন। তাঁর অসম্বৃত পদক্ষেপে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো—এত সকালেই তাঁর মদের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠস্বর জড়ানো, মেজাজ ক্রুদ্ধ, সহনশীলতার শেষ সীমানায় টান টান করে বাঁধা।

'তোমাদের নিগ্রোদের কাজই হচ্ছে, পরের ব্যাপারে নাক গলানো। নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছো আমি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছি। তোমাদের রাখবার সাধ্য আমার নেই, এই ভদ্রলোকের কাছে বিক্রী করে দিতে হচ্ছে।'

ক্রীতদাসের মাঝে তখনই একটা আর্তরব উঠেছিলো। অন্য লোকটি রূঢ় কণ্ঠে সকলকে থামিয়ে দেয়—'চুপ কর! কাল রাত থেকেই এসব ন্যাকামো চলছে। জেনে রাখ, আমি মামুলী দাসব্যবসায়ী নই। এ ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমাদের বহু শাখা আছে। রিচমণ্ড, চার্লসটন, মেম্ফিস, নিউ অর্লিন্স সর্বত্র ফরমাইশ মতো নিগ্রো আমরাই পাঠিয়ে থাকি।'

ম্যাটিলডা সকলের মনের আশঙ্কা প্রকাশ করে জানালো—'মালিক আমরা সকলে বিক্রী হয়ে একই জায়গায় যাবো তো?'

'বলছি, চুপ কর! সে দেখতে পাবে। তোমাদের মালিকের মতো সত্যিকারের মহাশয় ব্যক্তি হয় না। বাড়ীর ভেতরে যে ভদ্রমহিলা তোমাদের মতো নিগ্রোর জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছেন, তাঁর মতো দয়াবতীও আমি কখনো দেখিনি। তোমাদের আলাদা করে বিক্রী করলে তাঁরা অনেক বেশী দাম পেতেন।'

ত্রাসকম্পিত লিটন কিসি ও মেরীর দিকে তাকিয়ে বললো—'তোমাদের দিয়ে তো এখনই বাচ্চা পয়দা করানো যায়। অন্ততঃ চারশো ডলার করে এক একজনের দাম হবে।' ম্যাটিলডার দিকে দৃষ্টি গেলো—'বয়স খানিকটা হয়েছে বটে, তবে বলছো রান্না করতে জান। দক্ষিণ অঞ্চলে রান্নার লোকের আজকাল বারোশো থেকে পনেরোশো ডলার দাম।' টম সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করলো—'বিশেষ একটা ব্যবসা জানা লোকের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। এরকম উঠতি বয়সের কামারের দাম অনায়াসেই আড়াই থেকে তিন হাজার ডলার।' কুড়ি থেকে আটাশ বছর বয়সের বাকী পাঁচ ভাই সম্পর্কে তার মন্তব্য—'ক্ষেতের মজুরের দাম জনপ্রতি ন'শো

থেকে হাজার ডলার হবে। কিন্তু তোমাদের ভাগ্য খুবই ভালো। মালিকানী কিছুতেই তোমাদের আলাদা আলাদা বিক্রী করতে দেবেন না। মালিকও তাতে রাজী হয়েছেন। নর্থ ক্যারলিনা রেলরোড কোম্পানীর কাছে একটি তামাকের আবাদ আছে। সেখানে আমাদের খরিদ্দার আছে। তারা একটা পুরো নিগ্রো পরিবার চাইছে। ভাবছে পরিবারের সবাই একসাথে থাকলে মালিকের বিরুদ্ধে কোন ঝামেলা বাধাবে না কিংবা পালাবার চেষ্টা করবে না। সেখানেই তোমাদের পাঠাবো। তোমরা এখানে আর গোলমাল করো না। তাহ'লে তোমাদের নীলামে চড়াবো না, শেকল দিয়েও বাঁধবো না। যাও! সবকিছু গুছিয়ে নেবার জন্য চারদিন সময় দিলাম।'

ভার্জিল বিপন্নকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—'কারী সাহেবের আবাদে আমার স্ত্রী লিলি স্যু আর ছেলের কী হবে? ওদের কিনে নেবেন না?'

টম জানতে চাইলো—'আমাদের ঠাকুরমা, সিস্টার স্যারা, মিস ম্যালিসি আর পম্পেকাকার কী হবে?'

দাস ব্যবসায়ী বিদ্রূপ করে উঠলো—'আর কী! বাহানার শেষ নেই। কবে কে কার সাথে শুয়েছে, তার বিরহজ্বালা মেটাতে তার ছুকরিকেও কিনে নিতে হবে নাকি? বুড়ো হাবড়া নিগ্রো কতগুলো জুটেছে এখানে! ভালো করে চলতেই পারে না, কাজ করা তো দূরের কথা। ওদের কে কিনবে?'

বৃদ্ধা কিসি লী সাহেবের সামনে এগিয়ে গিয়ে হাহাকার করে উঠলো—'আপনার নিজের ছেলেকে আপনি নির্বাসনে পাঠিয়েছেন! আমাকে অন্ততঃ নাতি-নাতনীর কাছে থাকতে দিন।' কিসি মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লো। কিন্তু লী সাহেব চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মিস ম্যালিসি ও সিস্টার স্যারাও সমস্বরে আবেদন জানালো—'মালিক এরাই আমাদের সব। পঞ্চাশ বছর আমরা এক সাথে রয়েছি। এ বয়সে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবেন না। শুধু পম্পেকাকাই নীরব। অশক্ত বৃদ্ধের উঠবার ক্ষমতা ছিল না। তার দুই গালে অবিরাম জলের ধারা, চোখে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি!

'এই শেষবার বলছি--চুপ কর! কান ঝালাপালা করে দিলো! কী করে নিগ্রো শায়েস্তা করতে হয়, এবার দেখিয়ে দেবো।'

মুহূর্তের জন্য লী সাহেবের দৃষ্টি টমের দৃষ্টির সাথে মিলিত হলো। টম রুদ্ধস্বরে বললো—'মালিক, আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য আমরা দুঃখিত। আমরা জানি আপনি বাধ্য হয়েই আমাদের বিক্রী করে দিচ্ছেন।'

লী সাহেবের দৃষ্টিতে প্রায় কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলো। তিনি মাথা নত করে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন—'না, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। তোমাদের মাঝে বেশীর ভাগই এখানে বড় হয়েছো, সর্বদাই ভালো নিগ্রোর মতো ব্যবহার করেছো।' এবার টম অতি নম্রভাবে তার প্রার্থনাটি জানালো—'মালিক, নতুন আবাদের লোকেরা যদি আমাদের পরিবারের বৃদ্ধদের না নিতে চান, কোন উপায়েই কি এদের আপনার কাছ থেকে কিনে নিতে পারি না? এ ভদ্রলোক বলছেন এদের দাম তেমন বেশী হবে না। নতুন মালিকের কাছে আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইবো—তিনি যেন আমাকে কামারের কাজ করে কিছু উপার্জনের পথ করে দেন। আমার ভাইয়েরাও কিছু কিছু রোজগার করতে পারবে। আপনাকে আমি এদের জন্য উচিত মূল্যই দিয়ে দেবো।' চোখের জলে টমের মুখ ভেসে যাচ্ছিলো। নিতান্ত কাতরস্বরে সে মিনতি করেছিলো—'মালিক, আমাদের সমস্ত উপার্জন আমরা ঠাকুরমা আর এদের তিনজনের জন্য পাঠিয়ে দেবো। এতদিন একসাথে কাটিয়েছি। একসাথেই থাকতে দিন।'

লী সাহেব একটু কঠিন হয়ে উঠলেন—'ঠিক আছে, প্রত্যেকের জন্য তিনশো ডলার করে দিলেই এদের পাবে।' সকলের উল্লাস দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন—'না, না এখনই নয়। এখন ওরা যেতে পাবে না। টাকা হাতে পেলে তবে এদের ছেড়ে দেবো।'

সবাই কাঁদতে শুরু করলো। টম অতি দুঃখে বললো—'মালিক, আপনার কাছ থেকে আরো একটু বিবেচনা আশা করেছিলাম।'

লী সাহেব এবার দাসব্যবসায়ীকে তীক্ষ্ণস্বরে নির্দেশ দিলেন—সে যেন যত শীঘ্র সম্ভব ক্রীতদাসেদের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

রাত্রে কিসি টমের তৈরী দোলনা চেয়ারে বসে ছিলো। পরিবারের সবাই তাকে এক একবার জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলো। মিস ম্যালিসি ও সিস্টার স্যারা সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো।

অবশেষে কোথা থেকে কিসির মনে শক্তিসঞ্চার হলো। সে সাহসে বুক বেঁধে বললো—'তোমরা অমন করো না। জর্জের ফেরার অপেক্ষায় আমাদের চারজনকে এখানে থাকতেই হবে। দু'বছর প্রায় হয়ে এসেছে। যদি তার কাছে আমাদের কিনে নেবার টাকা না থাকে, টম আর অন্য ছেলেদের টাকা যোগাড় করতে দেরী হবে না। আর একটা কথা মনে রেখো। আমার সাথে দেখা হবার আগে যদি পরিবারে আরো ছেলেমেয়ে জন্মায়, তাদেরকে আমার মা বেল, আমার

আফ্রিকা দেশের বাবা কুণ্টা কিণ্টে, তার স্বদেশ ও স্বজাতির কথা বলতে ভুলো না। তাদের কাছে আমার কথা, আমার জর্জের কথা, তোমাদের কথা, কোন কোন মালিকের কাছে আমরা থেকেছি, আমাদের সত্যিকারের পরিচয়, আমাদের সমস্ত ইতিহাস গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলো।'

বেদনার্ত স্বরে, সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো—'বলবো ঠাকুরমা। নিশ্চয়ই বলবো। কখনো ভুলবো না।'

শনিবারের সকাল এলো। তার আগের রাতে কেউ ঘুমোয়নি। গাড়ী এলো। যারা চলে যাচ্ছিলো, আর যারা পড়ে থাকলো—পরস্পরকে একে একে আলিঙ্গন করে নিলো। 'পম্পেকাকা কোথায়?' কে যেন জিজ্ঞেস করলো। লিটল কিসি তাকে দেখতে ছুটলো। একটু পরেই আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—'না! না!' গাড়ীতে যারা উঠেছিলো, নেমে এলো। সবাই পম্পেকাকার ঘরের দিকে দৌড়ালো। বৃদ্ধ চেয়ারে বসে ছিলো। দেহ প্রাণহীন।

উনআশি

নতুন আবাদের মিঃ মারে এবং তাঁর স্ত্রীকে এদের সকলেরই পছন্দ হলো। ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছিলো। তবে চাষবাস সম্পর্কে ওদের বিশেষ জ্ঞান ছিলো না। তাঁরা শহরের লোক। বার্লিংটনে তাঁদের দোকান ছিলো। কাকার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে এ সম্পত্তি মিঃ মারের হাতে এসেছে। তিনি ভেবেছিলেন—একজন শ্বেতকায় ওভারসীয়ারকে এদের কাজ দেখাশোনা করবার জন্য রাখবেন। কিন্তু ভার্জিল, অ্যাশফোর্ড সকলেরই তাতে বিষম আপত্তি। এরা স্থির করেছিলো—নিজেরাই আপ্রাণ পরিশ্রম করে ভালো ফসল ফলিয়ে মালিকের আস্থা উৎপাদন করবে। তাছাড়া ম্যাটিলডাও সুযোগমত মিসেস মারেকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলবে। মিসেস মারেকে ম্যাটিলডা আর একটি অনুরোধ করবে। ভার্জিলের স্ত্রী পুত্র লিলি স্যু এবং ইউরিয়াকে যেন তাঁরা কিনে নেন। নতুন মালিকানী হৃদয়বতী মহিলা। তিনি এদের সব সমস্যাই সহানুভূতির সাথে শুনলেন। টম যাতে বাইরে পরিশ্রম করে তার ঠাকুরমাদের মুক্তিপণ সঞ্চয় করতে পারে—সে বিষয়েও তিনি সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন।

ম্যাটিলডার বাকী চিন্তা জর্জের প্রত্যাবর্তন নিয়ে। কিন্তু সে বিষয়ে তার কিছুই করবার ছিলো না—দিবারাত্র শুধু অপেক্ষায় থাকা। মেরী তার মাকে হাসতে হাসতে বলতো—'দেখো, গলায় সবুজ স্কার্ফ জড়িয়ে, মাথায় কালো ডার্বি চড়িয়ে ঠিক একদিন এসে হাজির হবে!'

ম্যাটিলডার কর্তব্যনিষ্ঠা, চমৎকার রান্না, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি গৃহস্থালী কাজ ও বিশ্বস্ততায় নতুন মালিক মালিকানী দুজনেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট। ভার্জিল তার ভাইবোনদের নিয়ে ভালো ফসল ফলাবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলো। টমের তত্ত্বাবধানে আবাদের সমস্ত যন্ত্রপাতির উত্তম সংরক্ষণ হচ্ছিলো। পুরোনো, মরচে পড়া ঝড়তি-পড়তি লোহাগুলো কাজে লাগিয়ে অতি দক্ষতার সাথে সে নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করছিলো। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা নিছক সৌন্দর্যবৃদ্ধির নানা বস্তুও নিপুণ হাতে গড়ে তুলছিলো।

প্রায় প্রতি রবিবারই মারে সাহেবরা কোথায়ও বেড়াতে যেতেন অথবা নিকটবর্তী আবাদের মালিকেরা সপরিবারে তাঁদের কাছে বেড়াতে আসতেন। বার্লিংটনের পুরানো বন্ধুরাও আসতেন। বড় বাড়ী ও প্রাঙ্গণ ঘুরিয়ে দেখাবার সময় মারে সাহেব অভ্যাগতদের টমের হাতের কাজ দেখিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। তাঁরাও দেখে বিস্মিত হতেন, চাইতেন টমকে দিয়ে নিজেদের কিছু কাজ করিয়ে নিতে। মারে সাহেব তাতে রাজী ছিলেন। ক্রমশঃ সে জেলায় টমের হাতের কাজের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। রোজই নানা বয়সের ক্রীতদাসেরা পায়ে হেঁটে বা খচ্চরের পিঠে চড়ে নানা কাজের ফরমাইশ নিয়ে টমের কাছে আসতে শুরু করলো। কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী নিজেদের বাড়ীর জন্য শৌখিন জিনিসের নকশা নিজেরাই এঁকে পাঠাতেন। তাঁদের অনুরোধে মারে সাহেব টমকে অন্যান্য আবাদে বা নিকটবর্তী শহরে নিজে যাবার অনুমতিও দিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টম মারের এতদূর প্রতিষ্ঠা হলো যে দিবারাত্রি পরিশ্রম করেও সকলের ফরমাইশি কাজ শেষ করে উঠতে পারছিলো না। তার শিক্ষাগুরু মিঃ ইসাইয়ার থেকেও টমের হাতের কাজের চাহিদা বেশী ছিলো। খরিদ্দারেরা অবশ্য মারে সাহেবকেই কাজের দাম দিতো। গরু, ঘোড়া, খচ্চরের একটি নাল লাগাতে চোদ্দ সেণ্ট, গাড়ীর চাকা লাগাতে সাঁইত্রিশ সেণ্ট, গাঁইতি ধার করতে ছ'সেণ্ট, যন্ত্রপাতি সারাতে গেলে যত সামান্য কাজই হোক, আঠারো সেণ্ট লাগতো। শৌখিন জিনিসপত্র করাবার খরচ তো অনেক বেশী। সদর দরজার ওপর লাগাবার জন্য ওক পাতার জাফরির দাম পাঁচ ডলার।

মারে সাহেব সপ্তাহান্তে হিসাব করে প্রতি ডলারের শতকরা দশভাগ পারিশ্রমিক হিসাবে টমকে দিতেন। ম্যাটিলডা সে টাকা গোপনে সঞ্চয় করে রাখতো।

শনিবার দুপুরে ক্ষেতের কাজ শেষ হলে উনিশ বছরের লিটল কিসি এবং সতেরো বছরের মেরী তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেগুজে কামারশালায় যেতো। হাতে থাকতো সরবতের জগ ও পানপাত্র। টমের তৃষ্ণা মিটলে মালিকদের ফরমাইশি জিনিসপত্র নিতে আসা অন্য আবাদের ক্রীতদাসদেরও পানীয় দেওয়া হতো। খনিকটা হাসি তামাশা চলতো। ম্যাটিলডার এতে পরোক্ষ সমর্থন ছিলো। শুধু টমকে বলা ছিলো একটু নজর রাখতে—অযোগ্য পাত্রে যেন মেয়েদের মন আবদ্ধ না হয়।

শীঘ্রই মেরী নিকটবর্তী আবাদের একটি ক্রীতদাসকে বিবাহের ইচ্ছা জানালো। ম্যাটিলডাকে অনুরোধ করলো মালিককে জানিয়ে রাখতে। সে ছেলেটির মালিক মেরীকে কিনতে চাইলে, মারে সাহেব যেন আপত্তি না করেন, যেন ন্যায্য দামে মেরীকে ছেড়ে দেন। তাহলে তারা বিয়ের পর একত্র বসবাস করতে পারবে। ম্যাটিলডার মেয়েকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু টম তাকে বুঝিয়ে বললো বিয়ের পর আলাদা থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। লিলি স্যুকে ছেড়ে ভার্জিলের কত কষ্ট হচ্ছে সেটা দেখেই তো ম্যাটিলডার বোঝা উচিত।

ম্যাটিলডা বিষণ্ণস্বরে বললো—'সেটা ঠিক কথা। কিন্তু এভাবে আমাদের পরিবারটিকে তো একত্র রাখা যাবে না। চারিদিকে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাকে আর ভার্জিলকে ছাড়া আর কাউকেই কাজের পর চোখে দেখতে পাই না। সবাই সঙ্গীর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ টমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—'টম, তুমি কবে বিয়ে করছো?'

সহসা এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে টম হকচকিয়ে গেলো—'না ভাবিনি তো কিছু।' চট করে সে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলো—'মা! ঠাকুরমা, সিস্টার স্যারা ও মিস ম্যালিসির জন্য কত জমেছে?'

'কত আর! সাতাশি ডলার বাহান্ন সেণ্ট।'

'কিছুই তো নয়। আচ্ছা, ওদের বয়স কত হলো?'

'তোমার ঠাকুরমার সত্তরের কাছে। ওদের আশির ঘরে হবে।'

ম্যাটিলডার মনে একটা নতুন চিন্তা খেলে গেলো। তার দৃষ্টি কোন সুদূরে উধাও হলো—'টম, তোমার ঠাকুরমার কাছে শুনেছি, তাঁর বাবা লাউয়ের শুকনো খোলার ভেতরে পাথরের টুকরো ফেলে বয়সের হিসাব রাখতেন। তোমার

ঠাকুরমার যদি সত্তরের কাছে বয়স হয়, তবে তার বাবা, মা কেউই এখন বেঁচে নেই।'

'হ্যাঁ, মা। ওঁদের কথা এত শুনেছি। কী জানি ওঁরা কেমন দেখতে ছিলেন।'

'আমারও ওঁদের কথা খুব মনে হয়। তবে তোমার ঠাকুরমার জন্য আমি রোজই প্রার্থনা করি। তোমার বাবার জন্যও প্রার্থনা করি। তিনি যেন একদিন অনেক টাকা নিয়ে ফিরে আসেন আর আমাদের সবাইকে কিনে নিতে পারেন। তাহলে আমরা আকাশের পাখীর মতো মুক্তপক্ষ হয়ে যাবো।'

দু'জনেই নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলো।

টম একটু পরে ইতস্ততঃ করে বললো—'মা, আমার বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? একটি মেয়ের সাথে দেখা হয়েছে মা। তার সাথে একটু আলাপও করেছি।'

'কে সে, টম?'

'তুমি তাকে চিনবে না। তার নাম আইরিন। সবাই রিনি বলে ডাকে। এড-উইন হল্ট সাহেবের বাড়ীতে কাজ করে।'

'যেখানে তুমি সেই চমৎকার ডিজাইন করা জানালার গ্রীল লাগিয়েছো?'

'হ্যাঁ, মা।' টমের অবস্থা যেন মিষ্টি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়া শিশুর মতো।

ম্যাটিলডার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে উঠে গিয়ে কুণ্ঠিত বিব্রত ছেলেকে জড়িয়ে ধরলো।

'আমি খুব খুশী হয়েছি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। এখনো তো কিছু ঠিক হয়নি। এখনো কাউকে কিছু বলো না। কেমন?'

'আমার কোন ছেলেই তোমার মতো কম কথা বলে না। সেই তোমার মুখ দিয়ে যখন কথাটা বেরিয়েছে, তখন ঠিকই আছে। মালিক নিশ্চয়ই মেয়েটিকে তোমার জন্য কিনে নেবেন।'

ম্যাটিলডা এ বিয়ে স্থির বলেই ধরে নিলো। মনে মনে তখনই সে বিয়ের ব্যবস্থা, কেকের ডিজাইন ভাবতে শুরু করে দিলো। টম বহুদিন তার মায়ের মুখে এমন প্রসন্ন হাসি দেখেনি।

আরো কয়েকমাস আগেকার ঘটনা। মারে সাহেব এক রবিবার গীর্জা থেকে ফিরেই টমকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে বিশেষ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো। হণ্ট কটন মিলের মালিক মিঃ এডউইন হণ্ট কারুকার্যময় লোহার গ্রীলের ফরমাইশ দিতে চান। মিসেস হণ্ট টমের হাতের সূক্ষ্ম কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজেই তাঁদের 'লোকাষ্ট গ্রোভ' নামে বাড়ীর জানালার গ্রীলের এক বিচিত্র নকশা এঁকেছেন। আশা করছেন টম সেটি ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। টম যেন তাঁর কাছ থেকে নকশাটি নিয়ে যায় এবং গ্রীল তৈরী করে নিজেই তাঁদের জানালায় লাগিয়ে দিয়ে আসে।

পরের দিন ভোরবেলা টম মারে সাহেবের লিখিত অনুমতিপত্র নিয়ে খচ্চরে চেপে জানালার মাপ ও নকশা আনতে চলে গিয়েছিলো। মারে সাহেব তাকে পথের সন্ধান বলে দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছোলে মিসেস হণ্ট তাকে দেখে খুব খুশী হলেন এবং যত্ন করে কাজটা বুঝিয়ে দিলেন। জাফরিটির গড়ন হবে আঙুর লতার মতো। টম তাঁকে আশ্বস্ত করলো—'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ! আশা করছি কাজটি আপনার পছন্দ হবে। তবে অনেকগুলো জানালার কাজ। শেষ হতে প্রায় দু'মাস সময় লাগবে।'

মিসেস হণ্ট তাতেই সন্তুষ্ট। টম জানালাগুলোর মাপ নিতে শুরু করলো।

ওপরতলার জানালার মাপ নিতে দুপুর পেরিয়ে গেলো। বারান্দায় কাজ করবার সময় মনে হলো কেউ যেন তাকে লক্ষ্য করছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়লো। সে ঝাড়ন দিয়ে পাশের জানালাটি ঝাড়ছিলো। গায়ের রঙ তামাটে, গায়ে হণ্ট বাড়ীর নামাঙ্কিত পরিচারিকার পোশাক। কালো রঙের সোজা চুলগুলো পেছনে টেনে বাঁধা। তারও দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশংসা। টমের স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য তাকে নিমেষে সংযত করে দিলো। মনের ভাব গোপন রেখে সে টুপি খুলে মেয়েটিকে অভিবাদন জানালো। মেয়েটিও উজ্জ্বল হাসিতে তাকে সম্বর্ধিত করে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলো।

মারে সাহেবের আবাদে ফিরে এসেও টম মেয়েটিকে ভুলতে পারছিলো না। তার মনের স্বাভাবিক স্থৈর্যে বিঘ্ন ঘটছিলো। এ অস্থিরতায় নিজেই সে অবাক হয়ে যাচ্ছিলো। বিছানায় শুয়ে ভাবতো—মেয়েটির নাম পর্যন্ত সে জানে না। বয়স মনে হয় উনিশ কুড়ি হবে। এত সুন্দর মেয়ে কি আর এতদিন অবিবাহিত আছে ! যদি

বা থাকে বিয়ে নিশ্চয় তার ঠিকই হয়ে আছে। এ চিন্তাটা সর্বক্ষণই তাকে উত্ত্যক্ত করতো। দুশ্চিন্তায় ভালো ঘুমও হতো না।

কাজে হাত দিয়ে লতার ডিজাইন তার কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিলো না। অবশেষে একদিন ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়ে সত্যিকারের আঙুরলতার গড়ন খুব মন দিয়ে দেখে এলো। এবার সেটি সঠিক ভাবে লোহার পাতে ফুটিয়ে তুলতে আর অসুবিধা হলো না। এ কাজটা নিয়ে সে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, যে একান্ত জরুরী ছাড়া অন্য খরিদ্দারদের কোন কাজই তার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছিলো না। মিঃ এডউইন হণ্টের নাম সে অঞ্চলে সুপরিচিত। তাঁর একটা বড় কাজের জন্য সাময়িকভাবে অন্য কাজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে—মারে সাহেব তাঁর অন্য খরিদ্দারদের এই বলেই কোনক্রমে শান্ত রাখছিলেন।

টমের সর্বসত্তা এই কাজটিতে নিবিষ্ট ছিলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আর কোন কথা ভাববার সময় ছিলো না। হণ্ট বাড়ীর সুন্দরী পরিচারিকাটির কথাও সে সময়টাতে ভুলে থাকতো। পাতাগুলো তৈরী করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। পাতলা লোহার পাত অতিরিক্ত গরমে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে প্রত্যেকটি পাতা একটি একটি করে অতি সাবধানে পরম যত্নে গড়ে তুলতে হচ্ছিলো। কোন দুটি পাতাই সে একরকম করেনি। প্রকৃতি রাজ্যেও তাই হয়। সাত সপ্তাহের অক্লান্ত পরিশ্রমে পাতাগুলো শেষ হলো। এবার সেগুলো গ্রীলের ফ্রেমে লাগাতে হবে। ম্যাটিলডা পুত্রের শিল্পকুশলতায় আত্মহারা। টমের ভাইবোনেদেরও বিস্ময় ও শ্রদ্ধার শেষ ছিলো না। মারে দম্পতি তাঁদের ক্রীতদাসের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও অসাধারণ পারদর্শিতায় পুলকিত ও গর্বিত।

যথাসময়ে গাড়ীতে গ্রীল বোঝাই করে টম হণ্টদের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হলো। জানালায় গ্রীল লাগিয়ে দিয়ে তবে তার কাজ শেষ হবে। মিসেস হণ্ট সাগ্রহে একটি গ্রীল তুলে ধরলেন। তার অভাবনীয় লাবণ্যময় সৌন্দর্যে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। এতটা তিনি আশাই করতে পারেননি। হণ্ট পরিবারের প্রত্যেকেই জাফরির অপরূপ গঠন-সৌকুমার্য দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হলেন।

টম গ্রীল লাগাতে শুরু করলো। নীচের তলার কাজ শেষ হতেই দু'ঘণ্টা লাগলো। জানালায় লাগাবার পর যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো। দাসদাসী সবাই এসে দেখে যাচ্ছিলো। কিন্তু যার জন্য টমের হৃদয় আকুল হয়ে ছিলো সে কোথায়? দোতলায় যেখানটায় আগের দিন দেখা হয়েছিলো সেখানে কাজ করতে গিয়ে টম হাজারো চিন্তার উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলো। সে কে, কী কাজ করে,

কোথায় আছে ! টমের হাত দ্রুততর হলো। আশাভঙ্গের বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিলো। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হলো। অকস্মাৎ সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেলো। ছুটে আসবার পরিশ্রমে লাল হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে মেয়েটি সামনে এসে হাজির হলো। টম হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

'নমস্কার, মিঃ মারে !' টমের খেয়াল হলো লী সাহেবের নাম এ মেয়েটির জানবার কথা নয়। তাকে মারে সাহেবের অধীন বলেই সে জানে। অপ্রস্তুতভাবে টুপি খুলে সেও বললো—'নমস্কার, মিস্ হণ্ট— — ।'

'নীচে রান্নাঘরে কাজ করছিলাম। এইমাত্র শুনতে পেলাম আপনি এসেছেন।' জানালার গ্রীলের দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ নয়নে বললো—'অপূর্ব হয়েছে। যাই, নীচে কাজ পড়ে আছে।'

টম তাড়াতাড়ি তার নাম জিজ্ঞেস করলো।

'আইরিন। সবাই আমাকে রিনি বলে ডাকে। আপনার নাম?'

'টম।'

এর পর থেকে প্রতি রবিবার টম মালিকের অনুমতিপত্র নিয়ে খচ্চরের গাড়ী করে বেরোতো। বাড়ীতে বলেছিলো—পথে ফেলে দেওয়া পুরোনো লোহার টুকরো সংগ্রহ করতে যায়। কথাটা নিছক মিথ্যা নয়। দু'ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আইরিনের সাথে দেখা করতে গিয়ে কিছু জিনিস অবশ্যই সংগ্রহ হতো। কিন্তু তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো আইরিনের সাথে সাক্ষাৎ। হণ্ট সাহেবের ক্রীতদাস বসতির সবাই তাকে পছন্দ করতো। সে আইরিনকে নিয়ে কাছাকাছি কোন অপেক্ষাকৃত জনহীন পথে বেড়াতে যেতো। গাড়ী ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই বেড়াতো। কথাবার্তা যা বলবার আইরিন বলতো।

'আমার বাবা ইণ্ডিয়ান। মা বলেছে তাই আমার গায়ের রঙ তামাটে। অনেকদিন আগে আমার মা একজন খুব খারাপ মালিকের কাছে ছিলো। অসহ্য হয়ে উঠতে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পথে মা ইণ্ডিয়ানদের হাতে পড়ে। তারা মাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানেই আমি জন্মেছি। আমার খুব অল্প বয়সে সাদা মানুষেরা ইণ্ডিয়ানদের সেই গ্রাম আক্রমণ করে। মাকে ধরে এনে তারা আবার সেই আগের মালিকের কাছে দিয়ে দেয়। সেখানে মাকে তারা অনেক মারধোর করেছে। পরে মালিক আমাদের দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করে দেন। সেখান থেকেই আমরা হণ্ট সাহেবের কাছে এসেছি। এঁরা সত্যিকারের ভালো লোক। মা হণ্ট সাহেবের বাড়ীর কাপড় কাচা আর ইস্ত্রীর

কাজ করতো। চার বছর আগে মারা গিয়েছে। আমার বয়স এখন আঠারো। নতুন বছরের দিনে উনিশ হবে।' তার স্বভাবসিদ্ধ সরলচোখে টমের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো—'তোমার?'

'চব্বিশ।'

টম তাকে নিজেদের পরিবারের কথা জানালো। পরের রবিবার আইরিন তাকে মালিকের তুলোর কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলো। আইরিন সম্পর্কে একটা জিনিস টমকে ক্রমেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো। মালিকের সব কিছুতে তার যেন গর্ব ও প্রশংসার সীমা ছিলো না। টম আইরিনের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু দুটো সমস্যার সমাধান না হলে সে বিবাহ সম্পর্কে মন স্থির করে উঠতে পারছিলো না। প্রথমতঃ টম নিজে কোন সাদা মানুষকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে বা আপন মনে করতে পারতো না। আইরিনের যদি সাদা মানুষ সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রীতি থেকে থাকে তবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক হবে না। দ্বিতীয়তঃ হণ্ট পরিবারের সকলেই আইরিনের প্রতি অনুরক্ত। উপযুক্ত ক্রীত-দাসের প্রতি এমন অনুরাগ অনেক বড়লোক মালিকের বাড়ীতেই দেখা যায়। টমের সাথে বিয়ে হলে বিয়ের পর আইরিনকে অন্য আবাদে চলে আসতে হবে। ভিন্ন আবাদের মেয়ে বিয়ে করে অনেক ক্রীতদাসই মালিকের অনুমতি নিয়ে ছুটির দিনে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে যায়। কিন্তু টমের মতো আত্মসম্মানী লোকের পক্ষে ওরকম পরিস্থিতি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। হণ্ট সাহেবরা যদি আইরিনকে ছাড়তে রাজী না হ'ন তবে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে টমের এখনই তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে দেওয়া উচিত।

এ সব চিন্তাতেই টম মগ্ন হয়ে থাকতো। পরের রবিবার আইরিন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—'তোমার কী হয়েছে টম?'

'না, কিছু না।'

'ঠিক আছে। ইচ্ছা না হলে বলো না। কিন্তু তোমার মনে কিছু একটা ভাবনা হয়েছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

হাতে লাগাম ধরে টম অন্যমনস্কভাবে বসেছিলো।—সত্যি তো। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। আর যাই হোক্ আইরিনের স্বভাবে সততা ও সারল্যের অভাব ছিলো না। অথচ সে নিজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাকে প্রবঞ্চনা করছে অর্থাৎ নিজের ভাবনার অংশ তাকে দিচ্ছে না। যত বেদনাদায়কই হোক্, সত্যকথা

প্রকাশ করাই উচিত। এতে যত দেরী হবে, তার নিজের মনের অশান্তি, হতাশা আর তিক্ততাও বাড়বে।

টম চেষ্টাকৃত লঘুস্বরে বললো—'তোমাকে আমার দাদা ভার্জিলের কথা বলিনি? আমাদের যখন এ মালিকের কাছে বিক্রী করে দেওয়া হয়, তার স্ত্রীকে তখন অন্য মালিকের কাছে রেখে আসতে হয়েছে। আমি কখনো ওভাবে বাস করতে পারবো না।'

'আমিও পারবো না।' জোরালো স্বরের এই চটপট উত্তরে টম হতভম্ব হয়ে গেলো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। হাঁ করে আইরিনের দিকে তাকিয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করলো—'তার মানে?'

'তুমি যা বললে, তাই!'

'হল্ট সাহেবরা তোমাকে বিক্রী করতে রাজী হবেন না।'

আইরিন ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো—'আমি চাইলেই বিক্রী হতে পারবো।'

টমের সারা শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আসছিলো। 'কী বলছো, তুমি?'

'ঠিকই বলছি। বিক্রী হওয়াটা আমার চিন্তা। তোমায় ভাবতে হবে না।'

'তাহ'লে বিক্রী হচ্ছো না কেন?'

এবার আইরিনকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো। ভয়ে টমের বুক শুকিয়ে গেলো।

একটু পরে আইরিন বললো—'ঠিক আছে। কখন দরকার, সময় কিছু ঠিক করেছো?'

'সেটা তো তুমি ঠিক করবে'—টম আবার চিন্তিত হয়ে পড়লো। আইরিনের জন্য তার মালিক কী বিরাট টাকার অঙ্ক চেয়ে বসবেন কে জানে। মিথ্যা আশায় ভুলে নিজেকেই ছলনা করা। আইরিনের কথায় চেতনা ফিরলো।

'তোমার মালিককে তুমিই তো বলবে আমাকে কিনে নিতে।'

'হ্যাঁ, বলবো।' মূর্খের মতো আবার প্রশ্ন করলো—'আচ্ছা, তোমার দাম কত হবে, কিছু আন্দাজ আছে?'

'ন্যায্যমূল্য যা তিনি দেবেন, এঁরা তাতেই রাজী হবেন।'

টম তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো।

'টম মারে, তোমার মতো অপদার্থ লোক দুনিয়ায় আমি দু'টি দেখিনি। যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম, সেদিন থেকে অপেক্ষা করে আছি—কবে তুমি কিছু বলবে। তোমাকে ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকুনী লাগাতে হয়। তবে যদি তোমার স্বভাবের জড়তা কাটে।'

তার মাথায়, তার কাঁধে আইরিনের কোমল হাতের মুষ্টি বর্ষিত হচ্ছিলো। টম সত্যি যেন জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু মুহূর্তে সে সচেতন হয়ে উঠলো। তার জীবনের প্রথম নারীকে নিবিড় আলিঙ্গনের বন্ধনে গ্রহণ করলো। খচ্চরটা চালকবিহীন নিজের খুশীমত পথ চলছিলো।

সে রাত্রে টম কল্পনার চোখে একটি লোহার গোলাপ নিরীক্ষণ করছিলো। বাজার থেকে প্রথমে একখণ্ড উৎকৃষ্ট মানের লোহা কিনে আনতে হবে। একটি আসল গোলাপফুল সে খুব মন দিয়ে দেখে নেবে। বোঁটা থেকে ঠিক কোথায় পাপড়ি শুরু হয়েছে, পাপড়িগুলো কেমন করে প্রস্ফুটিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তার অতি সুকুমার লাবণ্য, সব সে নিখুঁতভাবে লোহার বুকে ফুটিয়ে তুলবে। আইরিনকে সেটাই হবে তার প্রথম উপহার।

একাশি

সিঁড়ির নীচের ধাপের কোণায় আইরিন উচ্ছ্বসিত কান্নায় উপুড় হয়ে পড়েছিলো। শব্দ শুনে মিসেস এমিলি হণ্ট ছুটে এসেছিলেন। তাঁর একান্ত স্নেহের পাত্রীকে এহেন অবস্থায় দেখে যেন শিউরে উঠলেন। নীচু হয়ে তার গায়ে হাত রেখে নাড়া দিলেন—'কী হয়েছে আইরিন?—উঠে বস। বল আমাকে, কী হয়েছে। ওঠ শীগগির।'

আইরিন অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালো—একটু একটু করে তার মালিকানীকে জানালো—টমকে সে ভালোবেসেছে। তাকেই সে বিয়ে করতে চায়। এদিকে কিছু অল্পবয়সী সাদা মানুষ তাকে উত্ত্যক্ত করে মারছে। তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো ক্রমেই তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিসেস হণ্ট দয়া করে শীঘ্র তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। গৃহকর্ত্রী এধরনের অভিযোগ শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। অপরাধীদের নাম জানতে চাইলেন। আইরিন চোখের জলে ভেসে দুটি নামও প্রকাশ করলো।

হণ্ট দম্পতি নিজেদের মাঝে আলোচনা করে স্থির করলেন পারিবারিক স্বার্থে আইরিনকে অবিলম্বে মারে সাহেবের কাছে বিক্রী করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে আইরিন তাঁদের বিশেষ স্নেহভাজন। টমও উপযুক্ত পাত্র। তাঁরা মারে সাহেবদের অনুরোধ জানাবেন যাতে বিবাহ এবং প্রীতি সম্মেলন মিঃ হণ্টদের বাড়ী থেকেই

হয়। মিঃ হণ্ট নিজে কন্যা সম্প্রদান করবেন। তাঁদের পারিবারিক যাজক বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। মিঃ মারে এবং মিঃ হণ্টের বাড়ীর যাবতীয় শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি এ বিবাহে নিমন্ত্রিত থাকবে।

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ সৃষ্টি করেছিলো লম্বা ডাঁটিতে একটি নিখুঁত, সুন্দর লোহার গোলাপ ফুল। আইরিন সেটি বুকে চেপে রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলো—'এ ফুল প্রশংসার উর্ধ্বে। প্রাণ থাকতে তুমি বা তোমার ফুল কোনটাই আমার কাছ ছাড়া হবে না।'

প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। আহারের পর শ্বেতকায়েরা বড় বাড়ীতে চলে গেলে ম্যাটিলডা আইরিনকে বললো—'তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছো। এ ছেলে নিয়ে আমার মহা চিন্তা ছিলো। টম এত লাজুক, কোন মেয়েকে সে মুখ ফুটে বিয়ের প্রস্তাব জানাবে কী করে, সেই আমার ভাবনা ছিলো।'

আইরিন চটপট উত্তর দিলো—'সে তো প্রস্তাব জানায় নি।'

অতিথিদের মাঝে অট্টহাস্যের রোল উঠলো।

বিয়ের পরে টমের কাজের উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেলো। তার স্বভাবেরও পরিবর্তন হলো। তাকে এত হাসতে, সকলের সাথে এত কথা বলতে কেউ কখনো দেখেনি। তাদের নতুন তৈরী ঘরে লোহার গোলাপটি অতি যত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো। কামারশালায় টমের হাত অবিশ্রান্ত চলছিলো। যারা কাজ নিয়ে আসতো তাদের মাঝে ক্রীতদাসেরা একদিকে রাখা কতকগুলো কাঠের টুকরোর ওপর বসতো। সাদা মানুষদের অপেক্ষা করবার জন্য টম অপর দিকে কয়েকটি চেরা কাঠের বেঞ্চ তৈরী করে রেখেছিলো। এমন জায়গায় সেগুলো রাখা ছিলো যাতে টম তাদের কথাবার্তা শুনতে পায়। আবার অতি নিকটেও নয়। টম কথা শুনছে বলে যেন তাদের সন্দেহ না জাগে। টমের কামারশালাটি স্থানীয় লোকদের মিলন-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। গল্পগুজব, সাময়িক খবরের আলোচনা সবই সেখানে চলতো। ক্রীতদাসপ্রথা বিলোপের সমর্থনকারীদের প্রাধান্য ক্রমেই বাড়ছিলো। অপর পক্ষের সাথে বিরোধিতা ও তিক্ততাও বেড়ে যাচ্ছিলো। ঠিক এ কারণেই আব্রাহাম লিঙ্কন সম্পর্কে দক্ষিণের সাদা মানুষদের অসীম বিদ্বেষ ছিলো এবং উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মাঝে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো।

লিলি স্যুকে মারে সাহেব কিনে এনেছিলেন। আইরিন ও লিলি স্যু দুজনকেই ক্ষেতের কাজে লাগানো হয়েছিলো। কয়েক মাসের মধ্যেই আইরিন টমকে দিয়ে একটি তাঁত বানিয়ে নিলো। গভীর রাত্রি অবধি তার ঘর থেকে তাঁত চালাবার

শব্দ শোনা যেতো। কিছুদিনের মধ্যেই টমের গায়ে আইরিনের বোনা কাপড়ে তারই সেলাই করা শার্ট দেখা গেলো। এর পর লিলি স্যু ও লিটল কিসির জন্য পোষাক তৈরী হলো। বাড়ীর ছেলেদের প্রত্যেকের জন্য শার্ট তৈরী করে আইরিন তাদের এমন কি টমের চিরশত্রু অ্যাশফোর্ডের পর্যন্ত হৃদয় কিনে নিলো। সবশেষে তৈরী হলো ম্যাটিলডা ও তার নিজের পোষাক। মালিক মালিকানীও বাদ গেলেন না। নিজেদের ক্ষেতে উৎপন্ন তুলোর সূক্ষ্ম বস্ত্রে তৈরী জামাকাপড় পরে মিঃ এবং মিসেস মারেও কম বিস্মিত বা পুলকিত হননি!

আইরিন রঙীন কাপড় পছন্দ করতো। নানা গাছের পাতা থেকে সে রঙ সংগ্রহ করতো। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে মিঃ মারের ক্রীতদাস বসতির উঠোনের দড়িতে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, বেগুনী নানা বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রখণ্ড শুকোতে দেখা যাচ্ছিলো। ক্রমশঃ আইরিন ক্ষেতে কাজ করা একেবারেই ছেড়ে দিলো। কিন্তু তার কাজের অন্ত ছিলো না। বড় বাড়ির মালিক দম্পতি থেকে ভার্জিল, লিলি স্যু তাদের চার বছরের ছেলে ইউরিয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই আইরিনের হাতের পরোক্ষ সেবা অনুভব করতো। আইরিন তাদের জীবনে নতুন দীপ্তি এনে দিয়েছিলো।

শীঘ্রই আইরিন সন্তানসম্ভবা হলো। ম্যাটিলডা এ খবরে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলো। গর্ভাবস্থায় শ্রমসাধ্য কাজ করা সম্ভব নয়। তবুও শীতের মাস-গুলিতে বসে সে যে কত বিচিত্র, অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিলো তার ইয়ত্তা নেই। তার স্পর্শে জাদু ছিলো। বড় বাড়ি থেকে ক্রীতদাস বসতির প্রতিটি ঘর সে স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো—পুরোনো কাপড় পাকিয়ে কম্বল, রঙীন সুগন্ধি বড়-দিনের মোমবাতি, গরুর শিঙ থেকে চিরুনি, লাউ থেকে জলপাত্র, পাখীর বাসা থেকে গৃহসজ্জার অভিনব চারুশিল্প। কাপড় কাচার ও ইস্ত্রী করবার কাজ সে নিজেই যেচে নিয়েছিলো। কাপড়ের ভাঁজে শুকনো গোলাপের পাপড়ি আর সুগন্ধি পাতা রেখে শ্বেতকায় ও কালো মারে পরিবারের প্রত্যেককে সে সুবাসিত করে তুলেছিলো।

বিরাশি

চিকেন জর্জ ঘোড়ায় চেপে আসছিলো। সহসা লাগাম টেনে ধরলো। হ্যাঁ, সে জায়গাই তো! কিন্তু বিশ্বাস করা যাচ্ছিলো না। আগাছায় পথ ছেয়ে গিয়েছে।

লী সাহেবের বাড়ী বিবর্ণ, জীর্ণ। নানা জায়গায় রঙ চটে গিয়েছে। জানালার কাঁচের জায়গায় পুরোনো কাপড় গোঁজা। ছাদটা একদিকে হেলে পড়েছে। বাড়ীর পাশের জমিগুলোতে পর্যন্ত চাষ করা হয়নি—খালি পড়ে আছে। শস্য ফলাবার কোথায়ও কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বেড়াগুলো ভেঙে পড়েছে। বিমূঢ়, উৎকণ্ঠিত জর্জ আগাছার ভেতর দিয়ে পথ করে নিলো। আরো কাছে এলে দেখতে পেলো বড় বাড়ীর গাড়ীবারান্দা ঝুলে পড়েছে, ধাপগুলো ভাঙা। বেড়াল, কুকুর এমন কি একটা মুরগী পর্যন্ত চোখে পড়লো না। ঘুরে বাড়ীর পেছন দিকে গিয়ে দেখতে পেলো এক বৃদ্ধা একখণ্ড কাঠের ওপর বসে শাক বাছছে। মিস ম্যালিসি! কিন্তু চেহারায় অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। চোখ তুলে তাকিয়ে সে কিন্তু জর্জকে চিনতে পারলো না।

'মিস ম্যালিসি!' বৃদ্ধা মুখ তুলে চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর এক হাতে কাঠটা শক্ত করে চেপে নিজেকে তুলবার চেষ্টা করলো—'জর্জ—তুমি জর্জ নও?'

জর্জ ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো। অর্থশূন্য, আবেগহীন কণ্ঠে মিস ম্যালিসি প্রশ্ন করলো—'কোথায় গিয়েছিলে জর্জ? আগে তো এখানেই থাকতে তুমি!'

'সাগর পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। মিস ম্যালিসি আমার মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা সব কোথায়?'

কিন্তু মিস ম্যালিসির মুখ অভিব্যক্তিশূন্য। যেন সে সব সুখ-দুঃখের ওপারে চলে গিয়েছে। 'আজকাল কেউ তো এখানে থাকে না। সবাই চলে গিয়েছে। শুধু আমি আর মালিক পড়ে আছি।'

'কোথায় চলে গিয়েছে?' জর্জের মনে হলো মিস ম্যালিসির মস্তিষ্ক ঠিকভাবে কাজ করছে না। সে চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। রোগে স্ফীত অশক্ত একটি হাত দিয়ে কোন রকমে উইলো ঝোপের দিকে ইঙ্গিত করলো—'তোমার মা—তার নাম কিসি—ঐখানে শুয়ে আছে।'

উথলে ওঠা কান্না চিকেন জর্জ মুখে হাত চাপা দিয়ে রুখতে চেষ্টা করলো।

'স্যারাও ওখানে— —। আর সামনের উঠোনে মালিকানী।'

'ম্যাটিলডা আর আমার ছেলেমেয়েরা কোথায় মিস ম্যালিসি?'

'ম্যাটিলডা হ্যাঁ, সে ভালো মেয়ে ছিলো। অনেক ছেলে মেয়ে ছিলো তার। তাদের তো মালিক বহুদিন আগে বিক্রী করে দিয়েছেন। তুমি জান না?'

'কোথায় মিস ম্যালিসি,—কোথায় ?' তার কান্না ক্রোধে পরিণত হলো—'মালিক কোথায়, মিস ম্যালিসি ?'

বাড়ীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে উত্তর দিলো—'ঐখানে। এখনো ঘুমিয়ে আছেন বোধহয়। বড় বেশী মদ খান। দেরী পর্যন্ত শুয়ে থাকেন। ক্ষিধে পেলে চিৎকার করতে থাকেন। কী রান্না করবো ? তুমি কিছু এনেছো ?'

চিকেন জর্জ রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে হল পার হয়ে বসার ঘরে ছুটে গেলো। ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে চিৎকার করলো—'লী সাহেব! লী সাহেব!'

কিছুক্ষণ বাদে শোবার ঘরের দরজায় এক শিথিলবসন মূর্তি দেখা গেলো। জর্জের স্মৃতিপটে রক্ষিত মালিকের চেহারার সাথে তার সামান্যই সাদৃশ্য। সেই সতেজ, সবল দেহের এই বিশুষ্ক, অপরিচ্ছন্ন রূপান্তরে জর্জ ক্ষণেকের জন্য থমকে গেলো—'মালিক ?'

'জর্জ! জর্জ ?'—বৃদ্ধের দেহ কেঁপে উঠলো। কাছে এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। শীর্ণ আননে অশ্রুপূরিত চোখে, অন্তঃসারশূন্য উচ্চহাস্যে লী সাহেব দু' বাহু বাড়িয়ে জর্জকে আলিঙ্গন করতে গেলেন। জর্জ তা গ্রহণ না করে পাশে সরে গেলো। তারপর হাত বাড়িয়ে লী সাহেবের কৃশ হাতখানি মর্দন করলো।

'জর্জ, তুমি ফিরে এসেছো। আমি খুব খুশী হয়েছি। এত দেরী হলো কেন ? তোমার তো অনেক আগেই ফিরবার কথা ছিলো।'

'হ্যাঁ স্যর। কিন্তু লর্ড রাসেল এতদিনে আমাকে ছাড়লেন। তারপর রিচমণ্ডে জাহাজ থেকে নেমে এখানে আসতেই আট দিন লেগে গেলো।'

লী সাহেব তাকে হাত ধরে টেনে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভাঙা টেবিলের পাশের দু'টি চেয়ারের একটিতে তাকে বসালেন। অপরটিতে নিজে বসে বললেন—'কথা বলবার লোক নেই। এসো কিছু একটু পানীয় নিয়ে বসে খানিক-ক্ষণ গল্প করি। ম্যালিসি! আমার বোতল কোথায় রেখেছো ?'

'মালিক, আগে বলুন আমার পরিবারের সবাই কোথায় ?'

'কে, ম্যালিসি ?'

'বলুন মালিক ?'—দরজা দিয়ে ঢুকে কোন রকমে একটা বোতল ও দুটো গ্লাস সামনে রেখে তেমনি অনিশ্চিত পদক্ষেপে ম্যালিসি বেরিয়ে গেলো।

'তোমার মায়ের তো বয়স হয়েছিলো। সহজেই গিয়েছে—বেশী কষ্ট পায়নি।'

জর্জ মনে মনে ভাবলো—ইচ্ছা করে ম্যাটিলডা আর ছেলেমেয়েদের কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। আগের মতই খল আর বিপজ্জনক স্বভাব রয়েছে সাহেবের!

'মালিক, মনে আছে বলেছিলেন—ফিরে এলেই আমাকে মুক্তি দেবেন ? আমি তো এসেছি।'

কিন্তু লী সাহেব যেন সে কথা শুনতেও পেলো না। গ্লাসে খানিকটা পানীয় ঢেলে জর্জের দিকে এগিয়ে দিলেন—'এই নাও।'

জর্জ আর একবার চেষ্টা করলো—'মিস ম্যালিসির কাছে মেমসাহেবের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বড় দুঃখ হলো, স্যর।'

'হুঁ, একদিন সকালে তার আর ঘুম ভাঙলো না। সেই মোরগ লড়াইয়ের পর থেকে আমাকে একদিনও শান্তি দেয়নি। তবুও আমি চাইনি সে চলে যাক্। কারো চলে যাওয়াই আমি চাই না।'

'ম্যাটিলডা আর ছেলেমেয়েরা কোথায় মালিক? মিস ম্যালিসি বললো, আপনি তাদের বিক্রী করে দিয়েছেন ?'

এতক্ষণে লী সাহেব জর্জের দিকে তাকালেন—'হ্যাঁ, বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বড় দুঃসময় এসেছিলো। জমি, মোরগ সব কিছু বিক্রী করতে হয়েছিলো।' একটু থেমে আবার শিথিল কণ্ঠে বললেন—'এত গরীব হয়ে গিয়েছি, খাওয়া পর্যন্ত জোটে না।' হেসে উঠলেন—'নতুন নয় অবশ্য। গরীব হয়েই তো জন্মেছিলাম। কিন্তু তুমি এসেছো। আবার আমরা নতুন করে সব গড়ে তুলবো।'

জর্জ বহুকষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো। সাদা মানুষের গায়ে হাত তুলবার শাস্তি কী, সে তার জীবনের গোড়া থেকে জানে। কিন্তু তার প্রচণ্ড ক্রোধ কথায় প্রকাশ পেলো—'মালিক, আমাকে স্বাধীনতার প্রত্যাশা দেখিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। বাড়ী এসে দেখতে পেলাম আমার পুরো পরিবারটিকেই বিক্রী করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন ফিরে এলেই আমাদের মুক্তিপত্র দেবেন। দয়া করে সেটা দিন। আমার পরিবার কোথায় আছে তাও বলে দিন।'

'তারা অ্যালাম্যান্‌স্ জেলাতে তামাকের আবাদের মালিক মিঃ মারের কাছে। রেল রোড থেকে বেশী দূরে নয়। কিন্তু আমাকে মেজাজ দেখাচ্ছো কেন ? কী ভেবেছো মনে ?'

অ্যালাম্যান্‌স্—মারে—রেল রোড—চিকেন জর্জ কথাগুলো মনে গেঁথে নেবার চেষ্টা করলো। চেষ্টা করে গলার স্বরও একটু নরম করলো—'বড় দুঃখিত স্যর। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।' মনে ভাবছিলো—সাহেবের হাতে লেখা মুক্তির স্বীকৃতি দেওয়া সেই কাগজটা আমাকে পেতেই হবে। কী ভাবে সেটা পাওয়া যায় !

'ঐ হারামজাদারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমি নিজের কানে শুনেছি। শপথ করেছি—টম লী এর প্রতিশোধ নেবে! এখন তুমি এসেছো। আবার মোরগ কিনবো। আমার তিরাশি বছর বয়স। তাতে ঘাবড়ে যেয়ো না। তোমার যেন কত হলো?'

'চুয়ান্ন বছর, স্যর।'

'কখনো নয়!'

'হ্যাঁ মালিক। শীগগিরি পঞ্চান্ন হবে।'

'তোমাকে তো সেদিন জন্মাতে দেখলাম। ছোট্ট কুঁচকানো এতটুকু মুখ। বাদামী রঙ। আমিই তো তোমার নাম রেখেছি।'

গ্লাসে আবার খানিকটা ঢালা হলো। ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে চুপি চুপি বললেন—'টাকা আছে! কেউ জানে না। আমি মরে গেলে তুমিই তো সব পাবে। দশ একর জমিও আছে। আমার যা কিছু আছে সবই তোমার। তুমিই আমার সবচেয়ে নিকট জন!' কথাটা বলবেন কিনা—যেন বহু দ্বিধার পর আরো কাছে সরে এলেন। চোরা চাহনিতে জর্জের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমাদের মধ্যে যে রক্তের সম্পর্ক! জর্জ তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমিই যে তোমাকে পৃথিবীতে এনেছি।'

জর্জ ভেবে দেখলো—লী সাহেবকে আরো মদ খাইয়ে একেবারে বেহেড করে ফেলতে হবে। তাছাড়া কাজ উদ্ধার হবে না। তাই সে পুরোনো দিনের বহু গল্প, কতদিনের মোরগ লড়াইয়ের কাহিনী, মিঙোকাকার নানা কথা অনর্গল বলে যেতে লাগলো। আর মাঝে মাঝেই নিজে না নিয়ে বৃদ্ধের গ্লাসে পানীয় ঢেলে দিচ্ছিলো। অবশেষে লী সাহেবের মাথা টেবিলে ঝুঁকে পড়লো। জর্জ এবার অতি সন্তর্পণে চেয়ার ছেড়ে উঠলো। দরজার কাছে গিয়ে 'মালিক! মালিক!' বলে চিৎকার করে করে ডেকে দেখলো। তারপর বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলো। প্রতিটি ড্রয়ার একটি একটি করে খুলে দেখতে লাগলো। সাদা মানুষের শোবার ঘরে ঢোকা অতি গুরুতর অপরাধ—সে সম্বন্ধে জর্জ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলো। কিন্তু সে নিরুপায়। সম্ভবপর সমস্ত জায়গায় ব্যর্থ হয়ে তারপর নতজানু হয়ে খাটের নীচে উঁকি মারলো। একটা ছোট্ট সিন্দুক না?

টেনে বার করে হাতে নিয়ে দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মালিক একই ভাবে টেবিলে মাথা রেখে নিঃসাড়ে পড়েছিলেন। জর্জ দরজা পেরিয়ে বাড়ীর একপাশে চলে গেলো। কী দিয়ে খোলা যায়? একটা কুড়োল পড়েছিলো। তারই এক ঘায়ে বাক্সের ডালা ছিটকে খুলে ফেললো। নোট, পয়সা, নানাবিধ কাগজপত্রে

বোঝাই। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে সেই ঈপ্সিত বস্তুটি চোখে পড়লো। বহুদিন আগে দেখা সেই কাগজটি সে দেখেই চিনতে পেরেছিলো।

'কী করছো ওখানে?'

জর্জ ভয়ানক চমকে উঠেছিলো। কিন্তু মিস ম্যালিসি আগেকার সেই কাঠের টুকরোটির উপরেই বসে ছিলো। চোখে অবোধের দৃষ্টি!

'আমাকে এবার যেতে হবে, মিস্ ম্যালিসি!' কাছে এসে জর্জ তাকে শেষ আলিঙ্গন করলো। তার জন্মস্থান এবং আশৈশব লীলাক্ষেত্রের দিকে একবার নিবিড় চোখে তাকিয়ে দেখলো। তারপর বহুমূল্য মুক্তিপত্রটি চেপে ধরে ক্ষিপ্র-গতিতে ঘোড়ায় চাপলো। জঙ্গলাকীর্ণ পথটি ধরে সে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। আর ফিরে তাকালো না।

তিরাশি

বড় রাস্তার দিকে বেড়ার ধারে আইরিন সুগন্ধ তৈরী করবার পাতা তুলছিলো। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে মুখ তুলে ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করলো। দেখেই হত-চকিত হয়ে গেলো। গলায় তার সবুজ স্কার্ফ, মাথায় তেরচা করে কালো ডার্বি টুপি। তাতে একটি মোরগের পালক গোঁজা। পরম উত্তেজনায় রাস্তার দিকে ছুটলো। হাত তুলে ডাকতে লাগলো—'চিকেন জর্জ! চিকেন জর্জ!'

অশ্বারোহী রাশ টেনে ঘোড়া থামালো। মেয়েটির হাসির প্রত্যুত্তরে নিজেও হেসে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি আমাকে চেন?'

'না স্যর। মানে আগে আপনাকে দেখিনি। কিন্তু টম, ম্যাটিলডা আর সকলের কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনার চেহারা দেখেই চিনেছি।'

জর্জ অবাক নয়নে তাকিয়ে রইলো—'আমার টম, আমার ম্যাটিলডা?'

'হ্যাঁ স্যর। আপনার স্ত্রী ম্যাটিলডা। টম আমার স্বামী, আমার বাচ্চার বাবা।'

জর্জের বুঝে উঠতে কয়েক সেকেণ্ড লাগলো। 'তোমার ও টমের বাচ্চা হয়েছে?'

আইরিন হেসে বললো—'শীগগিরই হবে।'

'তোমার নাম কি?'

'আইরিন, স্যর।'

পরিবারের অনেকেই তখন ক্ষেতে কাজ করছিলো। আইরিন তাদের বলতে দ্রুত এগিয়ে গেলো। এই মহা সুসংবাদে সকলেই ছুটে এসে ক্রীতদাস বসতিতে জড়ো হলো। ততক্ষণে জর্জও এসে পৌঁছেছে। জর্জকে জড়িয়ে ধরবার জন্য সবাই কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলো। চারিদিকের উল্লাস ও অভ্যর্থনার আতিশয্যে জর্জ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো!

জর্জের কাছেই তারা ঠাকুরমা কিসি, সিস্টার স্যারা আর মিসেস্ লীর মৃত্যুসংবাদ পেলো। মিস ম্যালিসির বর্তমান অবস্থাও জানতে পারলো। লী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে সবশেষে সে সগৌরবে মুক্তিপত্রটি বার করে দেখালো। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই পরম আগ্রহে তার পাঁচবছর ইংল্যাণ্ডবাসের গল্প শুনলো।

'নতুন দেশে অনেক কিছু শিখবার ছিলো—কিন্তু তোমাদের ছেড়ে একদণ্ডও সুখে ছিলাম না।'

কথাটা শুনেই ম্যাটিলডা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলো—'কাজে তো তা মনে হচ্ছে না। দু'বছরের জায়গায় পাঁচ বছর কাটিয়ে এলে!'

চিকেন জর্জ হাসিমুখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো—'দেখেছো, বুড়ো বয়সেও স্বভাবটা বদলায়নি!'

ম্যাটিলডা কপট রাগ দেখালো—'বুড়ো বয়স কার? নিজের মাথার দিকে তাকিয়ে দেখো—কার বেশী চুল পেকেছে!'

জর্জ হেসে ম্যাটিলডার গায়ে হাত রাখলো—'আমি কি আসতে চাইনি? দু'-বছর হয়ে যেতেই লর্ড রাসেলকে তাড়া দিয়েছি। কিন্তু তিনি ছাড়তে চাননি। বলেছেন, আমি এত ভালো কাজ করছি যে আমাকে তিনি আরো কিছুকাল রাখতে চান। সেজন্য তিনি লী সাহেবকে আমার ভাড়া হিসাবে বাড়তি টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুনে আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কী করবো—উপায় তো ছিলো না। রাসেল সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম—আমার খবরটা তোমাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে। লী সাহেব তোমাদের কিছু বলেননি?'

'কিছু না। তার আগেই তো তিনি আমা[illegible] বিক্রী করে দিয়েছেন।'

'স্যর রাসেল আমার কাজে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। সেখানকার সবচেয়ে বড় মোরগলড়াইয়ে তাঁকে জিততে সাহায্য করেছিলাম। খুবই অনিচ্ছার সাথে শেষ পর্যন্ত আমাকে ছাড়তে রাজী হয়েছেন। ওখানকার সাদা মানুষেরা আমাকে খুব

ভালবাসতো। ফিরবার সময় সাউথ হ্যাম্পটন পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়েছিলো। দু'গাড়ী ভর্তি সাদা মানুষ আমার সাথে অতটা পথ এসেছিলো। ওরকম সম্বর্ধনা কোন কালো লোককে ওরা কখনো দেয়নি। জাহাজে আসবার ব্যবস্থা স্যর রাসেলই করে দিয়েছেন। পথে সমুদ্র যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলো। জাহাজ অসম্ভব দুলছিলো। অবশ্য সারা পথে নয়। কিছুদিন পরই সমুদ্র অনেক শান্ত হয়ে এসেছিলো। সে জাহাজে করেই নিউইয়র্ক পর্যন্ত এলাম।'

'তারপর কী হলো?'

'তারপরের রাস্তাটুকুর জন্যও লর্ড রাসেলই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জাহাজের লোকেদের টাকা দিয়ে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন অন্য একটা জাহাজে করে যেন আমাকে রিচমণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। অন্য জাহাজের অফিসার আসতে পাঁচ ছ'দিন দেরী করে। সে সময় আমি নিউইয়র্ক ঘুরে ফিরে দেখেছি।'

'সেখানে কোথায় ছিলে?'—ম্যাটিলডা শুধালো।

'নিগ্রোদের থাকবার জন্য ব্যবস্থা আছে। সেখানে ছিলাম। কী ভাবছো তুমি? টাকা ছিলো আমার হাতে। এখনো অনেক টাকা আছে। এক্ষুণি একশো ডলার বার করে দিতে পারি, তা জান? লর্ড রাসেল সত্যি লোক খুব ভালো। আসবার আগে আমাকে অনেক টাকা দিয়েছেন—ইচ্ছামত খরচ করতে। ওটা আমার নিজস্ব টাকা। ও সম্বন্ধে লী সাহেবকে কিছু বলতে বারণ করেছিলেন। তাঁকে বলিও নি।'

নিউইয়র্কে স্বাধীন নিগ্রোদের সাথে কথাবার্তা অনেক হলো। কিছু লোক খুব গরীব, কায়ক্লেশে দিন চলে। কিন্তু অনেকে ভালো রোজগার করছে। নিজেদের ব্যবসা আছে। অনেকে ভালো মাইনের চাকরী করে। অল্প কিছু লোকের নিজেদের বাড়ীও আছে। বাকীরা ভাড়া দিয়ে অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে। ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে।'

টম জিজ্ঞেস করলো—'ঘোড়া কোথায় কিনলে? রিচমণ্ডে?'

'হ্যাঁ। সত্তর ডলার দাম নিয়েছে। খুব ছুটতে পারে। ভেবে দেখলাম স্বাধীন মানুষের ঘোড়া থাকা উচিত।'

তখন এপ্রিল মাস। সবাই চাষের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। বৎসরের এই সময়টাতেই চাষের কাজ বেশী। বড় বাড়ীর রান্নাবাড়া ঝাড়া পোঁছা সেরে ম্যাটি-লডার নিজস্ব সময় খুব কম। খরিদ্দারেদের কাজে টমকে উদয়াস্ত খাটতে হয়। আট মাসের গর্ভবতী আইরিনও তার সাধ্যমত নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। চিকেন জর্জেরই

নিরঙ্কুশ অবসর। সে ঘুরে ঘুরে সবার কাছে যায়। তবে ক্ষেতের কাজে তার চির-কালের বিরাগ। কামারশালায় টমের সাথে গল্প করতে গেলে আগন্তুকদের মাঝে চাপা অসন্তোষের গুঞ্জন ওঠে। টমও অস্বস্তি বোধ করে। অপেক্ষমান সাদা মানুষেরা এই সবুজ স্কার্ফ গলায়, কালো ডার্বি টুপি মাথায় লোকটিকে সন্দেহের চোখে দেখে। তাকে দেখতে পেলেই তাদের স্বচ্ছন্দ গল্পগুজব অকস্মাৎ থেমে যায়। সাদা মানুষদের এই প্রতিক্রিয়ায় কালোরাও শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

টম লক্ষ্য করেছে দু'বার মারে সাহেব কামারশালায় আসতে গিয়েও চিকেন জর্জকে দেখে ফিরে গিয়েছেন। ম্যাটিলডাও তাকে বলেছে—জর্জের পরিচয় জেনে সাহেব মেমসাহেব প্রথমে এ পরিবারটির সুখের কথা ভেবে সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু ইদানীং জর্জকে নিয়ে তাঁদের মাঝে প্রায়ই আড়ালে আলোচনা হয়। ম্যাটিলডাকে দেখলেই থেমে যান।

মারে সাহেবের আবাদে স্বাধীন চিকেন জর্জের কী পদমর্যাদা হবে—সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কী ভাবে তার দিন কাটবে? ভার্জিল ও লিলি স্যুর চার বছরের ছেলে ইউরিয়া ছাড়া অন্য সকলেরই এ চিন্তায় মন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলো। জর্জও কোথায়ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলো না। একদিন অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে ফিরে জর্জ বিরসমনে ঘরে ফিরে আসছিলো। পথে চার বছরের নাতিটি বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকে নিরীক্ষণ করছিলো—'তুমি আমার দাদু?'

'হ্যাঁ, তোমার নাম কি?'

'ইউরিয়া। দাদু, তুমি কী কাজ কর?'

জর্জ সচকিত হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো—'এ কথা কে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে?'

'কেউ তো নয়। আমি নিজেই জিজ্ঞেস করছি।'

বালকের অপাপবিদ্ধ, সরল মুখখানা দেখে জর্জের সে কথা বিশ্বাস হলো।

'কোথায়ও কাজ করি না। আমি স্বাধীন।'

বালক একটু ইতস্ততঃ করলো—'দাদু, স্বাধীন কাকে বলে?'

ম্যাটিলডা বলেছিলো—ইউরিয়ার শরীর যথেষ্ট সবল নয়। তার বোধশক্তিও স্বাভাবিক থেকে কম বলে মনে হয়। চিকেন জর্জ ভেবেছিলো উত্তর দেবে না। কিন্তু সে চলতে শুরু করেও ফিরে দাঁড়ালো। ছেলেটির দেহ সত্যি দুর্বল বলে মনে হলো। বড় বড় চোখ দু'টি জর্জের ওপর স্থির হয়ে ছিলো। যেন দৃষ্টি দিয়ে তার প্রতিটি চলন পরিমাপ করে নিচ্ছিলো।

'স্বাধীন মানুষ মানে হলো সে কারো অধীন নয়।' একটু থেমে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললো—'তুমি কোথা থেকে এসেছো, তোমার মা বা অন্য কেউ তোমাকে বলেছে?'

'আমি কোথা থেকে এসেছি! জানি না তো!'

'এসো, আমার সাথে এসো।'

যাই হোক্, একটা কাজ জুটলো। এ ছেলেটা তারই তো নাতি। ভাবতে ভাবতে জর্জ ইউরিয়াকে নিয়ে ম্যাটিলডার ঘরে ঢুকলো।

'ঐ চেয়ারটাতে বস। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। মেলা একগাদা প্রশ্ন করবে না।'

'হ্যাঁ দাদু।'

'তোমার বাবা আমার আর তোমার ঠাকুরমার ছেলে। বুঝেছো? আমার মায়ের নাম কিসি। তাহলে কিসি হলো তোমার বাবার ঠাকুরমা। ঠিক আছে? আচ্ছা এবার, সেই কিসি ঠাকুরমার মায়ের নাম বেল। বলো তো?'

'নাম বেল।'

'ঠিক আছে। কিসি ঠাকুরমার বাবার নাম কুণ্টা কিণ্টে।'

'কুণ্টা কিণ্টে।'

'ঠিক আছে। তাহ'লে কুণ্টা কিণ্টে আর বেল হলো তোমার দাদুর দাদু আর ঠাকুরমা।...'

ঘণ্টাখানেক বাদে ইউরিয়াকে খুঁজতে খুঁজতে উদ্বিগ্ন ম্যাটিলডা ঘরে ঢুকে দেখে সে অনন্যমনে 'কুণ্টা কিণ্টে' 'কো' 'কাম্বি বলোঙো' ইত্যাদি শব্দ যথাযথ উচ্চারণের চেষ্টা করছে। ম্যাটিলডা খুশী মনে সেখানেই বসে পড়লো। তাদের নাতি একাগ্র-চিত্তে দাদুর কাছে গল্প শুনছিলো। সেও নতুন করে শুনতে বসলো। কেমন করে তার আফ্রিকা দেশের প্র-প্র-পিতামহ ঢাক বানাবার জন্য গ্রামের কাছের এক জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলো, কেমন করে অকস্মাৎ চারজন সাদা মানুষ তাকে গায়ের জোরে পরাজিত ক'রে বন্দী করেছিলো, তাকে জাহাজে করে বিরাট সমুদ্র পার করে কেমন করে এদেশে আনা হয়েছিলো ইত্যাদি। ভার্জিনিয়া রাজ্যের স্পটসিলভেনিয়া জেলার জন ওয়ালার সাহেব তাকে কিনে নিয়েছিলেন—।

পরের সোমবার একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলো। চিকেন জর্জ টমের সাথে খচ্চরের গাড়ীতে করে সদর শহর গ্র্যাহামে কামারশালার জন্য কিছু মাল কিনতে গিয়েছিলো। পথে কথাবার্তা বিশেষ হয়নি। যে যার ভাবনায় মগ্ন ছিলো। সেখানে

পৌঁছে সাদা চামড়ার ব্যবসায়ীদের সাথে সাতাশ বছরের টম যেমন শান্ত মর্যাদার সাথে কথা বলছিলো দেখে চিকেন জর্জের খুবই আনন্দ হচ্ছিলো। পরে তারা জে. ডি. কেটসের দোকানে গিয়েছিলো। দোকানের মালিক আগে সে জেলার শেরিফ ছিলো।

স্থূলকায় কেটস সাহেব টমেদের গ্রাহ্যই করছিলো না। শ্বেতকায় খরিদ্দারদের প্রয়োজন আগে মেটাচ্ছিলো। অকস্মাৎ টম মনের ভেতরে একটা আসন্ন বিপদের পূর্বাশঙ্কা অনুভব করলো। চমকে তাকিয়ে দেখলো কেটস সাহেব আড়চোখে তার বাবাকে লক্ষ্য করছে। জর্জের ভাবভঙ্গী চিরকালই একটু বেপরোয়া ধরনের। সবুজ স্কার্ফ গলায়, কালো ডার্বি টুপি মাথায় চিকেন জর্জ নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে মুরব্বীর মতো দোকানের জিনিসপত্র দেখে বেড়াচ্ছিলো। কেটস সাহেবের সেটা একেবারেই পছন্দ হয়নি। টম তার বাবাকে দোকানের বাইরে যেতে বলতে যাচ্ছিলো—তার আগেই কেটস সাহেবের তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেলো, 'এই ছোকরা! ঐ জালা থেকে আমাকে এক গ্লাস জল এনে দাও তো!' কেটসের দৃষ্টি টমের দিকে। গলায় অপরিসীম অবজ্ঞা ও শ্লেষ। টম আড়ষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু সাদা মানুষের আদেশ অমান্য করবার উপায় ছিলো না। জল পান করবার সময় কেটসের দৃষ্টি জর্জের ওপর স্থির হয়ে রইলো। তার দিকেই গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে বললো—'আরো জল খাবো।'

চিকেন জর্জ অলস ভঙ্গীতে তার পকেট থেকে মুক্তিপত্রটি বার করে কেটসের হাতে দিলো।

কেটস সেটি পড়ে শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—'আমাদের জেলায় তোমার প্রয়োজনটা কীসের?'

টম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। তার বাবাকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত কণ্ঠে বললো—'ইনি আমার বাবা। সদ্য মুক্তি পেয়েছেন।'

'মিঃ মারের আবাদে তোমাদের সাথে আছেন?'

'হ্যাঁ স্যর।'

শ্বেতকায় খরিদ্দারেদের দিকে তাকিয়ে কেটস বললো—'মিঃ মারের এ রাজ্যের নিয়মকানুনগুলো ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত ছিলো।'

হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর অতি অমায়িক হয়ে উঠলো—'ওহে ছোকরারা, বাড়ী গিয়ে মিঃ মারেকে বলো, আমি তার সাথে দেখা করতে যাবো।'

টম ও চিকেন জর্জের দ্রুত নিক্রমণের দিকে তাকিয়ে সাদা মানুষেরা এক সাথে হেসে উঠলো।

পরদিনই কেটস ঘোড়ায় চেপে মারে সাহেবের বাড়ীতে এলো। রাত্রে ম্যাটি-লডা সাহেবদের খেতে দেবার সময় একটা অস্বস্তিকর নীরবতা লক্ষ্য করলো। সব শেষে মিষ্টি ও কফি পরিবেশনের পর সাহেব খানিকটা চেষ্টাকৃত দৃঢ়স্বরে আদেশ দিলেন—'ম্যাটিলডা, তোমার স্বামীকে বারান্দায় ডেকে দাও।'

'হ্যাঁ স্যর, মালিক।'

ডাক শুনে চিকেন জর্জ তার স্বভাবসিদ্ধ ভাবনা-চিন্তাহীন ভঙ্গিতে হেসে উঠলো—'মনে হচ্ছে, লড়াইয়ে মোরগের সন্ধান চাইছেন।'

গলার স্কার্ফটি ঠিক করে, মাথার ডার্বিটি আরো একটু তেরচা করে বাঁকিয়ে জর্জ সিঁড়ির গোড়ায় উপস্থিত হলো।

'আপনি আমাকে ডেকেছেন, স্যর?'

'হ্যাঁ জর্জ। তোমাদের পরিবার সকল দিক দিয়েই আমাদের সন্তোষে রেখেছে শুধু তোমাকে নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল শহরে আমাদের আগেকার শেরিফ মিঃ জে. ডি. কেটসের সাথে তোমার দেখা হয়েছিলো, না?'

'হ্যাঁ স্যর হয়েছিলো।'

'নিশ্চয়ই জান, আজ তিনি এসেছিলেন। তাঁর কাছে জানলাম নর্থ ক্যারলিনা রাজ্যে একটা আইন আছে, কোন স্বাধীন নিগ্রো এখানে ষাট দিনের বেশী থাকতে পারবে না। তাহ'লে তাকে আবার ক্রীতদাস করে নেওয়া হবে।'

কথাটা বুঝে উঠতে চিকেন জর্জের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। তারপর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মিঃ মারের দিকে তাকালো। তার কথা বলবার ক্ষমতা ছিলো না।

'আমি খুবই দুঃখিত, জর্জ। তোমার নিশ্চয়ই এটা খুব অন্যায় মনে হচ্ছে।'

'মিঃ মারে, আপনিই কি এটা ন্যায়সঙ্গত মনে করছেন?'

মারে সাহেব একটু ইতস্ততঃ করলেন।

'না তা মনে করতে পারছি না। কিন্তু আইন তো মানতেই হবে।'

একটু থেমে বললেন—'তুমি যদি এখানে থাকতে চাও, আমাদের কাছে খুবই ভালো ব্যবহার পাবে। এটুকু তোমাকে কথা দিতে পারি।'

জর্জ অনুভূতিশূন্য কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করলো—'আপনি কথা দিতে পারেন, মিঃ মারে?'

রাত্রে জর্জ ও ম্যাটিলডা পাশাপাশি শুয়েছিলো। হাতে হাত ধরা। দৃষ্টি ঊর্ধ্বে।

'ম্যাটিলডা, মনে হচ্ছে থেকেই যেতে হবে। তাছাড়া উপায় কি? শুধুই ছুটো-ছুটি করে বেড়ালাম।'

ম্যাটিলডা মাথা নাড়লো! তার কণ্ঠস্বর দৃঢ়—'না জর্জ। তা হয় না। আমাদের মাঝে তুমিই প্রথম স্বাধীন হয়েছো। এ স্বাধীনতা তোমাকে রাখতে হবে। আমাদের মাঝে একজন অন্ততঃ স্বাধীন থাক। তোমাকে আবার ক্রীতদাসে পরিণত হতে আমি দেবো না।'

চিকেন জর্জের চোখ দিয়ে জল গড়ালো। ম্যাটিলডাও কাঁদছিলো।

দুদিন পর টম ও আইরিনের ঘরে তার নিমন্ত্রণ ছিলো। তখনও শিশুর জন্মগ্রহণ করতে দু'সপ্তাহ বাকী। চিকেন জর্জ বললো—'তোমাদের সন্তানকে আমাদের পরিবারের কাহিনী বলতে ভুলো না।'

'বাবা, আমার প্রত্যেকটি সন্তানই সে কাহিনী শুনবে।'—টম অতি কষ্টে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুললো—'না শোনালে কিসি ঠাকুরমা আমাকে ছাড়বেন না।'

তিনজনেই নীরবে আগুনের দিকে তাকিয়ে ছিলো। অবশেষে চিকেন জর্জ আবার মুখ খুললো—'আইনমতে আমি আরো চল্লিশদিন এখানে থাকতে পারি। এই কি যাবার সময়? কিন্তু থাকতে চাই না। থেকে লাভ কী?'—চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। টমকে ও আইরিনকে দৃঢ়বন্ধনে আলিঙ্গন করে ভগ্নকণ্ঠে বললো—'সাবধানে থেকো। আমি আবার ফিরে আসবো।' তীরবেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো!

চুরাশি

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের শুরু। টম অন্ধকার হবার আগে তার কামারশালা বন্ধ করবে। দ্রুত হাতে শেষ কাজটি সমাপ্ত করে অন্যমনস্কভাবে ঘরে ফিরে এলো। তাকে চিন্তামগ্ন দেখে আইরিনও নীরবে খাওয়া সারলো। তাদের শিশুকন্যা মারিয়ার বয়স তখন ছ'মাস।

রাত্রে অভ্যাসমত সবাই ম্যাটিলডার ঘরে জমা হয়েছে। ম্যাটিলডা ও আইরিন আসন্ন বড়দিনের কেকের জন্য বাদাম ভাঙছিলো। এতক্ষণে টমের মুখে কথা

ফুটলো—'লিঙ্কন সাহেবের কথা তো তোমরা শুনেছো। এবার তিনি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। শুনছি তিনি হোয়াইট হাউসে গিয়ে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়বেন। এ খবর শোনা অবধি আমি কাজে মন লাগাতে পারিনি। বিশ্বাস করতে পারছি না—সত্যি এমন একদিন আসবে যেদিন ক্রীতদাস বলে কেউ থাকবে না!'

অ্যাশফোর্ড কটু কণ্ঠে বললো—'সে আর আমাদের জীবনকালে ঘটবে না।'

ভার্জিল আইরিনের শিশুকন্যাটিকে দেখিয়ে দিলো—'এ হয়তো কোনকালে দেখতে পাবে।'

আইরিন মন্তব্য করলো—'আমার কাছে সেটা অসম্ভব বলেই মনে হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে যত ক্রীতদাস আছে তার দাম কত হবে ভেবে দেখ। সাদা মানুষেরা অমনি সব ছেড়ে দেবে!'

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে একদিন মিঃ এবং মিসেস্ মারের পাশের আবাদে রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ ছিলো। তাঁরা বাড়ী ফেরার পর ম্যাটিলডা বড় বাড়ীর বাকী কাজ শেষ করে দ্রুত ঘরে ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলো—'বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কাকে বলে বলো তো? মালিকরা বলাবলি করছিলেন—সাউথ ক্যারলিনা নাকি ইউনাইটেড স্টেটস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।'

পরিবারের কারোরই এর অর্থ জানা ছিলো না।

সেদিন কামারশালায় যেসব সাদা মানুষ এসেছিলো সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদেরকে টম মহা অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট দেখে এসেছে। তারা বলাবলি করছিলো—উত্তর অঞ্চল দক্ষিণকে ন্যায্য অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত করে, তবে রক্তের স্রোত বয়ে যাবে।

এতক্ষণে টম কথা বললো—'তোমরা ভয় পেয়ে যাবে বলে আগে বলিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে—সত্যি যুদ্ধ বাধবে।'

'কোথায় যুদ্ধ হবে, টম?'

'এ গীর্জা বা পিকনিকের মাঠ নয়, মা। যুদ্ধের জন্য কোনও নির্দিষ্ট জায়গা থাকে না!'

আইরিন শ্লেষের সুরে বললো—'নিগ্রোর জন্য সাদা মানুষেরা একে অপরের রক্তপাত করবে? আমার বিশ্বাস হয় না।'

কিন্তু যত দিন গেলো, চারিদিকের কথাবার্তা শুনে টমের দৃঢ় ধারণা জন্মালো—যুদ্ধ হবেই। সব কথা সে ঘরে গিয়ে বলতো না। বলবে কী, সে নিজের মনই

ভালো করে বুঝতে পারছিলো না। যুদ্ধ তাদের পক্ষে আরো বিপদ ডেকে আনবে, না আশার বাণী বহন করবে? ক্রীতদাসেদের পক্ষে যুদ্ধ শুভ, না, অশুভ? অনেক ভেবোচিন্তে, চারিদিকের গতিবিধি দেখে তার ভরসা হলো—যুদ্ধে উত্তর অঞ্চল জিতলে ক্রীতদাসেরা মুক্তি পাবে।

টমের কাছে যেসব ক্রীতদাসেরা কাজ নিয়ে আসছিলো তারা বলছিলো—'প্রত্যেক আবাদেই মালিকেরা ক্রীতদাসেদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন। অনেক কিছুই তাদের কাছে গোপন রাখবার চেষ্টা করছেন।'

ম্যাটিলডা বললো—'ঠিক অতটা না হলেও কথাটা সত্যি। হয়তো নিজেরা কিছু একটা বলছেন, আমি কাছাকাছি গেলেই প্রসঙ্গটা বদলে ফেলেন। অন্য কথার আলোচনা শুরু করেন।'

এক রাতে ম্যাটিলডা একটা চালাকি খেললো। সাহেব মেমসাহেবের খাওয়া শেষ হয়ে যেতে বড়ই কাতর স্বরে তাঁদের বললো—'মালিক চারদিকে যেমন শুনছি, ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। ছেলেপিলে নিয়ে থাকি, যুদ্ধ বাধলে কী হবে জানি না। বিপদে পড়লে আপনারা আমাদের বাঁচাবেন তো?'

তৎক্ষণাৎ মিঃ এবং মিসেস মারের মুখে স্বস্তি ও সন্তোষ ফুটে উঠলো। তার ফন্দী সফল হয়েছে দেখে ম্যাটিলডার বড় ফুর্তি হলো। তাঁরা ভরসা দিয়ে বললেন—

'কিছু চিন্তা করো না। তেমন বড় রকমের কোন গোলমাল বাধবে বলে মনে হয় না।'

ম্যাটিলডার কাণ্ড শুনে গম্ভীর প্রকৃতির টম পর্যন্ত হেসেছিলো। টমও একটা হাসির গল্প সবাইকে শুনিয়েছিলো—মেলভিল শহরের এক ক্রীতদাসকে তার মালিক জিজ্ঞেস করেছিলেন যুদ্ধে সে কোন পক্ষে যোগ দেবে। ক্রীতদাসটি উত্তর দিয়েছিলো—'হাড় নিয়ে দুটো কুকুরের লড়াই দেখেছেন, মালিক? আমরা নিগ্রোরা হ'লাম সেই কুকুরের মুখের হাড়।'

অ্যালাম্যানস জেলায় সে বৎসর বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে কোন উৎসব হয়নি। দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলি একে একে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, অ্যালাব্যামা, জর্জিয়া ও লুইসিয়ানা বেরিয়ে যায়, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিনেই টেক্সাস। এই রাজ্যগুলি জেফারসন ডেভিস নামে নতুন প্রেসিডেণ্টের অধীনে আলাদা সংযুক্তদেশ বা কনফেডারেসি গঠন করেছিলো।

টম এবং ম্যাটিলডা আলাদা আলাদা সূত্রে এত বিভিন্ন রকমের খবর আন

ছিলো, যার হিসাব রাখা মুস্কিল। মার্চ মাসের একই দিনে দু'টি উল্লেখযোগ্য খবর ছিলো। একদিকে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে অ্যালাব্যামার মণ্টগমারী শহরে বিরাট সমারোহের সাথে সংযুক্ত দেশ বা কনফেডারেসির পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন হয়। শোনা গেলো প্রেসিডেণ্ট জেফ ডেভিস আফ্রিকা দেশের ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ করে দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণাটির তাৎপর্য ক্রীতদাসেরা ভালো বুঝতে পারেনি। কারণ জেফ ডেভিসের নীতি সম্পর্কে তারা আগে যা শুনেছিলো তা এই নতুন কর্মপন্থার বিরোধী।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল, শুক্রবার সকালে মারে সাহেব মেবান শহরে একটি মীটিঙে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। লুইস, জেমস, অ্যাশফোর্ড, লিটল কিসি, লিলি স্যু-এরা সব ক্ষেতে তামাক গাছের চারা লাগাচ্ছিলো। এমন সময় দেখা গেলো বড় রাস্তা দিয়ে দলে দলে সাদা মানুষ ঘোড়ায় চেপে সজোরে ছুটছে। তাদের মাঝে একজন ঘোড়া রুখে কালোদের দিকে ঘুষি পাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে কী যেন চিৎকার করে বলে গেলো। লিটল কিসি ছুটে টম, আইরিন ও ম্যাটিলডাকে খবর দিতে গেলো—নিশ্চয় বড় রকমের কিছু হয়েছে। কিসি পরিষ্কার করে কিছুই বলতে পারছিলো না দেখে স্বভাবশান্ত টমও অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো—'চিৎকার করে কী বলছিলো, কিছুই বুঝতে পারনি?'

টম কাজ ফেলে খচ্চরে চেপে বড় রাস্তায় ছুটলো। ভার্জিল বাধা দিতে গেলো—'বাইরে যাবার অনুমতিপত্র ছাড়া যাচ্ছো যে!'

'সে ঝুঁকি তো নিতেই হবে!'

বড় রাস্তার চেহারা তখন ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো। সব গুরুত্বপূর্ণ খবরই প্রথমে টেলিগ্রাফ অফিসে আসে। সবার লক্ষ্যস্থল সেখানে। গরীব সাদা মানুষেরা আর কালোরাও ছুটলো। অনেকেরই বাহন ছিলো না। টমের মনে হচ্ছিলো—নিশ্চয় খারাপ কিছুই ঘটেছে। টেলিগ্রাফ অফিসে জনারণ্য। সাদা মানুষেদের ভাবভঙ্গী উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ। কালোরা বলাবলি করছিলো—লিঙ্কন সাহেব নিশ্চয় আমাদের হয়ে লড়াই শুরু করেছেন। এতদিনে বুঝি ঈশ্বর নিগ্রোদের কৃপা করলেন। বিশ্বাস করতে পারছি না। স্বাধীন হবো······ঈশ্বর······সত্যি কি স্বাধীন হবো!

শেষ পর্যন্ত খবর পাওয়া গেলো। ক্রীতদাসেদের পক্ষে খবরটি অশুভ। প্রেসিডেণ্ট ডেভিসের আদেশে দক্ষিণ ক্যারলিনা বাহিনী গোলাবর্ষণ করে উত্তর

অঞ্চলের প্রায় ত্রিশটি ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। যুদ্ধ তাহলে সত্যি শুরু হলো। টম মালিকের ফিরে আসবার আগেই বাড়ী ফিরতে পেরেছিলো।

উত্তর ক্যারলিনার গভর্নর জন এলিস প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনকে জানিয়েছিলেন—তাঁর রাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রবাহিনীর জন্য কোন সৈন্যদল পাঠাতে তিনি অসমর্থ। অথচ কনফেডারেট সৈন্যবাহিনীর জন্য তিনিই সহস্রাধিক বন্দুকধারী সৈন্য সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ডেভিস দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতকায়দের মাঝে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেককে তিন বৎসরের জন্য সৈন্যদলে স্বেচ্ছাসেবী হ'তে আহ্বান জানান। তাছাড়া ক্রীত-দাসেদের মাঝে প্রতি দশজন পুরুষের মাঝে একজনকে বাধ্যতামূলক ভাবে বিনা-পারিশ্রমিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে দিয়ে দেবার জন্য মালিকদের আদেশ দেন। জেনারেল রবার্ট লী যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ভার্জিনিয়া রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হয়েছিলেন। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় ওয়াশিংটন ডিসির প্রতিটি সরকারী বাড়ী সশস্ত্র সৈন্য পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছিলো।

অ্যালাম্যানস জেলার শ্বেতকায়েরা দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। যারা যুদ্ধে যাচ্ছিলো তাদের বিদায় জানাবার জন্য আত্মীয়-স্বজনেরা স্থানীয় রেলস্টেশনে ভীড় করেছিলো। প্রিয়জনেদের করুণ বিদায় সম্ভাষণে বাড়ীর পুরোনো বিশ্বস্ত ক্রীতদাসেদেরও চক্ষু সজল হয়ে উঠেছিলো।

পঁচাশি

এই সময় আইরিন ও টমের দ্বিতীয় কন্যা এলেন জন্মগ্রহণ করে। যথারীতি একটি রবিবার রাত্রিবেলা পরিবারের সকলকে টমের ঘরে একত্র করে নবজাতিকাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস শোনানো হয়। এই অনুষ্ঠানটি অবশ্য-পালনীয়। এটি পালিত না হলে কিসি ঠাকুরমার আত্মা তাদের ছাড়বে না—পরিহাসটি সে পরিবারে চালু হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু সাময়িক ঘটনা প্রবাহে টমের দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার উত্তেজনা চাপা পড়ে গেলো। যুদ্ধের জন্য ঘোড়া খচ্চরের নতুন নাল পড়াবার কাজ, যন্ত্রপাতি সারাবার কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। ইদানীং কনফেডারেট বাহিনী

অধিকাংশে স্থানে জয়লাভ করছিলো। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের এক অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীতে জেনারেল পদে ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর পতনের খবরে লিঙ্কন সাহেব শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পুরো বৎসরটিই ভাগ্যলক্ষ্মী কনফেডারেট শক্তিসমষ্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে পূর্বতন জেলা শেরিফ, বর্তমান দোকানঘরের মালিক কুখ্যাত কেটস মিঃ মারের কাছে আসে। যুদ্ধের কাজে টমকে প্রয়োজন। অশ্বারোহী সৈন্যদের শিক্ষাঘাঁটিতে একজন কর্মকার মোতায়েন থাকা দরকার। সারাদিনে প্রচুর ঘোড়ার নাল লাগাবার কাজ থাকে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক সপ্তাহ মিঃ মারের কাজ, এক সপ্তাহ অশ্বারোহী বাহিনীর কাজ—এই ভাবে চলবে। টম যেন পরদিন সকালেই নতুন কাজে যোগ দেয়। যাবার সময় কেটস বিদ্রূপ করে বলে গেলো—নিগ্রোদের যেমন বুদ্ধি—সৈন্যবাহিনীর কাজ ছেলেখেলা নয়! টম নিশ্চয় পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নেবে।

সেখানে প্রত্যূষ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ঘোড়ার নাল পরাতে হতো। কিছুদিন যাবৎ টম চোখের সামনে ঘোড়ার খুরের তলার দিকটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। আর খবরের মধ্যে কনফেডারেট বাহিনীর জয়লাভ। এক সপ্তাহ পরে শ্রান্ত দেহে, ভারাক্রান্ত মনে টম মিঃ মারের নিয়মিত খরিদ্দারের কাজে ফিরে আসে। হতাশ, বিষণ্ণ ম্যাটিলডা বলেছিলো—'আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের ভাগ্যে আরো দুর্ভোগ আছে!'

দ্বিতীয়বার কনফেডারেট বাহিনীর কাজে যাবার সময় টমেরও মনে একটা অজানা শঙ্কা ঘনিয়ে এসেছিলো। যেন কী একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছোবার তৃতীয় রাত্রে সে জেগে শুয়ে ছিলো। আবর্জনা ফেলবার জায়গা থেকে সহসা কিসের শব্দ পেলো। অন্ধকারে খুঁজে নিয়ে হাতুড়িটা হাতে করে বেরিয়ে এলো। বাইরে চাঁদের ম্লান আলো। একটা মানুষের ছায়া আবর্জনার পাশে দাঁড়িয়ে হাত থেকে কিছু একটা খাচ্ছিলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখে টম অতিশয় বিস্মিত হলো। রোগা, ফ্যাকাশে অল্পবয়সী একটি শ্বেতকায় ছেলে। দশ গজ দূরেও নয়। ছেলেটি তাকে দেখতে পেয়ে চমকে পালাতে গিয়ে কিসের ওপর পড়লো—বিরাট আওয়াজ উঠলো। তারপরেই সে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। সান্ত্রীরা ছুটে এসে লণ্ঠন তুলে আলোতে দেখলো হাতুড়ি হাতে টম দাঁড়িয়ে।

'কী চুরি করছিলে, নিগ্রো?'

টম তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলো—সে ভয়ঙ্কররকমের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে

পড়েছে ! তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করাও বিপদ—কারণ সাদা মানুষকে মিথ্যাবাদী বলা ভয়ানক অপরাধ।

'আবর্জনার কাছে শব্দ শুনতে পেয়ে দেখতে এসেছিলাম। স্যর, একটা সাদা মানুষ এখানে ছিলো। আমাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'

সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী কে বিশ্বাস করবে ? শান্ত্রী দু'টি চোখ চাওয়াচাওয়ি করে শ্লেষের হাসি হেসে উঠলো—'দিব্যি গল্প ফেঁদেছো ? আমাদের বোকা ঠাউরেছো নাকি ব্যাটা নিগ্রো ? মেজর কেটস তোমার ওপর নজর রাখতে বলেছেন। কাল সকালেই তাঁর সাথে দেখা করবে। হাত থেকে হাতুড়ি ফেল ! ফেলে দাও বলছি !'

টমের স্খলিত আঙুল থেকে হাতুড়িটা ঠকাস্ করে মাটিতে খসে পড়লো। প্রহরী দু'জন তাকে সামনে রেখে বেশ খানিকটা দূরে আর একজন সশস্ত্র প্রহরীর কাছে নিয়ে গেলো।

'এই নিগ্রোটা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। মেজর সাহেব আমাদের বলে দিয়েছিলেন—এর ওপর বিশেষ ভাবে নজর রাখতে। একে এখানে রেখে যাচ্ছি। পরে এসে মেজর সাহেবের সাথে দেখা করবো।'

তারা চলে যেতে নতুন লোকটি টমকে আদেশ করলো—'এক্ষুনি চিত হয়ে শুয়ে পড়। একেবারে নড়বে না। নড়লেই মারা পড়বে।' সেই ঠাণ্ডা মাটিতে টমকে নির্দেশ মতো শুয়ে পড়তেই হলো। অবাধ্যতার বা পালাবার চেষ্টার বিপদ সে জানতো।

সকালবেলা মেজর কেটস এলো। টমকে দেখে নিমেষে তার চোখের দৃষ্টি ক্রূর হয়ে উঠলো। ক্ষুধার্ত বেড়াল যেন একটি অসহায় পাখীকে নিজের কবলের মধ্যে পেয়েছে !

'কী হে চালিয়াত নিগ্রো ! চুরি করতে গিয়েছিলে শুনলাম ! সৈন্যবাহিনীতে এ অপরাধের শাস্তি কী জান ?'

টম তাকে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বললো—'স্যর, লোকটি অত্যন্ত ক্ষুধিত ছিলো। তাই আবর্জনার ভেতর খাবার খুঁজছিলো।'

'বটে। তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। সাদা মানুষ আবর্জনার ভেতর খাবার খুঁজছিলো,—আর গল্প পেলে না ! তোমাকে তো আমি আগেও দেখেছি—ভালো করেই চিনি। তোমার ঐ বদমাশ বাবাটাকে আগে শায়েস্তা করেছি। এতদিনে তোমাকে আইনের মধ্যে পেয়েছি।'

কেটস লম্বা লম্বা পা ফেলে একটা ঘোড়ার চাবুক নিয়ে এলো। টম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালো। তিনদিকে তিনজন সান্ত্রী তার দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে। পালাবার পথ ছিলো না। কেটস ক্রোধবিকৃত মুখে সর্বশক্তি দিয়ে টমকে কষাঘাত করতে শুরু করলো। সে আঘাত তীব্র দহনে আগুনের মতো তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছিলো।

প্রচণ্ড রোষে ও অপমানে জ্বলতে জ্বলতে টম ফিরে এলো। তার খচ্চরটি সেখানেই ছিলো। ফলাফল বিচার না করে সে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র ছেড়ে বিনা অনুমতিতে তখনই সোজা মারে সাহেবের কাছে চলে এলো। মিঃ মারেও সব শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন।

টম বললো—'আমি আর সেখানে ফিরে যাবো না, স্যর।'

'ঠিক আছে টম। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—এর বিহিত আমি করবো। এ জন্য দরকার হলে সবচেয়ে বড় অফিসারের কাছেও যাবো। যা ঘটেছে সেজন্য আমি দুঃখিত। তুমি কামারশালায় গিয়ে তোমার কাজ কর।'—একটু থেমে তিনি আবার বললেন—'তোমাদের পরিবারে তুমি বয়সে সবচেয়ে বড় না হলেও তোমাকেই কর্তা বলে জানি। সকলকে বলে দিয়ো উত্তরের লোকদের হারিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রী ও আমি তোমাদের নিয়ে একসাথে সুখে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবো—এটাই আশা করছি।'

'হ্যাঁ স্যর।' ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকা যে কখনোই সুখের হতে পারে না একথা মালিকেরা বুঝতে পারবেন না।

বসন্তকাল পার হয়ে গেলো। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে লাগলো।

ছিয়াশি

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের নতুন বৎসরের দিনে ম্যাটিলডা ছুটতে ছুটতে ঘরে ফিরে এলো—'এই মাত্র একজন সাদা মানুষ ঘোড়ায় চেপে এসেছিলো। মালিককে খবর দিয়ে গেলো প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন ক্রীতদাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্র সই করেছেন।'—ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস এ খবরে উল্লসিত হয়ে উঠলো। কিন্তু এ উল্লাস দিনে দিনে হতাশায় পরিণত হলো। কনফেডারেসিতে প্রেসিডেন্টের আদেশ কাজে পরিণত

করা হলো না। বরঞ্চ প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের প্রতি দক্ষিণের অধিবাসীদের বিদ্বেষ তীব্রতর হলো।

এর পরে উত্তরের সৈন্যবাহিনী কয়েকটি বড় যুদ্ধে জয়লাভ করলো এবং অ্যাটলাণ্টা দখল করে নিলো। কিন্তু ক্রীতদাসেদের গভীর হতাশা সহজে দূর হলো না। স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদের কাছে নিছক দুরাশা বলে বোধ হচ্ছিলো। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আবার একটু পরিবর্তন দেখা গেলো। টমকে একদিন বিশেষ উত্তেজিত মনে হলো। খবর এসেছে—জেনারেল শেরমানের অধীনে অগণিত উত্তরের সৈন্য জর্জিয়া রাজ্য ধ্বংস করে ফেলছে। ক্ষেতখামার বাড়ীঘর পুড়িয়ে, পশুহত্যা করে কিছুই বাকী রাখছে না।

কিছুদিন পরের খবর—প্রথমে চার্লসটনের পতন, পরে জেনারেল গ্রাণ্টের রিচমণ্ড দখল। অবশেষে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে খবর এলো কনফেডারেসি সৈন্যবাহিনীর পক্ষ হয়ে জেনারেল লী আত্মসমর্পণ করেছেন। দক্ষিণ অঞ্চলের শক্তি-সমষ্টির পতন ঘটলো।

ক্রীতদাস বসতিতে উল্লাসের সীমা ছিলো না। সকলে বড় বাড়ীর প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ উপচে রাস্তায়, সেখান থেকে বড় রাস্তায় আরো শতসহস্র আনন্দোন্মত্ত মানুষের সাথে সমবেত হয়েছিলো। সবাই হাসছিলো, নাচছিলো, চিৎকার করছিলো। কেউ বা গান করছিলো, লাফালাফি করছিলো। আবার কেউ কেউ প্রার্থনা করছিলো—'ঈশ্বর, স্বাধীন! আমরা স্বাধীন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অবশেষে আমরা সত্যি স্বাধীন!'

অল্পদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের মর্মান্তিক হত্যার খবরে উৎসবের আনন্দ গভীর বিষাদ ও শোকে পরিণত হলো। যারা নিহত প্রেসিডেন্টকে ত্রাণকর্তা বলে জেনেছিলো, সেই লক্ষ লক্ষ দুঃখী মানুষ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো।

মে মাসে মারে সাহেব তাঁর সমস্ত ক্রীতদাসেদের বড় বাড়ীর সামনের প্রাঙ্গণে ডেকে পাঠান। সাহেব ও মেম সাহেবের অতি বিমর্ষ, ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না। মারে সাহেব বহুকষ্টে তাঁর হাতের একটি কাগজ পাঠ করছিলেন—'দক্ষিণ অঞ্চল যুদ্ধে হেরে গিয়েছে। তার অর্থ তোমরা সবাই এখন স্বাধীন। তোমরা চলে যেতে চাইলে, চলে যেতে পার। যদি কেউ থাকতে চাও, থাকতে পার। যে থাকবে, তাকে আমরা সাধ্যমত বেতন দেবো।'

কৃষ্ণকায় মারে-রা সকলেই আবার নতুন করে নাচানাচি, গান, চিৎকার আর প্রার্থনা শুরু করলো—'আমরা স্বাধীন!—স্বাধীন! যীশু তোমাকে ধন্যবাদ!' আট-

বছরের ইউরিয়া এই সময় অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলো। বাইরের চিৎকারে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে, প্রাঙ্গণে ছুটোছুটি করতে লাগলো। শুয়োরের খোয়াড়ে গিয়ে বললো—'আর ঘোঁত ঘোঁত করো না, তোমরা স্বাধীন।' গোয়ালঘরে গিয়ে গরুগুলোকে বললো—'আর দুধ দিতে হবে না। তোমরা স্বাধীন।' মুরগীগুলিকে বললো—'আর তোমাদের ডিম পাড়তে হবে না। তোমরা স্বাধীন।···আর আমিও স্বাধীন—স্বাধীন!'

উৎসবের আনন্দের শেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে টম মারে তার মস্ত বড় পরিবারের সকলকে একত্র করলো। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পাবার পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে হবে। স্বাধীনতায় কারো পেট ভরবে না। কী ভাবে খাওয়াপরার সংস্থান হবে সেটা এবার ভাবা দরকার। ম্যাটিলডা জানালো—'মারে সাহেব একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। কেউ যদি ভাগে চাষ করতে রাজী থাকে, তবে তিনি অর্ধেক ফসল তাকে দেবেন। যতটুকু জমি আছে, ছোট ছোট ভাগ করে প্রত্যেককে দেওয়া যেতে পারে।'

দেখা গেলো পরিবারের কিছু লোক এ প্রস্তাবে রাজী নয়। তাদের তখনই আবাদ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা। ম্যাটিলডা তা চাইছিলো না। তার বক্তব্য—'এ পরিবার ভেঙে আলাদা হয়ে যাক্—এ আমি চাই না। তাছাড়া এখনই চলে গেলে তোমাদের বাবার কী হবে? তিনি এসে আমাদের কোথায় খুঁজে পাবেন?'

টম শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে তার মতামত জানালো—'নতুন জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এখনো আমরা প্রস্তুত হইনি। এত শীঘ্র কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। যখন উপযুক্ত সময় আসবে—আমি নিজেই তোমাদের বলবো।'

সবাই তার যুক্তি মেনে নিলো। সে রাতের মতো সভা ভঙ্গ হলো।

এক সপ্তাহের মধ্যে জমির ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যে যার জমিতে পরিশ্রম করতে লাগলো। একদিন টম সকালবেলা তার কামারশালা ছেড়ে ভাইদের কাছে আসছিলো—বড়রাস্তায় একাকী এক অশ্বারোহী চোখে পড়লো। আর একটু কাছে এলে চিনতে পারলো—রুগ্ন ঘোড়ার পিঠে ছিন্নবাস মেজর কেটস্। কেটস্ তাকে দেখে ঘোড়ার লাগাম রুখে চেঁচিয়ে উঠলো—'এই নিগ্রো, এক গ্লাস জল দাও!'

টম কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলো। পরে জল নিয়ে তার কাছে গিয়ে ধীর কণ্ঠে বললো—'মিঃ কেটস্, সময় বদলে গিয়েছে। তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া উচিত বলেই আপনাকে জল দিলাম। আপনার চিৎকারে ভয় পেয়ে নয়। এটা আপনাকে জানানো দরকার।'

কেটস্ তার হাতে গ্লাস দিয়ে বললো—'আর এক গ্লাস দাও!'

টম গ্লাসটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে নিজ গন্তব্যে চলে গেলো। আর ফিরে তাকালো না।

শীঘ্রই বিবর্ণ সবুজ স্কার্ফের ওপর বিধ্বস্ত কালো ডার্বি মাথায় আর একটি অশ্বারোহী তাদের মাঝে মহা আলোড়ন জাগালো। 'মা! এসেছেন! এসেছেন!' —ছেলেরা চিকেন জর্জকে কাঁধে তুলে নিলো। ম্যাটিলডা কাঁদতে লাগলো।

সবাই শান্ত হলে চিকেন জর্জ তার স্বভাবসিদ্ধ হাঁকডাকে পরিবারের সকলকে একত্র করলো। তারপর নিজস্ব নাটকীয় ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলো—'আমরা সবাই যেখানে যাচ্ছি, এবার সে জায়গাটার সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।' চারিদিকে অটুট নিস্তব্ধতা। চিকেন জর্জ বলতে লাগলো, সে পশ্চিম টেনেসিতে জায়গা দেখে এসেছে। স্থানীয় সাদা মানুষদের সাথে তার কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছে। এরা গিয়ে সেখানে নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলবে। নতুন শহর হবে। —'অতি চমৎকার জায়গা। সেখানকার কালো মাটি এত উর্বর যে শুয়োরের লেজ পুঁতলে শুয়োর গজাবে। তরমুজ নিমেষের মধ্যে বেড়ে উঠে বাজির মতো শব্দ করে ফেটে যায়—রাতে শব্দের চোখে ঘুমোতে পারবে না। পোসামগুলো এত মোটা, নড়তে পারে না। চিনি গাছ থেকে অ্যাই পুরু হয়ে চিনি গড়ায়!'

অতদূর পথ মালপত্র আর মানুষ কেমন করে যাবে, কীভাবে কিছু গাড়ী তৈরী করে নেওয়া যায়—টম তাই নিয়ে চিন্তা করছিলো। দশখানা হ'লেই নিজেদের সবাই এবং জিনিসপত্র ধরে যেতে পারে। কিন্তু সে রাত্রের মাঝেই আরো বহু লোকজন এসে পড়লো। সবাই কাছাকাছি আবাদের মানুষ। কৃষ্ণকায় হল্ট, ফিউজ প্যাট্রিক, পার্ম, টেলর, রাইট, লেক, ম্যাকগ্রেগর—এমনি আরো বহু পরিবার। অ্যালম্যানস জেলার বিভিন্ন আবাদ থেকে এসেছে। নতুন উপনিবেশের কথা শুনে সবাই সেখানে যেতে আগ্রহী। পরের দু'মাস সকলেরই প্রচুর কর্মব্যস্ততায় কাটলো। পুরুষেরা গাড়ীগুলো তৈরী করতে ব্যস্ত। মেয়েরা পথের জন্য শুকনো খাবার তৈরী করে নিচ্ছিলো। কত রকমের প্রস্তুতি তার শেষ নেই। চিকেন জর্জ শুধু সবাইকে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছিলো। সে এই কর্মকাণ্ডের নায়ক। তার উদ্যমেই এতগুলো লোকের আশ্রয় জুটবে—এ কথা কাউকে শোনাতে বাকী রাখেনি। ক্রমেই নতুন নতুন সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত পরিবার এসে জুটছিলো। টমের কাজে স্বেচ্ছাসেবকের অভাব ছিলো না। সকলেই নিজ নিজ আবাদের মালবওয়া গাড়ীগুলো এনে ভ্রমণের উপযোগী করে নিচ্ছিলো। টম সবাইকে জানিয়ে

দিয়েছিলো—যে কেউ তাদের সঙ্গী হতে পারে। কিন্তু পরিবারপ্রতি অন্ততঃ একটি করে গাড়ীর ব্যবস্থা থাকতে হবে। অবশেষে সেই অসামান্য যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হলো। আঠাশটি গাড়ী মাল বোঝাই হয়ে যাবার জন্য তৈরী। একটি নিশ্চিন্ত প্রশান্তির সাথে বেদনাও মেশানো ছিলো। চিরদিনের মতো চলে যাবার আগে ফেলে যাওয়া বহুপরিচিত জিনিসগুলি তারা শেষবারের মতো পরম আদরে স্পর্শ করে নিচ্ছিলো।

সাহেব মেম সাহেবকে বহুদিন দেখা যায়নি। ম্যাটিলডা কেঁদে বললো—'তাঁদের যে কী ভাবে দিন কাটছে—সে আমি বুঝতে পারি।'

সে রাত্রে সবাই যার যার গাড়ীতেই শুলো। ভোরেই যাত্রা। কিন্তু বাধা পড়লো। টমের গাড়ীর পেছনে কার যেন করাঘাত! দরজা খুলে দেখা গেলো তাদের পূর্বপরিচিত এক হতদরিদ্র শ্বেতকায় যুবক। সে আর তার স্ত্রী। দুনিয়াতে তাদের কেউ নেই। অন্নবস্ত্রের সংস্থানও নেই। টম কি দয়া করে তাদের সঙ্গে নেবে? এ কাজ টমের একার মতে হতে পারে না। সে প্রতিটি গাড়ীর লোকেদের জড়ো করে এ বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাইলো। ছেলেটির নাম জর্জ জনসন, স্ত্রীর নাম মার্থা। কিছু কিছু লোকের শ্বেতকায়দের সম্পর্কে প্রচণ্ড বিরাগ ছিলো। কিন্তু তাদের আপত্তি টিঁকলো না। অধিকাংশই জনসনদের নিয়ে যেতে রাজী হলো।

আবার একদিন দেরী। জর্জ ও মার্থার জন্য আর একটি গাড়ী তৈরী করতে হলো। এবার যাত্রা শুরু। উনত্রিশটির গাড়ীর দীর্ঘ সারির সর্ব সম্মুখে চিকেন জর্জ। সে তার ওল্ড বব নামে ঘোড়ায় চেপে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তার বয়স তখন সাতষট্টি। গলায় সবুজ স্কার্ফ, মাথায় ডার্বি টুপি—তাতে একটি মোরগের পালক গোঁজা। জর্জের পেছনে প্রথম গাড়ীটির চালক টম। আইরিন পাশে বসে। পেছনে বড় বড় চোখ করে কৌতূহলী বাচ্চারা। সবচেয়ে ছোট সিন্থিয়ার বয়স তখন দুই। সেই কনিষ্ঠা কন্যা। মারিয়া ও এলেনের পর তাদের তৃতীয় কন্যা ভিনী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলো। তারপর লিটল ম্যাটিলডা, এলিজাবেথ এবং ইয়ং টম। টমের গাড়ীর পেছনে আরো আটাশটি গাড়ীতে কালো বা মিশ্রবর্ণের স্ত্রী পুরুষ। সর্বশেষে জর্জ ও মার্থা জনসন। চিকেন জর্জের প্রতিশ্রুত স্বপ্নরাজ্যের জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো।

সাতাশি

'এই সেই ?' টম প্রশ্ন করলো।

'এই তোমার প্রতিশ্রুতির সোনার দেশ ?'—ম্যাটিলডার জিজ্ঞাসা।

একটি বাচ্চা অবাক চোখে প্রশ্ন করলো—'মাটি ফুঁড়ে তরমুজ আর শুয়োর দেখা যাচ্ছে না তো !'

চিকেন জর্জ রাশ টেনে ঘোড়া থামাতেই চারিদিক থেকে প্রশ্নের ঝড় উঠলো। সামনে জঙ্গলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা। কয়েকখানা কাঠের ঘর। তিনটি সাদা মানুষ। একজন একটা পিপের ওপর বসে আছে। একজন দোলনা চেয়ারে। অপরজন দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটা টুলে বসে। পা দু'টো সামনের খুঁটির ওপর তোলা। দু'টি শ্বেতকায় ছেলে চাকা গড়িয়ে খেলছিলো। সারি সারি ধুলি আকীর্ণ গাড়ী আর আরোহীদের দেখে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। কৌতূহলী হয়ে পরস্পরকে ইঙ্গিতে ঠেলাঠেলি করতে থাকে। চাকাটা ছেলেদের নাগালের বাইরে গড়িয়ে এসে রাস্তায় কয়েক পাক খেয়ে পড়ে গেলো। একটা কুকুর গা চুলকাচ্ছিলো। যাত্রীদের দেখে একটা পা তুলে ঘাড় কাত করে তাদের পর্যবেক্ষণ করে নিলো। তারপর আবার গা চুলকাতে শুরু করলো।

'হ্যাঁ, এটাই সে জায়গা। এখানেই উপনিবেশ গড়ে উঠবে। এখন মাত্র শ'খানেক সাদা মানুষ বাস করে। আমাদের সাথের কয়েকখানা গাড়ী তো পথেই যাত্রা শেষ করেছে। মাত্র পনেরো গাড়ী লোক আমরা এখানে এসে পৌঁচেছি। আমরা আসাতে এখানকার লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হলো। একটা নতুন শহরের পত্তন হবে এখানে। চাষের জমি এখনো তোমরা চোখেই দেখনি। দেখো সে কেমন সেরা জমি !'

ছেলেরা মুখ বাঁকালো। কিন্তু চিকেন জর্জ যথার্থ বলেছিলো। সেখানে অতি উৎকৃষ্ট জমি ছিলো। পরিবার প্রতি ত্রিশ একর করে জমি মিললো। অত্যন্ত উর্বর দো-আঁশলা জমি—লডারডেল জেলায়, হ্যাচি নদীর ধারে। সাদা মানুষেরা ইতি-মধ্যেই সবচেরে সেরা, সিংহভাগ জমি দখল করে নিয়েছিলো। তাদের এতগুলো পরিবারের একত্রে যে জমি মেলে সাদামানুষদের এক একজনেরই তার চেয়ে বেশী। তা হোক্। তাহলেও এরা যা পেয়েছিলো তা ত্রিশভাগের এক ভাগও তো আগে কখনো পায়নি।

তারা প্রথমেই ঘর তোলেনি। গাড়ীতে কোনক্রমে মাথা গুঁজে থেকে জমি চাষ করে শস্য বুনে দিয়েছিলো। বেশীর ভাগ জমিতে তুলো। কিছু জমিতে ভুট্টা,

খানিকটা সবজি। আর এক ফালি করে ফুলের বাগান। তারপর গাছ কেটে, কাঠ চিরে ঘর তৈরীর কাজ। চিকেন জর্জ ঘোড়ায় চেপে প্রতি পরিবারের জমিতে ঘুরে ঘুরে যথারীতি উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছিলো। নিজের কৃতিত্বের ঢাকও পেটানো হচ্ছিলো। হেনিঙ অঞ্চলের নতুন উপনিবেশের শ্বেতকায়দের কাছেও তার যাতায়াত ছিলো। এ অঞ্চল গড়ে তুলে নতুন শহরের পত্তন করতে কালোদের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—সেকথা বোঝানোই উদ্দেশ্য। তার মধ্যমপুত্র টম কর্মকারের কাজে অতিশয় দক্ষ। শীঘ্রই হেনিঙ অঞ্চলের প্রথম কামারশালা খোলা হবে—এ সংবাদও প্রচার করতে ভোলেনি।

তার ফলে কয়েকদিনের মাঝেই তিনটি সাদা মানুষ ঘোড়ায় চেপে টমের জমিতে এলো। টম এবং তার ছেলেরা তাদের ঘরের দেওয়ালে লাগাবে বলে মাটি সানছিলো।

ঘোড়ার পিঠ থেকেই একজন বললো—'তোমাদের মধ্যে কে কর্মকারের কাজ জানে ?'

টম উৎফুল্ল হয়ে ভাবলো—এরা নিশ্চয় তার প্রথম খরিদ্দার। সে একটু গর্বভরে এগিয়ে এলো।

'তুমি নাকি শহরে কামারশালা খুলবে ?'

'হ্যাঁ স্যর। কোথায় খুললে ভালো হবে—তাই ভাবছিলাম। কাঠের কারখানার পাশের খালি জমিটার কথা ভাবছি।'

লোক তিনটি এবার পরস্পরকে চোখের ইঙ্গিত করলো। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বললো—'স্পষ্ট করে বলাই ভালো। কামারের কাজ জান, সে খুব ভালো কথা। কিন্তু শহরে স্বাধীন ব্যবসা করতে পাবে না। ওখানে একজন সাদা ভদ্রলোকের দোকানঘর আছে। শহরে কাজ করতে চাইলে তাঁর অধীনে করতে হবে। সেটা ভেবে দেখো।'

টমের সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলে উঠলো। নিজেকে সংযত করে নিয়ে কথা বলতে একটু দেরী হলো। 'না, স্যর। তাতে আমি রাজী নই। আমি এবং আমার পরিবারের সবাই এখন স্বাধীন। আর পাঁচজনের মতো গায়ে খেটে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করতে চাই। আমাদের যার যে কাজে দক্ষতা—সে সেটাই করবে। কঠিন পরিশ্রমে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু কারো অধীনে কাজ করতে পারবো না।' লোকটির চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে সে স্পষ্টস্বরে বললো—'নিজের পরিশ্রমে যা গড়ে

তুলবো, তার ওপর অপর কারো অধিকার মানবো না। তা যদি মানতে হয় তবে বৃথাই এত দূরে এসেছি।'

তৃতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলো—'তবে তোমার এ রাজ্যে থাকা চলবে না। আরো বহু ঘুরতে হবে।'

'ঘোরাঘুরিতে আমরা অভ্যস্ত। কোথায়ও ঝামেলার সৃষ্টি করতে চাই না ঠিকই, কিন্তু আমি আত্মনির্ভর হতে চাই। সেটা যদি আপনাদের পছন্দ না হয়, তবে পরিবার নিয়ে আমাকে চলেই যেতে হবে।'

'ঠিক আছে। সে তোমার ইচ্ছা।'—দ্বিতীয় ব্যক্তিটি মন্তব্য করলো।

প্রথম জন বললো—'স্বাধীনতার আনন্দে মাথা গরম করে ফেললে তো চলবে না।'

আর কথা না বাড়িয়ে তিন জনেই ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে গেলো।

খবরটা বিদ্যুতগতিতে নতুন উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়লো। প্রতি পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এলো। চিকেন জর্জ বললো—'জানো তো, সাদারা কেমন মানুষ। একটু সামলে চলতে পারলে না? একবার কাজ শুরু হলে তোমার মতো কাজের লোকের নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে দেরী হতো না। তখন তাদেরও মত পাল্টাতো।'

ম্যাটিলডা বললো—'যেয়ো না টম। এত কষ্ট করে সব গুছিয়ে এতদূর এসেছো। স্ত্রী, কন্যাপুত্র নিয়ে আবার কোথায় ঘুরতে যাবে?'

আইরিনও যোগ দিলো—'না, টম। যেয়ো না। আর আমি পারি না। আর পথে পথে ঘুরো না।'

কিন্তু টম দৃঢ়সংকল্প। যেখানে স্বাধীন মানুষের মতো কাজ করবার অধিকার থাকবে সে সেখানেই যাবে। সে জন্য যত কষ্ট স্বীকার করতে হয়, সে রাজী আছে। তার বৃহৎ পরিবারের অন্যেরা সেখানে থেকে যেতে চাইলে—টমের আপত্তি নেই। শুধু সে তার গাড়ীতে করে স্ত্রী কন্যা পুত্র নিয়ে চলে যাবে।

ক্রুদ্ধ অ্যাশফোর্ড বললো—তাহলে সেও যাবো।

রাত্রে টম একা হাঁটতে বেরোলো। সবার ওপর আবার কষ্ট চাপিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিলো না। নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিলো। সপ্তাহের পর সপ্তাহ গাড়ী করে দীর্ঘ পথ চলা কম কষ্টকর নয়। ম্যাটিলডা বলতো—'চেষ্টা করলে সব অবস্থাতেই ভালো কিছু খুঁজে বার করা যায়।' টম সে কথাটাই ভাবছিলো।

অবশেষে একটা চিন্তা মাথায় এলো। সেটা কী ভাবে কাজে পরিণত করা যায়—আরো খানিকক্ষণ তাই ভেবে নিয়ে টম ঘুমোতে গেলো।

সকালবেলা জেমস ও লুইসকে টম একটা অনুরোধ জানালো। টমের ঘর তৈরী তখনো শেষ হয়নি। আইরিন ও ছেলেমেয়েদের জন্য তারা যেন চট করে একটা অস্থায়ী ঘর তৈরী করে দেয়। টমের গাড়ীটা আশু প্রয়োজন।

সবাই অবাক হয়ে টমের কাজ দেখছিলো। গাড়ীর মাথার ওপরের ক্যানভাসের ঢাকনা এবং ধার থেকে কাঠের দেয়াল সরিয়ে টম গাড়ীটাকে একটা চলন্ত কামারশালায় পরিণত করছিলো। নেহাই, হাপর, গরম লোহা ঠাণ্ডা করবার জন্য জলের টব—যন্ত্রপাতি রাখবার র‍্যাক সব ব্যবস্থাই গাড়ীতে থাকলো। গাড়ীর মেঝেটা ভারী কাঠের পাটতন দিয়ে মজবুত করা হলো। এক সপ্তাহ পরেই টম তার গাড়ী নিয়ে শহরে বেরোলো। সাদা, কালো—সবাইকেই সে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করছিলো—তাদের কামারের কাজের প্রয়োজন আছে কিনা। নতুন উপনিবেশে কামারের কাজের প্রচুর চাহিদা। সে চাহিদা দিন দিন বাড়ছিলো। ন্যায্য মজুরীতে ভালো ভাবে কাজ করে দিতে পারলে লোকে সে কাজ নেবে না কেন? কাজেই একজন কালো লোকের নিজের গাড়ী থেকে কামারের কাজ করায় কেউ কোন আপত্তি খুঁজে পেলো না। বরঞ্চ এতে টমের ভালোই হলো। দোকানে স্থিত হয়ে বসে কাজ করার চেয়ে গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে তার ব্যবসা আরো ভালো হচ্ছিলো। ক্রমে তার কাজ লোকের কাছে এমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো যে কারো পক্ষে তার বিরোধিতা করা সম্ভব ছিলো না। টম নিজের কাজ ছাড়া অপর কোন ব্যাপারে মাথা গলাতো না। স্বভাবগুণে সে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকায় মারে-দের পুরো পরিবারটিরই স্থানীয় সমাজে সৎ, ভদ্র ও ধর্মভীরু বলে সুনাম হয়েছিলো। বাজারে সাদা মানুষদের গল্পগুজবে তাদের নাম সৌজন্যের সাথে উল্লেখ করা হতো। জর্জ জনসন শুনে এসে সে কথা এদের জানিয়েছিলো।

কিন্তু জর্জ জনসন কালোদের সাথে নতুন বসতিতে এসেছিলো বলে স্থানীয় শ্বেতকায় সমাজে অনেকটা পতিত হয়ে ছিলো। দোকানদারেরা অন্যান্য শ্বেতকায় খরিদ্দারেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তবে তার দিকে ফিরে তাকাতো। একবার টুপি কিনতে গিয়ে মাথায় ছোট হচ্ছিলো বলে একটি টুপি সে দোকানের তাকে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলো। কিন্তু দোকানদার সে টুপিটি তাকে কিনতে বাধ্য করে। অ্যাশফোর্ড এ ঘটনায় দোকানদারের ওপর ভয়ানক চটে যায়।

লিটল জর্জ ঠাট্টা করে জর্জ জনসনকে বলেছিলো—'এত কম বুদ্ধিওয়ালা মাথায় কোন টুপি ছোট হয় কী করে তাও তো বুঝতে পারি না!'

সাদা মানুষের সাথে সামাজিক আদানপ্রদান তাদের ছিলো না। তবুও কালোরা সেখানে বসতি স্থাপন করায় স্থানীয় শ্বেতকায়দের উপকারই হয়েছিলো। নতুন বসতকারীরা নিজেদের বস্ত্র ও খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করছিলো। কিন্তু বাসস্থান তৈরী করতে, ভূসম্পত্তির চারিপাশে বেড়া লাগাতে পরের দু' বৎসরে তাদের প্রচুর পরিমাণ করোগেটেড টিন, পেরেক ও কাঁটা তারের প্রয়োজন হয়েছিলো। সে প্রয়োজনের পরিমাণ দিয়ে কালোদের নিজেদের গোষ্ঠীর উন্নতির পরিমাপ করা যাচ্ছিলো। আবার শ্বেতকায়দের ব্যবসায়ও সে পরিমাণই বেড়ে যাওয়াতে তারা পুলকিত হয়েছিলো।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মাঝে নবাগতদের বসতবাড়ী, গোলাঘর, পশুশালা, ভূসম্পত্তির বেষ্টনী ইত্যাদির কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। ম্যাটিলডার একান্ত আগ্রহে তারপর তারা কালোদের জন্য নিজস্ব একটি গির্জা তৈরী করতে মনস্থ করে। গির্জাটি শেষ হতে প্রায় এক বৎসর সময় লেগেছিলো। তাদের এতদিনের সঞ্চয় অধিকাংশই এতে খরচ হয়ে যায়। কিন্তু সেই সময়, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিলো। টম, তার ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা যখন গির্জার শেষ আসনটি তৈরীর কাজ শেষ করে, সীয়ার্সে ফরমাইশ দেওয়া আড়াইশো ডলার দামের রঙীন কাঁচের জানালাটি যখন আইরিনের হাতে বোনা বেগুনি রঙের ক্রস চিহ্ন আঁকা বস্ত্রটি দিয়ে সাজানো হয়—তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছিলো নিউ হোপ কালারড্ মেথডিস্ট এপিস্কোপাল চার্চটি স্থাপত্য ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় হয়েছে।

প্রথম রবিবারের প্রার্থনায় অগণিত জনসমাবেশ হয়েছিলো। কুড়ি মাইলের মধ্যে যত কালো মানুষ ছিলো একান্ত অক্ষম ছাড়া সবাই উপস্থিত হয়েছিলো। গির্জার ভেতর উপচে বাইরের প্রাঙ্গণে জনতায় ভরে গিয়েছিলো। ডাঃ ডি. সি. হেনিঙের পূর্ববর্তী ক্রীতদাস রেভারেণ্ড সাইলাস হেনিঙ সেদিনকার প্রার্থনাসভা পরিচালনা করেন। নিবিড় লোক সমাগম সত্ত্বেও অটুট নীরবতার জন্য রেভারেণ্ড সাইলাস হেনিঙের উদ্দীপিত ধর্মোপদেশের কণামাত্রও কারো শুনতে অসুবিধা হয়নি।

চিকেন জর্জ ম্যাটিলডাকে কখনো এত আনন্দিত দেখেনি। প্রার্থনার শেষে সমবেত সঙ্গীতে সকলেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যোগ দিয়েছিলো। সকলেরই চোখে জল। উপাসকেরা পূর্ণ হৃদয়ে যাজকের করমর্দন করে। গভীর প্রশান্তিতে এই স্মরণীয়

উপাসনাসভার সমাপ্তি ঘটে। তারপর বাইরে চাদর বিছিয়ে যে যার সঙ্গে আনা খাবার নিয়ে চড়ুইভাতি করতে বসেছিলো। এত খাবার, এত আনন্দোচ্ছ্বাস—সে যেন এক মহোৎসবের মেলা।

ছেলেরা সেদিন কোট ও টাই পরেছিলো। বয়স্কা মহিলারা সাদা পোষাক। ছোটরা উজ্জ্বলবর্ণের জামাকাপড়ে ছুটোছুটি করছিলো। ম্যাটিলডা জলভরা চোখে তাকিয়ে দেখছিলো। স্বামীর মোরগের ঠোকরে ক্ষত চিহ্নিত হাতটি তার হাতে ধরা ছিলো—'জর্জ, আজকের দিনটি কখনো ভুলবো না। ডার্বি টুপি মাথায় দিয়ে যেদিন আমাকে বিয়ে করতে এসেছিলে—সেদিনটি পার হয়ে আমরা বহুদূর পথ চলে এসেছি। ঈশ্বরের কৃপায় পরিবারের সকলকে নিয়ে সুখে আছি। শুধু আজ যদি তোমার মা কিসি আমাদের মাঝে থাকতেন!'

বাষ্পাকুল নয়নে জর্জ বলেছিলো—'আছেন, ম্যাটিলডা, তিনিও আছেন। ওপর থেকে সব দেখছেন।'

অষ্টাশি

নিউ হোপ সি এম ই চার্চের তত্ত্বাবধায়ক মণ্ডলীতে চিকেন জর্জ, টম এবং তার ভাইয়েরা ছিলো। তারা আরো একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলো। সে অঞ্চলে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি স্কুল চালু ছিলো। গত দুই বৎসর যাবৎ সেটি বাইরে খোলা জায়গাতে চলছিলো। টেনেসির জ্যাকসন শহরের লেন কলেজের স্নাতক সিস্টার ক্যারি হোয়াইট সে শহরে আসার পর থেকে তিনি-ই ছোটদের পড়তে, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শেখাচ্ছিলেন। এবার সে স্কুলটি চার্চের ভেতর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলো। তত্ত্বাবধায়কেরাই বই খাতা পেন্সিলের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলো। পাঁচ থেকে পনেরো বৎসরের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়তে আসতো। তার মাঝে টমের নিজেরই পাঁচটি। বড় মারিয়া জেনের বয়স তখন বারো। তারপর এলেন, ভিনী, লিটল ম্যাটিলডা এবং ছ'বছরের এলিজাবেথ। পরের বছর ইয়ং টম, আরো পরে সর্বকনিষ্ঠা সিন্থিয়ার স্কুলে যাবার বয়স হয়েছিলো।

সিন্থিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্নাতক হয়। ততদিনে মারিয়া জেন এক সন্তানের জননী। পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবিনী ছাত্রী ছিলো এলিজাবেথ। তার বাবা টম মারে-কে এলিজাবেথ লিখতে পড়তে শেখায়। সে-ই তার বাবার ব্যবসায়ের

হিসাবপত্র রাখতো। সে সময় টম মারে-র ব্যবসায়ের জাজ্জল্যমান অবস্থা। গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে কাজ ছাড়াও শহরে তার একটি স্থায়ী দোকানঘর ছিলো। এ বিষয়ে কেউই বিন্দুমাত্র আপত্তি তোলেনি। টম মারে তখন সে অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বছর খানেক পরে এলিজাবেথ হেনিঙে নবাগত জন টোল্যাণ্ডের প্রেমে পড়লো। হ্যাচি নদীর ধারে একটি শ্বেতকায় পরিবারের ছ'শো একর জমিতে ছেলেটি ভাগে চাষ করতো। শহরের একটি দোকানে দুজনের আলাপ পরিচয় হয়। ছেলেটির সুগঠিত দেহ, সুন্দর মুখশ্রী ও ভদ্র ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করতো। কিন্তু এলিজাবেথ আকৃষ্ট হয়েছিলো তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ও মর্যাদাপূর্ণ আচার আচরণে। সে লক্ষ্য করেছিলো ছেলেটি সামান্য লেখাপড়াও জানে। কারণ দোকানের রসিদ পত্রে সে নিজেই সই করতো। কয়েক সপ্তাহ দু'জনে এক সাথে ঘুরে বেড়িয়েছে। এলিজাবেথ খবর নিয়েছে সে অঞ্চলে ছেলেটির যথেষ্ট সুনাম। নিয়মিত চার্চে যায়। টাকা পয়সা জমিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের চাষবাস আরম্ভ করবার ইচ্ছা। যেমন সবল দেহ, তেমনি নম্র শান্ত স্বভাব।

পরিচয় হবার প্রায় দু'মাস পরে তারা বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছে, সে সময় টম একদিন এলিজাবেথকে নির্দেশ দিলো—ছেলেটিকে বাড়ীতে নিয়ে আসতে। এদের ঘনিষ্ঠতার খবর টম প্রথম থেকেই জানতো।

টমের প্রতি জন টোল্যাণ্ডের ব্যবহার অত্যন্ত আন্তরিক ও সম্ভ্রমপূর্ণ ছিলো। তবুও স্বল্পবাক টম মারের গাম্ভীর্য ছেলেটিকে দেখে যেন শত গুণে বেড়ে গিয়েছিলো। বহুকষ্টে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাবার পর টম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। জন টোল্যাণ্ড চলে যাবার পর টম মেয়েকে ডেকে পাঠালো—

'তোমরা বিয়ে করতে চাও? আমি তোমার সুখ চাই, কাজেই আমার আশীর্বাদ তুমি সকল অবস্থাতেই পাবে। ছেলেটিকে ভালো বলেই মনে হলো। কিন্তু যদি আমার মত জানতে চাও তবে বলবো—আমি স্বেচ্ছায় তার সাথে কখনও তোমার বিয়ে দেবো না।'

বিস্মিত এলিজাবেথ হতবাক হয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

'তার গায়ের রঙেই আমার আপত্তি। বড় বেশী সাদা ঘেঁষা। সাদা মানুষ বলেই চালানো যেতো। তবু একটু উনিশ বিশ আছে। আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর। সে এত বেশী ফর্সা যে কালোদের মাঝে বেমানান হবে। আবার সাদা মানুষের মতো অতটা ধবধবে নয় বলে তাদের সমাজেও চলবে না। তার গায়ের রঙের জন্য ছেলেটি দায়ী নয় ঠিকই। কিন্তু তাকে বিয়ে করলে তোমাকে নানা

সমস্যায় পড়তে হবে। কোন সমাজেই সে নিজেকে ঠিক মানিয়ে চলতে পারবে না। ভবিষ্যতে তোমার সন্তানদেরও ওরকম রঙ হতে পারে। সেটা ভাল করে ভেবে নাও। এলিজাবেথ, তোমার জন্য আমি ওরকম সমস্যাপূর্ণ জীবন কামনা করি না।'

'কিন্তু বাবা, জনকে সবাই ভালোবাসে। জর্জ জনসন আমাদের সাথে এ উপ-নিবেশে এসেছে। তার সাথে যদি আমরা বসবাস করতে পারি, তবে এর সাথেই বা পারবো না কেন?'

'ও দুটো এক কথা হলো না।'

'বাবা, তুমি বলছো লোকে তাকে আপন বলে মেনে নেবে না। সে লোকেদের মাঝে তুমি সবার আগে। তুমিই তাকে আপন বলে মেনে নিতে পারছো না।'—এলিজাবেথ মরিয়া হয়ে উঠেছিলো।

'থাক—যথেষ্ট হয়েছে। নিজেকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার সুবুদ্ধি তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে। তুমি এ ছেলেটির সাথে মেলামেশা কর—তা আমার ইচ্ছা নয়।'

এলিজাবেথ কেঁদে ফেললো—'জন ছাড়া আর কাউকে আমি কখনো বিয়ে করবো না।'

টম মারে রাগ করে সজোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ম্যাটিলডা ব্যাপারটি শুনে ভারী উত্তেজিত হয়ে ওঠে—'ছেলেটির দেহে সাদা মানুষের রক্ত আছে!'—চিৎকার করে উঠে সে নিজের বুক চেপে ধরে বিকৃত মুখে ঢলে পড়লো। আইরিন পাশে ছিলো। তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলেছিলো। ততক্ষণে ম্যাটিলডার বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, চক্ষু মুদিত। কান পেতে তার হৃৎপিণ্ডর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। কিন্তু মাত্র দু'দিন। তারপর চিরদিনের মতো তা নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।

চিকেন জর্জ কাঁদেনি। কিন্তু তার স্তব্ধতা, তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি দেখে অতি নিষ্ঠুরেরও বুক ভেঙে যেতো। তার মুখের হাসি ও মিষ্টি কথা চিরকালের মতো ফুরিয়ে গেলো। রাতারাতি শুকিয়ে এক বিশীর্ণ বৃদ্ধে পরিণত হলো। ম্যাটিলডার সাথে এতদিন যে ঘরে শুয়েছিলো, আর সে ঘরে ঢোকেনি। পালা করে এক এক ছেলে মেয়ের কাছে থাকতে লাগলো। তার রূঢ়, কর্কশ ব্যবহারে সে বাড়ীর লোক তিতবিরক্ত হয়ে উঠলে অন্য বাড়ী চলে যেতো।

জন্মদিনের কেক জর্জ জীবনে আর ছোঁয়নি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে সে তার বড় নাতনী মারিয়া জেনের বাড়ীতে ছিলো। তিরাশি বৎসরের বৃদ্ধ একা আগুনে সামনে বসে ছিলো। মারিয়া পাশের ক্ষেতে তার স্বামীকে খাবার পৌঁছে

দিতে গিয়েছিলো। ফিরে এসে দেখে জর্জ কখন অজানতে আগুনে পড়ে গিয়েছে। নিজেকে টেনে যতদূর সম্ভব সরিয়ে নিয়েছিলো। তবুও দেহের অনেকটাই পুড়ে গিয়েছে। তার ডার্বি টুপি, স্কার্ফ ও সোয়েটার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিলো। শেষরাত্রে সে মারা যায়।

তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হেনিঙবাসী কালোরা সকলেই উপস্থিত ছিলো। তার মাঝে বৃদ্ধের নিজের সন্তান, নাতি-নাতনী এবং তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম নয়।

উননব্বই

সিন্থিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো—'মা, উইল পামারের সাথে বেড়াতে যেতে পারি?'

টম জিজ্ঞেস করলো—'কে?'

'উইল পামার।—ঠিক আছে তো?'

টম শুষ্কস্বরে বললো—'ভেবে দেখি।'

সিন্থিয়া অত্যন্ত আহত মুখে সরে গেলো।

আইরিন বিব্রত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—'আচ্ছা টম! কী ব্যাপার বল তো? কোন ছেলেই কি তোমার মেয়েদের উপযুক্ত নয়। শহর সুদ্ধ লোকে জানে পাঁড় মাতাল মিঃ জেমসের কাঠের ব্যবসা আসলে চালাচ্ছে উইল। গাড়ী থেকে কাঠ নামানো থেকে শুরু করে বিক্রী করা, পৌঁছে দেওয়া, বিল তৈরী, টাকা আদায়, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় যতরকমের কাজ সে একাই করছে। হেনিঙের লোকেদের এ স্বচক্ষে দেখা। ছোটখাটো ছুতোরের কাজও উইল বিনা খরচায় খরিদ্দারদের করে দেয়। এত কাজের জন্য যৎসামান্য পারিশ্রমিক সে পায়। অথচ মিঃ জেমসের বিরুদ্ধে তার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই।'

'হ্যাঁ, কাজকর্ম তো সে ভালোই করে। চার্চেও নিয়মিত যায়। কিন্তু লুনা কার্টারকে ফুল দিয়েছিলো কেন?'

টম এতও খবর রাখে! আইরিন অবাক হয়ে গেলো—'সে তো বছর খানেক আগেকার কথা। এখন তার সাথে উইল কথাও বলে না।'

'একবার যে অমন করেছে, সে বার বারই করতে পারে।'

'না, সিন্থিয়ার সাথে করবে না। তার মতো মেয়ে ক'টা হয়? যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি চমৎকার শিক্ষা-দীক্ষা। উইল থেকে সে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে। টম, অমন করো না। ওদের মেলামেশা করতে দাও। তারপর পছন্দ হয় কিনা সে ওরা বুঝবে।'

টম তার মেয়েদের সম্পর্কে অতি সতর্ক। আইরিনকে বুঝতেই দিলো না উইল পামার সম্বন্ধে সে আগেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে পছন্দ করে রেখেছিলো। উইল হেনিঙে আসার পর থেকেই টম তাকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে রেখেছিলো। উইলকে তার খুবই পছন্দ। উইলের মতো বাস্তববুদ্ধি নিজের ছেলের মাঝে পেলে সে সুখী হতো। উইল পামারের আন্তরিকতা, উচ্চাশা ও অসাধারণ কর্মদক্ষতা তাকে নিজের যৌবনকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো।

দশ মাস পরে নিউ হোপ সি এমই চার্চে সিন্থিয়ার সাথে উইল পামারের বিবাহ হয়। প্রায় দু'শো লোক বিবাহোৎসবে যোগ দিয়েছিলো। বহুদূর থেকেও গাড়ী করে অতিথিরা এসেছিলো। সেটা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। উইল নিজের হাতে তাদের ছোট্ট বাড়ীটি তৈরী করেছিলো। এক বৎসর পর তাদের প্রথম পুত্রসন্তানটি জন্মের কয়েকদিন পর মারা যায়।

উইল পামার পারতপক্ষে ছুটি নিতো না। সারা সপ্তাহই কঠোর পরিশ্রম করতো। কাঠের ব্যবসায়ের মালিক মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কার্যতঃ উইল-ই ব্যবসা চালাচ্ছিলো। একবার শুক্রবার সন্ধ্যায় উইল একটা সংকটে পড়ে গেলো। কোম্পানীর হিসাবপত্রে দেখা গেলো সেদিনই পিপলস ব্যাঙ্কে এক কিস্তি টাকা শোধ দেবার কথা। বাইরের প্রবল ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে উইল ঘোড়ায় চেপে ভিজতে ভিজতে আট মাইল দূরে ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলো—

'মিঃ ডন, মিঃ জেমসের এই টাকাটা পাঠাতে ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি জানি তিনি সোমবার পর্যন্ত টাকাটা ফেলে রাখতে চাননি।'

ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট তাকে ভেতরে এসে বসবার সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু উইল বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছিলো।

এ ঘটনাটি প্রেসিডেণ্টের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিলো। শহরে অনেকের কাছেই তিনি এ কাহিনী বলেন। এর ফলে ভবিষ্যতে উইলের জীবনে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসেছিলো।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে পিপলস ব্যাঙ্কে উইলের ডাক পড়ে। হেনিঙের দশ

জন অগ্রগণ্য শ্বেতকায় ব্যবসায়ী সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের চেহারায় কিছুটা অস্বস্তি ও অনিশ্চিতভাব ফুটে উঠেছিলো। প্রেসিডেন্ট ডন অল্প কথায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।—কাঠের ব্যবসায়ের মালিক মিঃ জেমসকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অথচ হেনিঙ শহরে কাঠের অত্যন্ত চাহিদা। এ ব্যবসায়টি শহরে থাকা প্রয়োজন। উইলকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—'এ ব্যবসা চালাতে গেলে তোমার চেয়ে উপযুক্ত লোক এখানে নেই। এ বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করে নিয়েছি। তুমি যদি এটা নিতে রাজী হও, কোম্পানীর দেনা শোধের ব্যবস্থা আমরা করবো।'

উইলের চোখে জল এসেছিলো। সে যখন প্রত্যেকের করমর্দন করছিলো তাদেরও চোখ শুষ্ক ছিলো না। সবাই চলে গেলে উইল একটু বেশী সময় প্রেসিডেন্টের হাত ধরে থাকলো—'মিঃ ডন, আপনার কাছে আর একটি অনুগ্রহ চাইবো। আমার সঞ্চয়ের অর্ধেক আমি মিঃ জেমসকে দিতে চাই। আপনি তার ব্যবস্থা করে দিন। কিন্তু তিনি যেন কখনো না জানতে পারেন—কোথা থেকে টাকাটা এলো।'

এক বৎসরের মধ্যে উইলের ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেলো। ন্যায্য দামে সর্বোৎকৃষ্ট মাল পাবার আশায় দূরদূরান্ত থেকে গাড়ী ভর্তি খরিদ্দার উইলের দোকানে আসতে লাগলো। বেশীর ভাগ লোক কালো। উইল পশ্চিম টেনেসিতে স্বাধীন ব্যবসায়ের সর্বপ্রথম কৃষ্ণকায় সত্বাধিকারী ছিলো। তাকে কেবলমাত্র চোখে দেখবার জন্য আটচল্লিশ মাইল দূরের দক্ষিণ মেম্ফিস অঞ্চল থেকে পর্যন্ত কৌতূহলী মানুষেরা আসতো।

নব্বই

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সিন্থিয়া ও উইলের মনোবাসনাটি পূর্ণ হয়। একাগ্র প্রার্থনার উত্তরে তাদের একটি স্বাস্থ্যবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় বার্থা জর্জ। জর্জ উইলের বাবার নাম। টম যারে যেমন করে তার সন্তানদের আফ্রিকা দেশীয় কুণ্টা কিণ্টের কাহিনী শোনাতো, সিন্থিয়াও তেমনি করে তার পরিবারের সবাইকে একত্র করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে সে কাহিনী শুনিয়েছিলো।

পূর্বপুরুষের প্রতি সিন্থিয়ার এই অনুরক্তি ও বিশ্বস্ততা উইল শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু সন্তানের ব্যাপারে নিজের প্রাধান্যকে বিসর্জন দিতে সে রাজী ছিলো না। বার্থা হাঁটতে শিখবার আগে থেকে তার উপর একচ্ছত্র অধিকার সে পাকা করে নিয়েছিলো। যতক্ষণ বাড়ী থাকতো উইলের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিলো বার্থার দেখাশোনা করা। বার্থার পাঁচবছর বয়সের মাঝেই সে এ কারণে স্থানীয় কৃষ্ণকায়দের মাঝে আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সকলেই বলতো উইল তার মেয়ে বার্থাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে তার মাথা খাচ্ছে। হেনিঙের প্রতিটি দোকানে বলা ছিলো বার্থা যত খুশী মিষ্টি ধারে কিনতে পারবে। মাসের শেষে উইল সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিতো। বার্থার নিজেরও হিসাব রাখতে হতো। উইলের বক্তব্য ছিলো—সে এভাবে মেয়েকে ব্যবসায় শেখাচ্ছে। বার্থার পনেরো বৎসরের জন্মদিনে তার নামে সীয়ার্সরোবাকে মেল অর্ডার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিলো। ক্যাটালগ দেখে তার ইচ্ছামত অর্ডার দিলেই সে জিনিস চলে আসবে। তার বাবা পরে দাম মেটাবেন।

শহরের লোকেরা চরম বিস্ময়ে আর একবার মাথা নেড়েছিলো। এমন অভাবনীয় প্রশ্রয়ের কথা কে কবে শুনেছে!

সে বছরই বার্থাকে পিয়ানো শেখাবার জন্য শিক্ষক নিয়োজিত হয়। শিক্ষকটি সুদূর মেম্ফিস থেকে আসতো। বার্থা প্রতিভাময়ী ছাত্রী ছিলো। শীঘ্রই সে নিউ হোপ কালারড মেথডিস্ট এপিস্কোপাল চার্চের কয়ারে বাজাবার মতো পারদর্শিতা অর্জন করেছিলো। সেখানকার পরিচালিকা সমিতিতে সিন্থিয়া আগে থেকেই প্রেসিডেণ্ট ছিলো। উইল ছিলো সিনিয়র ট্রাষ্টি।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বার্থা স্থানীয় স্কুলের অষ্টমশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর সে হেনিঙের বাইরে টেনেসি রাজ্যের জ্যাকসনের লেন ইনষ্টিটিউটে একটি দু'-বছরের কোর্স পড়তে যায়। সেটি কলেজে ডিগ্রীকোর্স পড়বার সমতুল্য। বাইরে পড়তে যাওয়া অবধি বার্থা তার মা ও বাবার উচ্চারণ ও ব্যাকরণের ভুলসংশোধন করতে শুরু করে। সিন্থিয়ার সেটা পছন্দ হতো না। কিন্তু উপায় ছিলো না। উচ্চ-শিক্ষার উদ্দেশ্যই তাই। নইলে উচ্চশিক্ষা লোকে নেয় কেন? তবুও সিন্থিয়া মেয়ের মাঝে বড়দের ক্রটি ধরবার এই চেষ্টায় দুঃখ পেতো। স্বামীকে বলেছিলো—'জানি না কী হবে! মেয়েটা যে কিছুই বোঝে না।'

উইল তাকে সান্ত্বনা দিতো—'না বোঝাই ভালো। আমাদের চেয়ে সে জীবনে অনেক বেশী সুযোগ পাবে—সেটাই আমার একমাত্র কাম্য।'

বার্থা শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রী নিচ্ছিলো। তাছাড়া সে একটি স্কুলে গান করতো ও ও পিয়ানো বাজাতো। প্রতি মাসে দু'বার বাড়ী আসতো। সে সময় বাবাকে সে ব্যবসায়িক বুদ্ধি দিতো। এ বিষয়ে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিলো। কিছুদিন পর টেনেসির সাভানা শহরের সাইমন আলেকজাণ্ডার হেলি নামে এক যুবকের সাথে তার আলাপ হয়। সে কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্র। অত্যন্ত গরীব। পড়ার খরচ চালাতে তাকে চার জায়গায় কাজ করতে হতো। বার্থার সাথে একবৎসর পরিচয়ের পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উইল ও সিন্থিয়া ছেলেটির সাথে পরিচিত হবার জন্য তাকে নিজেদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানায়। বার্থার কলেজের বন্ধু আসবে জেনে সে রবিবার নিউ হোপ সি. এম. ই. চার্চে স্থানীয় কৃষ্ণকায় সমাজের লোকের ভীড়ে তিল-ধারণের স্থান ছিলো না। শুধু সিন্থিয়া এবং উইল পামার নয়, সকলেই যুবকটিকে সাগ্রহে যাচাই করে নিচ্ছিলো। কিন্তু সাইমনের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিলো। বার্থার পিয়ানো বাজনার সাথে প্রথমে সে একটি গান করে। পরে উপস্থিত সকলের সঙ্গেই সপ্রতিভ ভাবে আলাপ পরিচয় করে। তার চোখের দৃষ্টি সহজ ও সরল। ব্যবহার ভদ্র ও আন্তরিকতা পূর্ণ।

সন্ধ্যার বাসে বার্থা ও সাইমন লেন কলেজে ফিরে যায়। সমাজের কারোরই ছেলেটির বিরুদ্ধে বলবার মতো কিছু ছিল না। শুধু তার গায়ের রঙটি বড়ই ফর্সা। বার্থার গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী। সাইমন তাকে জানিয়েছিলো—সাইমনের বাবা ও মা দুজনেই মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। তাদের দু'জনেরই বাবা আয়র্ল্যাণ্ডের সাদা মানুষ ছিলো। এই ত্রুটিটুকু ছাড়া আপত্তি করবার মতো আর কিছুই পাওয়া যায়নি। সাইমন ভালো গান করে, এবং উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও তার ভেতর আত্মম্ভরিতা ছিলো না, এ কথা সবাইকে স্বীকার করতেই হয়।

অবসর সময়টুকুতে চাকরী করে বহুকষ্টে কিছু অর্থসঞ্চয় করে সাইমন এরপরে নর্থ ক্যারলিনার গ্রীনসবরোর এ এ্যাণ্ড টি কলেজে চারবছরের একটি কোর্সে ভর্তি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে কলেজের সকলের সাথে সেও যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলো।

ফ্রান্সের আর্গন ফরেস্ট অঞ্চলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সাইমন শত্রুপক্ষের গ্যাসের কবলে পড়ে। বিদেশের হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাকে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দেশে

পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে আবার হেনিঙে এসেছিলো। সে বৎসরই সাইমন বার্থার সাথে বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

নিউ হোপ সি. এম. ই. চার্চে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তাদের বিবাহ হয়। হেনিঙের ইতিহাসে সেই প্রথম কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে সাদা এবং কালো সকলেই উপস্থিত হয়েছিলো। তার মূলে ছিলো উইল পামারের সুপ্রতিষ্ঠা। উইল পামার ততদিনে স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। শুধু তাই নয়। বার্থাও শিক্ষা এবং স্বভাবগুণে সকলের গর্বের বস্তু ছিলো। পামারদের সদ্য তৈরী সুবৃহৎ বাসগৃহের উদ্যানে প্রীতি সম্মেলনটির ব্যবস্থা হয়। প্রচুর খাদ্যের আয়োজন ছিলো। যত উপহার জড়ো হয়েছিলো, সাধারণতঃ তিনটি বিবাহেও তা হয় না। লেন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জ্যাকসন থেকে আনা নেওয়ার জন্য উইল পামারই বাস ভাড়া করে দেয়।

এরপর সাইমন ইথাকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য ভর্তি হয়েছিলো। বার্থা সেখানকার সঙ্গীত নিকেতনে নাম লেখায়। বার্থা নিয়মিত বাড়ীতে চিঠি দিতো। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল থেকে তার চিঠির সংখ্যা কমে আসতে থাকে। সিন্থিয়া ও উইল চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। কন্যা জামাতা হয়তো কোন আর্থিক অসুবিধায় আছে মনে করে বার্থাকে তারা গোপনে পাঁচশো ডলার পাঠিয়ে দেয়। টাকাটা প্রয়োজনমত খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছিলো। আবার এও অনুরোধ জানিয়েছিলো—সাইমনকে যেন এ বিষয়ে কিছুই না জানানো হয়। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বার্থার চিঠির সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছিলো। আগস্ট মাসের শেষে সিন্থিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেই বার্থার কাছে যাওয়া স্থির করে।

সিন্থিয়া রওয়ানা হ'বার দু'দিন আগে মধ্যরাত্রে সদর দরজায় করাঘাত হলো। দু'জনেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। এত রাত্রে কী ব্যাপার! বসবার ঘরের কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে চন্দ্রালোকে সাইমন ও বার্থার ছায়ামূর্তি দেখা গেলো। ছুটে গিয়ে দরজা খুলতে বার্থা শান্ত কণ্ঠে বললো—'তোমাদের জন্য একটি উপহার এনেছি। চমকে দেবো বলে আগে জানাই নি।'

সিন্থিয়ার হাতে সে একটি কাপড়ের পুঁটুলী তুলে দিয়েছিলো। অসীম উৎকণ্ঠায় সিন্থিয়া পুঁটুলীর আবরণ সরিয়ে দেয়। তার পেছন থেকে উইলও পরম কৌতূহলে তাকিয়ে ছিলো। একটি ছোট্ট গোল বাদামী রঙের মুখ। ছ'সপ্তাহ বয়সের একটি শিশু—সে আমি।

একানব্বই

বাবার কাছে শুনেছি আমার মাতামহের পুত্রের আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে পূর্ণ হয়েছিলো। সপ্তাহ খানেক পরে আমাকে ও মাকে হেনিঙে রেখে বাবা ইথাকা ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পড়া শেষ করা দরকার ছিলো। দাদামশায় ও দিদিমা, বিশেষ করে দাদামশায় আমাকে পুত্রাধিক স্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। দিদিমার কাছে শুনেছি—আমি হাঁটতে শেখার আগেই দাদামশায় আমাকে কোলে করে তাঁর কাঠের ব্যবসায়ের অফিসে নিয়ে যেতেন। আমার জন্য সেখানে একটি খাট তৈরী করে রাখা হয়েছিলো। তাতে আমাকে শুইয়ে দিয়ে তিনি নিজের ব্যবসায়ের কাজকর্ম সারতেন। হাঁটতে শিখবার পর আমাকে নিয়ে তিনি শহরে বেরোতেন। আমার তিন পদক্ষেপে তার এক পদক্ষেপে হতো। ক্ষুদ্র মুষ্টিতে তাঁর বাঁ হাতের তর্জনীটি ধরে থাকতাম। পথে পরিচিত লোকের সাথে দেখা হলে তিনি কথা বলতেন। আমি যেন একটি সবল, দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে থাকতাম। লোকের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বিনীত অথচ স্পষ্ট স্বরে কথা বলতে তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। লোকে বলতো—'বাঃ কী সুশিক্ষা!' দাদামশায় বলতেন—'হ্যাঁ, মনে হয় ঠিক পথেই যাচ্ছে।'

কাঠের দোকানে ওক, সিডার, পাইন আর হিকরি কাঠের ছোট বড় টুকরোর ফাঁকে ফাঁকে খেলে বেড়াতাম। কাঠের সুগন্ধে আমার নাক ভরে যেতো। আর কল্পনায় নানা উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের অলীক স্বপ্ন দেখতাম। সে সব কোন সুদূর দেশ আর অলৌকিক যুগের অবাস্তব কাহিনী! দাদামশায় মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর অফিসের মস্তবড় উঁচু ঘোরানো চেয়ারে বসিয়ে দিতেন। চোখে তাঁর নিজের রোদে পরবার কালো চশমা এঁটে দিতেন। চেয়ারে পাক খেতে খেতে আমার মাথা ঘুরে যেতো। দাদামশায়ের সঙ্গ—সর্বত্র, সর্ব সময় আমার কাছে পরম সুখের ছিলো।

আমার পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে কেউই সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে পারছিলো না—এত অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে ডাক্তার আমাকে ঘুম পাড়াবার ঔষধ দিয়েছিলেন। মনে আছে বাড়ীর সামনের রাস্তায় সাদা ও কালো লোকেদের বিরাট লাইন হয়েছিলো। সবাই নত মস্তকে শোকাহত, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। পরের কয়েকদিন আমার স্মৃতিতে কেবলই কান্না। যেন পৃথিবী-সুদ্ধ মানুষ কান্নার সমুদ্রে নিরালম্বন ভাসছিলো।

বাবা তাঁর পড়াশুনা শেষ করে এসে দাদামশায়ের ব্যবসায় অধিগ্রহণ করেন।

পরে বুঝতে পেরেছিলাম এ ধরনের কাজ তাঁর পছন্দ ছিলো না। অধীত বিষয় নিয়ে থাকাই তাঁর মনোগত বাসনা ছিলো। মা স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা নেন। দাদা-মশায়ের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা ও দিদিমার প্রচণ্ড শোক আমাদের পরস্পরের অতি নিকটে নিয়ে এসেছিলো। আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়তাম না। তিনিও সর্বত্র আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন।

শোক ভুলে থাকবার জন্য দিদিমা তাঁর আত্মীয়াদের প্রায়ই তাঁর কাছে আসবার আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁদের বয়স মোটামুটি তাঁরই মতো পয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন—তাঁরা দিদিমার বোন, ভ্রাতৃবধূ, বোনঝি, ভাইঝি ইত্যাদি। তাঁরা একত্র হলে নিজেদের বাল্যকালের গল্প করতেন। মাঝে মাঝে আমাকে দেখিয়ে বলতেন—'আমার তখন ঐ বয়স।' সেই কুঞ্চিতচর্ম প্রৌঢ়ারা কখনো আমার বয়সী ছিলেন—আমি কল্পনা করতে পারতাম না। যাই হোক তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হতো তাঁরা আমার অপরিচিত কোন প্রাচীন দিনের কাহিনী বলছেন।

সেই অল্পবয়সে তাঁদের সব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারতাম না। 'মালিক', 'মালিকানী', 'আবাদ' এসব শব্দ এবং কতকগুলো অদেখা মানুষের নাম প্রায়ই শুনতে পেতাম। তাঁদের মাঝে সবচেয়ে গোড়ার দিকের মানুষটিকে তাঁরা আফ্রিকার লোক বলে উল্লেখ করতেন। সে মানুষটিকে এদেশে তাঁদের উচ্চারণে 'নাপোলিস' বলে একটি জায়গায় জাহাজে করে আনা হয়েছিলো। ভার্জিনিয়া রাজ্যের স্পটসিলভেনিয়া জেলার জন ওয়ালার সাহেব তাকে কিনে নিয়েছিলেন। সেই আফ্রিকার লোকটি প্রথম দিকে বার বার পালাতে চেষ্টা করেছিলো। চতুর্থবার পালাবার পর সে অপরাধে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো যাতে অন্যান্য বন্দীদেরও তা দেখে সমুচিত শিক্ষা হয়। তার একটি পায়ের পাতার অর্ধেক কেটে ফেলা হয়। শ্বেতকায়েরা এমন হীন, অমানবিক কাজ কী করে করতে পেরেছিলো —আমার শিশুমনে তা বুঝে উঠতে পারতাম না।

সেই প্রৌঢ়াদের কাহিনীতেই জেনেছিলাম জন ওয়ালারের ভাই ডাঃ উইলিয়াম ওয়ালার এই অকারণ নৃশংস অঙ্গচ্ছেদে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি ক্রীতদাসটিকে ক্রয় করে নিজের আবাদে নিয়ে এসেছিলেন। চিকিৎসা করে মরণাপন্ন লোকটিকে তিনি সুস্থ করে তোলেন। পঙ্গু হয়ে গেলেও ক্রীতদাসটি কিছু কিছু কাজ করতে পারতো। ডাক্তার প্রথমে তাকে বাগানের কাজে লাগিয়েছিলেন। আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা এই বিশেষ ক্রীতদাসটি তার পঙ্গুতার জন্যই দীর্ঘকাল একই আবাদে থেকে গিয়েছিলো। নইলে সে সময় ক্রীতদাসদের এত ঘন ঘন

ভিন্ন আবাদে বিক্রী করে দেওয়া হতো যে তাদের সন্তানদের পক্ষে নিজের মা বাবাকে চেনা বা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব ছিলো না।

আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা ক্রীতদাসেদের তাদের মালিক নিজেদের ইচ্ছামত নামকরণ করতেন। এই বিশেষ ক্রীতদাসটির নাম দেওয়া হয়েছিলো 'টবি'। কিন্তু দিদিমা ও অন্যান্যদের গল্পে জেনেছিলাম 'টবি' নামে তার বিশেষ আপত্তি ছিলো। অন্যান্য ক্রীতদাসেরা তাকে 'টবি' বলে ডাকলে সে রুষ্ট হয়ে আপত্তি জানাতো এবং বলতো তার নাম কুণ্টা কিণ্টে।

কিছুদিন বাগানের কাজ করবার পর তাকে মালিকের গাড়ীর চালক করা হয়েছিলো। এই 'টবি' অথবা 'কুণ্টা কিণ্টের' সাথে 'বড় বাড়ীর রাঁধুনী' বেল নামে ক্রীতদাসীর বিবাহ হয়। তাদের একটি মেয়ে জন্মায়। তার নাম রাখা হয়েছিলো 'কিসি'। মেয়েটির যখন চার পাঁচ বছর, তার আফ্রিকাদেশীয় বাবা সুযোগ পেলেই তাকে হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যেতো এবং বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে তার আফ্রিকাদেশের ভাষার প্রতিশব্দ শেখাতো। যেমন গীটার দেখিয়ে বলতো—একে 'কো' বলে। আবাদের কাছেই ম্যাটাপনি নদী ছিলো। সেটা দেখিয়ে বলতো 'কাম্বি বলোঙো'। কিসি একটু বড় হয়ে উঠতে ততদিনে তার আফ্রিকাদেশীয় বাবা ইংরাজী ভাষায় অনেকটা দক্ষ হয়ে উঠেছিলো। তখন সে কিসিকে তার নিজের সম্পর্কে, স্বদেশ ও স্বদেশবাসী সম্পর্কে গল্প বলতো। বলেছিলো—সতেরো বৎসর বয়সে যখন গ্রামের কাছে একটি জঙ্গলে সে ঢাক বানাবার জন্য কাঠ কাটতে গিয়েছিলো, তখন চারজন সাদা মানুষ তাকে জোর করে ধরে এনে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে।

এই কিসিকে তার ষোলো বৎসর বয়সে নর্থ ক্যারলিনার একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আবাদের মালিক টম লী-র কাছে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছিলো। সেখানে তার একটি পুত্র হয়। পুত্রের পিতা টম লী তার নাম রেখেছিলেন জর্জ। মালিকের লড়াইয়ে মোরগগুলোর দেখাশোনার কাজে তার অত্যন্ত উৎসাহ ছিলো এবং মোরগ লড়াইয়ে অতিশয় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলো বলে সবাই তাকে চিকেন জর্জ বলে ডাকতো। নিকটবর্তী আবাদের ম্যাটিলডা নামে এক ক্রীতদাসীর সাথে তার বিবাহ হয়। সেই বিবাহের ফলে তাদের আটটি সন্তান হয়। চিকেন জর্জ তার মা কিসির কাছে দাদামশায় কুণ্টা কিণ্টে, দিদিমা বেলের কথা শুনেছিলো। কিসিকে তার বাবা নিজের সম্পর্কে ও স্বদেশ সম্পর্কে যা কিছু কাহিনী এবং আফ্রিকাদেশের ভাষায় যে সব শব্দ বলেছিলো সব সে তার পুত্র জর্জকে গল্পচ্ছলে জানিয়েছিলো।

জর্জ সঙ্কল্প করেছিলো সেও যথাসময়ে তার সন্তানদের ঐ সব কাহিনী বলবে। প্রত্যেকটি সন্তানের জন্মের পর পরিবারের সকলকে একত্র করে নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে চিকেন জর্জ তার আফ্রিকদেশীয় মাতামহের কাহিনী, কিণ্টে বংশের ইতিহাস, স্বদেশীয় পরিভাষায় যে সব জিনিসের নাম কিসিকে শেখানো হয়েছিলো —সব কিছুর পুনরাবৃত্তি করতো। ম্যাটিলডা ও তার পুত্রদের কিসি শপথ করিয়েছিলো—তাদের পরিবারে জাত প্রতিটি শিশুকে জন্মের পর কুণ্টা কিণ্টের উপাখ্যান শোনাতে হবে। জর্জও তার ছেলেদের সেরকম নির্দেশ দিয়েছিলো।

জর্জের আটটি সন্তান বড় হয়ে বিবাহাদি করে। চতুর্থ পুত্র টম কর্মকারের কাজে বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলো। সেই সময় তাদের মালিক টম লী চিকেন জর্জকে ক্রীতদাস হিসাবে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর বাকী পরিবারটিকে নর্থ ক্যারলিনার অ্যালাম্যানস্ জেলার মিঃ মারের কাছে বিক্রী করে দেন। সেখানে চতুর্থ পুত্র টমের সাথে নিকটবর্তী আবাদের আইরিন নামে একটি অর্ধইণ্ডিয়ান ক্রীতদাসীর বিবাহ হয়। ক্রমে তাদেরও সাতটি সন্তান হয়েছিলো। টম প্রতিটি সন্তানের জন্মের পর পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী সকলকে একত্র করে, নবজাতককে কোলে নিয়ে তাদের আফ্রিকাদেশীয় পূর্বপুরুষের ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতো। আফ্রিকা দেশের ভাষায় কুণ্টা কিণ্টের উল্লিখিত শব্দগুলিও বলা হতো। সেই সাতটি সন্তানের সর্বকনিষ্ঠা সিন্থিয়া। তার দুই বৎসর বয়সে তার বাবা টম ও ঠাকুরদা চিকেন জর্জ কয়েকটি সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস পরিবার নিয়ে এসে টেনেসি রাজ্যের হেনিঙ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। বাইশ বৎসর বয়সে সিন্থিয়ার উইল পামারের সাথে বিবাহ হয়। তাঁদের একমাত্র কন্যা বার্থা—আমার মা।

হেনিঙে দিদিমার কাছে থাকাকালেই আমার আরো দুটি ভাই হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পর আমার বাবা দিদিমাকে কাঠের ব্যবসায় বিক্রী করে দিয়ে কৃষি বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ নিয়ে হেনিঙ ছেড়ে চলে যান। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে আমার মা মারা যান। আমরা তখন বাবার কর্মস্থল অ্যালাব্যামায় ছিলাম। তারপরও কিছুকাল আমরা তিন ভাই দিদিমার কাছে গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়েছি। কিন্তু ক্রমে দিদিমার মাঝে অনেক পরিবর্তন এসেছিলো। দাদামশায় এবং আমার মায়ের মৃত্যুতে তাঁর সতেজ, আনন্দময় স্বভাবের উজ্জ্বল দীপ্তি নিভে গিয়েছিলো।

দু'বছর কলেজে পড়বার পর সতেরো বৎসর বয়সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি

যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল রক্ষিবাহিনীতে যোগ দিই। জাহাজে যথেষ্ট কাজের অভাবে সময় কাটানো দুরূহ হয়ে উঠেছিলো। বাবার উৎসাহে আমি স্কুলে পড়বার সময়েই টাইপ করতে শিখেছিলাম। জাহাজে একটি ছোট টাইপ রাইটার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। সবাইকে টাইপ করে চিঠি লিখতাম। আর জাহাজের ছোট্ট লাইব্রেরীর বইগুলো বার বার পড়তাম। সঙ্গীদের কাছে যত বই ছিলো—সব, আর লাইব্রেরীর বইগুলোর প্রতিটি তিন চার বার করে পড়া শেষ হয়ে যেতে নিছক সময় কাটাবার জন্যই লিখতে শুরু করি। টাইপ রাইটারে একটা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে এমন কিছু লিখে বার করে নেওয়া যায় যা লোকে সাগ্রহে পড়বে, এই কল্পনাটা আজও আমাকে বিস্মিত ও উল্লসিত করে তোলে। রাতের পর রাত অক্লান্তভাবে লিখে যাবার শক্তি ও ধৈর্য কে আমাকে দিয়েছিলো—জানি না! শত শত পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছি—প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আট বৎসর পরে আমার লেখা প্রথম একটি পত্রিকায় ছাপানো হয়। লেখা আমি কখনোই ছেড়ে দিইনি। ফলে উপকূল রক্ষিবাহিনীর পরিচয়পত্রে যুদ্ধের পর সাংবাদিক হিসাবে আমার নামের পেছনে নতুন যোগ্যতার সংযোজন হয়। ক্রমে আমার লেখার চাহিদা বাড়ছিলো। লেখাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করবার সঙ্কল্প জোরালো হচ্ছিলো। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে কুড়ি বছরের চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করি।

সমুদ্র আমি ভালোবাসি। দুঃসাহসিক অভিযান আমার প্রিয় বিষয়। রীডারস ডাইজেস্ট নামক পত্রিকার কাছ থেকে--যাঁরা উত্তেজনাপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন বা যাঁদের জীবনে নাটকীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন লোকের জীবনী লিখবার ফরমাইশ পেয়েছিলাম। আমার লেখার প্রয়োজনে প্রায়ই আমাকে লণ্ডনে যেতো হতো। সেখানে ইতিহাসের এত মূল্যবান তথ্য চারিদিকে ছড়ানো আছে যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াতাম। তেমনি এক সময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম! সেখানে রসেটা স্টোন নামে একটি বিখ্যাত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই।

এই পাথরটি নীল নদের মুখে পাওয়া গিয়েছিলো। তার তিন ধারে তিনটি পৃথক ভাষায় লেখা ছিলো। একটিতে গ্রীক ভাষা। অপর দুই ধারের একটিতে অজানা চিত্রলিপি। অপর দিকেও একটি অজ্ঞাত ভাষা। লোকের ধারণা হয়ে গিয়েছিলো ঐ দু'ধারের বক্তব্যর রহস্যভেদ করা মানুষের অসাধ্য। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত জাঁ শ্যাম্পলিয়ন সেই অসাধ্য সাধন করেন। অজ্ঞাত ভাষা দু'টির রহস্যভেদ করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন রসেটা স্টোনের তিন ধারের লেখাই সমার্থক। তাঁর

গবেষণার আরো একটি উল্লেখযোগ্য সুফল হয়েছিলো। মানবজাতির প্রাচীন যুগের ইতিহাসের অনেকটাই ঐ অজানা চিত্রলিপিতে লেখা থাকায় এতদিন তা রহস্যাবৃত ছিলো। জঁা শ্যাম্পলিয়ন একটি অনাবিষ্কৃত রহস্যলোকের রুদ্ধদ্বার খুলে দিতে সমর্থ হ'ন।

এই ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মনে হচ্ছিলো এই গবেষণার ফল ব্যক্তিগত ভাবে আমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেন, তা স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। প্লেনে করে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরবার পথে হঠাৎ আমার মনে আলোকপাত হয়। একটি অভিনব চিন্তাধারা ক্রমে রূপ নিচ্ছিলো। ফরাসী পণ্ডিত আমাদের পরিচিত ভাষার সাথে পাথরে খোদাই করা অজ্ঞাত ভাষার অর্থের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করেছিলেন। আমার দিদিমা এবং তাঁর সমসাময়িক মহিলারা হেনিঙের বাড়ীর বারান্দায় বসে গল্পচ্ছলে তাঁদের আফ্রিকাদেশীয় পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত কতকগুলো রহস্যময় শব্দের উল্লেখ করতেন। তিনি তাঁর বংশের নাম বলেছিলেন 'কিনটে'। গীটারকে তিনি 'কো' বলতেন। ভার্জিনিয়ার একটি নদীকে 'কাম্বি বলোঙো' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এগুলি আফ্রিকা মহাদেশের কোন উপভাষার অন্তর্গত? আমি কি তা বার করতে পারি না?

আমার দিদিমা মারা গিয়েছিলেন। ততদিনে সেই প্রাচীন মহিলাদের মাঝে শুধু একজনই বেঁচে ছিলেন। তাঁর কাছে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলতে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বহু আবৃত্ত সেই পারিবারিক ইতিহাস নতুন করে আমাকে আর একবার শোনালেন। বললেন—'তোমার দিদিমা এবং অন্যান্য সবাই ওপর থেকে তোমাকে দেখছেন। এ কাজ করলে তাঁরা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।' কল্পনাটি আমাকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করলো।

কিছুদিন পর ওয়াশিংটন ডি. সি.-র ন্যাশনাল আরকাইভসে গিয়েছিলাম। নর্থ ক্যারলিনার অ্যালাম্যানস জেলার সিভিল ওয়ারের পরের সেন্সাস রিপোর্ট খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ চোখে পড়লো—'টম মারে, কালো, কর্মকার— —। আইরিন মারে, কালো, গৃহিণী— —।' তারপর দিদিমার বড় দিদিদের নাম লেখা।

দিদিমাদের গল্প আমি কোনকালেই অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী নথিপত্রে সেই বহুশ্রুত নামগুলো ছাপার অক্ষরে কেমন অবাস্তব দেখাচ্ছিলো। যেন নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর থেকে আমার কাজ হলো বারবার ওয়াশিংটন ন্যাশনাল আরকাইভস ও অন্যান্য লাইব্রেরীতে গিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসন্ধান চালানো। সে সব

জায়গার কৃষ্ণকায় পরিচারকেরা আমার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য জানতো। সকলেই আমাকে সাধ্যমত সাহায্য করতো। আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে এনে দিতো। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের বহু আদৃত পারিবারিক ইতিহাসের অনেকটাই সংগ্রহ হয়ে গিয়েছে। দিদিমাকে কাছে পেতে, তাঁকে সব জানাতে প্রচণ্ড ইচ্ছা হতো। তখন আমার সেই বৃদ্ধা আত্মীয়ার কথা মনে পড়তো—'তাঁরা সবাই ওপর থেকে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন।'

কুন্টা কিন্টের উল্লিখিত ঐ শব্দগুলো আফ্রিকার কোন উপজাতির ভাষার অন্তর্গত এবার তা জানা দরকার। আফ্রিকায় বহু উপজাতি। তাদের ভাষাও আলাদা। প্রচুর অনুসন্ধানের পর কিসির কাছে গল্পচ্ছলে বলা শব্দগুলি মানডিনকা উপজাতির ভাষাতে পাওয়া গেলো। কাম্বি বলোঙো মানে গাম্বিয়া নদী; কিন্টে বংশ গাম্বিয়া রাজ্যের একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত বংশ। এরপর আফ্রিকাতে গিয়ে আমার আরো কিছু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। কিন্তু এত দূরে যাওয়া যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিছুকাল যাবৎ এই অনুসন্ধানের কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কোন লেখায় হাত দিতে পারেনি। ফলে উপার্জনের পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

একসময় রীডারস ডাইজেস্টে প্রকাশিত আমার একটি লেখা পড়ে মিসেস ডিউইট ওয়ালেস নামে এক ভদ্রমহিলা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলে রেখেছিলেন—কখনো প্রয়োজন হলে যেন তাঁকে জানাই। অনেক ইতস্ততঃ করে তাঁকেই একটি চিঠি লিখলাম। তাঁরই চেষ্টায় রীডারস ডাইজেস্ট আমার আফ্রিকা যাত্রার ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়।

আফ্রিকাতে একটি সম্প্রদায় আছে—দেশের ইতিহাস মুখে মুখে আবৃত্তি করে শোনানো তাদের কাজ। এই চারণদের মাধ্যমেই দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তথ্যের বিবরণী রক্ষিত হয়। কোন লিখিত ইতিহাস থাকে না। আমার সাথে দো-ভাষী ছিলো। জুফরে গ্রামে পৌঁছে সেখানকার চারণকে খুঁজে বার করা হলো। আমার দোভাষীরা যখন তার সাথে কথা বলতে ব্যস্ত তখন গ্রামবাসীরা আমার চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছিলো। আমাকে গোল হয়ে ঘিরে তারা এমন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো যে আমি একটু বিপর্যস্ত বোধ করছিলাম। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম এমন একান্ত পর্যবেক্ষণের মতো কী বৈশিষ্ট্য আমার আছে! আমাকে ঘিরে লোকের সমাবেশে আমি অনভ্যস্ত নই। কিন্তু এ জনতার সাথে তার কী যেন পার্থক্য ছিলো। অবশেষে খেয়াল হলো—এখানকার প্রতিটি মানুষ অবিমিশ্র কালো। নিজের বাদামী রঙের হাতের দিকে তাকিয়ে জীবনে সেই প্রথম নিজের

বর্ণসংকরতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। আমার চারিপাশে যারা ভীড় করে আছে—প্রত্যেকেই বিশুদ্ধ বর্ণের। একা আমিই সেখানে কৌলীন্যহীন। একটা অভাবনীয় লজ্জাবোধে আমার মাথা নীচু হয়ে এলো।

বৃদ্ধ চারণ কিণ্টে বংশের যশোগাথা শুরু করলো। একেবারে বংশের প্রথম পুরুষ থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যক্তির অতি বিশদ বিবরণ। কৈরাবা কুণ্টা কিণ্টের তিন পুত্র ছিলো। কনিষ্ঠ পুত্র অমোরোর ত্রিশ বৎসর বয়সে বিণ্টা কেব্বা নামে এক মানডিনকা বংশীয়া কন্যার সাথে তার বিবাহ হয়। আনুমানিক ১৭৫০ থেকে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের মাঝে তাদের কুণ্টা, ল্যামিন, সুওয়াডু ও ম্যাডি নামে চারটি পুত্র জন্মায়। এদের মাঝে জ্যেষ্ঠ কুণ্টা একদিন গ্রামের বাইরে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলো। তাকে আর কখনো দেখা যায়নি।

আমি প্রস্তরীভূত হয়ে গেলাম। এ লোকটি সারাজীবন এই সুদূর অনুন্নত দেশে কাটিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। টেনেসি রাজ্যের হেনিঙে দিদিমার বাড়ীর বারান্দায় বসে বাল্যকালে আমি যে কাহিনী শতবার শুনেছি, এর পক্ষে তা জানবার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না। অথচ যথার্থই বহু দূরের ভার্জিনিয়া দেশে এক আফ্রিকাবাসী দৃঢ়তার সাথে বার বার সকলকে জানিয়েছিলো—তার প্রকৃত নাম কিণ্টে। সে গীটারের নাম 'কো' বলেছিলো। ভার্জিনিয়া দেশের একটি নদীকে সে 'কাম্বি বলোঙো' নামে অভিহিত করেছিলো। সে জানিয়েছিলো—একটি ঢাক বানাবার জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে গিয়ে সে অপহৃত হয় এবং অবশেষে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কোনক্রমে ব্যাগ থেকে নোট বই বার করে আমি দোভাষীকে দেখালাম। সেখানে দিদিমার বলা কুণ্টা কিণ্টের কাহিনী লেখা ছিলো। সে পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। চারণকে নোটবই দেখিয়ে বুঝিয়ে বলতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। উপস্থিত জনতাকে ব্যাপারটা জানাতে তারা সকলেই নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

কেউ তাদের কোন নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু আমার চারিপাশে যারা ঘিরে ছিলো তারা নিজেরাই একটা বৃত্ত রচনা করে ফেললো। তারপর সুসংবদ্ধভাবে নাচতে নাচতে গান শুরু করলো। দশ বারোটি মেয়ের পিঠে কাপড়ের ফালিতে ক্ষুদ্র শিশু বাঁধা ছিলো। তাদেরই একজন এগিয়ে এসে তার শিশুটিকে আমার কোলে তুলে দিলো। মেয়েটির ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখখানি গভীর আবেগে উদ্দীপ্ত। আমার কোলে তুলে দিয়ে আবার সে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিলো। এমনি করে প্রতিটি শিশুর মা-ই তাদের কোলের শিশুকে আমার কোলে তুলে দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিচ্ছিলো।

প্রায় এক বৎসর পরে হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির প্রফেসর ডাঃ জেরোম ব্রুনারের কাছে জেনেছিলাম এটি মানবজাতির একটি অতি প্রাচীন উৎসব। তারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলো—এই রক্তমাংস আমাদের। এ তোমার হলো। তুমি আমাদের হ'লে।

ফিরবার পথে পরদায় প্রতিফলিত ছায়াচিত্রের মতো আমার মানসচক্ষে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠছিলো। সবই আমার পূর্বশ্রুত কাহিনীর প্রতিফলন। আমার লক্ষ লক্ষ পূর্বপুরুষকে এরা কুণ্টা কিণ্টের মতো একজন একজন ক'রে বাহুবলে পরাজিত করে বন্দী করেছিলো। আবার কোথায়ও বা অপহরণকারীর দল গ্রামসুদ্ধ জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুদূর বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করবার জন্য হতভাগ্য বন্দীদের গলায় গলায় বেঁধে দীর্ঘ সারিবদ্ধ লাইনে সমুদ্রতীর পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অমানুষিক অত্যাচারে শত শত লোক পথেই প্রাণ হারিয়েছে। যারা সমুদ্রতীরে পোঁছোতে পেরেছিলো. তাদের সর্বাঙ্গে চর্বি মাখিয়ে, চুল কামিয়ে নির্লজ্জ অবহেলাভরে প্রতিটি অঙ্গ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছিলো, জলন্ত লোহা দিয়ে গায়ে চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলো। শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীদের প্রচণ্ড কশাঘাত, জাহাজে তুলবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিষ্ঠুরভাবে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া—সবই যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার পূর্বপুরুষেরা স্বদেশ আঁকড়ে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টায় শিকলে বাঁধা অক্ষমদেহে সমুদ্রতীরের বালি মুখে কামড়ে ধরেছিলো। নির্মমভাবে মারতে মারতে জোর করে তাদের জাহাজের দুর্গন্ধ খোলের ভিতর গাদাগাদি করে ঠেসে দেওয়া হয়েছিলো। তাদের নড়বার এমন কি পাশ ফিরবার জায়গা পর্যন্ত ছিলো না। প্রতিটি বন্দী একের সাথে অপরে হাতে হাতে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল।

ততক্ষণে আমার পরিচয় চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। পথের দু'পাশে যুবক, শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ ভীড় করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে 'মীস্টার কিণ্টে' 'মীস্টার কিণ্টে' বলে চিৎকার করছিলো। আমি পরিণতবয়স্ক পুরুষ। বলতে দ্বিধা নেই, সেদিন দুই হাতে মুখ ঢেকে আমি শিশুর মতো অবাধে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছিলাম। আমার স্বদেশবাসীর প্রতি সেই অবিশ্বাস্য, অমানবিক অত্যাচারের ইতিহাস সমগ্র মানবজাতির কলঙ্ক বলে বোধ হয়েছিলো।

আফ্রিকা থেকে ফিরে যাবার পথে সঙ্কল্প করেছিলাম—একটি বই লিখবো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি কৃষ্ণবর্ণ মানুষের পেছনে নিশ্চয় কুণ্টার মতো একজন পূর্বপুরুষের

অস্তিত্ব আছে, একজন আফ্রিকাবাসী—যাকে বন্দী করে, শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জাহাজে সমুদ্রপার করে নিয়ে এসে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিলো।

পরে ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ডে সরকারী নথিপত্রে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বরের তারিখে একটি আইনসিদ্ধ দলিল খুঁজে পাই। জন ওয়ালার ও তাঁর স্ত্রী অ্যান ওয়ালার উইলিয়াম ওয়ালারকে কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সাথে 'টবি' নামে একজন নিগ্রো ক্রীতদাসকে হস্তান্তর করেছিলেন।

'শিকড়ের সন্ধানে' কাহিনী লিখবার আগে আমি আবার আফ্রিকাতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জাহাজে করে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরি। আফ্রিকা থেকে সোজা যুক্তরাষ্ট্রে আসে এমন কোন মালবাহী জাহাজের সন্ধান করছিলাম। কুণ্টা কিণ্টেদের ক্রীতদাসবাহী জাহাজের যে পথ পার হতে প্রায় একশো দিন লেগেছিলো, আধুনিক মালবাহী জাহাজ সে পথ মাত্র দশদিনে অতিক্রম করেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আহারের পর বেশ ক'টি লোহার মই একটার পর একটা অতিক্রম করে জাহাজের অতি গভীর, ঠাণ্ডা, অন্ধকার খোলের ভিতর নেমেছি। উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন করে সেখানকার কর্কশ, নিরাবরণ কাঠের উপর শুয়ে থেকেছি।

কুণ্টা কিণ্টের শারীরিক ও মানসিক মরণাধিক যন্ত্রণা কল্পনায় অনুভব করতে চেষ্টা করেছি। অবশ্য আমার বিলাসবহুল সমুদ্রযাত্রার সাথে কুণ্টা কিণ্টে ও তার সঙ্গীদের অতি ভয়ঙ্কর অগ্নি পরীক্ষার কোন তুলনাই হয় না।

অনেকে প্রশ্ন করবেন 'শিকড়ের সন্ধানে' কতটা সত্য ঘটনা আর কতটা কল্পনা। আমি সাধ্যমত আমার আফ্রিকাবাসী ও আমেরিকাবাসী আত্মীয়দের মুখে মুখে রক্ষিত কাহিনীর প্রতি অনুগত থেকেছি, সরকারী দলিলপত্রে প্রাপ্ত প্রামাণিক তথ্য অনুসরণ করেছি। রসেটা স্টোন দেখার পর বারো বৎসর ধরে এই অনুসন্ধান চালিয়েছি। এ কাজে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করেছি। অসংখ্য লোকের সাথে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনটি মহাদেশের অন্ততঃ পঞ্চাশটি লাইব্রেরী, আরকাইভস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন নিয়ে গবেষণা করেছি।

কাহিনীর ঘটনাকালে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই কথাবার্তা, দৈনন্দিন ইতিবৃত্তে কিছুটা নাটকীয়তার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যেমন ঘটা সম্ভব বলে নিজের মনে অনুভব করেছি, প্রকৃত তথ্যের সাথে ততটুকুমাত্র সংযোজিত হয়েছে।

আমার বিশ্বাস দিদিমা ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বৃদ্ধারা ওপর থেকে গভীর

আগ্রহে আমার পরিশ্রম ও গবেষণার উপর লক্ষ্য রেখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অবশ্যই আমাকে সঠিক পথনির্দেশও করেছেন। এ ছাড়া কুণ্টা ও বেল, কিসি, চিকেন জর্জ ও ম্যাটিলডা, টম ও আইরিন, আমার দাদামশায় উইল পামার এবং আমার মা বার্থা এঁরাও নিশ্চয় সকৌতূহলে এই রচনার দিকে তাকিয়ে আছেন। সবার শেষে তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমার বাবা। তাঁর তিরাশি বৎসর বয়স হয়েছিলো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা ওপর থেকে যেমন আমার এ প্রচেষ্টার ওপর লক্ষ্য রেখেছেন, তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে এ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার সার্থকতাও অনুভব করেছেন।

এ জগতে ইতিহাস রচনার অধিকার একমাত্র বিজয়ী পক্ষের নয়। নিপীড়িত-জনের রচিত ইতিহাসও কোন কোন ক্ষেত্রে মহত্তর হয়ে ওঠে।